চিহ্ন মাত্র নাই, জাতীয়ভাবের সংস্পর্শ নাই। সেই সমস্ত ভাব আজিও কিছুই উন্মূলিত হয় নাই। নীচ শ্রেণীস্থ লোকের কথা দূরে থাক, অর্দ্ধশিক্ষিত ভদ্রজনগণের মুখে আজিও সেই পূর্ব্বকার ভাবের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত ভাব বিষয়ে নীচ শ্রেণীস্থ জনগণ হইতে ভদ্রলোকের বড় প্রভেদ নাই; তাঁহারা কেবল জাতিতে শ্রেষ্ঠ; কিন্তু আর কিছুতেই তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীত হয় না। জাতিতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কেবল ব্যবসায়ে ভিন্ন। তাঁহারা জাতিতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া, যে ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন, যে চাকরী, যে গোলামী করিয়া বেড়ান, তাহারই গৌরব বৃদ্ধি করিয়া থাকেন, এবং এই গৌরবে পূর্ণ হইয়া আত্মাভিমানে আপনাদিগকে বড় লোক বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে, শ্রেষ্ঠ জাতি সমুদায়কে চাকরী করিতে দেখিয়া নীচ-জাতীয় লোকেরাও সাধ্য হইলে আপনাপন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ব্যবসায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক চাকরী করিয়া ভদ্রলোক হইতে চেষ্টা করিতেছেন। ইহাতে স্বাধীন ব্যবসায়ের বিলক্ষণ ক্ষতি হইতেছে। যাহারা নিতান্ত অজ্ঞ, ক্ষমতাহীন, দীন ও দরিদ্র তাহারাই কেবল স্বজাতীয় বৃত্তি অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। ক্ষমতাবানেরা ভদ্রলোক হইয়া দাড়াইয়াছেন। সুতরাং স্বাধীন ব্যবসায়ের একান্ত হীনাবস্থা ঘটিযাছে। সমস্ত স্বাধীন ব্যবসায় নীচ হইতে নীচতর হইয়া যাইতেছে। এক্ষণে স্বজাতীয় ব্যবসায় করাও নীচ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রাচীন কালের সুব্যবস্থা সকল এক্ষণে বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইতেছে। যে সদুদ্দেশ্যে এই ব্যবসায় সকল বংশ-পরম্পরা ক্রমে ধারাবাহিক করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, যাহাতে জাতির সৃষ্টি হইয়াছিল, এক্ষণে সেই উদ্দেশ্য বিফল হইতেছে। এক্ষণে বঙ্গধামে আর শিল্পের চাতুরী, কৌশল ও উৎকর্ষ দৃষ্টিগোচর হয় না। ব্যবসায় জাতীয় এবং বংশপরম্পরা ক্রমে ধারাবাহিক ছিল বলিয়া, প্রাচীন কালে বঙ্গীয় শিল্প এত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, এবং তাহার গৌরবে ইউরোপীয় বণিক্‌গণও আকৃষ্ট হইয়াছিলেন *। এক্ষণে সেই স্বাধীন ব্যবসায় সকলের গৌরব কমিয়া চাকরীর গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। ভদ্রলোকের নীচ ভাব সকল নিম্ন শ্রেণী মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। কোথায় বঙ্গদেশ ইউরোপীয় স্বাধীন বাণিজ্যের সংস্রবে দেশীয় ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন করিবে, তাহার গৌরব বৃদ্ধি করিবে, না সেই ব্যবসায় সকল পরিবর্জ্জন করিয়া উৎসন্ন যাইতেছে। আজি বঙ্গদেশ যদি ব্যবসায়ী হইয়া ইংরাজী বাণিজ্যের ধূমধামে মাতিয়া যাইত, নিশ্চয় বলিতে পারি, তাহা হইলে

* Vide Appendix to Dr. Robertson's Historical Disqusition concerning the knowledge which the Ancients had of India.

বঙ্গদেশ সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইত। স্বাধীন ব্যবসায়ের গৌরব বৃদ্ধি হইত। স্বাধীন চিন্তা প্রসারিত হইত। স্বাধীন ভাব সকল উন্মেষিত হইত। সমাজ স্বাধীন ভাবে সংগঠিত হইয়া আসিত। বঙ্গবাসিগণের স্বাধীন কার্য্যে শক্তির বল বৃদ্ধি হইত। তাঁহারা একটি গণনীয় জাতি হইয়া দাঁড়াইতেন। বঙ্গদেশের মুখ উজ্জল হইত। এরূপ না ঘটিয়া এক্ষণে ইহার ঠিক বিপরীত ঘটিয়াছে। স্বাধীন বৃত্তি সকল চাকরীতে লোপ পাইতেছে। সর্ব্ব সাধারণে এক্ষণে নীচ প্রকৃতির লোক হইয়া দাঁড়াইতেছেন। দাস্য বৃত্তিতে সমুদায় স্বাধীন প্রবৃত্তির লোপ করিতেছেন। দাস্যকেই গৌরবে পূর্ণ করিতেছেন। ক্রমে বাঙ্গালী জাতি একটি প্রকাণ্ড দাস জাতি হইয়া পড়িতেছেন। বাঙ্গালী জাতির এইরূপ গতি চলিলে আর পঞ্চাশৎ বৎসর পরে বঙ্গদেশ দাসের দেশ হইয়া দাঁড়াইবে। এদেশে চাকরী না জুটিলে, বাঙ্গালীরা দেশ দেশান্তরে চাকরী করিতে বহির্গত হইবেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র বাঙ্গালী দাসে পরিপূর্ণ হইবে। পৃথিবীতে বাঙ্গালীর নাম আর দাসের নাম এক হইয়া যাইবে।

এই কি উন্নত ইংরাজী শিক্ষার ফল? এই কি স্বাধীন ইংরাজজাতির সহিত সম্মিলন ও সহবাসের ফল? এই কি স্বাধীনভাবাপন্ন ইংরাজী সাহিত্য শিক্ষার পরিণাম? বাঙ্গালী জাতি না গৌরব করিয়া থাকেন, তাঁহারা ইংরাজী সাহিত্য শিক্ষায় ভারতীয় অপরাপর জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর? ইংরাজী-সাহিত্য শিক্ষার কি এই শ্রেষ্ঠতর ফল? ভারতের রাজধানীতে থাকিয়া ইংরাজী বাণিজ্য ব্যবসায়ের ধুমধামে পরিবৃত থাকিয়া বাঙ্গালী কি এই ফল লাভ করিলেন? তিনি দাসত্বে কেবল নিপুণ হইলেন! এই কি বাঙ্গালীর বুদ্ধি ও শ্রেষ্ঠতা! এই বুদ্ধি ও শ্রেষ্ঠতা লইয়া তিনি আবার বড় হইতে চাহেন। আগে তিনি দাসত্ব পরিত্যাগ করুন; আগে তিনি আপনি স্বাধীন হউন; দাসের কলঙ্ক আপনার গাত্র হইতে প্রক্ষালণ করুন, তার পর সমাজকে স্বাধীন করিতে যাইবেন। তিনি নিজে যতক্ষণ চাকরী করিবেন, পরের দাসত্ব করিবেন, ততক্ষণ সমাজকে সেই দাসত্ব শিক্ষা দিবেন, এবং সেই দাস্যে ক্রমে ক্রমে অপরকে আকৃষ্ট করিবেন। আপনি স্বাধীন হউন, পরকেও স্বাধীন করিতে পারিবেন। আপনি স্বাধীন হইয়া দেশ মধ্যে উপদেশে এবং কার্য্যে স্বাধীনতা শিক্ষা দিন, আপনার অদূর প্রসর জীবন-ক্ষেত্র মধ্যে স্বাধীনতার বীজ রোপিত করুন, নিজে স্বাধীন হউন, নিজ পল্লীকে স্বাধীন ভাবে পূর্ণ করুন, ক্রমশঃ সমাজ মধ্যে স্বাধীন ভাব আপনাপনি প্রচারিত হইবে। ইহাই কার্য্যের সোপান। ইহাই সমাজ সংস্কারের সহজ পন্থা। ইহাই উন্নতির স্বাধীনতার মূল। ক্রমশঃ শ্রীপূ

ম্যাট্‌সিনি ও নব্য ইতালী।

[illegible]

[illegible] প্র[illegible]কলন [illegible] বাজনৈতিক, [illegible] যে কোন বিপ্লব সাধন করিতে যাও না কেন, অগ্রে তোমাকে অন্তর্ব্বিপ্লব সাধন করিতে হইবে ;—অগ্রে তোমাকে লোকের মনের ভাবস্রোত তদনুকূল দিকে প্রধাবিত করিতে হইবে। অভীপ্সিত কার্য্যারম্ভ হওয়ার অগ্রে লোকের মনকে অনুকূলভাবে প্রমত্ত করিতে হইবে। লোকের মন অনুকূল ভাবে প্রমত্ত হইলে, তাহা কার্য্যের দিকে অপ্রতিহত বেগে আপনিই প্রধাবিত হইবে। সে বেগ নিবারণ করে কাহার সাধ্য? 'ক ঈপ্সিতার্থস্থিরনিশ্চয়ং মনঃ পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ?' অভিলষিত বিষয়ে দৃঢ়সঙ্কল্প মন ও নিম্নাভিমুখিনী স্রোতস্বিনীর গতি কে রোধ করে? এ স্রোতের বেগে পাহাড় পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া যায়, দুর্লঙ্ঘ্য বাধা বিপত্তি সকল অন্তর্হিত হয়। এই অন্তর্ব্বিপ্লব সাধন করাই—জনসাধারণের মানসিক ভাবস্রোতের গতি পরিবর্ত্তন করাই—সংস্কারকদিগের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। এই গভীর বিপ্লব সাধনের দুই মাত্র অস্ত্র—লেখনী ও জিহ্বা। বাগ্মী হৃদয়ালোড়নকারিণী বক্তৃতা দ্বারা সমাগত শ্রোতৃবর্গের চিত্ত উন্মাদিত করিয়া দেন; লেখক হৃদয়প্রজ্বালন-কারিণী রচনা দ্বারা অনাগত পাঠকবৃন্দের হৃদয়কে অগ্নিময় করিয়া তুলেন। অন্তর্বিপ্লব সাধন করিতে হইলে এই দুই শ্রেণীর সংস্কারকেরই একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু অধীন দেশে বাগ্মীর সংখ্যা অতি বিরল। ইতালী বহুকাল হইতে অধীনতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ রহিয়াছে। যে ইতালী একদিন বাগ্মিকশ্রেষ্ঠ সিসিরোর বক্তৃতায় উন্মাদিত হইয়াছিল, সেই ইতালী এক্ষণে চির-অধীনতায় নীরব। অষ্ট্রিয়ার দৌরাত্ম্যে মনের দুঃখ ব্যক্ত করিতেও অক্ষম! পিশাচদিগের আবির্ভাবে সেই দেবভূমি এক্ষণে শ্মশান! কুত্রাপি জীবনের কোন চিহ্ন উপলক্ষিত হইতেছে না; কেবল সেই পিশাচ-সমাচ্ছন্ন ভীষণ শ্মশানের অদূরে কয়েকটী নির্ভীক কাপালিক একত্রিত হইয়া শব সাধন করিতেছিলেন মাত্র। বলা বাহুল্য মাত্র যে এই কাপালিক সমাজ নির্ব্বাসিত ম্যাট্‌সিনি ও তৎ-সহচরবৃন্দ দ্বারা সংগঠিত। সেই কাপালিক সমাজ পৈশাচিক আবির্ভাব হইতে ইতালীকে উন্মুক্ত করিবার জন্য—ইতালীয়দিগের মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করিবার নিমিত্ত, ভগবতী সঞ্জীবনী শক্তির আরাধনা আরম্ভ করিয়াছেন। কিয়ৎকাল দেবীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেই

তাঁহারা অনুপ্রাণিত হইলেন। তাঁহাদিগের অবসন্নপ্রায় হৃদয় ভাব-বেগে উচ্ছ্বলিত হইল। তাঁহাদিগের শিথিলিত হস্ত নূতন বল পাইয়া লেখনী ধারণ করিল। তাঁহারা পিশাচগ্রস্ত ইতালীয়দিগের রুধিরে—তাঁহাদিগেরই বক্ষফলকে এই মূল মন্ত্রগুলি লোহিতবর্ণে অঙ্কিত করিলেন :—

"ভ্রাতৃগণ! তোমরা পিশাচদিগের হস্তে পতিত হইয়াছ! তোমাদিগের হৃদয় ক্রোধে ও দুঃখে ভস্মীভূত হইতেছে! তোমাদিগের শোণিত ভয়ে শুষ্ক হইতেছে! পিশাচ-তাড়নে তোমাদিগের মাংস অস্থি হইতে বিশ্লেষিত হইতেছে! কিন্তু ভয় পাইও না। হৃদয়ে ভবিষ্যতে বিশ্বাস স্থাপন কর এবং সিদ্ধির আশা ধারণ কর, দেখিবে অবিলম্বেই সমস্ত অন্ধকার তিরোহিত হইবে। আমাদিগের এই উক্তি নির্ব্বাসিতের বিলাপমাত্র মনে করিও না।

আমরা জানি যে এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত অনেক সময় কেবল বৃথা বাক্যব্যয়েই অতিবাহিত হইয়াছে, কিছুই অদ্যাপি কার্য্যে পরিণত হয় নাই। আমাদিগের নিজের হৃদয়-প্রবণতার অনুসরণ করিলে আমরা আর বৃথা বাক্যব্যয় করিতাম না, অত্যাচারের গভীর প্রায়শ্চিত্তের দিন পর্য্যন্ত নীরবে থাকিতাম; কিন্তু আমাদিগের মরণোন্মুখ ভ্রাতৃগণের কাতরোক্তিতে ও অনুরোধে সাধারণ হিতের জন্য আমরা সঞ্জীবনৌষধ স্বরূপ গুটিকত বীজ মন্ত্র না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমাদিগের হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া সরলভাবে স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণকে গুটিকত অকাট্য সত্যের কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। এবং যে সকল জাতি অবিচলিতভাবে ও অম্লানমুখে ইতালীর কষ্ট, যন্ত্রণা, দুর্দ্দশা অবলোকন করিয়াছেন তাঁহাদিগকেও গুটিকত মর্ম্মভেদী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

হৃদয়-ভাবের উদ্বেলতা হইতেই মহতী বিপ্লব-পরম্পরা সংসাধিত হইয়া থাকে। যাঁহারা মনে করেন যে শুদ্ধ শাণিত বেয়নেটেই বিপ্লব সংসাধিত হইতে পারে তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। নৈতিক উৎকর্ষ অন্তর্বিপ্লব সংসাধন করিলে, বেয়নেট্ বা শারীরিক বল বাহ্য বিপ্লব মাত্র সম্পাদিত করে। ভাবোদ্বোধিত স্বত্ব বিশেষের সমর্থন কালেই বেয়নেট্ প্রকৃত শক্তিশালী। জনসাধারণের মনে নৈতিক জ্ঞান বদ্ধমূল হইলেই, তাহা হইতে সামাজিক স্বত্ব ও কর্ত্তব্যজ্ঞান সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। অন্ধ পাশব বলে কখন কখন দুই একটী জেতৃপুরুষ সমুদ্ভূত হইতে পারে বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের জয় প্রায়ই জনসাধারণের ইচ্ছার প্রতিকূলে, এইজন্য তাহার পরিণাম প্রায়ই যথেচ্ছাচার—সাধারণ হিতের সমূলোৎপাটন।

যখন লেখকের তেজস্বিনী রচনা স্বাধীনতার ভাবে জনসাধারণের মনকে উচ্ছ্বসিত করিয়া দেয় তখনই লোকের স্বাধীনতা লাভে প্রকৃত অধিকার জন্মে। যখনই লোকে স্বাধীনতার অভাব অনুভব

করিতে শিখে, তখনই তাহাদিগের স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছা বলবতী হয়। তখন বিপ্লব আপন হইতেই আবির্ভূত হয়। তখনই বিপ্লব বিধি ও ন্যায়ের অনুমোদন প্রাপ্ত হয়। সুতরাং তখন বিপ্লবের সাধন-সামগ্রীও ন্যায় ও বিধির অনুমোদনে দুর্নিবার্য্য বল প্রাপ্ত হয়।

অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী প্রশস্ত-হৃদয় মনীষিগণ জগতে যে নূতন উন্নতির বীজ রোপণ করেন, অসংখ্য লোকের জল সেচনে সেই বীজ হইতে প্রথমে অঙ্কুর ও পরে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। সেই বৃক্ষ আবার বহুকাল জলসেচনের পরে ফল ধারণ করিয়া থাকে।

মানব সমাজের শিক্ষা একদিনে সম্পন্ন হইতে পারে না। কার্য্যকারণ-সম্বন্ধের বহুকাল-ব্যাপিনী পর্য্যালোচনায়, ঘটনা নিচয়ের অক্লান্ত অধ্যয়নে, এবং অধিগত সত্য সমূহের ধীর ও বহুকাল-ব্যাপী প্রয়োগেই মানবমনে নূতন সংস্কার—নূতন বিশ্বাস—প্রতিষ্ঠাপিত হইতে পারে।

এই ক্রমিক উন্নতি ও ক্রমিক শিক্ষার প্রধান সাধন সাময়িক পত্র। যাঁহাদিগের জীবনের এক লক্ষ্য, তাঁহাদিগের সমবেত শ্রমে ও সমবেত যত্নেই এরূপ গুরুতর ব্যাপার সংসাধিত হইতে পারে। এই সাময়িক পত্র—সমস্ত ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিবে, কোন ঘটনাকেই তুচ্ছ জ্ঞানে পরিত্যাগ করিবে না। ইহা প্রত্যেক ঘটনার অভ্যন্তরে যে গভীর ও অপরিবর্ত্তনীয় সত্য নিহিত আছে, তাহার অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করিবে। এরূপ শিক্ষাপ্রণালীই এক্ষণকার ঘটনাস্রোতের গতিপ্রাবল্যের সম্পূর্ণ উপযোগিনী।

ইতালী এক্ষণে একটী নব জীবনের দিকে প্রবলবেগে প্রধাবিত। সুতরাং এতদবস্থ অন্যান্য দেশের ন্যায় ইতালীতেও এক্ষণে ভীষণ শক্তি সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। লক্ষ্যের অবৈষম্য সত্ত্বেও, সাংঘাতিক মতবৈষম্য উপস্থিত হইয়াছে। সকলেরই এক লক্ষ্য; কিন্তু কি উপায়ে সেই লক্ষ্য সংসাধন করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে ঘোরতর মতান্তর উপস্থিত হইয়াছে।

অষ্ট্রিয় জেতৃগণের প্রতি কতকগুলি লোকের বিদ্বেষ এরূপ প্রবল, যে বিদেশীয় অষ্ট্রিয়গণ স্বাধীনতা অপহরণ করিয়াছে বলিয়াই, তাঁহারা স্বাধীনতার জন্য উন্মত্ত। কিন্তু তাঁহারা স্বাধীনতার স্বতন্ত্র মূল্য এখনও অনুধাবন করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

বিচ্ছিন্ন ইতালীয় প্রদেশ গুলিকে একত্রিত করা কতকগুলি লোকের আবার এত ইচ্ছা, যে সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁহারা বরং বিদেশীয় যথেচ্ছাচারী প্রবল রাজার অধীন হইতে প্রস্তুত আছেন, তথাপি তাঁহারা অসংখ্য স্বদেশীয় রাজার অধীনে ইতালীকে দুর্ব্বল ও বিচ্ছিন্নাঙ্গ দেখিতে প্রস্তুত নহেন।

আবার কতকগুলি লোক প্রাদেশিক বিদ্বেষের সংঘর্ষ হইতে এতদূর অনিষ্ট আশঙ্কা করেন, এবং সহসা প্রাদেশিক

স্বার্থের মূলোৎপাটন চেষ্টার সাফল্য বিষয়ে এতদূর সন্দিহান, যে ইতালীর পূর্ণ একতা বিধান চেষ্টা অসম্ভব ভাবিয়া তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিমুখ থাকিতে চাহেন এবং আপাততঃ এমন যে কোন নব বিভাগে সম্মত আছেন, যাহাতে ইতালীর বিচ্ছিন্ন ভাব কিয়ৎপরিমাণে সঙ্কুচিত হয়।

একতা, স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য—এই তিন অপরিহার্য্য ভিত্তির উপর ইতালীর উন্মোচন চেষ্টা সংস্থাপিত না হইলে যে ইতালীর প্রকৃত উন্নতি পদে পদে প্রতিহত হইবে, ইহা এক্ষণে অতি অল্প লোকেই বুঝিয়াছেন।

কিন্তু যাঁহারা এরূপ বুঝিয়াছেন, এরূপ লোকের সংখ্যা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে; এবং আশা করা যাইতে পারে যে অচিরকাল মধ্যেই এই বিশ্বব্যাপী বিশ্বাসের অভ্যন্তরে অন্যান্য সমস্ত বিশ্বাস বিলীন হইবে।

স্বদেশের প্রতি অনুরাগ, অষ্ট্রিয়ার প্রতি ঘৃণা, এবং অষ্ট্রিয়ার শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত হওয়ার জ্বলন্ত ইচ্ছা, এক্ষণে প্রায় ইতালীর সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিতেছে। ভয় এবং রাজনৈতিক কৌশল এতদিন যে সকল জঘন্য সাম্যের অনুমোদন করিয়া আসিতেছিল, তাহা অচিরাৎ পরিত্যক্ত হইয়া জাতীয় ইচ্ছার গৌরব পরিরক্ষিত করিবে। ভ্রাতৃগণ! এক্ষণে তোমাদিগের সম্মুখে দুইটী মাত্র সম্ভবনীয় ঘটনা রহিয়াছে—এই শক্তি-সংঘর্ষে হয় ইতালীতে বৈদেশিক যথেচ্ছাচারের চূড়ান্ত আধিপত্য পরিবর্দ্ধিত হইবে, নয় তোমাদিগের অমানুষ বীরত্বে বৈদেশিক যথেচ্ছাচার ইতালীক্ষেত্র হইতে জন্মের মত বিদূরিত হইবে।

কি উপায়ে সেই গভীর লক্ষ্য সংসাধন করিতে হইবে, এবং কি উপায়েই বা এই অন্তর্বিদ্রোহানলকে চিরস্থায়ী ও সফল বিজয়ে পরিণত করিতে হইবে, তাহা নির্ণয় করা নিতান্ত সহজ নহে।

একদল সম্ভ্রান্ত ও দক্ষ রাজনীতিজ্ঞ আছেন, যাঁহারা মনে করেন যে কৌশলে ও গুপ্তভাবেই বিপ্লব সাধিত হইতে পারে। বিশ্বাসের অবিচলিততা ও ইচ্ছার দৃঢ়তার অনিবার্য্য বল অপেক্ষা এই কৌশল ও গূঢ়তার উপরই তাঁহারা অধিকতর আশা সংন্যস্ত করেন। তাঁহারা আমাদিগের মতের অনুমোদন করেন বটে, কিন্তু তাহার পরিণাম বিষয়ে সন্দিগ্ধচিত্ত। বিদেশীয় অধীনতায় দেশের অসীম অমঙ্গল সংঘটিত হইতেছে তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন এবং তজ্জন্য মর্ম্মপীড়িত; তথাপি তাঁহারা উৎকট রোগের প্রতীকার জন্যও উগ্রতর ঔষধ প্রয়োগ করিতে ভীত হয়েন; তথাপি যে কৌশলে ও যে ধূর্ত্ততায় ইতালী যথেচ্ছাচারী অষ্ট্রিয়ার পদানত হইয়াছে, সেই কৌশল ও সেই ধূর্ত্ততা দ্বারাই তাঁহারা ইতালী উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন।

তাঁহারা যে সময়ে ইতালীতে জন্ম গ্রহণ

ও শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, সে সময়ে ইতালীয়গণের অন্তরে স্বাধীন জাতির কর্ত্তব্য-জ্ঞান উদ্বোধিত হয় নাই, সুতরাং অতীত মহিমার স্মরণে, প্রাকৃতিক স্বত্ব সমর্থনের জন্য, প্রাণের দায়ে. প্রজাসমূহ অভ্যুত্থিত হইলে যে, তাহাদিগের বেগ অসম্বরণীয়—এ বিশ্বাস তাঁহাদিগের হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না। জলন্ত উৎসাহে তাঁহাদিগের কোন বিশ্বাস নাই। যে কূট ও জটিল রাজনীতিতে আমরা সহস্রবার ক্রীত ও বিক্রীত হইয়াছি, এবং যে বৈদেশিক বেয়নেট্ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আমাদিগকে সহস্রবার শত্রুহস্তে সমর্পিত করিয়াছে, সেই কূট ও জটিল রাজনীতি এবং সেই বিশ্বাসঘাতক বৈদেশিক বেয়নেটেই তাঁহাদিগের সমস্ত আশা সন্ন্যস্ত রহিয়াছে।

অর্দ্ধ শতাব্দী হইতে যে—ইতালীয় হৃদয়ে সঞ্জীবন ক্রিয়া আরব্ধ হইয়াছে, ইতালীয় জাতি সাধারণের মন উৎকৃষ্টতর অবস্থার জন্য প্রবলবেগে প্রধাবিত হইয়াছে, তাহা তাঁহারা অবগত নহেন।

তাঁহারা জানেন না যে বহুকালব্যাপী দাসত্বের পর পুনরুজ্জীবিত হইতে হইলে অসাধারণ নৈতিক উৎকর্ষ ও জীবনের নির্ভীক উৎসর্গীকরণ একান্ত প্রয়োজনীয়।

তাঁহারা জানেন না যে ইতালীর শতাধিক সার্দ্ধদ্বিকোটী অধিবাসী এই সুমহৎ লক্ষ্য সাধনে সমব্রত ও দৃঢ়সঙ্কল্প হইলে, জয় দুর্নিবার্য্য। ইতালীর সমস্ত অধিবাসী যে এক লক্ষ্যে ও এক উদ্দেশ্যে কথন সমবেত হইতে পারে ইহা তাঁহারা সম্ভবপর বলিয়া মনে করেন না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা কি কখন একাগ্র চিত্তে ইহার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন? 'তাঁহারা ইহার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত' কথন কি তাঁহারা এরূপ ভাব ইতালীয় ভ্রাতৃগণের নিকট প্রদর্শন করিয়াছিলেন? শুদ্ধ ইতালীয় ভ্রাতৃগণের উপর নির্ভর করিয়া কখন কি তাঁহারা বিদেশীয় জেতৃগণের উপর রণোদ্ঘোষণ করিয়াছিলেন? 'আত্মনির্ভর ব্যতীত উদ্ধারের আর উপায়ান্তর নাই'—স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণের নিকট তাঁহারা কি কখন এই অমূল্য সত্যের উদ্‌ঘোষণ করিয়াছিলেন? 'তাঁহাদিগের স্বাপক্ষ্যে যে আন্দোলন অভ্যুত্থিত হইবে তাহা স্বশোণিতে পরিপুষ্ট ও পরিরক্ষিত করিতে হইবে'—ইহা কি তাঁহারা কখন লোকসাধারণের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন? 'যুদ্ধ অপরিহার্য্য—সেই সাংঘাতিক ও অপরিহার্য্য যুদ্ধকে হয় জাতীয় সমাধিতে নয় জাতীয় বিজয়ে পরিণত করিতে হইবে'—এ উপদেশ তাঁহারা কখন কি প্রজাসাধারণকে প্রদান করিয়াছিলেন?

না; কখন না; তাঁহারা কার্য্যের গুরুত্বে ভীত হইয়া হয় কার্য্যক্ষেত্র হইতে দূরে অবস্থিতি ছিলেন, নয় সভয়ে সন্দিগ্ধচিত্তে কার্য্যক্ষেত্রে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন, যেন তাঁহারা যে গৌরবের পথে অগ্রসর হইতেছিলেন, তাহা ন্যায় ও বিধির অনুমোদিত নহে।

যে সকল নিয়মাবলী ও বিধিব্যবস্থা

বৈদেশিক মন্ত্রিসভা দ্বারা প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে, প্রজাসাধারণকে সেই সকলের অনুবর্ত্তনে শিক্ষা দিয়া তাঁহারা তাহাদিগকে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রবঞ্চিত করিয়াছেন; বৃথা বৈদেশিক সাহায্যের আশা দিয়া—যাহারা হৃদয় চিরিয়া সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিল—তাহাদিগের উৎসাহানল নির্ব্বাপিত করিয়াছেন; এবং যে সময় অক্লান্ত কার্য্যে বা রণক্ষেত্রে যাপিত করা উচিত ছিল, সেই সময় আলস্যে বা বৃথা বৈধিক তর্ক বিতর্কে অতিবাহিত করিয়াছেন।

অবশেষে যখন আপনাদিগের আশা-মরীচিকায় আপনারা উদ্ভ্রান্ত হইলেন; যখন বৈদেশিক কূট রাজমন্ত্রণা-জালে আপনারা প্রবঞ্চিত হইলেন; যখন দ্বারে শত্রু ও হৃদয়ে ভীতি বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে লাগিল; যখন স্ব স্ব স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া স্বাধীনতা সমর্থনের জন্য জীবন উৎসর্গীকৃত করা তাঁহাদিগের মহৎ পাপের মহৎ প্রায়শ্চিত্তের একমাত্র ব্যবস্থা ছিল; তখন তাঁহারা ভয়ে কুণ্ঠিত হইয়া পলায়ন করিলেন।

যাঁহারা কখনই আত্মদৃষ্টান্ত দ্বারা জাতীয় হৃদয়ে জাতীয় বিশ্বাস উদ্দীপিত করিতে চেষ্টা করেন নাই, তাঁহারাই এক্ষণে জাতীয় বিশ্বাসের শক্তি অস্বীকার করিয়া থাকেন। যাঁহারা আপনাদিগের ভীরুতা ও সন্দিগ্ধতা দ্বারা জাতীয় উৎসাহানল নির্ব্বাপিত করিয়াছেন, তাঁহারাই এক্ষণে জাতীয় উৎসাহের অস্তিত্ব বিষয়েই সন্দেহ করিয়া থাকেন।

আশীর্ব্বাদ করি তাঁহারা শান্তিলাভ করুন। তাঁহাদিগের প্রতি আমাদিগের কোন বিদ্বেষ বা ক্রোধ নাই। আমরা জানি তাঁহাদিগের ভ্রম মানসিক-দুর্ব্বলতা-জাত, নীচতা-সম্ভূত নহে। কিন্তু যে কার্য্যের আদ্যন্ত ধারণা করিবার তাঁহাদিগের শক্তি নাই, সে কার্য্যের অধিনেতৃত্ব গ্রহণে তাঁহাদিগের কি অধিকার?

বিপ্লবের পরিণতির সময় প্রত্যেক ভ্রম প্রত্যেক স্খলন সত্য নির্ণয়ের এক একটী সোপান স্বরূপ হইয়া উঠে। অতীত ঘটনাবলী অভ্যুত্থানশীল পুরুষের বিশেষ শিক্ষাস্থল; এবং আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ঘটনাবলী অতীত কালের পুরুষদিগের সহিত নব্য ইতালীর পূর্ণ বিচ্ছেদ—পূর্ণ পৃথক্‌ভাব—সংসাধিত করিয়াছে।

এই শেষ দৃষ্টান্ত—যথায় যে শপথ সপ্ত সহস্র দেশীয় বীর পুরুষের দেহ স্পর্শ করিয়া গৃহীত হয়, তাহাও অগৌরবে ও প্রবঞ্চনায় পরিণত হইয়াছে—এই শেষ দৃষ্টান্তও কি ইতালীয়দিগকে শিক্ষা দিবে না যে জয় অসি-অগ্রে, রাজপুরুষদিগের কূট মন্ত্রণাজালে নহে?

সহস্র বৎসরের শিক্ষা এবং শত সহস্র প্রতারিত পিতৃপুরুষদিগের মৃত্যুশয্যায় প্রদত্ত শাপ, কি ইতালীয়দিগের মনে এই প্রতীতি জন্মাইতে পর্য্যাপ্ত নহে, যে বিদেশীয়দিগের হস্তে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা মরীচিকা মাত্র।

অসংখ্য স্বাধীন ব্যক্তি যে ইতালীর

সহিত এত বার প্রবঞ্চনা করিল; কত সহস্র নির্ব্বাসিত ইতালীয় যে এত কষ্ট ও এত যন্ত্রণা ভোগ করিল; কত সহস্র ইতালীয় যে স্বদেশে থাকিয়াও এত দুর্ব্বিষহ উৎপীড়ন সহ্য করিল; ইহাতেও কি ভ্রাতৃগণ! তোমাদিগের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইবে না?

অদ্য উনবিংশ শতাব্দী। এতদিন পরে —আমাদিগের বিশ্বাস—ইতালী জানিতে পারিয়াছেন যে লক্ষ্য ও সাধনার একতা ব্যতীত ইতালী উদ্ধারের আর উপায়ান্তর নাই; যুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গীকৃত না করিলে ইতালী উদ্ধারের আর অন্য উপায় নাই; বিজয়ের পথ রুধির-কর্দ্দমিত, পুষ্পবিকীরিত নহে।

ইতালীর ভাবী অদৃষ্ট লম্বার্ডীক্ষেত্রেই পরীক্ষিত হইবে; বৈদেশিক দিগের একটী চরণও ইতালীক্ষেত্রে থাকিতে ইতালীতে শান্তি সংস্থাপিত হইবে না।

ইতালী এতদিন পরে জানিতে পারিয়াছে যে—জন-সাধারণের অভ্যুত্থান ব্যতীত জাতীয় সমর সংঘটিত হইতে পারে না; যাঁহারা সেই জনসাধারণের অধিনেতৃত্ব পদে অভিষিক্ত হইতে চাহেন, জনসাধারণকে উত্তেজিত ও অভ্যুত্থিত করা তাঁহাদিগেরই হস্তে, তাঁহাদিগেরই দৃষ্টান্তে; নূতন ঘটনা নূতন প্রকার লোকের সৃষ্টি করিয়া থাকে—যাঁহারা প্রাচীন অভ্যাস ও প্রচীন নিয়মের অধীন নহেন, যাঁহাদিগের হৃদয়ে ভাবী শুভের ভাব জীবন্ত ও জাজ্বল্যমান; অবিচলিত বিশ্বাসই শক্তির গূঢ় কারণ, আত্মত্যাগই প্রকৃত ধর্ম্ম, এবং আত্মবলই সর্ব্ব কৌশলের মূল।

নব্য ইতালী সমাজ এ সমস্ত বিষয়ই অবগত আছেন। তাঁহারা আপনাদিগের সাধনার মহত্ত্ব অনুভব করিতেছেন, এবং তৎসিদ্ধি বিষয়েও কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। বিগত দশ বৎসরের মধ্যে যে অসংখ্য ইতালীয় স্বদেশের উদ্ধার-সাধন-ব্রতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের পবিত্র নামে শপথ করিয়া আমরা বলিতেছি যে নির্যাতনে আমাদিগের বিশ্বাস বিদলিত না হইয়া বরং দৃঢ়ীভূত হইয়াছে।

যে মহাত্মাগণ স্বদেশ উদ্ধার-যজ্ঞে জীবন বলি প্রদান করিয়াছেন, সেই মহাত্মাদিগের রুধিরের অভ্যন্তরে একটী সমগ্র ধর্ম্ম নিহিত রহিয়াছে। যে স্বাধীনতাবীজ বীরপুরুষদিগের রুধিরে অভিষিঞ্চিত, কোন শক্তিই তাহাকে অঙ্কুরে দলিত করিতে সমর্থ নহে। আমাদিগের অদ্যকার ধর্ম্ম স্বদেশ-উদ্ধার-ব্রতানলে জীবন আহুতি প্রদান; আমাদের কল্যকার ধর্ম্ম হইবে—জাতীয় বিজয়ের উদ্‌ঘোষণ করা।

নব্য ইতালী সমাজ যুবকমণ্ডলী-সংগঠিত—আমরা একমন্ত্রে দীক্ষিত—এক সাধনায় নিমগ্ন; যে কোন প্রকারে সেই পবিত্র ব্রতের উদ্যাপন করা আমাদিগের এক মাত্র কর্ত্তব্য ও একমাত্র লক্ষ্য। যেহেতু আমরা অস্ত্রের ব্যবহারে নিষিদ্ধ, সেই জন্য আমরা [illegible]।

যে সকল উদার—মত যে সকল উন্নত হৃদয়ভাব—আমাদিগের মধ্যে সঞ্চারিত ও বিচ্ছিন্ন রহিয়াছে, আমরা তাহাদিগকে সংশ্লেষিত ও শ্রেণীবদ্ধ করিব। যদি কোন দাসোচিত অভ্যাস—যদি কোন কাপুরুষোচিত হৃদয়ভাব—নব্য ইতালী সমাজের অন্তর্নিহিত থাকে, আমরা অচিরাৎ তাহাকে অঙ্কুরে দলিত করিব।

আমরা ইতালীয় ভ্রাতৃগণের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া এই গুরুতর কর্ত্তব্য ভার আমাদিগের মস্তকে গ্রহণ করিলাম; আমরা অদ্য হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতালীর বিবিধ কষ্ট যন্ত্রণা, বিবিধ আশা ভরশা, বিবিধ অভিলাষ আকাঙ্ক্ষা খ্যাপনের মুখযন্ত্রস্বরূপ হইলাম।

আমরা এই লক্ষ্য সাধনের জন্য মধ্যে মধ্যে পত্রিকাদি প্রচার করিব। আমরা যে সকল মত ব্যক্ত করিলাম আমাদিগের রচনা সেই সকল মত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

ইতালীই আমাদিগের প্রধান লক্ষ্য; সুতরাং আমরা অকারণে বৈদেশিক রাজনীতির সহিত সংশ্লিষ্ট হইব না; কিন্তু যখন দেখিব যে বৈদেশিক রাজনীতির আলোচনায় ইতালীয়দিগের শিক্ষার উন্নতি হইবার সম্ভাবনা, যখন দেখিব বৈদেশিক দৃষ্টান্তের তুলনায় মানবদ্রোহী অষ্ট্রিয়গণের কীর্ত্তি অধিকতর কৃষ্ণবর্ণে অভিরঞ্জিত হইতেছে, যখন দেখিব বৈদেশিক রাজনীতির আলোচনায় সর্ব্বদেশীয় স্বাধীন জনগণের ভ্রাতৃভাব অধিকতর দৃঢ় হইবার সম্ভাবনা, তখন বৈদেশিক রাজনীতির আলোচনা হইতে আমরা বিরত হইব না।

আমরা জানি যে **প্রেমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মানব ধর্ম্ম**। যেখানেই দুই হৃদয় এক লক্ষ্যে প্রধাবিত, যেখানেই দুই আত্মা এক ধর্ম্মে দীক্ষিত, সেই খানেই এক দেশ, সেই খানেই এক জাতি। সমস্ত জগতের সাধু ব্যক্তিদিগকে এক সমাজে আবদ্ধ করার বর্ত্তমান সময়ের যে অত্যুদার চেষ্টা তাহার অনুকূলতা সাধন বিষয়ে আমরা বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করিব না।

কিন্তু বিশ্বাসঘাতক বৈদেশিকদিগের হস্তে ইতালী—হৃদয়ে যে গভীর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে, যত দিন না সেই ক্ষত শুকাইতেছে, যত দিন না সেই ক্ষতদেশ হইতে রুধিরনির্গমন বন্ধ হইতেছে, ততদিন ইতালী বৈদেশিকদিগকে ক্ষমা করিতে পারিতেছেন না। যে সকল জাতি দ্বারা আমরা সহস্রবার ক্রীত, বিক্রীত, অবমানিত, ঘৃণিত ও পদদলিত হইয়াছি; যত দিন বিশ্বাসহত ব্যক্তিদিগের মৃত্যুশয্যায় ক্রন্দন সেই সকল বৈদেশিক জাতির ও আমাদিগের অন্তর্ব্বর্ত্তী থাকিবে, ততদিন আমরা বৈদেশিকদিগকে ক্ষমা করিতে পারিব না। ক্ষমা বিজয়ের ধর্ম্ম, দাসত্বের ধর্ম্ম নহে। প্রেম ক্ষমতা ও শ্রদ্ধার সাম্য সাপেক্ষ, ক্ষমতা ও শ্রদ্ধার বৈষম্যে প্রেম জন্মিতে পারে না।

যদিও আমরা বৈদেশিক সাহায্য ও বৈদেশিক কৃপার বিদ্বেষী, তথাপি আমরা

ইউরোপীয় মনের উৎকর্ষ বিধানে বিন্দুমাত্রও ক্রটী করিব না; আমরা দেখাইব যে ইতালীয়েরা এখনও পূর্ব্ব গৌরব কিয়ৎ পরিমাণে পরিরক্ষিত করিয়াছেন, আমরা দেখাইব যে ইতালীয়েরা হতভাগ্য হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা অন্ধ বা কাপুরুষ নহেন; এইরূপ সহানুভূতি কার্য্যে পরিণত করিয়া আমরা ভাবী বন্ধুত্বের মূলভিত্তি পরস্পর শ্রদ্ধার উপর সংস্থাপিত করিব।

ইতালীর নাম লুপ্তপ্রায়, ইতালীর এক্ষণে প্রকৃত ইতিহাস নাই। বৈদেশিকেরা স্বার্থসাধনোদ্দেশে ইতালীয় ঘটনা সকলকে, ইতালীয়দিগের প্রবৃত্তিনিচয়, রীতি নীতি, আচার ব্যবহার এবং অভ্যাস সকলকে অসত্য বর্ণে রঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন।

আমরা আমাদিগের হৃদয় খুলিয়া বৈদেশিকদিগের সম্মুখে আমাদিগের ক্ষত প্রদর্শন করিব, দেখাইব কূটমন্ত্রীরা সাধারণ শান্তিরক্ষা ব্যপদেশে ভয়ে আমাদিগের হৃদয়-ক্ষত হইতে কত পরিমাণ রক্ত উদ্গীরিত করিয়াছে, আমরা গগণ বিদারিয়া, বৈদেশিকদিগকে আমাদিগের প্রতি কর্ত্তব্য শিক্ষা দিব; বৈদেশিকেরা যে অসত্যজালে আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন, আমরা সে জাল ছিঁড়িয়া আমাদিগের প্রকৃত ছবি দেখাইব।

আমরা বৈদেশিক হস্তে যে অসংখ্য অত্যাচার সহ্য করিয়াছি, যে দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি, এবং সেই অত্যাচার ও সেই যন্ত্রণার মধ্যেও যে অতুল নৈতিক উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছি, আমরা কারাগারের অন্ধকার হইতে, এবং অত্যাচারীর মন্ত্রভবনের গূঢ়তম প্রদেশ হইতে, অসংখ্য লেখ্য সংগ্রহ করিয়া তাহা প্রমাণ করিব।

যে সকল মহাত্মা ইতালীর উদ্ধার সাধন করিতে গিয়া বৈদেশিক হস্তে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন; যাঁহারা আমাদিগের কষ্ট যন্ত্রণা, আমাদিগের অবিচলিত অধ্যবসায় ও আমাদিগের দুঃখে বৈদেশিকদিগের পাপময় উপেক্ষা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এবং যে মহাত্মাদিগের নাম পর্য্যন্তও ইউরোপে অদ্যাপি বিদিত নাই; আমরা আমাদিগের সমাধিস্থলের অধস্তম তলে নামিয়া সেই মহত্মাদিগের অস্থি উত্তোলন করিয়া বৈদেশিকদিগকে দেখাইব; দেখাইয়া বলিব যতদিন এই মহাত্মাদিগের অস্থি ইতালী-বক্ষে নিহিত থাকিবে, ততদিন বৈদেশিকদিগের মঙ্গল নাই, ততদিন বৈদেশিকদিগের সহিত আমাদিগের সখ্যসংস্থাপনেরও কোন আশা নাই।

যে ইতালী দুইবার ইউরোপে স্বাধীনতা ও সভ্যতা বিস্তার করিয়াছেন, সে ইতালীর ধ্বংস দেখিয়াও ইউরোপ উদাসীন—এই দেখিয়া যেন সেই সমাধিনিহিত ব্যক্তিগণের হৃদয় ভেদ করিয়া সহসা গগণবিদারী রোদনধ্বনি উত্থিত হইল।

আমরা সে রোদন শ্রবণ করিয়াছি; আমরা সেই রোদনের প্রতিধ্বনিতে সমস্ত ইউরোপ পরিপুরিত করিব। যতক্ষণ না

ইউরোপ বুঝিবে ইতালীর প্রতি কি পরিমাণ অত্যাচার কৃত হইয়াছে, ততক্ষণ সে প্রতিধ্বনি নীরব হইবে না। আমরা ইউরোপীয় লোকবৃন্দকে বলিব দেখ! কোন্ মহাত্মাদিগকে তোমরা ক্রীত ও বিক্রীত করিয়াছ, দেখ! কোন্ পুণ্য ভূমিকে তোমরা চিরবিচ্ছিন্ন ও চিরদাসত্বে পরিণত করিয়াছ।"

কাপালিকসমাজের এই প্রথম শব সাধন। নব্য ইতালী সমাজের এই সর্ব্বপ্রথম-মন্তব্য উদ্ঘোষণ। নব্য ইতালী সমাজের মুখযন্ত্রস্বরূপ 'নব্য ইতালী' নামক পত্রিকার এই প্রথম মুখবন্ধ। এই শবসাধনে—এই মন্ত্র-উদ্ঘোষণে—আল্‌প্‌স হইতে ভূমধ্য সাগর পর্য্যন্ত সমস্ত ইতালী কাঁপিল! অষ্ট্রিয়সম্রাটের মস্তক হইতে রাজমুকুট খসিয়া পড়িল! সেই তমসাচ্ছন্ন শ্মশানভূমিতে জীবন-সঞ্চার পুনরায় সুস্পষ্ট পরিব্যক্ত হইল! যেন তাড়িত যন্ত্র ইতালীর মৃতদেহ আলোড়িত করিয়া তাহাতে চৈতন্য সঞ্চার করিল! যেন এই আলোড়নে অধীনতাপ্রপীড়িত জাতিমাত্রেরই হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল।

ক্রমশঃ।

দিল্লী।*

দিল্লী ভারত-মানচিত্রের একটী বিন্দু মাত্র। কিন্তু এই বিন্দু অতীত-সাক্ষী পবিত্র ইতিহাসের অতি আদরের ধন। ভারতরাজচক্রবর্ত্তী হিন্দু ও মুসলমান সম্রাট্‌গণের বীরত্ব, সাহস ও বৈভব এই বিন্দুতে উদিত হইয়া এই বিন্দুতেই বিলীন হইয়া গিয়াছে। গ্রীসের এথেন্‌স্, ইতালীর রোম, যদি কবি ও ঐতিহাসিক গণের হৃদয়গত শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি পাইবার যোগ্য হয়; তাহা হইলে দিল্লীও সেই শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলির সম্যক্ অধিকারী। কল্পনা যাঁহার নর্ম্মসখী, ললিত পদাবলি যাঁহার জীবনসহচরী, শব্দচাতুরী যাঁহার বিশ্বস্ত পরিচারিকা, ভাবঘটা যাঁহার ছায়ার ন্যায় অনুগামিনী, দিল্লী সেই স্বভাবপ্রিয় অন্তস্তত্ত্বজ্ঞ কবির উপাস্য দেবতা স্বরূপ। আবার সত্য যাঁহার হৃদয়সখা, ন্যায় যাঁহার মন্ত্রদাতা, সমবেদনা যাঁহার জীবনতোষিণী, দিল্লী সেই অপক্ষপাতী সহানুভূতিপর ঐতিহাসিকের অতি আদরের সামগ্রী। কবির রসময়ী কবিতায়, ঐতিহাসিকের সারল্যময়ী বর্ণনায় দিল্লীর গৌরব, দিল্লীর বীরত্ব, দিল্লীর বৈভব অনন্তকাল লীলা করিবার যোগ্য। যাঁহারা বিষয়-নিস্পৃহ ভোগসুখে বিরত; সর্ব্বপ্রকার উদাসীনতা, সর্ব্বপ্রকার

* Archiological Report. Vol. I. By Alexandar Cunningham c. s. i.

নিবৃত্তি যাঁহাদিগের জীবনের অবলম্বন, যাঁহারা "নলিনীদলগত" জলের ন্যায় জীবনের ক্ষণস্থায়িতা, বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় সৌভাগ্যলক্ষ্মীর চঞ্চলতা, চক্রনেমির ন্যায় অদৃষ্টের পরিবর্ত্তনশীলতা দেখিয়া সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হয়েন, নিৰ্জ্জন গিরি-কন্দরে বা নির্জ্জন অরণ্যে নীরবে বসিয়া অন্তিমে অনন্ত পদ প্রাপ্তির আশায় অনন্তশক্তির ধ্যানে নিবিষ্টচিত্ত থাকেন, দিল্লী সেই সংসারবিরাগী যোগরত তাপসগণের যোগাভ্যাসের প্রবর্ত্তক। তাঁহারা সৌভাগ্যলীলা-তরঙ্গায়িত দিল্লীর ইদানীন্তন শ্মশান ভাব,—হিন্দু রাজ-চক্রবর্ত্তিগণের উত্থান ও পতন, মুসলমান সম্রাটগণের উদয় ও বিলয় ভাবিয়া সংসারের অসারতা, অদৃষ্টের চঞ্চলতা অনুভব করিবেন, এবং ক্ষণস্ফূর্ত্তিশীল জলবিম্ব জলে মিশাইতে দেখিয়া প্রবৃত্তির অনুরাগ, মায়ার কুহকে আকৃষ্ট না হইয়া গম্ভীর ভাবে যোগাসনে সমাসীন থাকিবেন। ফলে ভারতমানচিত্রের এই বিন্দু, ভারতসাম্রাজ্যের এই নগর—সকলেরই প্রাণগত প্রীতির অধিকারী। এই দিল্লীই অগাধসত্ব পাণ্ডবের লোকবিমোহন রাজসূয় সভা এবং সৌভাগ্যগর্ব্বিত মোগলের নয়নরঞ্জন আমখাসের বিলাস-ভূমি।

এই দিল্লীই হিন্দুরাজ-চক্রবর্ত্তী পৃথ্বীরায় এবং মোগল-শিরোভূষণ আকবরের নন্দন কানন। ভারতের সৌভাগ্য-সূর্য্য এক সময়ে এই দিল্লীতেই উদিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ বিভাসিত করিয়াছিল, এবং অধুনাতন ব্রিটেনিয়ার গর্ব্বস্বরূপিণী মহারাণীর 'ভারত-সাম্রাজ্যেশ্বরীর উপাধী ঘোষণা'' জন্য যে মহতী ঘটা ও মহদাড়ম্বরের বিজ্ঞাপনী প্রচারিত হইয়াছে, তাহাও এই দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হইয়া চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইবে।

যে প্রসন্ন-সলিলা যমুনা দিল্লীর পাদদেশ বিধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে, সেই যমুনাও দিল্লীর পূর্ব্বতন সজীবতা এবং ইদানীন্তন শ্মশানভাবের নিমিত্ত স্বদেশ বৎসল কবির মোহিনী কবিতায় বর্ণিত হইয়া অদ্যাপি লোকের রসনায় রসনায় লীলা করিয়া বেড়াইতেছে। কবি এই দিল্লীর বিগত মহত্ত্ব, বিগত কীর্ত্তি ও বিগত বৈভব স্মরণ করিয়া যমুনাকে বলিতেছেন :—

"তব জল কল্লোল, সহ কত সেনা,
গরজিল কোন দিন সমরেও।
আজি সব নীরব, হে যমুনে সব,
গত যত বৈভব, কালেও॥
শ্যাম সলিল তব, লোহিত ছিল কভু,
পাণ্ডব-কুরুকুল-শোণিতেও।
কাঁপিল দেশ, তুরগ গজ-ভারে,
ভারত স্বাধীন যে দিনও॥"

আবার যে দিন এই হিন্দুকুল-সূর্য্য অস্তমিত হইল, যে দিন দুরন্ত যবন-রাহু আসিয়া ভারতের ষোড়শ-কলা-পূর্ণ সুখশশী গ্রাস করিল, সেই অশুভদিনের সাক্ষীভূত যমুনাতীরবর্ত্তী দিল্লীই পুনর্ব্বার কবির মর্ম্মে আঘাত করিল :—

"কভু শতধারে, এ উভ পাবে,
পাঠান আফ্‌গান মোগলও।
ঢালিল সেনা, গ্রাসি নিবাসী,
ঘোর সে ভারত বন্ধনেও॥
অহ! কি কুদিবসে, গ্রাসিল বাহু,
মোচন হইল না আবও।
ভাঙ্গিল চূর্ণিল, উলটি পালটি,
লুঠি নিল যা ছিল সাবও॥
সে দিন হইতে, শ্মশান ভারত,
পর-অসিঘাত-নিপাতেও।
সেদিন হইতে, অন্ধ মনোগৃহ,
পরবল অর্গল-পাতেও॥
সে দিন হইতে, তব জল তবলে,
পরসে না কুলবালাও॥
সেদিন হইতে, ভারতনারী,
অবরোধে অববোধিতও॥
সেদিন হইতে, তব তটগগনে,
নূপুর-নাদ বিনীরবও।
সেদিন হইতে, সব প্রতিকূলে,
সেদিন ভারত বন্ধনও॥"

এইরূপ ঐতিহাসিক ঘটনাপূর্ণ এক দিন সৌভাগ্যলীলা-তরঙ্গায়িত, সুখবল্লীর বিলাসভূমি, অপর দিন বিকট শ্মশানের বিকট মূর্ত্তির উদ্দীপক যোগনিদ্রাভিভূত বিরাট পুরুষের ন্যায় অনন্ত জড়তায় সমাচ্ছন্ন দিল্লীর বিবর লইয়া প্রত্নবিষয়-প্রিয় পাঠক! অদ্য আমরা তোমার সমক্ষে উপস্থিত হইতেছি।

দিল্লীর পুরাবৃত্ত-ঘটিত বিবরণের প্রসঙ্গে আমরা সর্ব্বাদৌ সুবিশ্রুত ইন্দ্রপ্রস্থের সম্বন্ধে কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। কোন কোন মতে ইন্দ্রপ্রস্থ এবং দিল্লী দুটী পৃথক্ নগর। এই নগরদ্বয় পরস্পর পাঁচ মাইল ব্যবহিত। কিন্তু এই মতের সহিত অন্যান্য বিষয়ের সামঞ্জস্য লক্ষিত হইতেছে না। কারণ, মুসলমান দিগের আক্রমণ সময়ে যে স্থান দিল্লী নামে কথিত হইত, তাহা বর্ত্তমান লাল-কোট ও রায়পিথোরার কেল্লার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ইহার পর দিল্লীর সম্রাট্ ফিরোজ সা ফিরোজাবাদে (পূর্ব্বতন ইন্দ্রপ্রস্থ) স্বীয় রাজধানী উঠাইয়া নিলে কিয়ৎকাল সমস্ত ইন্দ্রপ্রস্থ এবং কেল্লা আলাই * ও জহাপনা নামক নগরোপান্ত জনপদ দিল্লী নামে উক্ত হইত। পরিশেষে মোগল সম্রাট্ হুমায়ুন পুরাতন ইন্দ্রপ্রস্থের সংস্কার করিয়া উহার 'দিনপনা' নাম দেন। হুমায়ুনের পর সের সা আবার ইন্দ্রপ্রস্থের নিকটে 'সের সা কেল্লা' নামে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। এই অবধি সাধারণ লোকের মধ্যে "পুরাতন দিল্লী" ও "নূতন দিল্লী" বলিয়া দুটী সংজ্ঞা প্রচলিত হয়। প্রথমটী হিন্দুরাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থের এবং দ্বিতীয়টী ইন্দ্রপ্রস্থের নিকটস্থ যমুনাতীর-বর্ত্তী স্থান সমূহকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

উপরে যাহা লিখিত হইল, তদনুসারে ইন্দ্রপ্রস্থও দিল্লীর অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া উঠিতেছে। বস্তুতঃ দিল্লী একটী সাধারণ

* অন্যতর নাম সিরি। খ্রীঃ ১৩০৪ অব্দে আলাউদ্দীন এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন।

নাম। এই নাম উচ্চারণ করিলে প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ ও মুসলমান রাজধানী প্রভৃতি সমস্তই বুঝাইয়া থাকে। সুবিখ্যাত বিশপ হিবার দিল্লীর ভগ্নাবশেষ লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন, "ভগ্নাবশেষের পর ভগ্নাবশেষ, মসজিদের 'পর মসজিদ, অট্টালিকাচ্যুত ইষ্টকরাশি, গ্রেনাইট, মার্ব্বেল প্রভৃতি বহুমূল্য প্রস্তরস্তূপ, বৃক্ষশূন্য দুই একটী স্বল্পায়তন ক্ষেত্র ব্যতীত বহুবিস্তৃত অকৃষ্ট ভূমির চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এই বিরাট দৃশ্য অতি গম্ভীর ও ভক্তি-মিশ্র ভয়ের উদ্দীপক" †। বিশপ হিবার-বর্ণিত এই ভগ্নাবশেষের দৈর্ঘ্যের পরিমাণ বর্ত্তমান সা জাহানাবাদ নগরের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে রায় পিথোরার কেল্লা এবং তোগলকাবাদ পর্য্যন্ত ১০ মাইল। বিস্তারের পরিমাণ উত্তরদিকে প্রায় ৩ মাইল এবং দক্ষিণদিকে কুতব মিনার হইতে তোগলকাবাদ পর্য্যন্ত কিঞ্চিদধিক ৬ মাইল। সমস্ত ভগ্নাবশিষ্ট ভূখণ্ডের পরিমাণ অনূন ৪৫ বর্গ মাইল। এই ৪৫ বর্গ মাইল পরিমিত ভূমির সাধারণ নাম দিল্লী—এক্ষণে ভগ্ন মসজিদের পর মসজিদ, অট্টালিকাচ্যুত ইষ্টকরাশির পর ইষ্টকরাশি মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সে অভ্রভেদী প্রাসাদ-শ্রেণী, সে অভেদ্য দুর্গরাজি এক্ষণে কালের অসীম শক্তির প্রভাবে ধরাশায়ী হইয়াছে। সে সুষমা সৌন্দর্য্য সমস্তই অনন্ত সময়ের সহিত বিলীন হইয়া গিয়াছে। অদ্য দিল্লী শ্মশান! সে ইন্দ্রপ্রস্থ সভার গৌরব নাই, সে আমখাসের মাধুরী নাই, সে বিলাস-ভবনের সৌন্দর্য্য নাই, অদ্য দিল্লী শ্মশান! সে হিন্দুকুল-কীর্ত্তি সে মুসলমানকুল-গৌরব-স্রোত অনন্ত কাল-সাগরে মিশাইয়া গিয়াছে; অদ্য দিল্লী শ্মশান! অদ্য এই মহা শ্মশানে লোক-বিমোহন প্রাসাদ, লোক-বিমোহন দুর্গ, লোক-বিমোহন মন্দির প্রভৃতির কঙ্কাল-স্তূপ ইতস্ততঃ গড়াগড়ি যাইতেছে।

সুপ্রসিদ্ধ ইন্দ্রপ্রস্থ পাণ্ডব-শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের রাজধানী। ইহার অন্যতর নাম ইন্দ্রপথ। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের সময় ইহা পাঁচভাগে বিভক্ত ছিল, যথাঃ—পানীপথ, সোনপথ, ইন্দ্রপথ, তিলপথ এবং বাঘপথ। শেষোক্ত বাঘপথ ব্যতীত অন্য পথ চতুষ্টয় যমুনার পশ্চিম তটে অবস্থিত ছিল। যুধিষ্ঠির বনবাস হইতে প্রত্যাগত হইয়া কৌরবরাজ দুর্য্যোধনের নিকট এই পঞ্চ পথেরই অন্যতম পথ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই পঞ্চপথ পাণ্ডবদিগের পঞ্চ-ভ্রাতার আবাস স্থান বলিয়া সাধারণে পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

ইন্দ্রপ্রস্থ কোন্ সময়ে পাণ্ডবদিগের রাজধানী ছিল, তাহা স্পষ্টরূপে জানিবার সম্ভাবনা নাই। জেনারেল কানিংহাম, এই সময় খৃঃ পূঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে নিবেশিত করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য মতের সহিত কানিংহামের এই মতের

† Bishop Heber's Journal Vol. II p. 290.

একতা লক্ষিত হয় না। সাধারণ কিম্বদন্তী অনুসারে মহাভারতকার কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক। এই মহাভারত রামায়ণের পরসাময়িক বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত *। ইতালীয় পণ্ডিত গোরিসিও রামায়ণ রচনার কাল খৃঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নিবেশিত করিয়াছেন †। মনিয়ার উইলিয়ম্‌সের মতানুসারে রামায়ণ খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে বিরচিত হইয়াছে ‡। যাহা হউক; রামায়ণের সময় এইরূপ পরস্পর-বিসম্বাদী হইলেও, উহা যে মহাভারতের অগ্রে প্রণীত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। এক্ষণে গোরিসিওর মতানুসারে যদি রামাণকে খৃঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় তাহা হইলে মহাভারতের সময় খৃঃ পূঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দী অপেক্ষা অনেক আধুনিক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের সময়ও খৃঃ পূঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর নিম্নগামী হইয়া উঠে। পরন্তু ভট্ট মোক্ষমূলর লিখিয়াছেন, বেদে মহাভারত বর্ণিত কুরু-পাণ্ডব-যুদ্ধের কোনও উল্লেখ নাই। কোল্‌ব্রূক প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রাচীন বেদসংহিতার কাল খৃঃ পূঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দী নিরূপণ করিয়াছেন *। সুতরাং এই প্রমাণ অনুসারে মহাভারত ও যুধিষ্ঠিরের সময় খ্রীঃ পূঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পরে নিবেশিত হইতেছে। এই সমস্ত কারণে অনেকে কানিংহামের মতে আস্থাবান্‌ হইবেন না। যাহা-হউক; আমরা বিষয়ান্তরাগত তর্কের অবতারণা করিয়া প্রস্তাবটী ভারাক্রান্ত করিতে ইচ্ছা করিনা। গবেষণা-প্রিয় পণ্ডিতবর্গ যতই বিভিন্ন মত উপন্যস্ত করুন না কেন, যুধিষ্টির যে রামায়ণের পরে ও খৃষ্টীয় অব্দের পূর্ব্বে ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন তদ্বিষয়ে বোধ হয় অনেকেই সন্দিহান হইবেন না। আমরা এস্থলে কেবল এই কথা বলিয়াই প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিতেছি।

ভাগবত পুরাণ অনুসারে যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থের প্রথম রাজা। যুধিষ্ঠিরের পর তদীয় ভ্রাতা অর্জ্জুনের বংশধর-গণের ৩০ জন ক্রমান্বয়ে ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে

---

* কেহ কেহ আবার মহাভারতকে রামায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী বলেন, কিন্তু এই মতের প্রতি অনেকের আস্থা নাই।

† Christian Observer Aug. 1850. p 375.

‡ Indian Wisdom p. 319.

* Maxmuller's Ancient Sanskrit Literature P. 46.

Colebrook's Missellaneons Essays" Vol I (Ed. By E. B. Cowell) P. 99, or As. Res, Vol VIII. P. 493.

Wilson's "Introduction Rigveda", P. 48

অধিরোহণ করেন। সর্ব্বশেষ ভূপতির নাম ক্ষেমক। রাজাবলি অনুসারে এই ক্ষেমক স্বীয় মন্ত্রী বিশ্ব রায় কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হয়েন। বিশ্বরায়ের বংশধর গণের ১৪ জন ৫০০ বৎসর কাল পাণ্ডবদিগের রাজ্য ভোগ করেন। ইহার পর ইন্দ্রপ্রস্থ গৌতমবংশীয় দিগের অধিকৃত হয়। ১৫ জন গৌতমবংশীয় নৃপতির রাজত্বের পর, উহা আবার ময়ূর-বংশীয়দিগের অধিকারে আইসে। এই ময়ূরবংশীয় সর্ব্বশেষ নরপতির নাম রাজ পাল। ইনি কমায়ুন দেশের অধিপতি শকাদিত্যের সহিত সমরে নিহত হয়েন। কানিংহাম বলেন, এই শকাদিত্য কমায়ুন রাজের প্রকৃত নাম নহে। সম্ভবতঃ উহা শকজাতির অধিপতির দ্যোতক। কারণ সুপ্রসিদ্ধ উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্য এই শক প্রভু শকাদিত্যকে সমরে পরাজিত করিয়া শকারি নামে প্রসিদ্ধ হয়েন। যাহাহউক; কিম্বদন্তী অনুসারে এই শকরাজ শকাদিত্যের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থ দিল্লী নামে পরিণত হয়। এই নাম পরিবর্ত্তনের কোন প্রামাণিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়না। প্রথিত আছে, দিল্লীপ নামক জনৈক চন্দ্রবংশীয় নৃপতি একটী নগর স্থাপিত করিয়া উহার দিল্লী নাম দেন। এই দিল্লীপ পঞ্চপাণ্ডবের ঊর্দ্ধতন পঞ্চম পুরুষ। কিন্তু এই কিম্বদন্তী নিরবচ্ছিন্ন মানব-কল্পনা-সম্ভূত। ইহার সহিত কোনরূপ প্রকৃত ঘটনার সংস্রব নাই। দিল্লী নাম নিঃসন্দেহ ইন্দ্রপ্রস্থ অপেক্ষা আধুনিক। কুরুপাণ্ডবের সময়ে সাধারণতঃ ইন্দ্রপ্রস্থ নামেরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যদি পাণ্ডবদিগের ঊর্দ্ধতন পুরুষের স্থাপিত বলিয়া দিল্লীর নামকরণ হইত তাহা হইলে যুধিষ্ঠিরদিগের গমন কালে তদীয় রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থের পরিবর্ত্তে দিল্লীনামেই সর্ব্বত্র পরিচিত হইত।

অপেক্ষাকৃত প্রামাণিক প্রবাদ অনুসারে দিল্লী অথবা ধিল্লী দিলু অথবা ধিলুনামক জনৈক রাজার নাম হইতে উদ্ভূত। কোন্ সময়ে এই দিলু দিল্লী নগর স্থাপন করেন, তাহা নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। ফেরিস্তার মতানুসারে রাজা দিলু ৪০ বৎসর রাজত্বের পর কমায়ুনরাজ ফুর অথবা পোরসের সহিত সমরে পরাজিত ও নিহত হয়েন। এই পোরসই পঞ্জাবে সুবিখ্যাত সেকন্দর সাহের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক প্রমাণের সহিত যদি ফেরিস্তার লিখিত এই বিষয়ের সামঞ্জস্য লক্ষিত হইত, তাহাহইলে অনায়াসে ইহা অবলম্বন করিয়া দিল্লীর প্রাচীনত্ব নিরূপণ করিতে পারা যাইত। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই ফেরিস্তা প্রাচীন ঘটনাবলির সময় নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া অনেক স্থলে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি যে পোরসকে সেকন্দর সাহের সমকালীন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই পোরসের ভ্রাতৃপুত্র জুনাকে খৃষ্টাব্দ ২২৬ অব্দে আনয়ন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন নাই। আবার অন্য স্থলে জুনার সম-

কালিক্ সাসনী বংশের সংস্থাপয়িতা আর্দ্দসির বাবখান উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। এইরূপ এক-পর্য্যায়-নিবদ্ধ ঘটনার সহিত বিভিন্ন সময় অনুস্যূত হওয়াতে ফেরিস্তার লিখিত ঐতিহাসিক সত্য অনেক স্থলে প্রমাদ-সঙ্কুল বোধ হয়। যাহাহউক ঘটনা অংশে ফেরিস্তা বর্ণিত কমায়ূনরাজ ফর কর্তৃক রাজা দিলুর পরাজয়ের সহিত শকাদিত্য কর্তৃক রাজপালের পরাভবের বিশিষ্ট সামঞ্জস্য লক্ষিত হইতেছে। অন্যান্য স্থানের কিম্বদন্তীর সহিতও ইহার বিশিষ্ট একতা লক্ষিত হয়। গোয়ালিয়র-নিবাসী খড়্গা রায় নামক জনৈক ভাট মোগল-সম্রাট্ সাজাহানের সমকালে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, কলির তিন হাজার বৎসর গত হইবার পর (খ্রীঃ পূঃ ১০০ অব্দে) পাণ্ডুবংশীয় শেষ রাজা নীলাঘপতি দিল্লীর অধিপতি ছিলেন। ঐসময়ে শঙ্খধ্বজ নামে জনৈক রঘুবংশীয় রাজা সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে তাঁহাকে আক্রমণ করেন। উভয়ের মধ্যে ১৭টী যুদ্ধ হয়। পরিশেষে নীলাঘপতি ৪৪ বৎসর রাজত্বের পর সমরে পরাজিত ও নিহত হয়েন। সুপ্রসিদ্ধ উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্য আবার এই শঙ্খধ্বজকে যুদ্ধে নিহত করিয়া দিল্লীর অধিপতি হয়েন, কিন্তু বিক্রমাদিত্যের বংশধরগণ দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন নাই। তাঁহারা ৭৯২ বৎসর ব্যাপিয়া উজ্জয়িনীতেই রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই ৭৯২ বৎসর কাল দিল্লী লোক-বসতি শূন্য হইয়া পড়িয়া থাকে। পরিশেষে (৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে) তুয়ার বংশীয় বিলাস দেবের (নামান্তর অনঙ্গপাল) সময়ে দিল্লীতে পুনর্ব্বার লোক সমাগম হয়। তুয়ার বংশীয়গণের পরে চোহান-বংশীয় বিশাল দেব দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন।

খড়্গরায়ের এই বিবরণ ব্যতীত রসিদুদ্দীন প্রণীত মোজমলাৎ তোয়ারিক গ্রন্থে এইরূপ আর একটী গল্প দেখিতে পাওয়া যায়। গল্পটী এই।—"রাসল নামক হিন্দুস্থানে জনৈক নৃপতি কোন বিদ্রোহী কর্তৃক সিংহাসন হইতে তাড়িত হয়েন। পরিশেষে বর্কমার্য্যের সহিত যুদ্ধে এই বিদ্রোহীর পরাজয় হয়। রসিদুদ্দীনের রাসল এবং বর্কমার্য্য সম্ভবতঃ রাজপাল এবং বিক্রমাদিত্যের অপভ্রংশ। পরন্তু খড়্গারায় যাঁহাকে 'শঙ্খধ্বজ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহার সহিত অনায়াসে শকাদিত্যের অভিন্নতা লক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু খড়্গারায়ের নীলাঘপতির সহিত রাজপাল কিম্বা দিলুর কোনও সামঞ্জস্য লক্ষিত হয় না। যাহা হউক, ফেরিস্তা, খড়্গা রায় ও রসিদুদ্দীনের বর্ণিত বিবরণ যখন পরস্পর অংশতঃ সমঞ্জসীভূত হইতেছে, তখন স্বীকার করিতে হইবে, দিল্লীর সংস্থাপয়িতা এক সময়ে শকনৃপতি কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং বিক্রমাদিত্য এই শকনৃপ-

তিকে সমরে পরাজিত করিয়া শকারি নামে প্রথিত হয়েন। বোধ হয় ফেরিস্তা রাজপালেরই নামান্তর দিলু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কানিংহাম ফেরিস্তার মতানুবর্ত্তী হইয়া স্থির করিয়াছেন, বিক্রমাদিত্যের সময়ে অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ৫৭ অব্দে দিল্লীর নামকরণ হয়। টলেমী স্বপ্রণীত গ্রন্থে দিল্লীর উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হয়, দিল্লী নাম অতি প্রাচীন সময় হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ক্রমশঃ—

শারদীয় জলদখণ্ড।

১

জল গর্ভ বরষায় দেখেছি গগন-গায়
তোমারে, জলদ, আমি রজনী দিবায়;
সেরূপ এখন্ কই? বদল হয়েছে অই;
সে রূপ এ নব রূপে হারে তুলনায়!
দেখিতেছি ঘন ঘন, তুমিই যে সেই ঘন,
এরূপ বিশ্বাস বশ করে না আমায়,
বাস্তবিক, তুমি সেই, সম্মুখে যা হেরি এই?
তুমিই কি সেই এই গগণের গায়?
বল রে জলদ, বল, সুধাই তোমায়?

২

আঁখি ভরে, প্রাণ খুলে, উচুঁ পানে মুখ তুলে
এবে রে তোমারে হেরি—আশা না ফুরায়;
তখন হেরিলে পরে, তোমারে গগন পরে,
আজের এ সুখ তুমি দিতে কি আমায়?
কালিমাখা ভয়ঙ্কর, নভোগ্রাসি-কলেবর,
যে দিকে তাকাই—দেখি সে দিকে তোমায়
গরজিতে ঘোর ডাকে, জলধারা লাখে লাখে
পড়িত প্রবল বেগে ধরণীর গায়।
আতঙ্কে যেতাম ছুটে, ধারা গুলো গায়ে ফুটে,
জালাইত—তাড়াইত আশ্রয় যথায়।
তুমিই কি সেই এই গগনের গায়?

৩

দুদিন না যেতে যেতে, রূপের পসার পেতে,
ভুলাইলে, বহুরূপী, নিমেষে আমায়;
একেবারে রূপান্তর, কিছুই তেমনতর,
এ শরতে, জলধর, নাই রে তোমায়!
বরষায় এই খানে, চেয়েছি তোমার পানে,
আজিও রে এই খানে আঁখি মোর চায়;
সেই তুমি, আঁখি সেই; কিন্তু সেই ভাব নেই
আজের ভাবের ভাব কি কব কথায়?
সরে না মনের ভাব ও তোর শোভায়।

৪

সে দিন দেখেছি তোরে আকাশের গায়,
যত দূর দৃষ্টি যায়, অভিন্ন অসীম কায়;
সে ভীষণ রূপ ভাল লাগে না আমায়।
আজের যেরূপ তোর, মানস করিল ভোর,
ফেরে না নয়ন যোড় ত্যজিয়ে তোমায়!
নূতন নূতন বই, পুরাতনে সুখী নই,
নূতন জিনিস পেলে, নয়ন জুড়ায়।
রে জলদ, তাই আজ, নূতন নূতন সাজ
কে, বল, পরা'লে তোর মনোহর গায়?
আমার মনের কথা, মনেই রয়েছে গাথা,

কি আশ্চর্য্য, কে কহিল একথা তাহায় ?
অবশ্য সর্ব্বজ্ঞ সেই, সন্দেহ কি তায় ?

৫

মরি, কি সুন্দর দেহ, অতুল আনন্দ গেহ,
অনন্ত আকাশ মাঝে ধীরে ভেসে যায়,
সুনীল সাগর-নীরে ভাসে কিরে ধীরে ধীরে
গিরি-চূড়া ?—অসম্ভব, কে বিশ্বাসে তায় ?
ভারতে কি বাম আছে, ভাসা'বে শিলায় ?
ও নয় ভূধর-খণ্ড, ও যে রে বাষ্পের পিণ্ড,
দেখিতে ওজনে ভারী, কিন্তু লঘু কায়,
বিজ্ঞানের কথা এই, সে কথায় কাজ নেই.
বিজ্ঞান নীরস শাস্ত্র, কে তাহারে চায় ?
কবি যাঁহা বলে ওরে, বিশ্বাসি তাহায়।

৬

ভারত-গৌরব-রবি কালিদাস মহাকবি
আঁকিল যেরূপে তোরে দেবী তুলিকায়,
ব্রিটনীয় কবি শেলি তেজাল সুরঙ্গ ঢালি,
আঁকিল যেরূপে ওরে, তাই চিত চায়।.
বিজ্ঞানেতে বৈজ্ঞানিক একেবারে অরসিক,
সুধারে গরল করে, ভাল যেটি পায়,
সেটিরে খারাপ করে, তবে রে কেমনে তারে
ভাল বলি?—কবি শত্রু—ধিক্ সে জনায়।

৬

শরতের জলধর, কবিকুল প্রিয়তর
তুই রে, কবিই তোরে সুন্দর সাজায়,
বিজ্ঞানবিতের কর করে তোরে জর জর,
এমন বিদ্বেষী নর আছে কি ধরায় ?
যারে দেখে সুখ লভি, যারে প্রিয়তর ভাবি,
যার মনোহর ছবি মোহিছে আমায়;
কবিকুল যার তরে সদাই ভ্রমণ করে,
বৈজ্ঞানিক অরসিক বাষ্প বলে তায় ?
নকুল অহির ভাব তাই দুজনায়।

৭

ভাবুক জনের চিত,কর তুমি বিমোহিত,
ক্ষণেকে ক্ষণেকে ধরি নব নব কায়;
ভব বঙ্গভূমি মত বদলিছ অবিরত;
বহুক্ষণ একভাবে দেখি না তোমায়।
তোরি বহুরূপ নরে অবস্থা শিখায় ?
কখন মুকুট পর, কভু ম্লান কলেবর,
কখন বিজলী হার চমকে গলায়;
কভু শোভ স্তরে স্তরে, কভু এক কলেবরে
কভু এ সুন্দর দেহ আকাশে মিলায়
তোরি বহু রূপ নরে অবস্থা শিখায়।

৮

অস্তগামী দিবাকর ঢালি নানারঙ্গি কর,
তোরে লয়ে কত রঙ্গে আকাশে খেলায়;
এ কালের ভাব হেরি, রেতে ছায়াবাজী-
কারী
রসায়ন-দীপে ছবি দেয়ালে খেলায়;
রবি, তুই শিক্ষা তার—সন্দেহ কি তায় ?
তোরি মত, জলধর, মনে মোর ভাবান্তর,
কতই ঘটিছে—আমি কি কব কথায় ?
কভু ভাবি মনে মনে ব'সে আছি সিংহাসনে,
কখন এ দেহ মোর ধূলায় লুটায়।
আমি রে পাগল এই বিশাল ধরায়।

৯

আদর্শ কবিয়ে তোরে, এ অনন্ত ভব ঘোরে,
ঘুরিছে আমার মন প্রতি লহমায়;
কখন ভূতলে ছুটে, কখন আকাশে উঠে,
কখন সাগর জলে হাবু ডুবু খায়!
আমি রে পাগল এই বিশাল ধরায়!
কেবল আমিই নই, বাঙ্গালি মাত্রেই অই,

নিরেট পাগল, নেঘ, সন্দেহ কি তায় ?
নাশিতে দেশের দুখ, বাক্যে হয় শত-মুখ,
কবন্ধের মত কিন্তু কাজের বেলায় ?
নিরেট পাগল এরা বিশাল ধরায়।
বালক-ক্রীড়ার মত, সভা করে কত শত,
বক্তৃতা বিতর্ক তর্ক যেমনি ফুরায়,
আকাশ কুসুম সম শেবটা দাঁড়ায় !
কারে বলে দেশোন্নতি,নাহি জানে এক রতি
সকলি সম্পন্ন করে কথায় কথায় ;
দরিদ্র স্বজাতি যারা, নিরাহারে যায় মারা,
ভুলেও তাদের পানে ক্ষণেক না চায়।
কিন্তু তৈল ঢালে তৈলাক্ত মাথায়।

১০

কিসের,কিসের বাধা ? সাহেবে চাহিলে চাদা.
সহস্র অযুত লক্ষ অনাসে বিলায় ;
হায়, একি অবিচার, কার টাকা হয় কার,
পরধনে পোদ্দারীর এই ব্যবসায় ;
ধনীরা প্রজার ধনে ধনিত্ব ফলায় !
'রাজা', 'রায় বাহাদুর' লভিতে বাঙ্গালি শূর
ছিছি রে, জীবন কাটে 'ইংরেজ সেবায় !'
খানিক কাগজ দিয়ে, রাশি রাশি টাকা নিয়ে
চতুর ইংরেজ বেস্ চাতুরী খেলায় !
বাঙ্গালি বিষম বোকা বিশাল ধরায় !'

১১

বাঙ্গালি বিষম খেপা, বধূর বিননী খোপা,
সাদরে ধরিয়ে, ফুল বসায় তাহায় !
এ দিকে নিজের শিরে, ছিছিরে, ছিছিরে,
ছিরে,
বিলাতী পাদুকা, ধিক্, ব'হে লয়ে যায় !
বাঙ্গালি পাগল শুধু ?—অধম ধরায় !
বাঙ্গালির কত গুণ, মুখে মাথে কালি চূণ,
স্বজাতির মন্দ বই ভাল নাহি চায় ;
হাত পা সকলি আছে,তবু বিলাতের কাছে,
কি লজ্জা ঢাকিতে লজ্জা বস্ত্রখানা চায় !
এমন নিরেট বোকা দেখেছ কোথায় ?
বাঙ্গালি নিরেট বোকা,বুকে ভয়,মুখে রোখা
সকল লক্ষণ গুলি পাগলের প্রায়।
কতকাল এই ভাবে বাঙ্গালি-কুলের যাবে,
কেউ কি এমন নাই এ ভাব ফিরায় ?
বে মেঘ বরষাকালে, কি ছিলে গগন-ভালে,
এবে বা কেমন তুমি আকাশের গায় ;
কতকাল এই ভাবে কিন্তু বাঙ্গালির যাবে,
কেউ কি এমন নাই এ ভাব ফিরায় ?
না ফিরিলে,—কে ফিরাবে কে হেন ধরায় ?

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

নবাব সেরাজুদ্দৌলা ; ঐতিহাসিক নাটক। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। কলিকাতা বহ্নিপ্রেসে মুদ্রিত। সন ১২৮৩ সাল।

যে মহা ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে বঙ্গরাজ্য মুসলমানদিগের হস্ত হইতে সভ্যতাভিমানী ইংরাজগণের কর-কবলিত হয়, তাহাই অবলম্বন করিয়া এই নাটকখানি

প্রণীত হইয়াছে। ইহাতেও সাক্ষ্য দিয়েছে কতিপয় প্রধান প্রধান বাঙ্গালী-গণই এই ষড়যন্ত্রের সৃষ্টিকার, প্রতিপোষক এবং সিদ্ধিদাতা। ইংরাজগণ সকলেই এক্ষণে তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন কি না বলিতে পারি না, কিন্তু তাহাদিগের কৃতজ্ঞতার পরিচয় উমিচাঁদের পুরস্কারে বিলক্ষণ প্রকাশিত আছে। আজিও প্রতি দেশে ও প্রতি জেলায় গিয়া দেখ, ইংরাজগন, তাঁহাদিগের ভক্ত বাঙ্গালীজাতির প্রতি প্রতিদিন কিরূপ ব্যবহার করিতেছেন। তাঁহারা না বলিয়াছিলেন বাঙ্গালীজাতির অভিধানে কৃতজ্ঞতা-ব্যঞ্জক কোন শব্দ নাই? ধন্য ইংরাজ জাতির কৃতজ্ঞতা! তাঁহাদিগের অভিধানে কৃতজ্ঞতাব্যঞ্জক শব্দ আছে বটে কিন্তু সে শব্দের অর্থ কি, তাহা কেবল ইংরাজজাতির ন্যায় অন্যান্য সভ্যজাতিতেই বলিয়া দিতে পারেন।

একচক্ষু মেকলে এবং তৎ-সদৃশ অন্যান্য ইংরাজী ইতিহাস-বেত্তাগণ সেরাজুদ্দৌলা, ক্লাইব, মীরজাফর, উমিচাঁদ প্রভৃতি ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণকে যেরূপে বর্ণিত করিয়াছেন, লক্ষ্মী বাবুর নাটকে তাহার অনুরূপ চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। এরূপ চিত্র মেকলে প্রভৃতি ইংরাজ ইতিহাস লেখকের সমুচিত বটে, কিন্তু বাঙ্গালী চিত্রকরের সেই চিত্রের আদর্শে চিত্র প্রস্তুত করিয়া বঙ্গসাহিত্যের নবীন চিত্রশালিকা ভূষিত করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহা আমরা বলিতে পারি না, অথবা তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। ইংরাজী চিত্রের যাথার্থ্য কতদূর, তাহার কি অন্য প্রমাণ আবশ্যক নাই? যদি আবশ্যক থাকে তবে ইংরাজী-চিত্র আজি ঠিক বলিয়া কখনই গ্রহণীয় হইতে পারে না। যাহাই হউক, ইংরাজীচিত্র যদি ঠিক বলিয়া ধর্ত্তব্য হয়, তবে লক্ষ্মীনারায়ণ বাবুর নাটকীয় চিত্র গুলি যে ঠিক হইয়াছে তাহার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহার সেরাজুদ্দৌলা, উমিচাঁদ, মীরজাফর, ক্লাইবকে দেখিলে মনে হয় আমরা যেন মেকলের চিত্রই দেখিতেছি; তাহার বিন্দু বিসর্গ প্রভেদ নাই। এই আদর্শ ধরিয়া অবশ্য বলিতে হইবে, লক্ষ্মী বাবুর ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের চরিত্র যেরূপ সুরক্ষিত হইয়াছে, এরূপ বাঙ্গালা সাহিত্যে অধিক দেখা যায় না।

কিন্তু তাঁহার ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের সংখ্যা অনেক। এত ব্যক্তির একত্র সমাবেশ প্রায় নাটকে সচরাচর দেখা যায় না। যে নাটকে এত ব্যক্তির সমাবেশ, সেখানে যে কাহারই চরিত্র সম্যক্ চিত্রিত হইবে না, এই রূপই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। এ নাটকে তাহাই ঘটিয়াছে। এক এক জন রঙ্গভূমিতে সং সাজিয়া আসিতেছেন, আর অমনি অদৃশ্য হইতেছেন; কেহই মনোমধ্যে নিজ নিজ ভাব অঙ্কিত রাখিয়া যাইতে পারেন না। তন্মধ্যে কেবল সেরাজুদ্দৌলা, মীরজাফর, উমিচাদ, ক্লাইব এবং রায়দুর্লভ কথঞ্চিৎ

নিজ নিজ ভাব অঙ্কিত রাখিয়া গিয়াছেন।

এ নাটকে লক্ষ্মী বাবু চিত্র কার্য্যের যেরূপ আধিক্য দেখাইয়াছেন, রচনায় সেরূপ নহে। তাঁহার রচিত ব্যক্তিগণের মধ্যে গোসাঁই দাস এবং স্ত্রীগণের মধ্যে সত্যবতীই প্রধান। কিন্তু গোসাঁই দাস এক জন সামান্য ব্যক্তি; তাহার চরিত্রের বৈশেষ্য কিছুই নাই। তিনি নাট্যব্যাপারে যেরূপ কার্য্য করিয়াছেন, ব্যক্তি মাত্রেই তদবস্থায় সেইরূপ করিয়া থাকেন। এরূপ কার্য্যেতে লোকের চরিত্র প্রকাশ হয় না; মনুষ্যেরই প্রকৃতির ভাব প্রকাশ হয়; কিন্তু যিনি যে ভাবে কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন; যেরূপ চিন্তা করেন, যেরূপ যাঁহার কার্য্যের গতিক, এবং সেই কার্য্যে অভিযুক্ত থাকিয়া কিরূপ নিজ প্রকৃতির পরিচয় দেন, তাহাই সুন্দর-রূপ বর্ণিত হইলে, তবে নাটকীয় ব্যক্তির চরিত্র বর্ণনা হয়। হ্যাম্‌লেট্‌ ইহার দৃষ্টান্ত। নহিলে লক্ষ্মী বাবুর নন্দ যেমন, গোসাঁই-দাসও তেমনি। উভয়েরি কার্য্যে কেবল মনুষ্য-প্রকৃতির পরিচয় হয়; তাহাদিগের বিশেষ চরিত্রের কিছুই পরিচয় হয় না। নন্দ রাজপুত্র, এই জন্য একটু সাহসী ও তেজীয়ান্‌, গোসাঁইদাস সামান্য ব্যক্তি এবং নবাবের সহিত তাহার বৈরতাসাধন, এই জন্য তাহাকে অনেক সতর্ক ও সাবধানে চলিতে হইয়াছিল। নহিলে বলিতে গেলে, গোসাঁই নবাবের আমলেরই নন্দ; নাটক-মধ্যে ইহাদিগের কাহারই চরিত্র নাই। মনুষ্যের সাধারণ প্রকৃতির পরিচয় এবং তাহার বিশেষ প্রকৃতির পরিচয়, এই দুইটী স্বতন্ত্র বিষয়। গোসাঁইদাসের সাধারণ-প্রকৃতির পরিচয়ের মধ্যে আমরা তাহার বিশেষ প্রকৃতির পরিচয় কিছুই প্রাপ্ত হই নাই। আর সত্যবতী; তিনিতো একাধিক সহস্রতম বাঙ্গালী সতী।

লক্ষ্মী বাবু নাটকীয় স্বগত বাক্য রচনায় একজন উৎকৃষ্ট লেখক। তাঁহার পূর্ব্ব-রচিত নন্দবংশোচ্ছেদ এবং কুলীন-কন্যায় উহার পরিচয় আছে। এ নাটকেও তিনি সেই প্রকার রচনার গৌরব সমান রক্ষা করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা একটি স্বগত বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। নবাবের অন্তঃপুর-অবরুদ্ধা সত্যবতীর মনের সুন্দর ভাব দেখুন:—

"আঃ সত্য! আঃ অভাগিনী সত্য! যে জহরত তুমি জন্মে কখন দেখ নাই, সেই হীরা পান্না আজ এই ছড়াছড়ি, যে একটি মুক্তার তরে তুমি লালায়িত হয়েছিলে, আজ হাজার হাজার সেই মুক্তা তোমার চরণতলে। পর সত্য, গহনা পর, একবার অমূল্য রত্ন অঙ্গে ধারণ করে জীবন সার্থক কর। একখানি ছোট আর্‌শিতে দিবানিশি তোমার প্রাণ পড়ে থাক্‌ত, আজ শত শত প্রকাণ্ড দর্পণ তোমার চারিদিকে। দেখ সত্য, একবার মনোহর মুখখানি দেখ। একবার তিল তিল করে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ কর, একবার নির্জ্জনে ব'সে আপনার রূপে আপনি মোহিত হও। হতভাগিনি, এখন বুঝ্‌তে পেরেছ হীরা

মুক্তার সুখ নাই, অহঙ্কারে সুখ নাই; রাজরাণীর যে সুখ নাই, ভিখারিণীর ও সে সুখ আছে। হায়! অভিমানই আমার সর্ব্বনাশ করেছে। আমি সুন্দরী লোকে আমায় সুন্দরী বলে, আমায় দেখ্‌লে মুনিরও মন টলে—কেন এই চিন্তায় আমার আমোদ হত? কেন বেস বিন্যাসে আমার তত অনুরাগ ছিল? পথের লোক হাঁ করে চেয়ে থাক্‌বে বলে, কেন আমি জানালায় বসে থাক্‌তে ভাল বাস্‌তেম? হায়! রূপ-গর্ব্বেই আমার 'সর্ব্বনাশ হল? নহিলে আমার এ দুর্দ্দশা হ'ত না, আমিই আমার সর্ব্বনাশের মূল!"

লক্ষ্মীবাবুর নাটকাবলির আর একটি গুণ এই, তাঁহার গ্রন্থ-মধ্যে ধর্ম্মনৈতিক ভাব বিশিষ্টরূপে প্রবল থাকে। যে কোন বিষয় বর্ণিত হউক না কেন, তন্মধ্যে ধর্ম্মনৈতিক ভাব প্রবিষ্ট করিয়া তাহা প্রবল করিয়া দিলে, তাহাতে যে গ্রন্থ পাঠে শুভ ফল উৎপন্ন হয় তাহার আর সন্দেহ নাই। লক্ষ্মীবাবুর গ্রন্থাবলিতে এই গুণটি বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। নাটকের বিষয় সমুদায় পাপময়, কি নবাবী রাজভবন, কি ক্লাইবের ও মীরজাফরের ষড়যন্ত্র এবং চরিত্র সকলই দূষিত ও অধর্ম্মে কলঙ্কিত, বাস্তবিক গ্রন্থের সমগ্র বিষয়-ভূমিই পাপময়, কিন্তু তন্মধ্য হইতে অবশেষে সত্যবতীর উদ্ধার, নবাবের পতন, গোঁসাইদাসের কার্য্যসিদ্ধিতে, ধর্ম্মের জয় বিলক্ষণ ফলে প্রভৃতি হয়। ক্লাইবের কার্য্যসিদ্ধি এবং উল্লাস উমিচাঁদের মনোভঙ্গ-জনিত বুদ্ধিনাশে যেন ভৎর্সিত হইতেছে। পাঠক উমিচাঁদের জন্য দুঃখিত হইয়া দুর্জ্জন ক্লাইবকে শত বার তিরস্কার করিতে উদ্যত হয়েন। যে রাজ্যস্থাপনের মূলে এই রূপ অধর্ম্ম তাহার পরিণাম যে কিরূপ হইবে তাহা ভবিষ্যতই জানেন। সেই অধর্ম্মকে ভৎর্সনা করিবার জন্যই যেন, গ্রন্থকার প্রধান নাট্যব্যাপারকে একটু প্রবৃদ্ধ করিয়া উমিচাঁদের মনোভঙ্গের চিত্র রঙ্গ ভূমিতে অবতারিত করিয়াছেন। ইহা তো উমিচাঁদের লোভের পরিণাম নহে, ক্লাইবের সমুচিত তিরস্কার। যিনি তাঁহার উন্মত্ততায় লোভের দণ্ড দেখেন, তিনি আজিও ধর্ম্মরাজ্যের জটিল গ্রন্থের উদ্ভেদ করিতে শিখেন নাই। বিশ্বরাজ্যের ধর্ম্মকৌশল এই রূপ জটিল। ইহার এক কৌশলে শত শত কার্য্য সম্পাদিত ও ফলাফল প্রদত্ত হইতেছে।

আর আমরা এ সমালোচনা প্রবৃদ্ধ করিব না। উপসংহার কালে অবশ্য স্বীকার করিব যে এ নাটক খানির ভাষা অতি উত্তম এবং নাটকীয় ব্যক্তিগণের কথোপকথনে জীবিত ভাব বিদ্যমান দেখা যায়।

মিত্রোদয়—ইংরাজী এবং বাঙ্গালা মাসিক পত্র ও সমালোচন। শ্রীহিরণ্ময় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত। প্রাকৃত যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৵০ আনা মাত্র। আশ্বিন মাস হইতে প্রকাশিত। আমরা

ইহার প্রথম সংখ্যা পাঠ করিলাম। ইহাতে তিনটী প্রবন্ধ লিখিত আছে— Education and toleration, সুন্দর বনের প্রাচীন ইতিবৃত্ত ও শাক্য সিংহ। তিনটীই অসমাপ্ত, ক্রমশ: প্রচারিত হইবে। সম্পাদক পৃষ্ঠদেশের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন "মিত্রোদয়ের আকার অতি স্বল্প বলিয়া আমরা ইহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন প্রকার ভূমিকা লিখিতে পারিলাম না। তবে আমাদিগের এই মাত্র বক্তব্য যে, এই পত্রে সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ের বিবিধ প্রবন্ধ ব্যতীত, সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি ভাষায় অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থের অনুবাদও থাকিবে"। আমরা এই বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া আনন্দে অভিভূত হইলাম। এতাবৎকাল পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্যসমাজে যাঁহারা সম্পাদকীয় কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই এরূপ সর্ব্বভাষা ও সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী বলিয়া আপনাকে খ্যাপন করিতে পারেন নাই। আমরা কখন বঙ্গভাষায় দেবভাষা সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন প্রভৃতির অন্তর্নিহিত রত্নরাজির একত্র সমাবেশ দেখি নাই। হিরণ্ময় বাবু যদি সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য আমাদিগকে দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে তিনি বঙ্গবাসিমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন সন্দেহ নাই।

শিক্ষা ও ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতা প্রবন্ধে লেখক যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা অনুমোদন করিতে পারিলাম না। আমরা ভারতকে আর প্রাচীন কালের ন্যায় অষ্ট পৃষ্ঠে ও ললাটে পারলৌকিক ধর্ম্মের বন্ধনে আবদ্ধ দেখিতে চাহি না। ঐহিক বিষয়ের অনুসরণে প্রকৃত উন্নতি নাই—এ মত আমরা আর ভারতে পুনঃ প্রচার করিতে চাহি না। এই ভয়ঙ্কর মতের অনুসরণেই ভারতের আজ এ দুর্গতি! ঐহিক সুখের অনুসরণেই ইউরোপের আজ এত উন্নতি! ইউরোপের উন্নতি প্রকৃত উন্নতি নহে—একথা অশ্রদ্ধেয় যেহেতু প্রত্যক্ষ-বিলোপী। সুতরাং 'ভারতে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মোন্মাদ নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে,—এ সংবাদ আমাদিগের নিকট অশুভসংবাদ নহে।

'সুন্দর বনের প্রাচীন ইতিবৃত্ত' প্রবন্ধটী মন্দ নহে। শাক্য সিংহ' এটী কবিতা, মধুসূদনের অনুকরণে অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দে লিখিত। লেখক এই অনুকরণে সম্পূর্ণ অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। ইহার দ্বারা শুদ্ধ যে তাঁহার অক্ষমতা প্রদর্শিত হইয়াছে এরূপ নহে; শাক্যসিংহ—জগতের ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তয়িতৃগণের মধ্যে যাঁহা অপেক্ষা উচ্চতর আসন গ্রহণের অধিকারী আর কেহই নাই, সেই শাক্যসিংহের অত্যুচ্চ চরিত্র তাঁহার তুলিকায় বিকৃত হইয়াছে। যে অত্যুচ্চ চরিত্র স্পর্শ করিতে মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের লেখনীও সাহস করে নাই, সে চরিত্র স্পর্শ করিতে যাওয়া সামান্য কবির পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র।

মনুষ্যবংশ।

দিনমণি! এই উজ্জ্বল গগণতল পরিশোভিত করিয়া বসুন্ধরার প্রতি হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে এক চক্রবেগে আজি তুমি এই উদয়গিরি পরিত্যাগ করিয়া অস্তগিরি মুখে গমন করিতেছ, আমরা চাহিয়া দেখিতেছি; এইরূপে তুমি কতবার গিয়াছ, কতবার আসিয়াছ, কতবার যাইবে আসিবে এবং এইরূপে মনুষ্য-নয়ন তোমাকে কতবার নিরীক্ষণ করিয়াছে, আবার করিবে, তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু যে দিন তোমার কিরণ প্রতিভাতে প্রথম প্রভাত হইতে দৃষ্টি করিয়া মানবচিত্ত বিগলিত হৃদয়ে হর্ষ ভয় বিমিশ্রিত লোচনে বদ্ধাঞ্জলি করে স্রষ্টার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কহিয়াছিল "প্রভু! এই আমি উপস্থিত, কি নিমিত্ত আমার আবির্ভাব, আমাকে কি করিতে হইবে বল" সে দিন তুমি কোথায় রাখিয়া আসিয়াছ? অথবা যে দিন তোমার প্রথম অস্তগমন দর্শনে বিক্ষুব্ধ ভাবে তারকামালা-বিভূষিতা স্তিমিতা লোকময়ী অবনীর নৈশ বসন দেখিয়া ভয়-বিহ্বল চিত্তে তোমার পুনরাগমন কামনা করিয়াছিল বা শারদ-শোভা মণ্ডিত পূর্ণচন্দ্র দর্শনে তোমার বিরহ-দুঃখ কথঞ্চিৎ বিস্মৃত হইয়াছিল, সেই দিনই বা কোথায় রাখিয়া আসিলে? তুমিত আসিতেছ যাইতেছ, কতবার আসিবে যাইবে, কিন্তু তোমার সে দিনটি কোথায়? সে দিন কি আর ফিরিবে?—আর ফিরিবে না, দিন যাইবে, মাস যাইবে, বৎসর যাইবে, যুগ গত হইবে, সূর্য্য! তুমি তোমার সহচরীবর্গ সহ আবার পরমাণুতে মিশিবে, শূন্যে মিশাইবে, তথাপি সে দিনটিকে ফিরাইতে পারিবে না। উহা স্মৃতিরও দর্পণ তল হইতে লুপ্ত, ভূত সাগর-গর্ভে অন্ধতম গুহায় নিহিত।

যাহা স্মৃতির আয়ত্ত হইতেও অতীত, তখন আর কি অবলম্বনের অস্তিত্ব থাকিতে পারে?—তথাপি কেন চিত্ত তদালোচনায় এতদূর ব্যাকুলিত? যাহা ভূতগর্ভে নিহিত, যাহা চিরদিনের মত গতাসু এবং শাশ্বত অগম্য,—তথাপি তাহা আয়ত্ত করিতে আমাদের কেন এত যত্ন? উহা মানব-চিত্তের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। আমরা কোমল উজ্জ্বল চক্ষু পাইয়াছি, দিবায় দিনদেব রাত্রিতে নৈশগগন, আলোক দানে অনন্ত বস্তু-মালা সেই নয়ন-পথে প্রতিমুহূর্ত্তে উপস্থাপিত করিতেছেন, এবং নয়ন তাহা হইতে চিত্তের চিন্তা-বিষয় কতই সংগ্রহ করিয়া দিতেছে, তথাপি চিত্ত তাহাতে স্থির এবং সন্তুষ্ট হয় না, সেই একদিকে গতি, সেই ভূত সাগর-গর্ভস্থিত রত্ন লাভে উৎসুক,—আপাততঃ সংগৃহীত বিষয় তদ্রত্ন হেতু

হেলা করিতে হয়, তাহাও স্বীকার তথাপি অতীত বস্তুর স্পৃহা ক্ষান্ত হইবার নহে। ইহার কারণ কি?—এই সংসার-নাট্য-শালায় জীবন-প্রবাহ মহানাটক স্বরূপ। প্রত্যেক মানব, প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক যুগ—এই নাটকের এক এক অভিনেতা। যে কৌশলী এই নাটকের কর্ত্তা তিনিই প্রত্যেক অভিনেতার অভিনয় অংশ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। এই বৃহদ্ব্যাপারের তুমি বিন্দুমাত্র অংশ অভিনয়ের ভারযুক্ত বটে, কিন্তু তাই বলিয়া অলস-প্রিয়তায় যদি কেবল আপন অংশ টুকু মাত্র অভ্যাস করিয়া নাট্যমন্দিরে উপস্থিত হইয়া অভিনয়ে প্রবৃত্ত হও, কোন্ কথার পর কোন্ প্রত্যুত্তর দিবে?—পূর্ব্বগত ভাবের সহিত সামঞ্জস্যে যথায় যে যে রসের উদ্দীপন আবশ্যক তথায় তুমি কি করিবে?—গোলমাল করিয়া সমস্ত পণ্ড করিবে, সুধু আপনি নিন্দনীয় ও তিরস্কৃত হইবে না, মূল বিষয়ও কলঙ্কিত করিবে!—ছি ছি—বড় লজ্জা, বড় ধিক্কারের কথা! তাহা করিও না, পূর্ব্বগত বিষয় জ্ঞাত হও, গৃহীত-ভার অংশের অপর পক্ষীয় অংশ জ্ঞাত হও—অভিনয়ে সুখ্যাতি লও—কেন তুমি নিন্দা কিনিবে। কি একক মানবীয় চিত্ত, কি তৎসমষ্টিবর্দ্ধিত জাতীয় চিত্ত, উভয়েরই এই আত্ম-তিরস্কার, এই আত্ম-উত্তেজনা, ভূতবিষয় অবগতি-বাসনার মোহমন্ত্র। এ মোহমন্ত্র বলেই পুরাণ ইতিহাসের সৃষ্টি, ইহারই তেজে কাব্য বিজ্ঞান প্রভৃতির উদ্ভব ইহারই উৎসাহে এ সকলের ও অতীত ভূতকালীয় ব্যাপার অবধারণ ও উপলব্ধি করণ হেতু আগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছে। এই আগ্রহই নিরন্তর আমাদিগকে সেই দিকে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও, আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে।

এই আত্ম-তিরস্কার, আত্ম উত্তেজনা প্রতিপোষণ বা অবহেলনের সুন্দর দৃষ্টান্ত-স্থল ভারত রোমক ও গ্রীক চিত্ত। সংসার-নাট্যশালায় ভারত—ভরত-ঋষি-প্রণীত লক্ষ্মী নাটকের উর্ব্বশী। উর্ব্বশী অনিন্দিতা অতুলনীয়া, রূপের ভারে ফাটিয়া পড়িতেছে, গুণের গরিমা গগনস্পর্শী, স্বয়ং লক্ষ্মীর অংশ অভিনয়ের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। আপন গুণের উপর নির্ভর করিয়া অভ্যাসে বাহিত হইয়া যোগ্য সময় অন্যমনস্কতায় নিয়োজিত করিয়া অনভ্যস্ত উর্ব্বশী যখন নাট্যমন্দিরে স্বামি প্রার্থনায় পৃষ্ট হইলেন, কোথায় নারায়ণ যাচিতে, যাচিয়া বসিলেন পুরোরবা। ভরত ঋষি ক্রোধে শাপ দিলেন অধঃপাতে যাও। স্বর্গ-গৌরব উর্ব্বশী স্বর্গ বিচ্যুতা হইলেন, স্বর্গাপ্সরা হইয়াও মানবে মন অর্পিত করিয়া, মানব লোকে মানব ধর্ম্ম-বিহারিণী হইয়া, আনুসঙ্গিক সুখ দুঃখের অধীনে জীবন সমর্পণ করিতে হইল। অভ্যাস-বিরহিতা ভারতেরও সেই দশা, উর্ব্বশীর অবস্থায় আর ইহার অবস্থায় প্রতি বিষয়ে তুলনা। বিধাতার মানসী কন্যা বটে—কিন্তু আপন দোষে শেষে পথের ভিখারিণী! আর রোম ও গ্রীক, নিকৃষ্ট

হইলেও অভ্যাসের গুণে এমন বাহবা লইল, যে এক অভিনয়ে ক্ষান্ত নাই, বেশ বদলাইয়া আবার নবাভিনয়ে প্রবৃত্ত, চতুর্দ্দিকে ধন্য ধন্য পড়িতেছে। কি ভাগ্য-বৈচিত্র্য!

মনুষ্য একবংশজ অর্থাৎ আদিতে এক পিতা মাতা হইতে মনুষ্য-বংশের উৎপত্তি কি না এই স্মার্ত্ত ও ঐতিহাসিক কাল বহির্ভূত সাময়িক ব্যাপার অদ্য আমাদিগের আলোচ্য বিষয়। এতদ্বিষয় অবধারণার নিমিত্ত কেবল বাহ্যিক প্রমাণাদি মীমাংসা-স্থলীয়, কিন্তু তাহা বর্ত্তমানে এখনও এতদূর সম্পূর্ণ অবয়ব প্রাপ্ত হয় নাই, যে তাহা হইতে নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারা যায়। তথাপি সেই সকলের বর্ত্তমান অবস্থায় যথাবুদ্ধি ও যথাসম্ভব তদ্বিষয়ের আলোচনায় ক্ষতি কি আছে?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভূতঘটনা জ্ঞাত হইতে মানব-চিত্ত অতিশয় ব্যগ্র। ব্যগ্রতা এত অধিক, যে মূলভিত্তি স্মৃতি বহির্ভূত হইলেও, তাহা কোন না কোনরূপ যথাবুদ্ধি ও যথাআগ্রহ অবধারণ ব্যতীত, জীবন-লীলায় অগ্রসর হইতে পারে না। ইহা কি সভ্য, কি অসভ্য, সকল জাতির মধ্যেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। আবার আশ্চর্য্য এই যে সেই সকল জাতিরই অবধারিত আদি বৃত্তান্ত কিছু না কিছু অবান্তর ভেদে একই রকমের বলিলে হয়। ইহার কারণ কি, যখন সকলেরই কথার ঐক্য অনেকাংশে দেখা যাইতেছে, তখন তাহা "যথাবুদ্ধি অবধারণা" ইহা স্পষ্ট জ্ঞাত হইতে পারিলেও ঐ শব্দ প্রয়োগ করিতে বাধ বাধ লাগিয়া থাকে। তবে কি সে ঐক্যের কোন সারবত্তা আছে। ভাল, দেখায় ক্ষতি কি? কোন্ জাতি কিরূপ আদি বৃত্তান্ত কল্পিত বা বিবৃত করিয়া থাকে অগ্রে তাহাই পরীক্ষা করা যাউক।

আমেরিকা-দেশীয় আদিম অসভ্য জাতির পোপল বুঃ (Popul Vuh) (১) নামক সংগৃহীত পৌরাণিক গ্রন্থে কথিত আছে, যে আদিতে চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র পৃথিবী ইত্যাদির কিছুই ছিল না, কেবল উর্দ্ধে আকাশ, নিম্নে দিগন্ত-ব্যাপিনী জলরাশি ব্যাপ্ত ছিল। সেই জলরাশির উপর দেবতাগণ তপোমগ্ন ছিলেন।

---

(১) এই তত্ত্বটি এবং পরে উদ্ধৃত অপরাপর তত্ত্ব গুলি সমস্তই সংগৃহীত। কোন্ পুস্তক এবং কোথা হইতে সে সকল সংগৃহীত হইল তাহা বিবৃত করিয়া এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অযথা কলেবর বৃদ্ধি করা তত আবশ্যক বিবেচনা করিলাম না। তজ্জন্য যেন বঙ্গীয় পাঠক মহাত্মাগণ লেখককে অকৃতজ্ঞ বা চোর বলিয়া গণ্য করিবেন না। বঙ্গীয় লেখকদিগের মধ্যে এখন প্রথা বটে যে শ্রুত এবং দৃষ্ট বহু পুস্তকের নাম গ্রহণ করিয়া প্রস্তাব মধ্যে সন্নিবেশ পূর্ব্বক স্বীয় পাণ্ডিত্য প্রচার করা। কিন্তু কি করিব, এ দুর্ভাগ্য লেখকের ভাগ্যে বিধাতা সে পাণ্ডিত্য এবং তজ্জনিত প্রশংসা প্রাপ্তি লিখেন নাই।

অনন্তর তাঁহাদের আজ্ঞাক্রমে জলভাগ অপসারিত হইয়া, রাত্রি দিবা ও বৃক্ষ-পুষ্প ফলাদি ধারণের উপযোগি স্থল ভাগের আবির্ভাব হইল। অতঃপর তাঁহাদের মহিমা কীর্ত্তন সক্ষম জীব সৃষ্টির মানসে কতকগুলি জীবের সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু যখন তাহাদের নাম জিজ্ঞাসা করা হইল, তখন প্রত্যেকে আপনাপন নাম বলিতে অক্ষম হওয়ায়, তাহাদিগকে পশু আখ্যা প্রদান করা হইল। তৎপরে দেবতারা মৃত্তিকা লইয়া মনুষ্য সৃষ্টি করিলেন, কিন্তু তাহারা জলচর হইল, এবং যদিও বাক্‌শক্তি-বিশিষ্ট হইল বটে; তথাপি বুদ্ধি-বৃত্তির অভাবে কোন-কার্য্যক্ষম হইতে পারিল না। তাহারা মস্তক এদিক্ ওদিক্ ফিরাইতে পারিত না এবং তাহাদের দৃষ্টি তমসাচ্ছন্ন হইল। অতএব দেবতাদিগের অভিপ্রায় নিষ্ফল হওয়ায় সমুদ্র সে মানব-বংশ গ্রাস করিয়া ধ্বংস করিল। তৃতীয়বারে দেবতারা কাষ্ঠ লইয়া মনুষ্য সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু ইহারা শূন্য হৃদয় ও শূন্য-বুদ্ধি হওয়ায় এবং স্রষ্টার কথা কিছুমাত্র স্মরণ না থাকায়, সমুদ্র আসিয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিয়া ধ্বংস করিল। চতুর্থবারে দেবতারা ঝিটে (Zite) নামক বৃক্ষ লইয়া মানব এবং সিবাক (Sibac) নামক বৃক্ষের মজ্জা লইয়া মানবী সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু ইহারাও দেব সমীপে অকৃতজ্ঞ হওয়ায় পূর্ব্ব কথিত রূপ ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। এই জাতির অবশিষ্ট যাহা রক্ষা পাইয়াছিল, তাহাদের বংশাবলী অদ্যাপি অরণ্যবাসী বানর জাতিতে দৃষ্ট হয়। পঞ্চমবারে অনেক চিন্তার পর দেবতারা চারি জন মনুষ্য সৃষ্টি করিলেন। ইহারা তাঁহাদের অভিপ্রায় পরিপূরণ করিল বটে, কিন্তু ইহাদের বুদ্ধি-বৃত্তি ও দর্শন-শক্তি এত তীক্ষ্ণ হইল, যে দেবতারা তাহাতে ভীত হইয়া ইহাদের দৃষ্টি তমসাচ্ছন্ন এবং দর্শন পথের সীমা নিরূপণ করিয়া দিলেন। এই চারি জন মনুষ্য যখন নিদ্রাভিভূত হইল, সেই সময়ে দেবতারা চারিটি পরমাসুন্দরী মানবী সৃষ্টি করিয়া ইহাদিগকে স্ত্রীরূপে প্রদান করিলেন। এই চারিটি দম্পতি হইতে কালক্রমে জগতের সমস্ত জাতির উৎপত্তি হইল।

গ্রীকদিগের মধ্যে অর্ফিক্ পুরাণ অনুসারে সৃষ্টি প্রকরণ নিম্নলিখিত প্রকারে কথিত হইয়াছে। আদিতে এক মাত্র ক্রনস্ (Chronos) অর্থাৎ কাল বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি সর্ব্ব নিয়ম-বিরহিত (Chaos) শূন্য হইতে একটি অণ্ডের উৎপত্তি করিলেন। এই অণ্ড ভেদ করিয়া স্ত্রী এবং পুরুষ উভয় ধর্ম্মবিশিষ্ট ফানিস (Phanes) নামক প্রথম দেবতার উৎপত্তি হইল। ইহা হইতে নিক্স (Nyx) নামক দেবীর জন্ম হইল। এই দেব এবং দেবী উভয়ের সহযোগে ঔরেনস (Ouranos) অর্থাৎ আকাশ এবং গিয়া (Gœa) অর্থাৎ পৃথিবী জন্ম গ্রহণ করিলেন। ঔরেনস এবং গিয়া স্বামী ও ভার্য্যারূপে ব্যবহার করিয়া ক্রমশঃ

(Kronos) এবং অন্যান্য বহুবিধ দেবতা ও অসুর গণের উৎপত্তি করিলেন। ক্রনস্ আপন ভগিনী রিয়াতে (Rhea) উপগত হইয়া অন্যান্য দেবতার সহ জিউসের (Zeus) জন্ম প্রদান করিলেন। এই জিউস বিশ্বের ঈশ্বর হইয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন এবং বহুবিধ লোক সৃষ্টি করিলেন। প্রথমে যাহাদের সৃষ্টি হইল, তাহারা নিরোগী ও যদৃচ্ছা আহার প্রাপ্ত হইয়া স্বচ্ছন্দে ও সুখে ভ্রমণ করিত, এই নিমিত্ত এই জাতির অবস্থিতি কালকে স্বর্গযুগ কহিয়া থাকে। ইহারা মৃত্যুর পর অশরীরী হইয়া মানবজাতির সৎ অসৎ কার্য্যের পরিদর্শন কার্য্যে নিযুক্ত হইল। এইরূপে এজাতির ধ্বংস হইলে যে জাতির সৃষ্টি হইল, তাহারা দুর্দ্দান্ত, ক্রূর-কর্ম্মা ও দেবনিন্দক হওয়ায় অত্যল্পকালে তাহাদিগের নিপাত সাধন হইল। ইহার পরে অ্যাস্ নামক কাষ্ঠে গঠিত আর একজাতির উৎপত্তি হইল, কিন্তু ইহারাও অপরিসীম-বলশালী, দুর্দ্দান্ত, ক্রূরকর্ম্মা হওয়ায় ইহাদিগকে বিনাশের নিমিত্ত সমস্ত পৃথিবী জলপ্লাবিত হইল। কেবল প্রোমিথ্যুসের (Prometheus) পুত্র একমাত্র ডুকালিওন (Duckalion) আপন স্ত্রী সহ এক খানি তরণীতে রক্ষা পাইলেন। এই ডুকালিওন হইতে বর্ত্তমান মনুষ্যবংশের উৎপত্তি হইল।

হিন্দুমতে সৃষ্টি-প্রকরণ একমত নয়। ভিন্ন ভিন্ন পুরাণ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বর্ণিত। কোন কোন বর্ণন উপরে কথিত বৃত্তান্তের সহ সাদৃশ্যযুক্ত আছে বটে, কিন্তু আবার তেমনি কতকগুলি আছে যে যাহা সম্পূর্ণই স্বতন্ত্র আকারের। অতএব তাহার কোন একটি মাত্রের সারসংগ্রহ এখানে করা বৃথা শ্রমমাত্র। এখানে এইপর্য্যন্ত বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, আদি সৃষ্টি প্রকরণ যতই ভিন্ন প্রকারে বর্ণিত হউক না কেন, সর্ব্বত্রই ইহা জ্ঞাপিত হইয়াছে যে আদিতে একমাত্র জনক জননী হইতে মনুষ্য বংশের উৎপত্তি হইয়াছে।

এইরূপে অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য এবং আদিম সভ্য জাতির মানববংশের উৎপত্তি-বিষয়ক মত কি তাহা দেখা গেল। অধুনাতন উন্নতিশীল সভ্যজাতির গৃহীত মত কি তাহা দেখা যাউক। বর্ত্তমান সভ্যজাতির চূড়াস্বরূপ খ্রীষ্টশিষ্যাদিগকেই ধরিতে হয়। তাঁহারা কি কহেন এবং কি বিশ্বাস করেন তাহা দেখ।—সয়তান অধঃপাতিত হওয়ার পূর্ব্বে স্বর্গীয় দূতের প্রধান ছিল। ঈশ্বরের সহ বিবাদে স্বদলসহ সয়তান স্বর্গচ্যুত হইলে, তাহাদের স্থান পরিপূরণ কল্পনায় অনন্তশূন্য প্রদেশে পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়া ঈশ্বর তাহাতে মনুষ্য স্থাপন করিলেন। এই স্থাপিত মনুষ্যেরা এক স্ত্রী ও এক পুরুষ মাত্র। ইহাদের হইতে যে বংশাবলীর উৎপত্তি হইল তাহারা ক্রমে অত্যন্ত পাপাসক্ত হওয়ায় ঈশ্বর তাহাদিগকে জলপ্লাবনের দ্বারা ধ্বংস করিলেন, কেবল

এক মাত্র ধর্ম্মশীল ব্যক্তি, তাহার স্ত্রী, তিন পুত্র এবং তাহাদিগের স্ত্রী ও যাবতীয় জীবের এক এক জোড়া রক্ষা করিলেন। এই পুত্রত্রয় হইতে মনুষ্যবংশের এবং জীবগণ হইতে জীববংশের বিস্তার হইল। এই জলপ্লাবন খ্রীষ্টের ২৩৫২ বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল, অর্থাৎ উহা হইতে বর্ত্তমান সময়ের অন্তর ৪২২৮ বৎসর।

কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি বা যে কেহ অন্যদর্শন-বিরহিত হইয়া, কেবল পূর্ব্ব-কথিত জাতীয় সৃষ্টি প্রকরণ অবলম্বন করিয়া যদি মীমাংসায় প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে উহাদের বাহ্যিক যে কথঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য, তাহা উপেক্ষা করিয়াও কেবল মাত্র অন্তর্ভূত সাদৃশ্য দর্শনে এরূপ মীমাংসায় উপস্থিত হইবে, যে বস্তুতই মনুষ্যজাতি আদিতে এক জনক জননী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং পুত্রগণ পিতার নিকট সৃষ্টি প্রকরণ জ্ঞাত হইয়া, যথাস্মৃতি নানাস্থানে প্রচার করিয়াছে; নতুবা এই বিভিন্ন জাতি কর্ত্তৃক কথিত বিবরণের মধ্যে এরূপ সৌসাদৃশ্য থাকার কারণ কি? বস্তুতঃ এরূপ মীমাংসায় উপনীত হওয়া শুদ্ধ অনভিজ্ঞ বা একদেশদর্শীর কার্য্য নহে। অনেক বহুদর্শী ও মহামহোপাধ্যায় গণকেও এইরূপ সাদৃশ্য মাত্র দর্শনে এইরূপ মীমাংসায় উপনীত হইতে দেখা যায়। অতএব ইহা নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে ভ্রম-যুক্ত জানিতে পারিলেও, তাহার সম্যক্ আলোচনায় হস্তচেষ্ট হইতে পারা যায়না। এ নিমিত্ত এতদ্রূপ সাদৃশ্য মালা, মানবের এক-পিতৃত্ব নিরাকারণ স্থলে, পর্য্যাপ্ত, প্রমাণ-রূপে গ্রহণ করিতে পারা যায় কিনা; এবং এরূপ সাদৃশ্য মানবের কেবল এক-পিতৃত্ব হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, কি তাহার উৎপত্তির আরও বহুবিধ কারণ আছে, অগ্রে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

কি আচারগত কি ঐতিহাসিক সৌসাদৃশ্য মনুষ্য মণ্ডলী একবংশোদ্ভূত না হইলেও নানা কারণে উপস্থিত হইতে পারে। ভিন্ন-ভিন্ন-দেশ-বাসী ও ভিন্ন-ভিন্ন ভাষা ব্যবহারী হইলেও, পরস্পর-কার্য্যব্যপদেশে সংলগ্ন হওয়ায় পরস্পরের আচার ব্যবহার ইতিহাস উপন্যাসাদি পরস্পরের মধ্যে বিনিময় হইয়া জাত্যন্তর হওত কখন প্রায় অবিকৃত থাকে অথবা দেশকাল পাত্র অনুসারে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া সেই সেই জাতীয় মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে। কালসহকারে যখন সেই বিনিময় স্মৃতিপথ বহির্ভূত হয়, অথবা সেই সকল নীত বিষয় বারম্বার ব্যবহারে এবং হস্তান্তরে কিয়ৎ পরিমাণে রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, কিম্বা উভয়বিধ কারণেই যখন একত্র সমাবেশ হয়, তখন সেই বিনিময়-লব্ধ বিষয় আবার নয়ন-পথে পতিত হইলে, দর্শকের নেত্রে সহসা তাহাদের বিভিন্ন জাতিতে স্বাধীন উৎপত্তি বোধের প্রতি-পোষক ভ্রম উৎপাদন করিয়া থাকে এবং তজ্জনিত ভ্রান্তিময় চিন্তার কারণ হইয়া থাকে।

পৃথিবী মনুষ্য-নিবাস হওয়া অবধি এরূপ ঘটনা শত শত হইয়া গিয়াছে। মানবের সভ্যাবস্থায় যেমন ভিন্ন ভিন্ন জাতির সংলগ্নের কারণ অসংখ্য, জাতি হইতে জাত্যন্তরে গৃহীত বিষয়ের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার উপায়ও তেমনি সভ্যজাতির মধ্যে অসংখ্য রহিয়াছে। অবনীতে সভ্যতা-সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে, সভ্যতার আনুসঙ্গিক জাতির সংলগ্নের কারণ সমুদয় যদিও ছিল না, তথাপি তাহা অন্য কারণে সমাধা হইত। সভ্যতা সময়ে মানব আশ্রমী হইয়া এক স্থানে বাস করিয়া থাকে, কেবল কার্য্য-ব্যপদেশে কোন নিয়মিত সময়ের জন্য স্থানান্তরিত হয়, সেই সময়েই যাহা কিছু বিজাতীয় সংস্রব হয়। কিন্তু অসভ্যাবস্থায় মানব নিরাশ্রমী, পশুপালন বা মৃগয়া মাত্র জীবিকা, যথায় যথায় তাহার সুবিধা, তথায় তথায় অনবরত বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিয়া ফিরিতেছে। যে স্থান হইতে প্রথম যাত্রা করিল, হয়ত আর কখন সে স্থানে পুনরাগমন করিবে না এবং এ গমন যে কোথায় গিয়া নিবৃত্তি হইবে, এবং নিবৃত্তি হওয়ার পূর্ব্বে কত কত স্থান পদতল-গত হইবে, তাহা এক অদৃষ্ট ব্যতীত আর কেহই বলিতে পারে না। এই পরিবর্ত্তন সময়ে পথ মধ্যে ভিন্ন-জাতীয় সংস্রব ঘটিয়া থাকে। যেখানে ঘাস জল ও মৃগ প্রচুর দেখিল, সেই থানেই অদৃষ্টপূর্ব্ব অপরিচিত অনেক জাতির একত্র সমাবেশ হইল এবং সেই সময়ে ব্যবহার ইতিহাস উপন্যাসাদির বিনিময়-কার্য্য সমাধা হইল। যখন সে স্থানের বাস ফুরাইল, তখন সর্ব্ব সম্বন্ধ-বিরহিত হইয়া যে যাহার গন্তব্য পথে প্রস্থান করিল, হয়ত ইহকালের মত আর কখন পুনর্ম্মিলন হইল না। কাল গত হইল, জাতির সংস্রব বিস্মৃতি-সাগরে ডুবিল,—কিন্তু দূরকালে এক-দেশ-দর্শীর ভ্রম-উৎপাদক স্বরূপ বিনিময় লব্ধ বিষয় সমূহ অস্থি মজ্জায় প্রবেশ করিয়া, স্থায়ীভাবে জাতীয় সম্পত্তির পদে অধিষ্ঠিত হইয়া রহিল। আমরা যখন দেখিতেছি যে সভ্য সমাজেও,—যখন মানবের জ্ঞান-চক্ষু বিস্ফারিত হইয়াছে তখনও,—যখন ভিন্ন জাতীয় বিষয় জাতীয় সম্পত্তি পদে অধিরূঢ় হইতেছে; তখন যে অসভ্য, বাস-পরিবর্ত্তন-শীল মানব সমাজে উহা কতদূর সম্ভব, তাহা বলা বাহুল্য। সভ্য সমাজের একটি দৃষ্টান্ত এখানে বলিব।

সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্র অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এবং কৌতুকাবহ উপন্যাসে পরিপূর্ণ, এই নিমিত্ত অতি প্রাচীন কাল হইতেই ইহা জন-সমাজে সমাদৃত। ৫৭০ খৃষ্টাব্দে পারস্যরাজ খস্রু নওসি রোঁয়া ইহার সুখ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া পহ্লবী অর্থাৎ তাৎকলিকী পারস্য ভাষায় ইহার অনুবাদ করাইয়াছিলেন। যখন পারস্য মুসলমান কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়, সেই সময়ে আরবী ভাষা মুসলমানদিগের প্রচলিত ভাষা হওয়ায় ৭৭০ খৃষ্টাব্দে আল্ম কাফা নামে এক জন আরব উহা আরবী ভাষায় অনু-

বাদ করেন। আলম্ কাফার আরবি অনুবাদ হইতে, সিমিওন্ নামক এক ব্যক্তির দ্বারা খৃষ্টের একাদশ শতাব্দীতে গ্রীক ভাষায় অনুবাদিত হয়। এই গ্রীকের আবার লাটিন অনুবাদ ১৬৭৭ শকে প্রকাশিত হয়। পুনশ্চ আরবী অনুবাদ হইতে রাবি জোয়েল এই পুস্তকের হিব্রু অনুবাদ করেন। এই হিব্রু অনুবাদ ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রায় যাবতীয় ইউরোপীয় ভাষায় নীত হইয়া সমস্ত ইউরোপে বিস্তৃত হয়। এবং এ যাবৎ ইউরোপ ভূমে লোকের এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে এই সকল উপন্যাস সমূহ হিব্রু জাতির জাতীয় সম্পত্তি। এ দিকে আবার পঞ্চদশ শতাব্দীতে আরবি অনুবাদ হইতে হুসেন বেগ আধুনিক পারসিতে অনুবাদ করিয়া, অন্যান্য গল্পের সহ সমাবেশ করিয়া, আজওয়ার সোহেলি নামে প্রকাশ করেন। উহা সপ্তদশ শতাব্দীতে দাউদ সৈয়দ ইস্পাহানি কর্ত্তৃক ফরাসি ভাষায় নীত হইয়া নূতন আকারে (Fables of Pil pay) পিল্পে কৃত গল্পাবলী নামে প্রচার হয়, তাহার পর অনুসন্ধানের আরম্ভ হইয়া স্থিরীকৃত হয় যে এত গোলযোগের মূল ক্ষুদ্র পুস্তক সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্র মাত্র।

অতএব যখন ঐতিহাসিক এবং সভ্যতালোকময় সময়েরই এই দশা, তখন দূরগত আদিম সময়ে কি না হইয়াছে। একারণে সৌসাদৃশ্য-যুক্ত বিষয় দেখিলেই যে পাঁচ ভাই এক ঠাকুর মার আগুনের মালসীর পাশে বসিয়া এক উপন্যাস শুনিয়া পাঁচ যায়গায় পাঁচ রূপে প্রচার করিয়াছে, এরূপ ভাব বা মীমাংসায় উপনীত হইতে প্রস্তুত নহি।

যদৃচ্ছা জাতীয় সংশ্রবে বিষয় পরিবর্ত্তন হেতুই যে কেবল ভিন্ন ভিন্ন জাতি মধ্যে বহু বিষয়ের সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাই এমন নহে। সমজাতির পদার্থ মাত্রেরই জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত কতকগুলি স্বাভাবিক অবস্থা এবং কার্য্য আছে, যাহা সেই সেই জাতির প্রত্যেক পদর্থেই নিয়মিত সময়ে সর্ব্বত্র সমভাবে প্রতিভাসিত হইয়া থাকে। বাহ্যিক আকৃতিতে সেই সকল কার্য্য এবং অবস্থার কিছু কোথাও রূপান্তর থাকিলেও, উহার অন্তঃপ্রকৃতি সর্ব্বত্র এক এবং সাদৃশ্যময়। বিবেচনা কর কোন উন্নত চূড় ক্ষুদ্র শাখ এবম্ভূত জাতির বৃক্ষবিশেষ যেরূপে উৎপন্ন এবং পরিবর্দ্ধিত হইয়া আপন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইরূপ সে জাতীয় যে কোন বৃক্ষ তদ্বৎ ভাবে সমধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া, সমান স্বভাব প্রকাশ করিয়া বর্দ্ধিত অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। সেই পরিবর্দ্ধন সময়ে অমুক বৃক্ষের শাখা সরল ভাবে, অমুকের শাখা ঈষৎ ন্যুব্জ ভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে, এবম্ভূত বৈলক্ষণ্য ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। ছাগজাতি শৈশবে একইরূপ চপল ও ক্রীড়ন-শীল এবং তাহাদের ক্রীড়া প্রণালী ও বয়সে ছাগ-ভাব ছাগ-জাতির মধ্যে সর্ব্বত্রই সমান। মনুষ্য-শিশু বাল্যে যে ক্রীড়া কৌতুক এবং চাপল্য ও তদ্বৎ

অন্যান্য স্বভাব প্রকাশ করিয়া থাকে, সকল মনুষ্য-শিশুতেই তাহা দেদীপ্যমান, এবং সেইসমস্ত কেনা বলিবে যে এক-জাতীয়, তবে প্রভেদের মধ্যে এই, কেহ বা পেন্সিলটি লইয়া দন্তে চর্ব্বন করিল, কেহবা তাহা লেহন করিয়া আনন্দ বোধ করিল। মনুষ্য একইরূপ মনোবৃত্তি এবং স্বভাব লাভ করিয়া শৈশব যৌবন প্রভৃতি অবস্থা অতিক্রম করিয়া থাকে, এবং তাহাদের সেই অবস্থা ভেদে মনোবেগ বা কার্য্য দেখিলে, তাহাদের সমজাতীয়ত্ব এবং সৌসাদৃশ্য হেতু অনায়াসেই জানিতে পাওয়া যায় ইহা শৈশব, বা যৌবন বা বার্দ্ধক্য হইতে উৎপাদিত। এমন কথ নই বোধ হইবে না যে সেই সকল এক পিতৃত্ব বা পরস্পর সংস্রবে একজন অপ-রের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে। সেইরূপ মনুষ্যের অনন্ত জীবন প্রবাহও, গন্তব্য পথে গমন করিতে এমন কতক গুলি অবস্থা ভেদ করিয়া যাইতে হয়. যে সেই প্রবাহের যখন যে অংশই হউক না কেন, অবস্থা-বিশেষে আসিয়া পতিত হইলেই সেই অবস্থানুরূপ আকার ধারণ করিবে, মানসিক এবং দৈহিক গতি তদ্বৎ হইবে এবং তদ্বৎ কার্য্যের উৎপাদক হইবে, এবং একাংশের ক্রিয়া সহ সেই অবস্থায় পতিত প্রবাহের অপরাংশের ক্রিয়ার যদিও কিছু বাহ্য রূপান্তর দৃষ্ট হয়, তথাপি তাহাকে ভিন্ন বলিয়া বলা যাইবে না। অতএব ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে কতক গুলি এমন সমজাতীয় ও সৌসাদৃশ্য-যুক্ত বিষয় আছে, যাহাকে এক-পিতৃত্ব নিবন্ধন বা জাতীয় সংস্রবে উৎপন্ন বলিতে পারি না। উহা স্বাভাবিক ক্রিয়ার জীবন প্রবাহের অবস্থা বিশেষে উৎপন্ন বলিতে হইবে। এতদ্বিষয় নিম্নে উদাহরণ দ্বারা আরও পরিস্ফুট করণের চেষ্টা করা যাইতেছে।

ম্যাকলিনান সাহেবকৃত পুরাকালীন বিবাহ (On Primitive marriage) বিষয়ক প্রবন্ধে লিখিত আছে যে অতি পুরাকালে প্রায় সকল জাতির মধ্যেই বল পূর্ব্বক কন্যা হরণ করিয়া বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইত। ইউরোপের উত্তর প্রদেশের প্রাচীন জর্ম্মণীয় ভাষায় quan-fang অর্থাৎ স্ত্রী ধৃত করণ এবং Crut Loufti অর্থাৎ কন্যা শিকার ইত্যাদি কথার অস্তিত্ব থাকায় নিঃসন্দিগ্ধ-ভাবে অনুমান হয় যে বলপূর্ব্বক স্ত্রীগ্রহণ ঐ সকল দেশেও অতি প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল। আমাদের জাতিতে রাক্ষস বিবাহ আমাদের দেশেও স্ত্রী শিকার পক্ষে বিশেষ প্রমাণ। কুক্ সাহেব তাঁহার দ্বিতীয় বার মহার্ণব ভ্রমণে যখন অষ্ট্রে-লিয়ায় উপনীত হয়েন, তখন তথাকার অসভ্যবাসীদিগের বিবাহ প্রণালী এইরূপ অবলোকন করিয়াছিলেন। কোন পুরুষ স্বদল হইতে দলান্তরে প্রচ্ছন্নভাবে প্রবেশ করিয়া আড়ি পাতিয়া থাকে, এবং সেই সময় কোন নিঃসহায়া স্ত্রীলোক দেখিলেই, মস্তকে লগুড়াঘাত দ্বারা তাহাকে ভূপাতিত করিয়া, কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক হেঁচড়াইয়া

লইয়া স্বদলে উপস্থিত হয় এবং গৃহকার্য্যে নিযুক্ত করে, এতদ্ব্যতীত বিবাহের নিমিত্ত আর কোন স্বতন্ত্র পর্ব্ব ও আচার করিতে হয় না। এই স্ত্রীগণ এতদূর আজীবন উৎপীড়িত, যে কন্যা প্রসব করিলেই ভাবী দুঃখ হইতে তাহাদিগকে নিষ্কৃতি দিবার নিমিত্ত হত্যা করিবার ক্ষণ অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। মালয় এবং মধ্য আসিয়ায় এইরূপ রীতি দৃষ্ট হয় যে কন্যা এবং বিবাহার্থীগণ ঘোটকারূঢ় হইলে, কন্যা দৌড়িতে আরম্ভ করে, যে ব্যক্তি তাহাকে ধরিতে পারিবে, কন্যা তাহারই পরিণীতা হইবে। এই শেষোক্তটি নিঃসন্দেহ পূর্ব্ব-গত রাক্ষসাচারের কিঞ্চিৎ সংস্কার মাত্র। এখন দেখা যাইতেছে যে এই কন্যা-শিকার প্রথা পশুবদ্ভাবেই হউক বা তদপেক্ষা কিয়ৎ পরিমাণে উন্নত ভাবেই হউক আদিতে প্রায় সকল জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। এ নিমিত্ত ইহা বলা যাইতে পারে না, যে এই রীতি নোয়ার (Noah) জাহাজ হইতে সংগ্রহ করিয়া ভ্রাতৃত্রয় পৃথিবী লোক-পূর্ণ করিতে বহির্গত হইয়াছিল। ইহা স্বাভাবিক সূত্রে উৎপন্ন। এই রীতির স্রোত, নিতান্ত মৃদুভাবে হইলেও, মানবের অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থা পর্য্যন্তও চলিয়া আসিয়াছিল; কিন্তু ইহার উৎপত্তি নিঃসন্দেহই মানব-জীবনের অভ্যুদয়ে হয়। মনুষ্য তখন পশুবৎ, জীবন কেবল পশুর ন্যায় আহার নিদ্রা ও ইন্দ্রিয় তুষ্টির ইচ্ছাতে পরিপূর্ণ এবং তৎতৎ বিষয়ের জন্য ব্যবহারও পশুবৎ। এমন অবস্থায় তাহারা যে স্ত্রীজাতি লইয়া পশুদিগের ন্যায় কাড়াকাড়ি, বিবাদ বিসম্বাদ সর্ব্বদা করিবে তাহা স্বাভাবিক। মানববুদ্ধিহেতু উন্নতির মধ্যে এই মাত্র দৃষ্ট হয়, যে কেহ কেহ সম্মুখ বিবাদের বিপদ এড়াইতে গুপ্তভাবে স্বকার্য্য সাধন করিত এবং বুদ্ধি হইতেই স্ত্রীবিশেষে আকর্ষণের আধিক্য হেতু বিবাদের সম্ভাবনা অধিক হইত। এ রীতির সৃষ্টি এইরূপে, এবং কাল-মাহাত্ম্যে বদ্ধমূল হওয়ায়, মনুষ্যের উন্নত অবস্থা পর্য্যন্তও ইহার স্রোত কিয়ৎ পরিমাণে চলিয়াছিল।

এইরূপ আরও একটি বিষয় দেখা যাউক। ইতর হইতে উচ্চতম সকল জীবেই আত্ম-জীবনে মমতা সমান উগ্র। সর্ব্বস্ব একদিকে, আত্মজীবন একদিকে। মানবী প্রকৃতিও সেই আত্ম-জীবন-প্রিয়তা হইতে পৃথক্ নহে। যখন মানবেরা বাক্য-স্ফূর্ত্তি এবং বুদ্ধিশক্তির পরিমার্জ্জনা দ্বারা আপনাদিগের আত্মত্ব জ্ঞাত হইয়াছিল এবং পশুসৃষ্টি হইতে পৃথিবীর সুখগ্রহণে অধিক পটুতা লাভ করিয়াছিল, তখন যে সেই-জীবনের প্রতি তাহার সাধারণ মমতার আধিক্য হইবে, এবং জীবলীলা মাত্রে জীবনের ব্যাপ্তিকাল নিরূপণ করিতে কষ্ট বোধ করিবে, ইহা সম্ভব। অতএব বোধহয় সেই মমতা হইতেই পরলোক কল্পিত, ইহাই পশুসৃষ্টি হইতে মানবীয় বুদ্ধির উৎকর্ষ। এমন বিষয়ে সকল জাতিরই উদ্ভাবিত তত্ত্ব এক প্রকৃতির হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র বিচিত্রতা নাই।

সেই তত্বের ভিন্ন ভিন্ন জাতিকর্ত্তৃক উদ্ভাবিত কতক গুলি আকৃতির এস্থলে পরীক্ষা করা যাউক।

প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত পলিনেসিয়া নামক দ্বীপাবলীর অধিবাসী দিগের মধ্যে এরূপ বিশ্বাস, যে মানব মৃত্যুর পরে ক্যানো (Canoe), অর্থাৎ বৃক্ষকল্কল-নির্ম্মিত নৌকা বিশেষ দ্বারা গন্তব্যস্থানের ব্যবধানস্থিত জলের তরঙ্গ পার হইয়া, যথাস্থানে উপনীত হয়। ইস্কম নামক উত্তর আমেরিকা এবং গ্রীন্‌লণ্ড বাসীদিগের মধ্যে এইরূপ বিশ্বাস যে মানব মৃত্যুর পর টরণ-গারস্থক (Torn Gar suk) নানক স্থানে নীত হয়। ঐ স্থানে সর্ব্বদা উত্তাপময়, এবং পরিষ্কার তরল জল, পক্ষী, মৎস প্রচুর। সূর্য্য-কিরণ সর্ব্বদা পাওয়া যায়। সীল নামক মৎস্য এবং বল্‌গা হরিণ তথায় অপর্য্যাপ্ত বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে এবং বিনা ক্লেশে তাহাদিগকে ধৃত করা যায়। কিন্তু এই স্থানে যাওয়া বড় কষ্টকর, সেই পথে পূর্ব্বগত যাত্রীদিগের রক্তে এবং বরফে আর্দ্র অত্যুচ্চ পর্ব্বতের গা বহিয়া ক্রমাগত পাঁচদিন গমন করিলে তবে গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইতে পারে। এপথে বড় সাবধানে যাইতে হয়, হঠাৎ পিছ্‌লাইয়া পড়িলে যদি আবার মৃত্যু হয়, তাহা হইলেই তাহার একেবারে ধ্বংস হইল। এই হেতু যাহারা শীতকালে মরে, তাহাদের বড় কষ্ট, বড় ভয়, কেননা সে সময় দুরন্ত শীত এবং ঝটিকায় পথ-ভ্রষ্ট হওয়ার অত্যন্ত সম্ভাবনা। এখানে দেখা যাইতেছে যে জীবনের মমতায় এই নির্ব্বোধেরা প্রথম মৃত্যুতেও কোনরূপে প্রাণ বাঁধিয়াছিল, কিন্তু দ্বিতীয়বার মৃত্যুতে যে আর নিস্তার আছে, ইহা নিরূপণ করিতে তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি আর সাহসী হয় নাই।

থক্ত নামক আদিম আমেরিকদিগের মধ্যে বিশ্বাস যে মনুষ্যকে মৃত্যুর পর এক অতি ভয়ঙ্করী নদী পার হইয়া পশ্চিম দেশে যাইতে হয়। এই নদী পার হওয়া বড় সুকঠিন। ইহার উপরে অতি পিচ্ছল-গাত্র এক খান পাইন নামক কাষ্ঠ ভেলা আছে, তাহার উপর দিয়া যাইতে হয়। পার হওন সময়ে ছয় ব্যক্তি অপরদিক্ হইতে আগত ব্যক্তির উপর ক্রমাগত ধূলামাটি ও প্রস্তরাদি নিক্ষেপ করিতে থাকে। যে ব্যক্তি ভাল এবং জীবন্তে সকলকে নিজ-আহৃত শিকারের ভাগ দিয়াছে, সে স্বচ্ছন্দে নির্ভীক চিত্তে পার হইয়া যায়, কিন্তু যে দুষ্ট সে পদস্খলিত হইয়া নিম্ন-নদী তরঙ্গে পতিত হইয়া হাবুডুবু খাইতে থাকে। ইহাদের এই সুখময় পশ্চিম-দেশ-স্থিত পরলোক নিরূপিত হওয়ার কারণ, থক্ত জাতির বাসস্থানের পশ্চিমস্থ দেশ অপেক্ষাকৃত সুখময়। এইরূপ কষ্টসাধ্য পরলোক গমন সকলদেশেই কোন না কোন রূপে বর্ণিত হইয়াছে, এবং সুজনের জন্য সুখ ও দুর্জ্জনের জন্য দুঃখ কল্পনা করা হইয়াছে। সেই সুখ ও দুঃখ পার্থিব সুখ

দুঃখের আধিক্য মাত্র। মুসলমান দিগের পরলোক গমনের পথে একটি সেতু পার হইতে হয়, উহা কেশাপেক্ষাও সূক্ষ্ম এবং খড়্গের ধার হইতেও তীক্ষ্ণতর। আমাদিগের অথর্ব্ববেদ অনুসারে আত্মাকে মৃত্যুর পর ঘোরতর-অন্ধকারময় এবং কষ্টসাধ্য স্থান দিয়া পরলোকের পথ অতিক্রম করিতে হয়। পৌরাণিকী গাথানুসারে বৈতরণী নদীর উপর দিয়া যমালয়ে যাইতে হয়।

এই সকলের দ্বারা কি অনুমিত হয়? মানবচিত্ত যখন দেখিতেছে যে পরলোক গমনের সূচনারূপ মৃত্যুই যখন এত কষ্টকর, তখন গমন এবং গমন-পথ যে আরও কষ্টকর বিবেচনা করিয়া লইবে তাহাতে বিচিত্র কি? এ কষ্ট সীমা-পর্য্যন্ত। যে জাতি আপনার চতুঃপার্শ্বে অবলোকনে যাহা যাহা অত্যন্ত কষ্টের বলিয়া বিবেচনা করিয়াছে তাহাই এই পথের সহ যোজনা করিয়াছে; এবং বহুকষ্ট ভোগ হেতু স্বভাবজাত সুখের আশায়, গন্তব্য স্থানকে যথাবুদ্ধি সুখময় বিবেচনা করিয়া লইয়াছে। জীবন্তে লোকে যাহার মঙ্গল কামনা করে, পরলোকে তাহারই মঙ্গল সূচিত হইয়াছে, এবং জীবন্তে লোকে যাহার অমঙ্গল কামনা করে, পরলোকে তাহারই অমঙ্গল সূচিত হইয়াছে। পূর্ব্বরূপ আশাহেতু যেমন সুখের আধিক্য কল্পনা, তেমনি দুষ্টের প্রতি ক্রোধের আধিক্য হেতু তাহার ক্লেশাধিক্য কল্পিত হইয়াছে। এই পরলোক-বিষয়িনী তত্ত্বাবলী এত সাদৃশ্য-যুক্ত হইলেও, ইহা মানবের এক-পিতৃত্ব-রূপ মূল হইতে উৎপন্ন না হইলেও হইতে পারে; দেখা যাইতেছে যে ইহা অবস্থা-বিশেষে মানবের আত্ম-স্বভাব হইতেই উৎপন্ন।

সর্ব্বসংস্রব-শূন্য হইলেও, মানবের আত্ম-স্বভাব হইতে সমজাতীয় চিন্তক্রিয়া এবং তজ্জনিত কার্য্য বিশেষ যে স্বাধীন ভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহার আর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখাইব। যেখান হইতে এই দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলাম, সেই স্থান, পাঠকের মনে পূর্ণরূপে ভাবোদয় করিবার নিমিত্ত, অবিকল উদ্ধৃত করিলাম:—

An ingenious little drilling instrument which I and other observers had set down as peculiar to the South sea Islanders, in or near the Samaon group, I found kept one day in stock in the London tool shops"—Tylor's Researches into the early history of mankind, and the Development of civilisation.

এখানে নিঃসন্দেহ কেহই এমন কথা বলিতে পারিবেন না যে টাইলর সাহেব দক্ষিণ-সমুদ্রস্থ দ্বীপবাসীদিগের মধ্যে যে অস্ত্র দেখিয়াছিলেন, দ্বীপবাসীরা তাহার নির্ম্মাণ-কৌশল হয় লণ্ডনবাসী-দিগকে শিক্ষা দিয়াছিল, অথবা তাহারা লণ্ডনবাসী-দিগের নিকট শিক্ষা পাইয়াছিল।

পুনশ্চ মেক্‌সিকোর আদিম অধিবাসিবর্গ গ্রহণ সম্বন্ধে বলিত যে সর্প-দ্বারা চন্দ্র বা সূর্য্য গ্রাসিত হওয়ায় চন্দ্র বা সূর্য্য-গ্রহণ হইয়া থাকে। আমাদিগের শাস্ত্রানুসারেও কেতু নামক সর্পদ্বারা চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রাসিত হয়েন। এই সৌসাদৃশ্যও আমি টাইলর কর্ত্তৃক দর্শিত অস্ত্রের শ্রেণী-ভুক্ত করি।

উপরি উক্ত উদাহরণ-মালা হইতে বিভিন্ন-প্রকৃতির আর কতক গুলি সাদৃশ্য-যুক্ত বিষয়ের পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক, যে ইহাদের উৎপত্তি কিরূপে হইল।

সন্তান প্রসবকালীন নানা স্থানে একটি অতি অদ্ভুত এবং কৌতুকাবহ ঘটনা অবলোকিত হয়। দুতার্ত্তে (Du-Terte) নামক একজন ভ্রমণকারী আমেরিকার নিকটস্থ সাগর-স্থিত দ্বীপাবলীর আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে সন্তান প্রসবকালীন যে সকল নিয়ম প্রতিপালিত হইয়া থাকে, তাহা এই রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। সন্তান প্রসবের অব্যবহিত পরেই প্রসূতি স্বাভাবিক-অবস্থা-যুক্তের ন্যায় গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা হয়, কিন্তু তাহার স্বামী তৎক্ষণাৎ পীড়িতের ন্যায় তাহার স্থানাধিকার করিয়া সন্তান কোলে করিয়া শয্যাশায়ী হইয়া, ক্রমাগত চল্লিস দিন নিতান্ত রোগীর ন্যায় পথ্য ও শুশ্রূষা পাইয়া থাকে। চল্লিস দিনের পর জ্ঞাতিবর্গ নিমন্ত্রিত হয়, তাহারা আসিয়া প্রহার এবং আঁচড়ে কামড়ে ক্ষত বিক্ষত করিয়া সেই বেচারাকে প্রকৃতই রোগীর ন্যায় করিয়া তুলে। তাহার পর বাছিয়া বাছিয়া ভাল ভাল ৬০টি মরিচকে গুঁড়া করিয়া জলের সঙ্গে মিলাইয়া তাহার ক্ষত স্থান ধৌত করিয়া, তাহাকে শয়ন করাইয়া জ্ঞাতিবর্গ পান ভোজনে প্রমত্ত হয়। এই সকল যন্ত্রণাতেও দুর্ভাগ্য পিতাকে রা শব্দ করিবার যো নাই, তাহা হইলে অতি মন্দ-ভাগ্য এবং ভীরু বলিয়া তাহার কলঙ্ক হইয়া থাকে। ইহার পর আর কয়েক দিন বিছানায় কাল কাটাইয়া শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠে। (২)

দক্ষিণ আমেরিকার অ্যাবিপোন নামক আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে পাদ্রি দব্রিজফার এ প্রথা এইরূপ অবলোকন করিয়াছিলেন। যেমাত্র স্ত্রী সন্তান প্রসব করিয়াছে, অমনি স্বামী তাহার স্থানে সন্তান কোলে করিয়া এরূপ আচরণের সহিত শয়ন করিল, যে লোকে দেখিলে

---

(২) এই বিষয়টি দাম্পত্য-দণ্ডবিধির আইন কর্ত্তার কৌন্সিলে এবং আমার দেশস্থ সুবদনীদিগের বিচারাধীনে অর্পণ করিতে চাই। তাঁহারা দেখিবেন যে স্বামী-শাসনের পক্ষে ইহা এক অতি সুন্দর শাস্তি। বিশেষতঃ ইংরাজ বাহাদুর কর্ত্তৃক এদেশে আনীত সভ্যতার কল্যাণে, স্ত্রী পুরুষের সম সত্ত্বাধিকার লইয়া অনেক কলহ কচ্‌কচি চলিতেছে, অতএব এটি যদি ঐ আইনের একটি ধারা রূপে বিধিবদ্ধ হয়, তাহা হইলে তৎপক্ষেও ইহা অল্প সহায়তা করিবে না।

হঠাৎ মনে করিবে, যেন এই সন্তানটি এই পুরুষটিরই গর্ভজাত এবং ইহা হইতে প্রসূত। পাছে পুরুষটির গায় বদ হাওয়া লাগিলে সন্তানটির অমঙ্গল হয়, এজন্য সে মাদুর বা চর্ম্ম দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়া থাকে। এইরূপ কিছুকাল উপবাস, তৎপরে নিয়মপূর্ব্বক আহারাদির সহিত কাল যাপিয়া, শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মার্ক পলো (Marco Polo) নামক বিখ্যাত ভ্রমণকারী এইরূপ রীতির আভাস মিয়াং সি নামক এক জাতীয় চীন বাসিদিগের মধ্যে অবলোকন করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে এইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে যে সন্তান-প্রসবান্তে প্রসূতি সবল হইয়া বিছানা পরিত্যাগ করিলে, স্বামী তৎস্থান অধিকার করিয়া শয্যাশায়ী হইয়া, আগত ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে সন্তানের জন্য আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া থাকে। স্ত্রাবো নামক বিখ্যাত গ্রীক ভূগোলবেত্তার কিছু দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, উত্তর স্পেনে ইবিরীয় জাতির মধ্যে প্রসূতি সন্তান প্রসব করণান্তর স্বামীকে আপন স্থানে শয়ন করাইয়া, তাহাকে প্রসূতির অনুরূপ সেবা শুশ্রূষা করিত। দিওদোরস সিকুলসের কথিত বৃত্তান্ত অনুসারে জানা যায় তাঁহার সময়ে কর্সিকা দ্বীপেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। এইরূপ আপলোনিয়স রোদিউসের বৃত্তান্ত অনুসারে জ্ঞাত হওয়া যায়, যে কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণ-তীরবর্ত্তী তিবারেনিস নামক জাতির মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল।

এখন দেখা যাইতেছে যে এই প্রথা পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিভিন্ন সময়যোগে ব্যাপ্ত, এবং যথায় যথায় অবলোকিত, তথায় তথায় ইহা একরূপ ভাবাপন্ন দৃষ্ট হয়। ইহা কিরূপে উৎপন্ন? স্বভাব হইতে নিশ্চয়। এই স্থানে পূর্ব্ব-কথিত স্বভাবোৎপন্ন সৌসাদৃশ্য বিষয়িণী কারণ-পরম্পরার সম্প্রসারণ করিয়া—আরও কিঞ্চিৎ বলিব। প্রথা যে কোন প্রকারের হউক, তাহার অঙ্কুর স্বভাব হইতে উৎপন্ন, তাহার কোন কোনটীর উপর কাল সহকারে লৌকিক আকার নির্ম্মিত হয়। কেবল মাত্র, ভিন্ন-জাতিগত হইলেও যখন একরূপ দৃষ্ট হয়, তখনই তাহাকে পূর্ব্বকথিত স্বভাবোৎপন্ন সৌসাদৃশ্য শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়, অথবা সেই অঙ্কুরের উপর নির্ম্মিত লৌকিক আকার, বিভিন্ন জাতিগত হইয়া সৌসাদৃশ্য যুক্ত হইলেও, যখন দেখা যায়, যে তাহা তন্নিস্মাণোপযোগী স্বাভাবিক কারণের অধিকার বহির্ভূত নহে, তখন সেই লৌকিক আকারকে তৎশ্রেণী ভুক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু যখন অঙ্কুরের উপরে নির্ম্মিত লৌকিক আকার সর্ব্বত্র সমতাযুক্ত, অথচ তাহা স্বাভাবিক কারণের সীমা বহির্ভূত, তখন সে লৌকিক আকার সর্ব্বত্র স্বাধীনভাবে স্বভাবোৎপন্ন বলিয়া ধরিতে পারা যায় না। তাহা হয় এক বংশত্ব নতুবা জাতীয় সংস্রবে উৎপন্ন বলিতে হইবে। উপরে কথিত প্রথাটিতে

দেখা যাইতেছে, যে ইহার মূল যদিও এরূপে, যে সন্তান প্রসব কালীন কোন বিঘ্ন উৎপাদন রহিত করিবার নিমিত্ত কর্ম্মঠ স্বামীকে কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত থাকিয়া শান্ত ভাব ধারণ কর্ত্তব্য; কিন্তু ইহাকে ভিত্তি করিয়া স্বামীর পক্ষে যে ব্যবহার নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা অস্বাভাবিক; অতএব এরূপ অস্বাভাবিক বিষয় স্বভাব হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। ইহা দেশ কাল পাত্র ভেদে কোন স্থানে মনুষ্য দ্বারা উৎপাদিত হইয়া দিগন্ত বিকীর্ণ হইয়াছে। এই বিকীরণ কার্য্য। এক-বংশত্ব হেতু সাধিত হইয়াছে কি না? যদি তাহা স্বীকার করা যায়, তবে একথা বলিতে হইবে, যখন আদি পিতার এরূপ লৌকিক ব্যবহারও আজি পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণভাবে অনুকৃত হইয়া আসিতেছে, তখন অবশ্য যে ভাষায় প্রথম বাক্য স্ফুরণে মা বাপ বলিতে শিখিয়াছিল, সেই ভাষাগত ঐক্যও দৃষ্ট হইবে; তাহা না হইলে, অন্ততঃ আজন্ম উচ্চারিত পিতৃ মাতৃ সম্বোধন সূচক শব্দগত একতাও দেখিতে পাওয়া উচিত। কিন্তু তাহা সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয় না। এ বিষয় সবিস্তারে প্রবন্ধের যথা স্থানে আলোচ্য। অতএব এখানে এমন সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না যে, এই প্রথা এক-বংশত্ব হেতু উৎপাদিত। সুতরাং জাতীয় সংস্রবে ইহার উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়।

এইরূপ উপর্য্যুপরি আর উদাহরণ প্রদান করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আবশ্যকতা নাই। এক্ষণে বিভিন্ন-জাতিগত বিষয়ের সৌসাদৃশ্য বিষয়ে দ্বিবিধ কারণ প্রদর্শিত হইল। এক এই, জাতীয় জীবন গন্তব্য পথে গমন কালীন যখন অবস্থা বিশেষে উপনীত হয়, তখন সেই অবস্থা-প্রভাবে অনুরূপ চিত্ত-ক্রিয়ার অধীন হইয়া, অনুরূপ কার্য্য উৎপাদন করিয়া থাকে। সেই কার্য্য দেশ, কাল, পাত্র ভেদে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াও যদি সম্যক্ বা কিঞ্চিৎ-পরিমাণে সাদৃশ্য-যুক্ত হয়, অথচ তদুৎপাদক স্বাভাবিক কারণের সীমা-বহির্ভূত না হয়, সেই সকলকে এই প্রথম শ্রেণীরই অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করা যায়। কিন্তু যখন সেই কার্য্য দেশ, কাল, পাত্র ভেদ না করিয়া সর্ব্বত্রই সমান আকারের দৃষ্ট হয়, অথচ উৎপত্তি বিষয়ে স্বাভাবিক কারণের বহির্ভূত হয়, এবং পরে যে অপরাপর কারণ কথিত হইবে তাহার মধ্যে না, আইসে তখনই সেখানে জাতীয় সংস্রব ধরিতে হইবে এবং এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা যাইবে। ইহা ব্যতীত অপরাপর কারণ ক্রমে বিবৃত হইবে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে দেখা যাইবে যে এই জাতীয় সংস্রব এমন দূরতর স্থানে, এমন কি আসিয়া, আমেরিকায়, সেই আদিম কালে—যখন আপাততঃ দৃষ্ট কোন সুবিধারই অস্তিত্ব ছিল না—কিরূপে হইবার সম্ভব।

ক্রমশঃ—

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৃক্ষচ্যুত লতা।

১

একি তব দশা লতা?—ধরায় লুটাও!—
ছিন্ন ভিন্ন পত্রদাম,
দলিত অঙ্গ ললাম,
মলিন বরণ শ্যাম,
ধূলি-ধূসরিত, হায়, কে করিল হেন?
সুষমা সুখের ভোগে এ বিরাগ কেন?

২

কোথায় আশ্রয়তরু?—কুঠারে পাতিত!
হায়, তার পাশে পড়ি,
যে তোমারে শিরে করি,
সুখ-ধ্যানে মগ্ন, মরি,
ছিল এত কাল, ডুবে বিস্তারালিঙ্গনে,
আপনি যে শুষ্ক, নস্ট, না ভাবিয়া মনে।

৩

কি এ দৃশ্য প্রণয়ের, দুর্দ্দশায় এই!—
আবার সুখেতে পুনঃ,
যবে ভোগ অগণন,
ফুলে ফুলে বিচুম্বন,
পত্রে পত্রে জড়া-জড়ি, হৃদয়ে হৃদয়,
গাঢ়, গাঢ়তর সুখ আবেশ দোলায়।

৪

হায়!—
কোথা সেই দিন তব গিয়াছে এখন?—
যে দিন রূপের ভার,
বৃক্ষের শিরেতে আর,
না ধরি, বহিয়া তার
পড়িত ঢাকিয়া মুখ ঝালরে যেমন,
কি সুন্দর সে ঝালরে মৃদু আন্দোলন!

৫

পুনঃ—
নিশীথে নীরবে যবে ডুবিত সংসার,
উজ্জ্বল উত্তপ্ত বাস,
খুলিয়া ফেলি আকাশ,
নির্জ্জনে হৃদ-বিকাশ
করি যবে, বাতে তনু শীতলিত তার,
কিবা শোভা সেই শ্যাম হৃদে তারা-হার!—

৬

তদা
তোমারও শ্যামল অঙ্গ ধরায় বিশাল;
উবসে কুসুম হার,
খচিত রত্ন নিহার,
মলয় সঞ্চলে যার
ঝঙ্কারে মধুপকুল উড়িত সকলে,
সুখেতে বিনিদ্র, মগ্ন, যার তব কোলে।

৭

তাহে—
বিস্তৃত সুষমা, গন্ধে যোজন আকুল;
সুবর্ণে, চন্দ্রিকা হাসে,
মলয়, সৌরভে ভাসে,
নির্জ্জন সে সুখাবাসে,
ফুকারি উঠিত রয়ে কেবল পাপিয়া,
হৃদিভেদী সপ্তস্বরে প্রান্তর জাগা'য়া।

৮

আরো—
আকাশে জ্যোতির খেলা, নিম্নে জ্যোতি-
মেলা;
উভয় শোভার মাঝে,
চকোর বিভ্রান্ত সাজে,
উঠি, পড়ি শেষে, লাজে,

ঊর্দ্ধেতে না পেয়ে সুধা নামি তব পাশ,
বলিত পীযূষ পিয়ে এইই স্বর্গবাস!

৯

এবে!—
সব সুখ ছত্র সেই, সকলি উচ্ছিন্ন!—
নিষ্ঠুর মানব, হায়,
কাটিয়া পাদপাশ্রয়;
টানিয়া ফেলি ধরায়
দিয়াছে হেলায়; শেষে পশু পালে দলি,
ছিঁড়ি, খুঁড়ি ভক্ষিয়াছে লোভে কুতূহলি।

১০

হায়!—
দাঁটা সার মাত্র অঙ্গ!—তবু দেখি একি!
পুন মুঞ্জরিছ কেন?—
আবার সৌভাগ্য যেন,
আসিবে ভাবিছ কেন;
আশ্রয়, রক্ষক বিনা সব সুখ বেশ,
সংসারের ক্রূর ক্রীড়া-স্থল হবে শেষ।

১১

বলি,—
মুঞ্জর না, বলি লতা, আর মুঞ্জর না।
শুকাইয়া ফেলি কায়,
মাটিতে মিশাও তায়,
কেহ যেন নাহি পায়,
অস্তিত্বের চিহ্ন তব পৃথিবীতে আর,
আত্মত্ব বিনাশে হিংসা সাধ ক্রূরতার।

১২

প্রত্যুত্তর আশে নর চাহে লতা পানে।
কাতরে তখন, লতা,
কহিল কি কহ কথা?
সত্য বটে বড় ব্যথা
পেয়েছি সংসার হতে, জীবন সংশয়,
বাঁচিব না এও সত্য, মরণই নিশ্চয়।

১৩

ভাল তা সুধাই, নর, দেহ ত উত্তর?—
কি উদ্দেশ্য জীবনের?—
সুখোদ্দেশ্য যদি এর,
সে উদ্দেশ্য সাধনের
কি উপায় সুনিশ্চয় দেখাও আমায়,
জানি আমি পেলে বস্তু সুখ চলে যায়।

১৪

শুন—
নবীন পল্লব সাজে নধর এ তরু,
দেখে ভুলাইল মন,
এই চিন্তা অনুক্ষণ,
মস্তকে এর কেমন,
বিস্তারিবে বপু মোর, সুবর্দ্ধন, নব,
সংসারে বিকাশি রূপ সুখী কত হব।

১৫

ধাইলাম বৃক্ষ পাশে, উঠিলাম শিরে;
পুরিল মনের সাধ,
কিন্তু সুখে পরমাদ,
আমার অদৃষ্টে বাদ,
মনোজ-মোহিনী ভাব যেই গেল চলি,
বিকৃত আকুল শূন্য অন্তর সকলি।

১৬

পেয়েছি ত বস্তু তবে সুখী কি এ আমি?—
জিজ্ঞাসেছি যেই এই,
দেখি আর সুখ নেই,
কাটি গেছে সুখ-সেই,
আত্ম চেতনার জ্ঞান বড় দুঃসহ,
হৃদ ফাটি, চাহে প্রাণ মুগ্ধ:। অপর।

১৭

সৌন্দর্য্যেতে ভোলে মন, তাই ভুলে রব,
এবে করিয়াছি সার,
কিন্তু যেন নাই আর
ক্ষুদ্রাশ্রয়ে এ আমার
সুখভঙ্গ হয় ক্ষণে আশ্রয়ের নাশে,
আত্মত্ব ঢেলেছি তাই সংসার বিকাশে।

১৮

যাক্—
গেছে তরু ক্ষুদ্রাশ্রয় কি ক্ষতি আমার?
সংসারে ভুলেছি আমি,
সংসার আমার স্বামী
তারি কার্য্য অনুগামী
সহিছি এ প্রেমপীড়া সুখের লাঞ্ছনা,
হোক্ মৃত্যু, মৃত্যু মোর সুখের বাসনা।

১৯

ভুলিলে আত্মত্ব তবে মৃত্যু আর কিবা?
নহে মৃত্যু ভয়ঙ্কর,
সুখের ক্রীড়ার পর,
শান্তির বিরাম ঘর,
এখন এ তথ্য আমি বুঝিয়াছি সার,
এহেন দশায় তাই সন্তৃপ্তি আমার।

২০

যাও নর, ভুল গিয়া পরার্থ-সুখেতে।
উহাতেই পেয়ে সুখ,
বিদ্বেষে হয়ে বিমুখ,
এড়ায়ে জীবন-দুখ,
পরার্থ আমার ব্রত,—তাই যতক্ষণ
ভূমে মূল, দিই প্রাণ পরের কারণ।

শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশানুরাগ।

অদ্য উনবিংশ শতাব্দী। চতুর্দ্দিকে সংস্কার বা পরিবর্ত্তনের স্রোত তর্ তর্ বেগে প্রবাহিত হইতেছে। ধর্ম্মের মূল পরিবর্ত্তিত হইতেছে, সামাজিক নিয়মের আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, রাজনীতি নূতন ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইতেছে, জীবনের লক্ষ্য নূতন আকার ধারণ করিতেছে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যেন আবার নূতন করিয়া গঠিত হইতেছে। এই বিশ্বব্যাপী প্রলয়কালে—যখন সকল বস্তুই আমূল আলোড়িত হইতেছে, যখন সুসভ্য দেশ মাত্রই নবীন উৎসাহে মাতিয়া উঠিতেছে—জগতের আদি সংস্কারক, সভ্যতা মার্গের প্রথম অধিনায়ক, মানবকুলের শৈশব দোলা, ভারত কেন ঘুমাইয়া রয়?

যে তারে একদিন আর্য্যহৃদয় পরস্পর-গ্রথিত ছিল, যে তারে একদিন ভারত-বাসী মাত্রেরই হৃদয় অনুস্যূত ছিল, সে তার আজ কেন ছিন্ন? যে তারের বৈদ্যুতিক বলে এতদিন কতিপয়মাত্র আর্য্য ঔপনিবেশিক অমানুষী শক্তি লাভ করিয়াছিলেন, যে তারের বৈদ্যুতিক সংযোগে একটী আর্য্যহৃদয়ে আঘাত

লাগিলে একদিন সমস্ত আর্য্যহৃদয় আহত হইত, আজ কেন সেই তার বিযুক্ত? ভারতকে জগতের আদর্শ বলিয়া পরিচয় দিয়া যে আর্য্যজাতি একদিন স্বদেশানুরাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যে আর্য্যজাতি আপনাদিগকে "আর্য্য" (পূজ্য, বা মানবকুলের শ্রেষ্ঠ) এই উপাধি প্রদান করিয়া একদিন স্বজাতিপ্রেমের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সে আর্য্যজাতি আজ কোথায়? স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশানুরাগের সে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আজ কোথায়?

যৎকালে ঋক্‌বেদ-প্রণেতা ঋষিগণ কতিপয় বীর পুরুষ ও কতিপয় বণিক্ সমভিব্যাহারে ধীরে ধীরে হিন্দুকুশ বাহিয়া সিন্ধু উত্তরণ পূর্ব্বক পঞ্চ নদ প্রদেশে অবতরণ করেন, তখন তাঁহারা কয় জন ছিলেন? যখন কপালাভরণা কালী তাঁহাদিগের হইয়া অসুরবিমর্দ্দে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহারা কয় জন ছিলেন? রাক্ষসদিগের উপদ্রবে যখন ঋষিদিগের পদে পদে তপোবিঘ্ন ঘটিত তখন তাঁহারা কয় জন ছিলেন? অভ্রভেদী হিমশৃঙ্গ হইতে পাতাল ভেদী দক্ষিণ পয়োধি পর্য্যন্ত এবং প্রবল স্রোতস্বিনী সিন্ধু হইতে সুদূর ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত এই বিশাল ভারতক্ষেত্রের প্রায় সমস্তই তখন অসুর ও রাক্ষসাদি দ্বারা অধিষ্ঠিত ছিল। এই বিশাল ভারতক্ষেত্রের এক সহস্রাংশ মাত্রও তৎকালে আর্য্যগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত ও উপনিবেশিত হয় নাই। ভারতের আদিম অধিবাসীদিগের সংখ্যার সহিত তুলনায়, তদানীন্তন আর্য্য ঔপনিবেশিক দিগের সংখ্যা অনন্ত সাগরে জলবিন্দু পতনের ন্যায় বিলীন হইয়া যাইত! অসুর ও রাক্ষসাদি যে শুদ্ধ সংখ্যায় অনন্ত ছিল এরূপ নহে; তাহাদিগের প্রবল পরাক্রমের অজস্র দৃষ্টান্ত প্রাচীন ঋক্‌বেদ হইতে আধুনিক কাব্য পুরাণাদি পর্য্যন্ত সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। তবে কি বলে ও কি সাহসে সেই অসংখ্য ও প্রবল শত্রুদিগের বিরুদ্ধে কতিপয় মাত্র আর্য্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন? কি সাহসেইবা তাঁহারা শত্রু সমাচ্ছন্ন ভারতক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ করিলেন? তাঁহাদিগের কি জীবনে কোন মায়া ছিল না? তাঁহাদিগের কি বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল? অসুর রাক্ষসাদির প্রবল পরাক্রমের সংবাদ কি তাঁহাদিগের কর্ণগোচর হয় নাই? জীবনে মায়া না থাকিলে তাঁহারা স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া অসংখ্য গিরি নদী উত্তরণপূর্ব্বক সুদূর প্রাচ্যপ্রদেশে কখনই আগমন করিতেন না। অধিকতর সুখের আশা না থাকিলে তাঁহারা জন্মভূমির মায়া জন্মের মত পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। আর বৃহস্পতি যে আর্য্যদিগের উপদেষ্টা, তাঁহাদিগের বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল একথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়, এবং চাণক্য যে আর্য্যদিগের মন্ত্রী, তাঁহারা যে ভারতের শূদ্রাসুর রাক্ষসাদির প্রবল পরাক্রমের বিষয় অবগত ছিলেন না একথাও বিশ্বাস-যোগ্য হইতে

পারে না। তবে তাঁহারা কি বলে ও কি সাহসে গিরিনদী-সাগর-পরিবেষ্টিত অনন্ত ভারতক্ষেত্রে আগমন করিলেন, এবং [illegible] করিয়া কি বলে ও কি সাহসেই বা প্রবলপরাক্রান্ত আদিম অধিবাসিদিগের সহিত ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত হইলেন? কি বলেই তাঁহারা অবশেষে রাক্ষস ও অসুরকুলধ্বংশ করিয়া অসীম ভারতক্ষেত্রে একাধিপত্য বিস্তার করিলেন? কি বলেই বা শেষে তাঁহারা অসংখ্য বিজিত আদিম অধিবাসিদিগকে বিনয়াবনত দাস করিতে সক্ষম হইলেন? এ মর্ম্মভেদী গভীর প্রশ্নের কে উত্তর দিবে? স্বজাতি-প্রেমের বলের এরূপ উদাহরণ আর কোথায়?

যৎকালে অসংখ্য জেরাক্সিস-সেনা প্রবল সাগরতরঙ্গের ন্যায় উত্তর গ্রীস প্লাবিত করিয়া থার্ম্মোপিলি সমীপে উপনীত হয়, তখন কি সাহসে ও কি বলে বীরচূড়ামণি লিয়োনিডাস্ ত্রিশত মাত্র সহচর সমভিব্যাহারে সেই প্রবল সাগরতরঙ্গের প্রতিরোধে বক্ষ পাতিয়া দিয়াছিলেন? কি আভ্যন্তরীণ বলেই বা সালামিস্ যুদ্ধে কতিপয় গ্রীকযোদ্ধা জেরাক্সিসের অনন্ত সেনাসাগরের অপ্রতিহত গতি প্রতিরুদ্ধ করিলেন?

যৎকালে বীরবর হানিবাল্ মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ইতালী বিলেড়ান পূর্ব্বক অবশেষে কাণিসমরে অধিকাংশ রোমীয় জননীকে পুত্রবিরহে ও অধিকাংশ রোমীয় পত্নীকে পতিবিরহে বিধুর করিয়াছিলেন, তখন কোন্ দৈবী শক্তি বলে কতিপয় দিবসের মধ্যেই রোমরাজ্য অনন্ত সেনা সংগ্রহ করিলেন?

যৎকালে আফ্রিকবিজয়ী সিপিয়ো জামাসমরে অজেয় হানিবল্‌কে পরাজিত করিয়া দুরন্ত সেনা সমভিব্যাহারে হানিবলের প্রতি প্রতিহিংসা বিধানার্থ কার্থেজাভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন, তখন কি আভ্যন্তরীণ বলের প্রেরোচনায় কার্থেজ্ রমণীগণ রজ্জু ও অস্ত্র প্রস্তুত করণার্থ আপনাদিগের কেশমুণ্ডন ও অলঙ্কারোন্মোচন করিয়াছিলেন?

যৎকালে দৃপ্ত বৃটিশসিংহ সোদরপ্রতিম আমেরিকাবাসীদিগের ক্রন্দনে বধির হইয়া তাঁহাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাদিগের উপর কর স্থাপনে বদ্ধপরিকর হন, তখন কি বলে অস্ত্র শস্ত্রে অসজ্জিত, শিল্প-বাণিজ্য-বিবর্জ্জিত আমেরিকা বৃটিশসিংহের গতিরোধ করিতে সাহসিনী হন? যখন আমেরিকা বৃটিশসিংহের কোপানলে পতিত হন, তখন আমেরিকাকেও সামান্য সূচিকা হইতে পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত সমস্ত গৃহসামগ্রীর জন্যই বৃটনের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইত। ভারত অপেক্ষাও আমেরিকা তখন বৃটনের অধিকতর মুখাপেক্ষিণী ছিলেন; ভারতে স্বদেশজাত অনেক দ্রব্য পাওয়া যায়, কিন্তু তৎকালে আমেরিকাকে চিনিটী পর্য্যন্তের জন্য বৃটনের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইত। এরূপ অবস্থায় কি বলে আমেরিকা দৃপ্ত বৃটিশসিংহের কোপানল

উদ্দীপিত করিতে সাহসিনী হইলেন? কি আভ্যন্তরীণ তেজ তাঁহাদিগকে বহির্জ্জাত দ্রব্যমাত্রেরই ব্যবহার হইতে একেবারেই নিবস্ত করিল? কোন্ বলেইবা তাঁহারা অচিরকাল মধ্যেই আপনাদিগের সমস্ত অভাব বিদূরিত করিতে পারিলেন? কোন্ বলেই বা নিবস্ত্র বীরশূন্য মাকিন্ ভূমি অচিরকালমধ্যে অনন্ত-বীর-প্রসবিনী হইয়া উঠিলেন? কোন্ বলেই বা এই অনতিপ্রৌঢ় বীরমণ্ডলী বৃটিশ বীরকেশরী-দিগকে রণে পরাস্ত করিলেন? যে আমেরিকা একদিন বৃটনের পদভরে বিকম্পিত, যে আমেরিকা এক দিন কিশোরবয়স্কা বালিকার ন্যায় সকল বিষয়েই বৃটনের মুখাপেক্ষিণী, যে আমেরিকা একদিন অনন্ত জাতি-সাগরে একটী নগণ্য জলবুদ্বুদ, আজ কোন্ বলে সেই আমেরিকা—জগতের সভ্যজাতিগণের অগ্রগামিনী? কেন আজ সেই স্বপর্ব্বাচুতা দুহিতার বীরদর্পে বৃদ্ধা বৃটনজননী কম্পিত-কলেবরা?

অজেয় জর্ম্মান্ সেনা রাজরাজেশ্বরী পারিনগরী অবরোধ করিল; দিন গেল, পক্ষ গেল, মাস গেল, অর্দ্ধ বৎসর অতীত হইল, ক্রমে ধনাগার শূন্য, অস্ত্রাগার শূন্য, খাদ্যাগার শূন্য; ক্রমে শৃগাল কুক্কুর অশ্ব মূষিক ভেক প্রভৃতি মনুষ্যের অখাদ্যও উপাদেয় খাদ্য মধ্যে পরিগণিত হইল; তথাপি কোন্ আভ্যন্তরীণ বলে বলীয়ান্ হইয়া বীরকেশরী ফরাশিগণ অদম্যিত বীর দর্পে শত্রুসেনার ভীষণ গর্জ্জন উপেক্ষা করিলেন? কোন্ বলেই বা তাঁহারা তাদৃশ বিপৎপাতের পরও অচিরকাল মধ্যেই পরাজয়ের নিষ্ক্রয় স্বরূপ অগণিত মুদ্রা উত্তোলিত করিলেন? কি বলেই বা সেই মৃতপ্রায় জাতি প্রতাপে আবার দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত করিল?

আবার যাও, একবার ইতালীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। যে ইতালী এক সময় তদাপরিজ্ঞাত জগতের অধীশ্বরী ছিলেন, যে ইতালী ইউরোপে দুইবার সভ্যতা ও স্বাধীনতা বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই ইতালী প্রায় সহস্র বৎসর দাসত্বে জর্জ্জরিত-প্রায় হইয়াছিলেন: ইতালীর নাম লুপ্ত প্রায় হইয়া উঠিয়াছিল: ইতালীর ইতিহাস বৈদেশিক প্রবঞ্চকদিগের অসত্য বর্ণে রঞ্জিত হইয়া বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল; ইতালীর বীর পুরুষগণ নির্ব্বাসিত, জহ্লাদ হস্তে হত, কারাগারে রুদ্ধ বা অন্যান্য নানা নিষ্ঠুর উপায়ে পর্য্যুদস্ত হইতেছিলেন; পুণ্য ভূমি ইতালী ভীষণ শ্মশান ভূমিতে পরিণত হইয়া উঠিয়াছিলেন; তথাপি কোন্ দৈবীশক্তি বলে সেই ভীষণ প্রেতভূমি হইতে, সেই বীরপুরুষ-গণের রুধির সিঞ্চনে, আবার দুই প্রকাণ্ড বীরতরু অভ্যুত্থিত হইল? কোন্ আভ্যন্তরীণ বলে ঋষিপ্রবর ম্যাট্‌সিনি ও বীর-চূড়ামণি গ্যারিবল্‌ডি সেই শ্মশান ভূমিতে বহুদিনের পর আবার জীবন সঞ্চার করিলেন? কোন্ বলে বলীয়ান্ হইয়াই বা অসংখ্য ইতালীয় বীর পুরুষ স্বদেশ-উদ্ধারব্রতে জীবন আহুতি প্রদান করিলেন?

আজ কিঞ্চিদধিক সার্দ্ধ বিশত বৎসর মাত্র ব্রিটিশকেশরী ভারতে পদার্পণ করিয়াছেন। এই অল্পকাল মধ্যে কোন্ দৈবী শক্তি বলে ব্রিটিশ কেশরীর গর্জ্জনে সমস্ত ভারত কম্পান্বিত? আজ কয় দিন হইল কয় জন মাত্র শ্বেত বণিক্ পশ্চিম সাগরের উপকূলে আসিয়া কেমন অদ্ভুত কৌশলে ধীরে ধীরে গগন-স্পর্শী হিমশৃঙ্গ হইতে সিংহল ও আফ্গানস্থান হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী আধিপত্য বিস্তার করিল! কেন এই কয়েকটী মাত্র শ্বেত পুরুষের সম্মুখে মোগল পাঠান মহারাষ্ট্র সীক একে একে সকলেই বায়ুর নিকট তুষের ন্যায় উড়িয়া গেল? কেন আজ এই গুটি কত শ্বেত পুরুষের সম্মুখে বিংশতি কোটী ভারতবাসী মৃৎপুত্তলীর ন্যায় নিস্পন্দ ও নীরব? কেন আজ কাশ্মীর, সিন্ধু, বরদা, হোলকার, সিন্ধিয়া, নিজাম, নেপাল, ভূটান সকলই এই শ্বেত-চরণে লুণ্ঠিত-শির? কেন আজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠের নিকট গললগ্নকৃতবাস? রাজরাজেশ্বর হইয়া কেন আজ আমরা পথের ভিখারী? রত্ন প্রসবিনী জননীর সন্তান হইয়া কেন আজ আমরা অন্নের কাঙ্গালী? জগতের সভ্যতামার্গের নেতা হইয়া, কেন আজ আমরা লজ্জা নিবারণের জন্য শ্বেত দ্বীপের মুখাপেক্ষী? জগতের শিক্ষক হইয়া, কেন আজ আমরা সকলের অশ্রদ্ধার ভাজন? বীরত্ব-রত্নাকর ভারতের সন্তান হইয়া, কেন আজ আমরা সকলের চরণতলে? যে সিংহাসন সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় রাজগণ কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত হইয়াছিল, কেন আজ সেই সিংহাসন শূন্য? যে বেদি একদিন ঋক্ ও সামগায়ী ঋষিবৃন্দ দ্বারা উদ্ঘোষিত হইয়াছিল, কেন আজ সেই বেদি নীরব? যে ক্ষত্রিয়-জানু ও ক্ষত্রিয়-শির কেবল অভীষ্ট দেবতা ও বেদগায়ী ব্রাহ্মণগণের নিকটই বিনত হইত, কেন আজ সেই ক্ষত্রিয়-জানু ও ক্ষত্রিয়-শির সদা-বিলুণ্ঠিত? যে আর্য্যপতাকা একদিন জগতে হিন্দুজয় ঘোষণা করিয়াছিল, কেন আজ সেই আর্য্যপতাকা ধূলি-বিলুণ্ঠিত? যে আর্য্যজাতির সময় একদিন নিরন্তর অসুরবিমর্দ্দে অতিবাহিত হইয়াছে, কেন আজ সেই আর্য্যজাতির সময় নিরন্তর মসীমর্দ্দনে ও পাদুকাবহনে অতিবাহিত হইতেছে? যে আর্য্যজাতির সেনা একদিন পারস্য আফ্গান বিদলিত করিয়া, সুদূর স্কন্দনভ (Scandinavia) পর্য্যন্তও উন্মথিত করিয়াছিল, দূরতম আমেরিকাপর্য্যন্তও বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল, কেন আজ জগদুন্মাথিনী সেই আর্য্যসেনা মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য্য ভোগীর ন্যায় নিস্পন্দ ও নির্জীব? যে আর্য্যজাতির রণতরি একদিন পূর্ব্বে, দক্ষিণে ও পশ্চিমে—জাবা, সুমাত্রা, সিংহল, সকট্রা, মিসর প্রভৃতি আলোড়িত করিয়াছিল, কেন আজ সেই আর্য্যজাতি সমুদ্রযাত্রায় ভীত? যে আর্য্যললনা একদিন বক্ষঃস্থল হইতে স্তন্যপায়ী শিশুকে উন্মোচিত করিয়া রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছেন, কেন আজ সেই আর্য্যললনা

পুত্রকন্যাগণের সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শনের প্রতিকূল? যে আর্য্যবীরনারী এক দিন স্বামী সঙ্গে অসিহস্তে সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া স্বদেশহিত ব্রতে সোণার অঙ্গ আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন, কেন আজ সেই আর্য্যনারী স্বামীর স্বদেশানুরাগ প্রদর্শনের অন্তরায়? যে আর্য্যবীরনারী একদিন ধনুর্নির্ম্মাণার্থ অঙ্গের সুবর্ণাভরণ খুলিয়া দিয়াছেন, আবার সেই ধনুকের ছিলা নির্ম্মাণার্থ একটী একটী করিয়া মস্তকের কেশ কাটিয়া দিয়াছেন, আজ কেন সেই আর্য্যনারী স্বদেশ-হিতব্রতে আত্মত্যাগ-বিধুরা?

যে আর্য্যাবর্ত্ত একদিন কুরুক্ষেত্র রণে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা প্রেরণ করিতে পারিয়াছিলেন, কেন আজ সেই বীরভূমি বীর-শূন্য? যে আর্য্য-তেজ একদিন দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের অপ্রতিহত গতি রোধ করিয়াছিল, কেন আজ সেই আর্য্যতেজ প্রভাহীন? যে আর্য্য-প্রতাপের সম্মুখীন হইতে একদিন বীরবর মহম্মদ ঘোরীও ভীত ও চকিত হইয়াছিলেন, কেন আজ সে প্রতাপ তেজোহীন? সহস্র বৎসরের দাসত্বেও যে প্রতাপ নির্ব্বাপিত হয় নাই, কেন আজ সে প্রতাপ নিষ্ক্রিয়? মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধে, শীক যুদ্ধে, যে বীর্য্যবহ্নি বিস্ফুরিত হইয়াছিল, কেন আজ সে বীর্য্যবহ্নি নির্ব্বাণপ্রায়? যে ভারত-সন্ততিগণ একদিন বীর-দর্পে মেদিনী বিকম্পিত করিয়াছিলেন, কেন আজ সেই ভারত-সন্ততিগণ বীরত্বে শেষ প্রায়? কি পাপে আজ ভারতের এ দুর্দ্দশা? কি পাপে আজ ভারত শ্মশানপ্রায়?

ঐ হৃদয় আলোড়ন-কারী গভীর প্রশ্ন সকলের কে মীমাংসা করিবে? কিসের অভাবে ভারতের এ দুর্গতি? কিসের জন্য পাশ্চাত্য দেশ সকলের এত উন্নতি? এই প্রশ্নের একই মীমাংসা—একই উত্তর! স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেমের অভাব ও সত্ত্বা! স্বদেশ-হিতব্রতে জীবনের পূর্ণ আহুতির ভাবাভাব! ইহার অভাবে ভারতের এ দুর্গতি—ইহার ভাবে পাশ্চাত্য দেশ সকলের এত উন্নতি। যাও আমেরিকায় যাও, যাও শ্বেতদ্বীপে যাও, বীরভূমি ফ্রান্সে যাও, যাও জগদীশ্বরী ইতালীতে যাও, যাও জার্ম্মাণীতে যাও, যাও মৃতোত্থিত গ্রীসে যাও, যাও জগদ্বিজয়ী রুসে যাও, তাঁহাদিগের স্ব স্ব দেশের বিরুদ্ধে একটী কথা বল, দেখিবে অচিরাৎ অগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে! দেখিবে বাল হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত, কৃষক হইতে রাজা পর্য্যন্ত, মূর্খ হইতে পণ্ডিত পর্য্যন্ত, অধিক কি বালিকা হইতে বৃদ্ধা পর্য্যন্ত, সকলেই ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিবে! জলে, স্থলে, জঙ্গলে, পাহাড়ে—যিনি যেখানে আছেন, স্বদেশ ও স্বজাতি তাঁহার এক মাত্র উপাস্য দেবতা, এক মাত্র চিন্তার বিষয়। শয়নে স্বপ্নে, অশনে, উপবেশনে, লেখনে কথনে, স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-প্রেম তাঁহার হৃদয়ে জাজ্বল্যমান। তাঁহার প্রতি কার্য্য ও প্রতি চিন্তায় স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেম সুস্পষ্টরূপে পরিব্যক্ত।

সাহারার ভীষণ মরুভূমিতে, গ্রীনল্যাণ্ডের তুহিনরাজিসমাচ্ছাদিত অনুর্ব্বর প্রদেশে, হিমালয়ের অত্যুচ্চ শিখরে, অসভ্য-দস্যু-সমূহের মধ্য আসিয়ায়—একটী ইউরোপীয় যে যেখানে আছে স্বদেশের ও স্বজাতির পরিরক্ষণীয়। একটী ইউরোপীয়ের কেশ স্পর্শ কর, একটী ইউরোপীয়ের প্রাণ নাশ কর, দেখিবে তাহার জাতি ও তাহার দেশ, তোমার জাতি ও তোমার দেশকে রসাতলে দিবে। দেখিবে সেই ক্রোধানলে তোমার জাতি তোমার দেশ, চির জীবনের জন্য স্বাধীনতা-হারা হইবে। এক অন্ধকূপ-হত্যার অপরাধে মুসলমানেরা চিরকালের মত ভারত হারাইল! এক মার্গেরি সাহেবের মৃত্যুতে চীন ব্রহ্ম চলস্থুল। এক সৈনিক বধে আবিসিনিয়া সমাকুল।

প্রত্যেক ইউরোপীয়ের হৃদয় স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-প্রেমে বিচ্ছুরিত। তাঁহার ধর্ম্ম কর্ম্ম, যাগ যজ্ঞ, কাম মোক্ষ সমস্তই স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-প্রেম। তাঁহার স্নেহ, তাঁহার ভক্তি—প্রবলতর হৃদয়ভাব স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-প্রেমের অন্তর্লীন। আমাদিগের রাজ্ঞীর দ্বিতীয় পুত্র ডিউক্ অব্ এডিন্‌বরা স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-প্রেমের বশবর্ত্তী হইয়া পত্নী-প্রেমে বিসর্জ্জন দিলেন। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী, আমেরিকা প্রভৃতিতে স্বদেশানুরাগের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আমরা আর অধিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া পাঠকগণকে আক্রান্ত করিতে চাহি না। যাহা প্রদত্ত হইল—যদি দৃষ্টান্তের উদ্দীপনা শক্তি থাকে—ইহাতেই স্বদেশবাসিগণের অন্তরে স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশানুরাগ উদ্দীপিত হইতে পারিবে।

বহুদিনের দাসত্বে স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি প্রেম ভারতবাসিদিগের হৃদয় হইতে একবারে উন্মূলিত হইয়াছে। যে প্রবল স্বজাতি প্রেমের বলে একদিন কতিপয় মাত্র আর্য্য ঔপনিবেশিক অনন্ত ভারত ক্ষেত্রে অ পরিচ্ছিন্ন আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, আবার যে প্রবল স্বজাতি-প্রেমের বলে এক্ষণে একতিপয় মাত্র শ্বেত বণিক ভারতে অভূত পূর্ব্ব প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন, সে স্বজাতি-প্রেম ও সে স্বদেশানুরাগ ভারতবাসীর হৃদয় হইতে এক্ষণে অন্তর্ধান করিয়াছে। ইংলণ্ডের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে সেই স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেম ধীরে ধীরে দুই একটী মনীষীর হৃদয়-কোটরে প্রবেশ করিতেছে। ইংলণ্ডের উদ্দীপক সাহিত্য ও স্বাধীন ইতিহাস ধীরে ধীরে দুই চারি জনের অন্তরে সেই মূল মন্ত্র—স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেম—উদ্বোধিত করিতেছে। ইংলণ্ড! তোমার নিকট যদি আমরা কোন বিষয়ে ঋণী থাকি, তবে ইহারই জন্য। কিন্তু তোমার ভাষা, তোমার দৃষ্টান্ত, ভারতের বিংশতি কোটি অধিবাসীর কয় জনের অধিগম্য? এক লক্ষ লোকের নিকটও ইহা অধিগম্য কি না সন্দেহ। অবশিষ্ট উনবিংশ কোটী একোন-শত লক্ষ লোকের স্বজাতি-প্রেম ও স্বদেশানুরাগ শিক্ষার কি উপায়?

ইংলণ্ড! শুনিয়াছি তোমার অনন্ত ঐশ্বর্য্য; একবার চক্ষু বুজিয়া, সেই অনন্ত ঐশ্বর্য্যের কিয়দংশ তোমার অসংখ্য প্রজার উদার শিক্ষায় বিন্যস্ত কর; উদার শিক্ষা বিধান দ্বারা তোমার বিংশতি কোটী প্রজাকে স্বদেশহিত-ব্রতে দীক্ষিত কর; তাহাদিগকে স্বদেশহিত-ব্রতে জীবনকে পূর্ণাহুতি দিতে শিক্ষা দাও; স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতে শিক্ষা দাও; স্বদেশের জন্য ও স্বজাতির জন্য আত্ম ভুলিতে শিক্ষা দাও, স্বদেশের জন্য স্বদেহের রুধির বিন্দু বিন্দু করিয়া বিসর্জ্জন দিতে শিক্ষা দাও; পিতা যেমন শিশু সন্তানকে হাঁটিতে শিখায়, তেমনই ধীরে ধীরে আমাদিগকে স্বাধীনতার পথে লইয়া চল; যখন আমাদিগকে স্বাধীন ভাবে চলিতে সমর্থ দেখিবে, তখন আমাদিগকে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাবলম্বন প্রদান কর; তোমার জ্যেষ্ঠের সন্ততিগণকে পূর্ব্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠাপিত কর। ইংলণ্ড! এ সৌভাগ্য কয় জনের অদৃষ্টে ঘটে? ইংলণ্ড! এই অনন্ত কীর্ত্তি তোমার হস্তেই রহিয়াছে। ইংলণ্ড! এই অপ্রাপ্ত-বয়স্ক জ্যেষ্ঠ-সন্ততিগণের ধন, মান, প্রাণ সকলই তোমার হস্তে। তুমি ইচ্ছা করিলে তাহাদিগের উদার শিক্ষা বিধানপূর্ব্বক তাহাদিগকে পূর্ব্বগৌরবে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে পার ও তাহাদিগের ন্যস্ত ধন তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে পার; আবার ইচ্ছা হইলে তাহাদিগের সর্ব্বস্বাপহরণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে চির-অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন রাখিতে পার। একে অনন্ত কীর্ত্তি ও অক্ষয় স্বর্গ! অপরে অনন্ত অপযশ ও অনন্ত নিরয়! এক্ষণে তোমার যাহা অভিলাষ!

আবার ভারতবাসি! তোমায় বলি। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী, আমেরিকা প্রভৃতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্তেও যদি তোমার স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশানুরাগ উদ্দীপিত না হয়, যদি ইহাতেও তুমি একতা ও আত্মত্যাগ শিখিতে না পার, যদি ইহাতেও তোমার মনে জাতিগত ও দেশগত গৌরবের ভাব অঙ্কিত না হয়, যদি ইহাতেও তুমি প্রত্যেক ভারতবাসী ও প্রত্যেক জাতীয় ভ্রাতার জন্য ধন, প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে না শিখ, যদি ইহাতেও তুমি কেবল আত্ম লইয়া ব্যতিব্যস্ত থাক, তাহা হইলে বুঝিব যে নরকেও তোমার আর স্থান নাই! তাহা হইলে বুঝিব যে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী ও আমেরিকার পবিত্র নাম গ্রহণে তোমার কোন অধিকার নাই। বুঝিব তুমি মৃণ্ময়, সুতরাং, মৃৎপিণ্ডে ইংলণ্ড প্রভৃতির উদার শিক্ষা ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রতিফলিত হইল না! 'প্রভবতি শুচিবিম্বোদ্গ্রাহে মণির্ন মৃদাং চয়ঃ।' বিশুদ্ধ মণিই বিম্বগ্রহণে সমর্থ, মৃৎপিণ্ড নহে। জাপান সেই বিশুদ্ধ মণি, এই জন্য জাপানেই ইংলণ্ড প্রভৃতির উদার শিক্ষা ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রতিফলিত হইল! ভারতবাসি! ইহাতেও যদি তোমার চৈতন্য না হয়, তাহা হইলে আর তোমার আশা নাই!

মেহের আলি।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ফজরআলির গৃহে আমীরজান একাকিনী বসিয়া আছেন। যে স্ফূর্ত্তিযুক্তা চপলা পরিহাসপ্রিয়া সতেজ রমণী মেহেরন্নিসাকে সর্ব্বদা সাহস ও উৎসাহ দিতেন, এখন যে সেই রমণীই শয্যায় বসিয়া আছেন চেনা ভার। শরীর শীর্ণ ও স্ফূর্ত্তি-বিহীন হইয়াছে। বদনের সে গোল গোল চাকচিক্যময় ও সুপুষ্টি শ্রী নাই। নয়নের যে শ্বেতবর্ণে সতত হাসা ভাব প্রকটিত হইত, এখন তাহা পাংশুবর্ণ হইয়াছে। অস্থিময় শরীর, সচিন্তভাব ও বিমর্ষ বদন দৃষ্টে যথার্থই যে দেখে তাহার দুঃখ হয়। আমীরজান শয্যায় বসিয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতেছেন।

এ বিপরীত ভাব কেন? যে অবধি মেহেরন্নিসা ভবন ত্যাগ করিয়াছেন, নানা কারণে আমীরজানের দশা-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। যে সতীর সতীত্ব রক্ষার্থ আমীরজান বুদ্ধিকৌশল প্রয়োগ জন্য সতত ব্যস্ত ছিলেন, সে তাঁহার পতির তাড়নে কোথায় লুকাইয়াছে। তাঁহাকেও সে হয়ত অবিশ্বাস করিতেছে! নয় ত সংবাদ দেয় না কেন? অথবা সে অধিকতর বিপদে পড়িয়া আত্ম-বিনাশ করিয়াছে। পরোপকারী ব্যক্তির মনে এ চিন্তা মর্ম্ম-ভেদী। আবার তৎসঙ্গে তৎসঙ্গে আমীরজানের পতিরও পত্নীর প্রতি বিসদৃশ অনাস্থা হইয়াছে। পত্নীর ব্যাঘাতে এমন রূপ-ললাম ফজরআলির হস্তগতা হইয়া ভোগে এল না, এ রাগ কি যায়? যত দিন না লোকে পাপ-সাগরে নিমগ্ন হয়,—লোক লজ্জা নিন্দা-ভয়, আত্মীয় জনের অসন্তোষ-আশঙ্কা, সজীব থাকে। যেই অন্তর পাপ ভরা হয় এবং সেই পাপ উগলিয়া কার্য্যে প্রকাশ হয়, সেই লজ্জা নিন্দা আশঙ্কা ভাদ্র মাসের বন্যা জলে কোথায় ভাসিয়া যায় বলা যায় না। এতদিন আমীরজানকে তাঁহার স্বামী শ্রদ্ধা করিতেন, ভয় করিতেন, এখন আর সে ভাব নাই। বিরাগ, বিরক্তি, বিস্বাদ উক্তি এবং সর্ব্বাপেক্ষা কটুতম উপেক্ষায়— আমীরজান শুকাইয়া যাইতেছেন। ফজর আলির চরিত্র মন্দ হইয়াছে।

ফজরের চরিত্র মন্দ হইল কেন? তিনি স্বীয় খুল্লতাত আসগরআলির সহবাসে যে কোন দুষ্টতা, প্রবঞ্চনা, ও দুরভিসন্ধি শিক্ষা করুন না, তাঁহার চরিত্র মন্দ ছিল না। বিশেষতঃ প্রেমময়ী রসিকা আমীরজানের সহবাসে তিনি বড়ই প্রীত ও সন্তুষ্ট ছিলেন। রূপের লোভে, যৌবনের লোভে, মেহেরন্নিসার আকাঙ্ক্ষী হয়েন। তথনও তিনি আমিরজানের প্রেম ভুলেন নাই, অশ্রদ্ধা অনাস্থা করিতে ইচ্ছুক হয়েন নাই। তাঁহার সর্ব্বদা ইচ্ছা

ছিল, যদি আমীরজান বুঝে, তাঁহাকে বুঝান, ক্ষণিক ইন্দ্রিয় সুখার্থ অপরাবমণী ভোগে,—প্রাণের পুত্তলি প্রিয়তমা স্ত্রীর প্রতি অনাস্থা হইবে না, হইতে পারে না। একদিন সাধ করে কেহ ফলাহার করিলে কি চিরকালের অন্নকে অনাস্থা করিতে পারে?

যে অবধি মেহেরন্নিসা হস্তগত ফজরের কল্পনা চালিত হইল, ফজরের চরিত্র মন্দ হইতে লাগিল। ফজর যে দিন প্রথমে মেহেরের ঘরে প্রবেশ করেন, তাহার পূর্ব্বে কতবার যে কল্পনায় ঐ কার্য্য করেছেন, কতবার যে মনে মনে মেহেরকে উপভোগ করেছেন—কে জানে? কল্পনাই মনুষ্যের বন্ধু কল্পনাই মনুষ্যের পরম শত্রু। প্রথমে যখন মন্দ ইচ্ছা হয়,—কল্পনায় তাহা উপভোগ হয়—মনে মনে হচ্ছে কেহ দেখিবে না, জানিবে না, ভয় কি, লজ্জা কি? কাহারও কোন অপকার করা হইতেছে না, ইহাতে দোষই বা কি, পাপই বা কি? এই সকল পাপের প্ররোচনায় মন দূষিত হয়। যখন মনের রোগ বাড়ে, যখন মন পাপ-ভরা হয়,—মন ফাটিয়া যায়—পাপ কার্য্যে নামে। লোকে মনে করে দ্বার বন্ধ করে মদ খাইব, কে জানিবে? কিন্তু মত্ত হইলে দ্বার খুলে খানায় পড়িতে কোন বাধা দেখা যায় না। যেমন মল্লযুদ্ধের পাঁইতারা, নাপীতের ক্ষুর শানান, তেমনই পাপ কার্য্যের উদ্যম পাপ-চিন্তা, দুষ্ট কল্পনা। প্রথম উদ্যম আমীরজানের কৌশলে ভঙ্গ হইল; কিন্তু তাহার ফল গেল না। এখন কিসে কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইবে এই চেষ্টা হইল এবং ফজর আলি দ্বিতীয়বার মেহেরের ঘরে গিয়া অধিক সফল হইলেন। এবার আর মাথা ঘুরিল না, সাহসে স্বকার্য্য সাধনে ব্যস্ত হইলেন। নৃত্য করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আর অবগুণ্ঠনে প্রয়োজন কি? ফজর আলি নিষ্ফল হইয়াও দুঃসাহসী হইয়াছেন। পরনারী-ভোগলালসা এত উদ্দীপ্ত হইয়াছে যে যতক্ষণ না সে "দিল্লীকা লাড্ডু" আহার করেন, নিস্তার নাই। প্রতিবাসিনী একটী রমণী শীঘ্র ফজরের হস্তগত হইল এবং ফজর প্রকাশ্যেই দুশ্চরিত্র হইয়া উঠিলেন।

আমীরজানের তিরস্কার, লাঞ্ছনা, উপহাস সহ্য করা দূরে থাকুক, ফজর আলি তাঁহার স্ত্রীর বিমর্ষ ভাব ও ক্রন্দনেও বিরক্ত হয়েন। কটূক্তি, অশ্রদ্ধা ও প্রহার পর্য্যন্ত আমীরজানের সহ্য হইয়া আসিয়াছে। যখন ভাবেন তখনই আমীরজান বিমর্ষ হয়েন, আবার বলেন "দূর হউকগে ভেবে মরি কেন?" এজন্য তাঁহার অতি অস্থির ভাব হয়েছে এক এক বার গম্ভীর মলিন স্থ ভাব; এক এক বার পূর্ব্ববৎ চপল ভাব আমীরজান বসিয়া বেড়ার গায়ের বল্মীক গৃহ ভাঙ্গিতেছেন ও ভাবিতেছেন। যাহাতে কীট নাই এমন ঘর ভাঙ্গিলেন, আর তাহা পূর্ণ হইলনা। একটীতে কীট ছিল, যেমন ভাঙ্গিলেন, কীটেরা অবিলম্বে সে ভগ্ন

স্থল পূর্ব্ববৎ করিল। আমীরজান দেখিলেন ও হাসিলেন; ঘর ভাঙ্গিলে আবার গড়ে। জীব থাকিলেই গড়ে; যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। তবে কেন এত দুঃখ, এত অভাব ভাবনা? আমীরজান হাসিলেন, একটী পান খাইলেন, দর্পণ আনিয়া এলোথেলো চুল বাঁধিলেন। এখন মুখশ্রীতে সেই যে চপলা আমার জান, বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া গেল। না হইবে কেন? প্রকৃতি মরিলেও যায় না।

এমত সময় আমীরজানের পিত্রালয়ের দাসী আবজানি গৃহ-দ্বারে উপস্থিত। "কিলো আবজানি! এতক্ষণে তোর বার হলো।"

আবজানি। "কি করিব দিদি ঠাকরুণ, থানা পেকয়ে বাসন ধুয়ে আসচি, পান পর্য্যন্ত এখনও খাই নাই।"

আমীরজান একটী পান দিয়া কহিলেন, "বোস্ তোর সঙ্গে দুটা রঙ্গরসের কথা আছে।"

আবজানী হাসিল, চক্ষু দুটা বুজিয়া গেল, কাল কাল দাঁতগুলি বাহির হইল ও বিকটাকার এক মূর্ত্তি দেখা দিল। আবজানি কহিল, "সে কি দিদিঠাকরুণ! আমরা কি তোমার রঙ্গ রসের লোক? দাদাঠাকুরকে ডাক না।"

আমীর। দূর পোড়ারমুখী, তোর দাদাঠাকুর কত জায়গায় রঙ্গ করে বেড়াচ্ছে, এখানে কি আসে?

আবজানি। ওমা সে কি গা? এতেও আসবে?

আমীর। পরের বাড়ী রাত্রিতে নয় ত কি দিনের বেলা রঙ্গরস হয়? রাত্রিতে তুই তোর দাদাঠাকুরকে লয়ে যাস্—কত রঙ্গরস পাবি।

আবজানি আবার হাসিল, সে মূর্ত্তি দেখা অভ্যস্ত না হইলে আমীরজান ভয় পাইতেন।

আবজানি। ওকি গা? অমন কথা কেন? আমাদের কি অমন কপাল?

আমীরজান। "তোর কপাল মন্দ কি? আমার চেয়ে ভাল।" এমত সময় ফজর-আলির আসিবার শব্দ পাইয়া বলিলেন, "এই দেখ তোকে হাতে হাতে সঁপে দিই।"

ফজর আলি আসিয়া বস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন ও আমীরজান পান সাজিতেছেন দেখিয়া একটী পান চাহিলেন এবং আমীরজান আবজানিকে দিয়া পাঠাইলেন। ফজর বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "আবজানি কি তোমার একটীন্, নড়ে বস্‌তে পার না?" সেই দন্ত-চর্ব্বিত বাক্যে আমীরজানের যেন অস্থি চর্ব্বিত হইল। তথাপি সহ্য করিয়া কহিলেন "আবজানি যে আজ রাত্রে তোমাকে তাহার ঘরে নিমন্ত্রণ করিতে এসেছে। তা আমার সাম্‌নে পানটা খেতে দোষ কি?" ফজরআলি রোষ-কষায়িত লোচনে কহিলেন, "যত বড় মুখ তত বড় কথা! চক্ষে পাণি না পাড়ালে বুঝি থাকিতে পার না? ফের যদি উপহাস করিবে লাথিতে মুখ

ভেঙ্গে দিব।" বলিয়া ফজরআলি চলিয়া গেলেন ও কহিলেন "কাল সকালে আসিব সকাল সকাল ভাত করে রেখ।"

আমীরজান অপমানে নীরব রহিলেন, এবং ফজর আলি চলে গেলে বলিলেন, "দেখ্‌লিলো আবজানি! কত বঙ্গ রস দেখ্‌লি? আমার শরীরে যদি একটু রস থাকিত দুই চক্ষু দিয়া নদী ভেসে যেত।"

আবজানি। তাইতগা, দাদাঠাকুর এত বদ্ হয়েছেন্; ঐজন্য মাঠাকুরুণ্ তোমার জন্য দুঃখ করেন।

আমীর। দুঃখ কিসের? যে যেমন তাহাকে তেমনি ব্যবহার করিতে হয়। আমি কি ওর শাসনে কি প্রহারে ভয় করি? ও সব সহে গেছে। তুই না থাক্‌লে আজ সত্য সত্যই আমার মুখ ভেঙ্গে দিত। এমন পোড়ার মুখোর হাতে পড়ে আমার অঙ্গ কালী হল।

এখন উপায় কি বল দেখি, আবজানি?

আবজানি। আমি কি বলিব, তোমাদের বড় ঘরের বড় কথা, আমরা হলে অমন ভাতার কে ফেলে পালাইতাম।

আমীর। আবজানি! ঠিক বলেছিস অমন ভাতার চাহিনা, কিন্তু পলাব কোথা?

আবজানি। কেন বাবা ঠাকুর কে বলে তালাক করোনা, আর একটা মনের মত নিকাহা করে সুখী হইবে।

আমীর। সে ভাতারটাও যদি অমনি হয়?

আবজানি। তবে আর উপায় কি?

আমীর। উপায় নাই?—ওরা যেমন পাঁচ ফুলের মধু খেয়ে বেড়ায়, আমরা কি পাঁচটা মাছি ডেকে আনতে পারিনা?

আবজানি। ওমা! ভদ্দর ঘরে কি ও হয়? তোমার আমার ঘরে একদিন তা চলে।

আমীর। আবজানি, যা চালাও তাই চলে। তোকে একটা গোপনে কথা বলি কাহাকেও বলিবিনা শপথ করিতে পারিস?

আবজানি। তোমার কথা কি কাহাকে বলিব, আমি তোমার পায়ে হাত দিয়া দিব্য করিতেছি কাহাকেও বলিবনা। তুমি যাতে সুখী থাক, আমারও সুখ তাতে।

আমীর। আজ সন্ধ্যাকালে তবে এখানে, আসীস্; আমার এক উপপতি আছে, তার কাছে তোকে সঙ্গে করে যাব।

আবজানি অবাক্ হইয়া কহিল "সত্য?"

আমীর। সত্য না কি মিথ্যা? তুই কি বলিস্; আমার ভাতার ঘরে আসেনা আমি আর এক ঘরে যাবনা? আমার কি সুখেচ্ছা নাই?

আবজানি। আমি তোমার দোষ দিতে পারিনা, তবে কিনা, তোমাদের ভদ্দর ঘরে—"

আমীরজান ২টা টাকা আবজানিকে দেওয়ায় আবজানি অমনি বলিল "যাবেইত খুব করিবে। মেয়ে মানুষ কি চোরদায়ে ধরা পড়েছে? দিদিঠাকরুণ, আমি ঠিক সন্ধ্যাকালে এস্‌ব, তৈয়ার হয়ে

থেকো—নরকে যেতে বল আবজানি কোমর বেঁধে আছে।”

আমীরজান, আবজানির প্রকৃতি জানিত, কিছু টাকা দিলে ও খোসামোদ করিলে সে সব করিতে পারে। আমীর জান ঐ দিবস মেহেরন্নিসা হইতে এক পত্র পাইয়াছেন। মেহের জীবিতা আছেন,—নানা ঘটনার পর অরণ্যে গিয়াছেন। আমীরজান হইতে কিছু আহার দ্রব্য ও সাহায্য চাহিয়াছেন এবং একবার দেখা করিতে চাহিয়াছেন। আমীর জানের বড় আহ্লাদ সখীকে দেখিবেন। মনে মনেই স্বীকার —তথায় যাইবেন। সঙ্গে কারে লন্; আবজানিই উপযুক্ত পাত্র। গোপনীয় ব্যাপার; আবজানিকে উপপতির কথা বলিলে সে বুঝিবে ওকথা প্রকাশ-যোগ্য নহে। তাই রঙ্গ করিয়া অমন কথা কহিতে ছিলেন। নয়ত, ফজর আলি যত কেন উৎপীড়ন করুন না, আমীরজানের সতীত্ব চঞ্চল হইবার নহে। সন্ধ্যা হইল, আবজানি আসিল এবং আমীরজান আবজানীর সম্বন্ধে চাউল ডাউল লঙ্কা ও মৎস্য কিছু পোঁটলা বাঁধিয়া দিয়া ঝবঝব্যা বটতলাভিমুখে গেলেন।

যেই ঝবঝব্যা মসজিদ পার হইয়া যথার্থই অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিল, আব-জানি কহিল “দিদি ঠাকরুণ সত্য সত্যই বনে যাচ্ছেন। কেন আপনার পেয়ারকে আমার ঘরে আনাননী—কেহ টের পাবে না।”

আমীর। তোর সাহস না থাকে তুই মসজিদে থাক্ আমি অগ্রসর হই।

আবজানি আমতা আমতা করিল এবং পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। পরে দুই একটী পাহাড় পার হইয়া যেই আর একটী পাহাড়ের কাছে আসিয়া একটী আলোক দেখা গেল, আমীরজান আবজানিকে মসজিদে পাঠাইয়া একাকিনী বোচ্কা সহ আলোকাধিষ্ঠান এক কুটীর দ্বারে উপনীত হইলেন। আবজানি যাইতনা, তবে আমীরজান কহিয়া ছিলেন তাহাকে দেখিলে তাঁহার উপপতি আস্‌বে না। “কেন?” “তাঁহাকে দেখিলে তুই মূর্চ্ছা যাবি।” “কেন?” “সে ভূত।”

আবজানি। ভূত আবার মানুষের উপপতি হয়?

আমীর। ভূত না হলে কি এত রেতে বনে আস্‌তে হয়। রঙ্গ রস সব জাতেরই আছে, ভূতের কি পেত্নী ছাড়া আর কাহার কাছে যাইতে সাধ নাই? আর মানুষেরও কি মানুষ ছাড়া ভূতের কাছে যাইতে নাই? আবজানি বুঝিল হবেইবা, কহিল “আল্লা! আমাকে মসজিদে রেখে এস।” আমীর কহিল, “ভয় নাই ভূত আমার পোষা, তুই মসজিদে যা, দেবতার ঘরে ভয় কি?”

ক্রমশঃ।

বৃন্দাবন-দৃশ্যাবলি।

ব্রজ-বিপিন।

সময় সন্ধ্যা।

(শ্রীকৃষ্ণ, সিদাম, সুবল ইত্যাদি রাখালগণ আসীন)

কৃষ্ণ। সথে!——

অপরূপ পেখনু যমুনা-কিনারে
নীল-চল-সলিলে কনক-নলিনী!
যুগল পয়োধর মগন সলিলে
রশ্মি-পুতি-বাঞ্ছিত বক্তনাবলি
গ্রীবা ঘেরই খেলত সুনীল সলিলে
—থর থর কম্পিত অধীর সমীরে!
বাধই পয়োধরে মৃদু কল নাদে
চলল জল-রাশি উজলি যমুনে
মুকুতা-ফলে ঘেরই কনক প্রতিমা!—
যুগল ভুজ-লতা তুলল রাই
রাগ রাগিণী রুণ বাজল বলয়ে!
নথ চন্দ্র-দলে যতনে মিলই
কবরী এলায়ল নীরদ-সলিলে—
শোভল ভানু বালা শ্যামল শৈবালে!
খলিত ফুল-দল চলল কাতার—
নয়ন ভরিয়া হম্ পেখনু তাহারে!
সখা হে চারি আথে মিলল অমনি!—
ক্ষণ সৌদামিনী-সম হাসই
ঢাকল বিধুমুখ নীরদ দুকূলে—
আকুল ভেয়হু মদন-বিকারে!—
(দীর্ঘনিশ্বাস)

সিদাম—(অন্যমনস্ক করিবার বাসনায়)—

সথে—নিরখও গিরি গোবর্দ্ধনে—
কিবা সুশোভিত কিসলয়ে মধু-সমাগমে
দোলত তরু লতা মৃদু মধুরিমে!
ফুল-দল অধর লুটই ধীরে ধীরে
চলত ঝিমি ঝিমি মলয় অনিল!
কুহরত কোকিল নব অনুরাগে
গোবর্দ্ধন গিরি কিবা অপরূপ সাজে!—

কৃষ্ণ।—সখা হে—গোবর্দ্ধন নাই মোর নয়নমে লাগে

রাই-রূপ সদা হৃদয়মে জাগে?—
—তেয়াজই যমুনা উঠল রাই
রুণ রুণ নূপুর বাজল সোপানে!—
গায়ন পীকফুল নাচল পাপিয়া
কাঁদল ভানু বালা কল কল নাদে
রূপ-মাধুরী ভাসল তরল সমীরে!—
নীরদাম্বর ত্যজই রূপ-বিন্দু ছটা
গিরই ঝিমি ঝিমি তিতল সোপানে!
অম্বর ভেদই স্থির সৌদামিনী
খেলল!—মদনানল দহল হমারে!—
(দীর্ঘনিশ্বাস)—

সুবল। (অন্যমনস্ক করিবার চেষ্টায় মুরলী লইয়া সাধিতে সাধিতে)——

কেশব তোমার মুরলী
পাকর!—ফুকার নিধুবন মোহি!
সবই নিরখব কদম্ব-শেখরে

কইসন ঠববে কোকিল কোকিলা!—
তেয়াগই মঞ্জরী গুঞ্জরে বিরত,
শুনবে মধুকর সঙ্গীত-লহরী
ব্রজ কি গোবালিনী গেহ কাজ ত্যজই
উভ কাণে শুনবে দীরঘ নিশাসি!—

সিদাম।—(কিঞ্চিৎ কৃত্রিম ক্রোধ ভরে)—
হট্‌ না ত্যজ বনয়ারী!——
করত কইসন?—ফুকার বাঁশরী!
ধায়ত দোহা মেলি ধবলী সামলী
নব দুর্ব্বাদলে ভুলই দুর পাথারে!
বিষাদিতা ক্ষীরদা করুণা-নয়নে
তৃণদল ত্যজই নিরখত মোহে!—
তুহু কি করত?—বাজাও মুরলী
আবাই ফিরব ধবলী সামলী!—

শ্রীকৃষ্ণ। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করত বংশী-ধ্বনি)—
নয়নাসারে ভিজল হমার মুরলী—
বাসনা ভেয়ল বাজাই তাহাবে
বাজল না সথে!—রাই রূপ চরণে
ঝঙ্কার শুনই গিরল ভূতলে!
দশ দিশ উজলি গজেন্দ্র-গমনে
কোমল পরিমলে পুরই সমীরে—
সলাজ নয়নে ক্ষণে ক্ষণে তাকই
বিন্দুল জর জর!—অরুণ কপোলে
তরুণ দিবাকর ললিত নলিন
সরস-কর-সম শোভল সুরাগ!—
নবীনানুরাগে নব নব ভাবে
মিলল প্রাণ-সখা!—দুরাশা-কাননে
ফুটল কলিকুল; ছুটল ভ্রমরা;
গায়ল পীককুল; খেলল সমীর!—

সুবল।—সখা হে!—
প্রণমই হামই রমণী-চরণে
পীরিতি-চরণে সহস্র বার!
ধন মান আহুতি পরাণ প্রদানে
মন নাহি কহি চরণ না পারও!
গরবমে অধীরা ধরায় না ধরে
সমুদ্র গোষ্পদ গিরি তৃণ জ্ঞান!
সাম্রাজ্য যৌবন ইন্দ্রত্ব ছার—
লাবণ্য সম্পদ—কটক মাধুরী!
—অটল-দুর্গ অচল সদৃশ
পশুপতি-ত্রাস কটাক্ষ-বাণ
মদন-সহায় বধয়ে পুরুখে
প্রণমই শতকোটী রমণী-চরণে!—

শ্রীকৃষ্ণ। হামত চাহত বিসরিতে রাই
মন নাই মানত ধেয়ায়ত তাই!
—অধর সুমধুর প্রবাল রঞ্জিত
মনমথ-বাঞ্ছিত অমৃতাগার!—
নিতম্ব-বিম্বে বাসনা-তরঙ্গ
ইন্দু-বিনিন্দিত বদন-মাধুরী!
মদন-নিকেতন যুগল মলয়ে
সুললিত আবলি জলদ ধনুক!—
কবরী-কুণ্ডলিত ফণিনী আকারা
ফলদল শোভিত মণি হেন তায়!—
সথাহে, রাই মোর চন্দন-কলিকা
কোমল বায়ুভরে গিরত ধরায়!
সুধাংশুবদনী কোমল নবমী
কোমল প্রভাকর গলত কিরণে!
সথাহে, রাই মোর শারদ চন্দ্রমা
হৃদয়-সরোবরে মরীচি বিতরে!
রাই ভুবনময় আরাধনা রাই
কষিত হেম-রেখা হৃদয়-পাথানে!—

সিদাম। অব আয়ত বলাই!—

কদম্ব কলি ভরে বঙ্কিম ভই ;
রতন কিসলয়ে শোভিত সুন্দর
রজত গিরি যেন ভুতলে বিরাজে !
অস্তাচল-চূড়ে পুন পুন চাহই
আয়ত দ্রুত পদে !—বাজাও মুরলী !
সিরথত ধেনুদলে বিলোল নয়নে
আহার পরিহরি নেহালত তোয় !—
যামিনী আগত জসমতি রোয়ত
ব্রজ-রাজ ভাবত তোহার বিরহে
চল সব মিলই ধেনু লই যাই
পায়ব করে চাঁদ জসমতি মাই।—
(কদম্ব ফুল সহ বলরামের প্রবেশ)
বলরাম। আওরে কানাই
কদম্ব দলে আজি তোহারে সাজাই !
(শ্রীকৃষ্ণের কর্ণমূলে কদম্ব পরাইয়া)
দেখরে গোপাল গোপাল-রাজে
নৃপ কলি কইসন অপরূপ সাজে !—
সুবল। (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপনে কটাক্ষ-পাত করত)
অপরূপ যৈসন যমুনা কিনারে
নীল চল সলিলে কনক-নলিনী !—
কৃষ্ণ। (লজ্জিত হইয়া)
অই হের নলিনী-মোহনে—
অস্তাচল-চূড়ে মধুরিমে হাসই
মোহই ত্রিভুবন মাঙত বিদায় !
কন্দর ত্যজই ভীতান্ধকার
নিরখত ভাস্কর গমন-প্রয়াসি।—
চল সব মিলই ধেনু লই যাই
অব বংশী ফুকারব বোয়ত মাই।
(বংশী ধ্বনি ও ধেনু একত্র করণ)
যবনিকা পতন।

ক্রমশঃ—

পাণিনি।*

বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত "জয়দেব-চরিত" রচনা করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। পুনরায় পাণিনি-বিচার সম্বন্ধে ১৫৮ পৃষ্ঠাধারী একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহার কিয়দংশ মাত্র "বান্ধব" নামক মাসিক পত্রে পাঠ করিয়া বঙ্গদেশীয় প্রাচ্য-তত্ত্বানুশীলনকারী মহোদয়গণ প্রস্তাবটী সম্পূর্ণাবয়বে গ্রন্থবদ্ধ দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, রজনীবাবু স্বল্প-কালের মধ্যে তাঁহাদিগের সে আশা পূর্ণ করিয়াছেন। প্রস্তাবটী অধিকাংশ পণ্ডিতবর গোল্‌ড ষ্টুকর প্রণীত "পাণিনি-বিচার" হইতে অনুবাদিত। তদ্ভিন্ন ইহাতে মোক্ষমূলর, বোতলিঙ্ক, বেবর, লাসেন, মণিয়ার উইলিয়ম্‌স প্রভৃতি উরোপীয় প্রাচীন-তত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতবর্গের মত যথাবিহিত বিচারপূর্ব্বক গৃহীত হইয়াছে। রজনীবাবু বিশেষ পরিশ্রমের সহিত গ্রন্থখানি সঙ্কলন

* পাণিনি। পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির আবির্ভাব-কাল-নির্ণায়ক প্রস্তাব। শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। কলিকাতা জি, পি, রায় এণ্ড কোম্পানির যন্ত্রে মুদ্রিত।

করিয়াছেন, এবং ইহার রচনাও বিশদ হইয়াছে। আমরা এই গ্রন্থের সমালোচন উদ্দেশে সংক্ষেপে স্বতন্ত্ররূপে পাণিনিবিচারে প্রবৃত্ত হইলাম।

পাণিনি পাণিন্-বংশোদ্ভব এবং দেবলের পৌত্র। এ দেবেল কে? তাহার বিশেষ পরিচয় দিতে পারিলাম না; কিন্তু তিনি ঋষি দেবল নহেন, তাহা পাণিনির পরিচয়ে সুপ্রমাণ হইবেক। পাণিনির মাতার নাম দাক্ষী, এজন্য তাঁহার অপর নাম দাক্ষেয় এবং তিনি সালাতুর নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে সালাতুরীয় বলিত; ইহা "সালাতুরাদীয়ন্" সূত্রে প্রকাশ আছে। সালাতুর গান্ধার (কান্দাহার) প্রদেশের নগর, উহা আধুনিক অটকের উত্তর পশ্চিম দিকে স্থাপিত ছিল। আর্ষগ্রন্থে পাণিনির উল্লেখ নাই, এবং কোন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও আমরা পাণিনির বিষয় কিছুমাত্র দেখিতে পাই না; কেবল এক সোমদেব ভট্টকৃত কথাসরিৎসাগর নামক কথা গ্রন্থে পাণিনির সম্বন্ধে আখ্যায়িকা দেখিতে পাইতেছি। কথাসরিৎ-সাগর * বৃহৎ-কথামঞ্জরী হইতে ১২০০ খৃষ্টাব্দে সঙ্কলিত হইয়াছে। পাণিনি সম্বন্ধে তাহাতে ঐতিহাসিক সত্য কিছুমাত্র প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাহাতে এইমাত্র জ্ঞাত হওয়া যায় যে তিনি উপবর্ষ পণ্ডিতের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ও নন্দের সময় বর্ত্তমান ছিলেন। আচার্য্য গোল্ডষ্টুকারের মতে পাণিনি খৃষ্টজন্মের ৬০০ শত বৎসর পূর্ব্বে এবং বুদ্ধদেবের ধরামণ্ডলে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। ইউরোপীয় অন্যান্য পণ্ডিতগণ তাঁহাকে খৃষ্টের ৪০০ বৎসর পূর্ব্বের লোক স্থির করিয়াছেন। তিব্বত দেশীয় লামা তারানাথ ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধধর্ম্মের একখানি প্রসিদ্ধ ইতিহাস রচনা করেন। তিনি তাহাতে পাণিনিকে মহারাজ নন্দের সমসাময়িক স্থির করিয়াছেন। তাহা হইলে তিনি খৃষ্ট জন্মের ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন স্থির হইতেছে। বৌদ্ধ তারানাথ ও পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি উভয়েই বৃহৎ-কথার প্রমাণানুসারে তাঁহাকে রাজা নন্দের সমসাময়িক স্থির করিয়াছেন। এটী সম্ভবপরও বটে, কেননা পাণিনি আর্ষ কালের লোক নহেন এবং কোন ঋষিও তাঁহার উল্লেখ করেন নাই! পাণিনি ঋষি নহেন, একজন আচার্য্য; এবং মুনি বলিয়াও তাঁহাকে সম্বোধন করা যায়।

পাণিনি যুধিষ্ঠিরাদির পরবর্ত্তী, যেহেতু তিনি যুধিষ্ঠিরকে বিজ্ঞাত ছিলেন। তিনি যুধিষ্ঠির শব্দ নিষ্পাদনের নিমিত্ত স্বত

* বর্নেল্ সাহেব অনুমান করেন কথাসরিৎসাগর বৃহৎ-কথামঞ্জরী হইতে সঙ্কলিত কিন্তু তাহা নহে উহা গুণাধ্যায়কৃত বৃহৎ-কথা হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। বৃহৎ-কথা-মঞ্জরী ক্ষেমেন্দ্রকৃত। উহা বৃহৎ-কথার সার সঙ্কলন মাত্র। ক্ষেমেন্দ্র বৃহৎ-কথা-মঞ্জরী ভিন্ন ভারত-মঞ্জরী নামক মহাভারতের সার সঙ্কলন করিয়াছিলেন।

প্রকরণে "গবি যুধিভ্যাং স্থিরঃ *" এই সূত্র রচনা করিয়াছেন, অর্থাৎ গবি এবং যুধি এই আকারের শব্দের পরবর্ত্তী স্থির শব্দের ষভাব হয়। পাণিনির কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে এ সকল স্থূল কথা মাত্র। এক্ষণে পণ্ডিতবর গোল্‌ড ষ্টুকার মহোদয়ের কথার বিশেষ সামঞ্জস্য করা যাইতেছে। ইহাতে আচার্য্য গোল্‌ড ষ্টুকরের সহিত আমরা ঐক্যমত না হওয়াতে অত্যন্ত দুঃখিত হইতেছি; সুতরাং সুবিজ্ঞ পাঠকবর্গ আমাদিগের প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা করিবেন্।

বৈয়াকরণিক ভাষার দ্বারা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বা তৎকালের সমস্ত বিষয় অবগত হওয়া যায় না; এজন্য গোল্‌ড ষ্টুকর মহোদয় দ্বারা এতৎ সম্বন্ধে যে যুক্তি উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহা আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ভ্রম-পূর্ণ বোধ হইতেছে। সাধু অর্থাৎ বৌত্‌পত্তিক শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয়ের বিভাগ ও সাধন-প্রণালী প্রদর্শন পূর্ব্বক অর্থ-বিশেষ ব্যবস্থাপন করাই ব্যাকরণের মুখ্য প্রয়োজন এবং "ব্যাকরণ" এই শব্দের ব্যুৎপত্তির প্রতি লক্ষ্য করিলে তাহাই প্রতীত হয়। পারিভাষিক বা সাঙ্কেতিক শব্দের উপর ব্যাকরণের প্রভুতা নাই; এবং পারিভাষিক শব্দের সহিত কোন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ নাই। একটী প্রকৃতি ও একটী প্রত্যয় দ্বারা যে পদ নিষ্পন্ন হয়, তাহার দ্বারা এককালীন বহু অর্থ সংগ্রহ করা যাইতে পারে না; বরং বারে বারে অর্থ পরিবর্ত্ত করা যাইতে পারে। একটী শব্দদ্বারা যুগপৎ বহুদ্রব্য বা বহু অর্থের মধ্যে কোন এক নির্দ্দিষ্ট অর্থ বুঝাইতে হইলে পরিভাষা অপেক্ষা করে। সেই সর্ব্বজনীন-পরিভাষা কবলিত পদার্থের সহিত পরিভাষা-কারকদিগের সহিতই সম্বন্ধ, ব্যাকরণের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। মনে করুন্ 'পঞ্চাম্ৰ' একটী পারিভাষিক শব্দ। নিম্ব, অশ্বথ, বট, জাতিপুষ্প, দাড়িম্ব, এই বৃক্ষ গুলি একত্রিত হইলে তাহাকে পঞ্চাম্ৰ বলে। এখন বিবেচনা করুন শব্দ হইল পঞ্চাম্ৰ, কিন্তু আম্ৰবৃক্ষের নাম গন্ধও উহাতে নাই এবং থাকিলেও পাণিনি কি প্রকারে ঐ পঞ্চাম্ৰ শব্দকে প্রকৃতি-প্রত্যয়-বিভাগ-প্রদর্শক ব্যাকরণ শাস্ত্রে আনিতে সমর্থ হইতেন? ফলে পারিভাষিক শব্দের উপর ব্যাকরণের সম্বন্ধ নাই। এই জন্য শব্দপারঙ্গত প্রবীণ মনুষ্যেরা শব্দ শক্তি জ্ঞানের ৮ প্রকার পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন—ব্যাকরণ, উপমান, কোষ, আপ্তবাক্য, ব্যবহার ইত্যাদি। যখন পারিভাষিক শব্দ ব্যাকরণের নিয়মের অধীন নহে, তখন তাহা কি জন্য ব্যাকরণে থাকিবে? এজন্য সে সকল পারিভাষিক শব্দ ব্যাকরণে না থাকিলে সেই সেই শব্দ সেই সেই

* কাতন্ত্রে অবিকল এই সূত্রটী রহিয়াছে। পদ্মনাভ পঞ্চাধ্যায়ী অর্থাৎ সুপদ্ম ব্যাকরণে "গবিষ্ঠির—যুধিষ্ঠিরা" এইরূপ স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন।

ব্যাকরণ রচনার সময় ছিল না, ইহা কি প্রকারে অনুমান করিতে পারি?

পাণিনি সূত্রে "আরণ্যক" শব্দের অরণ্যবাসী অর্থ দেখিয়া, পাণিনির সময় আরণ্যক নামক বেদ ভাগ বর্ত্তমান ছিল না সিদ্ধান্ত করা নিতান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ। মনু ও ব্যাস যখন আরণ্যক নামক বেদ ভাগ অবগত ছিলেন, তখন পাণিনি তাহা জানিতেন না এবং তাঁহার সময় তাহা বর্ত্তমান ছিলনা অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত কথা। আরণ্যক শব্দ পবিত্র বেদাংশবিশেষ অর্থে পরিভাষিত। ঐ পরিভাষা ঋষি প্রচারিত; সেই জন্য পাণিনি উহা ত্যাগ করিয়াছেন, এবং এই জন্যই সায়নাচার্য্য "এতদারণ্যকং সর্ব্বং নাব্রতী শ্রোতুমর্হতি" পরিভাষাটী দেখাইয়াছেন। কাত্যায়ন, পতঞ্জলি প্রভৃতি পারিভাষিক অর্থ গুলি যথাযথ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন মাত্র, তাহার কোন স্বতন্ত্র বিধি বন্ধন করেন নাই।

পঞ্চাম্ন শব্দের ন্যায় আর একটী শব্দ শোষণী। এই শব্দের পুরাণ পরিভাষিত অর্থ তীর্থস্থলে প্রদত্ত ৯ পিণ্ড। বেদ পরিভাষিত অর্থ সোমরস গ্রহণের পাত্র বিশেষ। পাণিনি বৈয়াকরণিক নিয়ম দ্বারা ঐ অর্থ বিস্তার করিতে পারেন নাই, তাহা বলিয়া কি পাণিনির পূর্ব্বে কেহ যাগ যজ্ঞ করেন নাই বুঝিতে হইবেক? এইরূপ পারিভাষিক শব্দ বোধ হয় সমস্ত ভাষার অর্দ্ধেক হইবেক, ইহার সহিত ব্যাকরণের কোন সংশ্রব নাই।

ন্যায়দর্শন, ও সাঙ্খ্যদর্শন, ঐ রূপ পারিভাষিক। ঐ পরিভাষা আর্ষ নহে, উহা শিষ্য সম্প্রদায়ের। যাঁহাকে শিষ্যেরা বা আমরা যোগ বা পাতঞ্জল দর্শন বলি তাহার প্রকৃত নাম সাঙ্খ্য-প্রবচন। আমরা যাহাকে উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শন বলি, তাহার আর্ষ নাম উত্তর-কাণ্ড ইত্যাদি। উপনিষদ শব্দও এইরূপ পারিভাষিক।

পণ্ডিতবর গোলড্ষ্টুকরের তর্কের অনুসরণ করিয়া রজনী বাবু "পাণিনি" পুস্তকের ৫৪ পৃষ্ঠার টীকায় "আশ্চর্য্যমনিত্যে" পাণিনি সূত্র ও "আশ্চর্য্য অদ্ভুত ইতি বক্তব্যম্" এই বার্ত্তিক উদ্ধৃত করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে পাণিনির সময় ও তাঁহার পূর্ব্বে অনিত্য শব্দ বিনশ্বর-বোধক ছিল; কিন্তু আশ্চর্য্য শব্দ তদ্বোধক ছিল না, বস্তুতঃ তাহা নহে—অনিত্য শব্দে বিনশ্বর অর্থ বুঝেন এই আশঙ্কায় বার্ত্তিককার স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন, নচেৎ কাত্যায়নের সময়ে যে নূতন কোন অর্থ ছিল তাহা নহে। পাণিনির সময় যদি আশ্চর্য্য, অদ্ভুত, চিত্র, আদি শব্দ এক-পর্য্যায়াক্রান্ত না থাকিত, তবে পাণিনি "আশ্চর্য্য" অর্থে চিত্র শব্দের প্রয়োগ করিতে পারিতেন না। তিনি "চিত্রঙ্ আশ্চর্য্যে" এই একটী সূত্র করাতে আচার্য্য গোলড্ষ্টুকরের সিদ্ধান্তের মূলোচ্ছেদ হইতেছে। পুনরায় তিনি "ভোজ্যং ভক্ষ্যে" এই সূত্র উদ্ধার করিয়া যে নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা ও অসম্যক্। সুপদ্মকার ঠিক ঐ সূত্র রাখিয়া দৃষ্টান্ত দিয়াছেন

"অন্যত্র ভোগ্যাস্ত্রী" যেখানে উপভোগার্থে ভুজ ধাতু প্রয়োগ করিবে, সেখানে জ—বর্ণ স্থানে গ বর্ণ হইবে, এই মাত্র নিয়ম, নচেৎ পাণিনির সময়ে ভোজ্য শব্দের এক অর্থ আর কাত্যায়নের সময় আর এক অর্থ তাহা নহে; এবং অব্যবহৃত বা অব্যবহার্য্য শব্দ যে তরল ও কঠিন উভয়বিধ অর্থে প্রয়োজিত হইয়া থাকে, একথা অপ্রামাণিক বরং অমর প্রভৃতি কোষকারেরা খাদ্য অর্থে ব্যবহার, বন্ধন করিয়া গিয়াছেন।

এখানে একটী গুরুতর বিচার উত্থাপিত হইতেছে। পাণিনি কেবল সূত্রস্থান রচনা করিয়াছেন, বৃত্তি বা উদাহরণ তাঁহার নহে, তবে কি প্রকারে অন্যের দত্ত উদাহরণ দ্বারা পাণিনির সময়ের ব্যবহারিক ভাব নির্ণয় করা যাইতে পারে?

পণ্ডিতবর গোল্‌ডষ্টুকরের মতানুসারে রজনী বাবু কহেন, পাণিনি-সূত্রে "প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে অথর্ব্বাঙ্গিরস "শব্দের উল্লেখ কোন স্থলে দৃষ্ট হয় না" ইহাতে পাণিনি অথর্ব্ববেদের বিষয় অবগত ছিলেন না, অনুমান করিয়াছেন; কিন্তু ষষ্ঠাধ্যায়ের ৪র্থ পাদের ১৭৪ সূত্রে "দাণ্ডিনায়ন হাস্তিনায়নাহথর্ব্বণিক—" এই সূত্রে স্পষ্ট অথর্ব্ববেদের উল্লেখ আছে এবং "কপিবোধাদাঙ্গিরসে" এই সূত্রে আঙ্গিরস মুনির উল্লেখ দেখা যাইতেছে: সুতরাং সিদ্ধান্তটী ভ্রমপূর্ণ হইতেছে।

উক্ত জর্ম্মণদেশীয় পণ্ডিত মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে পাণিনির পরভাবী বলিয়াছেন, তাহাও অসঙ্গত, কেন না দুইজন যাজ্ঞবল্ক্য বর্ত্তমান ছিলেন, তাহার মধ্যে একের নাম যাজ্ঞবল্ক্য ও অপরের নাম যাজ্ঞবল্ক। যিনি যাজ্ঞবল্ক্য তিনি যোগী বিশেষণে বিশেষিত হইয়া থাকেন যথা "তথাচ যোগী যাজ্ঞবল্ক্যঃ"। দ্বিতীয় যাজ্ঞবল্ক ঋষিপুত্র নহেন; তিনি অরিষ্টনোম নামক সামান্য ব্রাহ্মণের পুত্র। যাস্ক পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী, গালব যাস্ক মুনির পূর্ব্ববর্ত্তী, এবং এই গালব ভাগুরিকে জানিতেন, সেই ভাগুরি-প্রোক্ত মার্কণ্ডেয় পুরাণে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের উল্লেখ আছে, সুতরাং এই যাজ্ঞবল্ক্য পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্রমাণ হইতেছে। পাণিনি যে সকল ঋষির নামোল্লেখ করেন নাই, তাঁহারা পাণিনির পরভাবী কোন্ যুক্তি অনুসারে মনে করা যাইতে পারে? শঙ্করাচার্য্য পাণিনিকে অতিক্রম করিয়া স্ফোটবাদী উপবর্ষের বাক্য প্রামাণ্য বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাই বলিয়া কি পাণিনিকে শঙ্করাচার্য্যের পরভাবী মনে করিব? পুনরায় পাণিনি যদি কোন শব্দের উল্লেখ না করিয়া থাকেন, তবে সেই শব্দ পাণিনির সময়ে ছিল না, তাহার অনুমান কি প্রকারে হইতে পারে?

এইরূপ পণ্ডিতবর গোল্‌ডষ্টুকরের পাণিনির সূত্র আলোচনায় পাণিনির কাল নির্ণয়ের প্রয়াস অযৌক্তিক বোধ হইল, এজন্য তাঁহার কতিপয় বাক্য খণ্ডন করিতে বাধ্য হইলাম। আমরা পাণিনির কাল নির্ণয়ের বিশেষ প্রমাণাভাবে তাঁহাকে

বৃহৎ-কথার আখ্যায়িকা অনুসারে রাজা নন্দের সমসাময়িক স্থির করিলাম। এক্ষণে তাঁহার ব্যাকরণের কিঞ্চিৎ সমালোচনা করা যাইতেছে।

সর্ব্বাদৌ কি আকারের ভাষা মানব-কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইয়াছিল, নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। ফল সেই ভাষার পরিণাম বা সংস্কার হইয়া সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি হয়। সংস্কৃত ভাষা আর্য্যদেশে ব্যাপ্ত হইলে, ঋষিরা সানন্দ চিত্তে স্তোত্র, শস্ত্র, গীতি প্রচার করিতে লাগিলেন। এই ভাষা তৎকালের লোকের অতীব হৃদয় আকর্ষণ করিতে লাগিল। অধ্যয়ন, অধ্যাপন আরম্ভ হইল। তৎপরে শিক্ষার সুগম উপায় করিবার নিমিত্ত সঞ্জাত শব্দের জাতি বিভাগ ও লক্ষণাদি নির্ব্বাচিত হইতে লাগিল এবং এতদ্দ্বারা অধ্যেতৃগণের অনেক আয়াস লাঘব হইল। ভাগুরি, গালব, ব্যাঘ্রপাৎ, মিমত, তৌকায়ন প্রভৃতি ঋষিরা উহার সূত্রপাত করেন। শাকটায়ন, যাস্ক, ব্যাড়ি প্রভৃতি ঋষিদিগের দ্বারা উহার পূর্ণতা জন্মে, তৎপরে অধিক সহজ উপায় অর্থাৎ সর্ব্বতোমুখ সূত্র রচনার উপায় স্থিরীকৃত হয়। এই সূত্রনির্ম্মাতাদিগের মধ্যে পাণিনি মুনি শ্রেষ্ঠ।

সূত্র দ্বিবিধ—সূচক ও সর্ব্বতোমুখ। সূচক কারের সূত্র বহু পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু সর্ব্বতোমুখ সূত্র-মাহাত্ম্য ইন্দ্রদত্ত কর্ত্তৃক প্রথম বিরচিত হয়। ইন্দ্রদত্তের ঐন্দ্র ব্যাকরণ, চন্দ্রাচার্য্যের চান্দ্র, কাশমুনির অঙ্গব্যাকরণ, কৃষ্ণাচার্য্যের ব্যাকরণ, আপিশালীর আপিশাল সূত্র, এতৎপরে পাণিনির সূত্র, তৎপরে অমরসিংহের বর্গসূত্র এবং অবশেষে জিনেন্দ্র বুদ্ধিপাদআচার্য্যের সংগ্রহ-সূত্র জন্মলাভ করে।

উন্নতির সময়ে ভাষার অধিকার এত অধিক হইয়াছিল যে সকল শব্দের রূপ নিষ্পত্তি সূত্র দ্বারা নির্ব্বাহ হইত না "উপসর্গ-নিপাতাঃ" এই বলিয়া যাস্কাদি আর্য সময়ে নিপাতের প্রয়োজন হইয়াছিল। "নিপাত" শব্দের অর্থ এই যে, "যদ্ যল্লক্ষণেনানুৎপন্নং তৎ সর্ব্বং নিপাতনাৎসিদ্ধম্" (কাতন্ত্রীয়ে দুর্গসিংহ) যে সকল পদের রূপ নিষ্পত্তি লক্ষণ দ্বারা না হয়, সে সমস্ত নিপাতন-সিদ্ধ জানিবে।

যাস্ক বলিয়াছেন "নিপতন্তি উচ্চায় চেম্বর্থেষু ইতি নিপাতাঃ" 'উচ্চায় চ' অর্থাৎ শব্দ সকল বিচিত্র অর্থে নিপতিত হইলে তাহা নিপাত নাম প্রাপ্ত হয়। এইরূপ নিপাতের প্রয়োজন পাণিনির সময়েও ছিল, পাণিনিও ইহা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। অর্থাৎ সূচকার্থ সূত্র দ্বারা সকল শব্দকে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। পাণিনি সংজ্ঞা প্রকরণে বলিয়াছেন, "প্রাগীশ্বরান্নিপাতাঃ" অর্থাৎ ঈশ্বর শব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিপাতের অধিকার। এই নিপাতের ন্যায় আর একপ্রকার সঙ্কেত আছে। তাহার নাম পৃষোদরাদি। ইহাও একপ্রকার নিপাতের জাতি। ইহার বলে যে সকল

বর্ণের আগম, বর্ণের বিপর্য্যয় ঘটনা প্রভৃতি হইয়া থাকে, তাহা সূত্র দ্বারা হয় না। সিংহ শব্দ পৃষোদরাদি-সিদ্ধ। হিংস্ ধাতু' ঘঞ, সকারের স্থান পরিবর্ত্তন ও অনুস্বারের আগম ঐ পৃষোদরাদি নিয়মে হইয়াছে। পাণিনিকেও এই নিয়মের অধীন থাকিতে হইয়াছিল।

পাণিনি, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি, বর্ষ, উপবর্ষ, ব্যাড়ি, ভাগুরি প্রভৃতি বৈয়াকরণিক আচার্য্যেরা বৈদিক ভাষার পরিবর্ত্তন করেন। তৎপূর্ব্বেও পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা কোন নিয়মের মধ্যে ছিল না। বৈদিক ভাষার উচ্ছেদ না হয় এবং তাহা বুঝিতে পারা যায়, এই মাত্র রক্ষা করা উল্লিখিত আচার্য্যগণের উদ্দেশ্য ছিল। এই সকল আচার্য্যগণের মধ্যেও পাণিনি বৈদিক ভাষার জন্য এবং তাহার বাক্য বিন্যাস ও তাহার রূপ নিষ্পত্তির আকার কিরূপ তাহা দেখাইবার জন্য 'ছান্দস' প্রকরণ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। এটী কাজে কাজেই ঘটিয়াছে, কেন না সে সকল বিষয় সূত্র নিয়মে আবদ্ধ হইতে পারে না। সেই জন্য কেবল "ছান্দসি" "আর্ষে" ইত্যাদি প্রকার বলিয়াছেন। বৈদিক পদ পদার্থ আর কেহ বলেন নাই। কেবল পাণিনিই বলিয়াছেন। লৌকিক ব্যাকরণে ল কার দশটী, কিন্তু বৈদিক ব্যাকরণে ১১টী, সেই অতিরিক্তটীর নাম 'লেট্'। এই 'লেট্' লকারের রূপ 'লট্' ল কারের তুল্য, কিন্তু তাহার অর্থ ভিন্ন "বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যস্থ "বিবিদিষন্তি" এই ক্রিয়াতে 'লেট' ল কারের ব্যবহার হইয়াছে।

বেদের ব্যাকরণের জন্য প্রাতি-শাখ্য পৃথক্‌রূপে রচিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে ঋগ্বেদ-প্রাতিশাখ্য * অতি প্রাচীন। ইহা পাণিনির পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল। অধ্যাপক গোল্‌ডষ্টুকর ও ওয়েষ্টর গার্ড, ইহা যে পাণিনির পরবর্ত্তী বলিয়াছেন তাহা সঙ্গত বোধ হয় না। ভট্ট মোক্ষমূলর, মস্যুর রেণিয়ার ও সুপণ্ডিত বর্ণেল, ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্য পাণিনির পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল, তাহা স্বীকার করিয়াছেন।—তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য † ও বাজসনেয়ী বা কাত্যায়নপ্রাতিশাখ্য ‡ নামক যজুর্ব্বেদের প্রাতি-শাখ্য, ও অথর্ব্ববেদের প্রতিশাখ্য আছে। নাগোজী ভট্ট সামবেদের প্রাতিশাখ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা "সামলক্ষণম্

* আনন্দপুর (কাশী?) বাসী বজ্রাক্ষের পুত্র উয়ট ভট্ট ইহার টীকাকার। এই টীকার নাম পার্ষদ ব্যাখ্যা। উয়ট ভোজদেবের সময় বর্ত্তমান ছিলেন।

† তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যের অনেক ভাষ্য ছিল, তন্মধ্যে এক্ষণে ত্রিভাষ্য রত্ন নামক ভাষ্যই প্রচলিত। এতৎ-পূর্ব্বে ইহার বররুচির আত্রেয় ও মাহেষী ভাষ্য ছিল।

‡ উয়ট ভট্ট ইহার টীকাকার। ইহা ভিন্ন রামচন্দ্র-কৃত প্রাতিশাখ্যজ্যোৎস্না নামক একখানি আধুনিক টীকা আছে।

প্রাতিশাখ্যম্ শাস্ত্রম্” কিন্তু এক্ষণে উহা এক প্রকার লোপ হইয়াছে বলিতে হইবেক। অধ্যাপক হৌগ সাহেব কহেন সামবেদের কোন প্রকার প্রাতিশাখ্য এখনও বর্ত্তমান থাকিতে পারে। *

প্রাতিশাখ্য এক প্রকার ব্যাকরণ। ব্যাকরণের সমস্ত লক্ষণই ইহাতে আছে। কেবল লৌকিক শব্দের জন্য বিবরণ নাই। ফলি, বেদ ব্যাখ্যার জন্যই ইহার নির্ম্মাণ। প্রাতিশাখ্যে সংজ্ঞা, সন্ধি, কারক, তদ্ধিত, সমাস, সকলই আছে। কিন্তু তাহা কেবল বৈদিক পদ সাধনের উপযোগী। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যের প্রথম সূত্র এই “অথ বর্ণ-সমাম্নায়” এই সূত্র দ্বারা বর্ণ উচ্চারণ অধ্যয়ন এবং প্রযত্নাদি ভেদের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে। তৎপরে ক্রমে অন্যান্য সূত্রে অন্যান্য প্রকার সাধনের উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা—“অথ নবাদিতঃ সমানাক্ষরাণি” “(২)” দ্বে দ্বে সবর্ণ হ্রস্ব দীর্ঘে “(৩)” নপ্লুত পূর্ব্বম্ “(৪)” ষোড়শাদিতঃ স্বরাঃ “(৫)” শেষোব্যঞ্জনানি “(৬)” ইত্যাদি।

পাণিনির পূর্ব্বে যে ব্যাকরণ ছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। কারণ পাণিনি স্বয়ং ৫ম অধ্যায়ে বলিয়াছেন “খার্যাঃ প্রাচাম্” অর্থাৎ খারী শব্দান্ত দ্বিগু ও অর্দ্ধ শব্দের উত্তর টচ্ প্রত্যয় হওয়া পূর্ব্বাচার্য্যদিগের মত। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, পাণিনির পূর্ব্বে ব্যাকরণের আচার্য্য ছিল।

ব্যাড়ি-কৃত লক্ষ-শ্লোকাত্মক সংগ্রহ নামক ব্যাকরণ গ্রন্থ পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী, কারণ পাণিনি ব্যাকরণের জন্ম হওয়ার পরে তদ্বিরুদ্ধ ব্যাকরণ জন্মে নাই। যিনি যিনি ব্যাকরণ করিয়াছেন সকলকেই পাণিনির নিয়মানুগত থাকিতে হইয়াছে; কিন্তু ব্যাড়ি-কৃত ব্যাকরণ তদ্বিরুদ্ধ-মতাক্রান্ত এবং ভিন্ন পদ্ধতিতে গ্রথিত। ই, উ, ঋ, ঌ, বর্ণের পরে স্বরবর্ণ থাকিলে মধ্যে য, ব, র, ল, ব্যবধান হওয়া কেবল ব্যাড়ি ও গালব এই দুই ব্যক্তির মত যথা “ত্রিয়ম্বকং সংযমিনং দদর্শ” কালিদাসঃ। ত্রি + অম্বক। এই বিষয়ে পাদ্মনাভিক পঞ্চাধ্যায়ী ব্যাকরণে এক সূত্র আছে যথা—

“যথা ব্যবধানং ব্যাড়ি গালবয়োঃ।”

এতভিন্ন ভাগুরি-প্রোক্ত ব্যাকরণ ছিল। ইঁহার মতে অব ও অপি এই উপসর্গ দ্বারা আকার লোপ হইয়া যায়, কিন্তু পাণিনির মতে তাহা হয় না।

কথিত আছে, পাণিনি মহেশ্বরের নিকট বর্ণমাত্রের উপদেশ পাইয়া ব্যাকরণ রচনা করেন যথা—

“যেনাক্ষর-সমাম্নায় অধিগম্য মহেশ্বরাৎ।
কৃৎস্নং ব্যাকরণং প্রোক্তং তস্মৈ
পাণিনয়ে নমঃ।”

* “Ich Bweifle nicht, dass noch weitere Prateca´khyas aufgefunden werdon , so vermisse ich bis jetzt das Beeder Meaitrayani´ Samhita´ die so veiles Eigwthiimliche hat, und gewiss ein beson deres Pratica´ khya besitzt.”

লিঙ্গানুশাসনের বৃত্তিকার প্রভৃতি।

এই মহেশ্বর মনুষ্য কি মহাদেব বলা যায় না। বৃহৎ-কথায় লিখিত আছে যে, মহাদেবের তপস্যায় সিদ্ধ হইয়া পাণিনি ব্যাকরণ রচনা করেন, যাহাই হউক পাণিনি মুনি মহেশ্বরের নিকট যে বর্ণোপদেশ পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন, যথা অ ই উ ন। ঋ ৯ ক্। এ ও ঙ। ঐ ঔ চ। ইত্যাদি ক্রমে বলিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন, "ইতি মাহেশ্বরাণি সূত্রাণি" অর্থাৎ এই সকল মহেশ্বরপোদিষ্ট সূত্র। কেহ কেহ বলেন "ইতি মাহেশ্বরাণি সূত্রাণি" এই বাক্য পাণিনির মুখ-নির্গত বাক্য নহে। ইহা বার্ত্তিক কারের বাক্য।

পাণিনির ব্যাকরণ ৮ অধ্যায়ে বিভক্ত, এজন্য ইহার নাম "অষ্টাধ্যায়ী।" প্রত্যেক অধ্যায়ে ৪টী করিয়া পাদ আছে। ইহার সূত্র সংখ্যা ৩৯৬৫। পাণিনি এই গুলি সূত্রদ্বারা সন্ধি, সুবন্ত, কৃদন্ত, উণাদি, আখ্যাত, নিপাত, উপসংখ্যান, স্বরবিধি, শিক্ষা, তদ্ধিত প্রভৃতি যে কিছু বৈয়াকরণিক বস্তু আছে, সমস্তই প্রকাশ করিয়াছেন। পাণিনির পূর্ব্বে এই সকল বিষয় ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে পাঠ করিতে হইত; এক্ষণে আর তাহা হয় না। তজ্জন্য পৌর্ব্বকালিক শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ নিরুক্ত গ্রন্থ প্রভৃতি বিরল-প্রচার হইয়া উঠিয়াছে। পাণিনি ব্যাকরণ যথার্থ সর্ব্বতোমুখ হওয়াতে লোক-সমাজে বিশেষ আদৃত হইয়াছে। ইহার উপর বৃত্তি, বার্ত্তিক, ভাষ্য, টীকা লিখিত হইয়াছে এবং ঐ সকলের মত সমালোচন ও প্রয়োগাদির পরিদর্শন করিয়া বহুতর গ্রন্থ জন্মিয়াছে, তাহার নাম-মালা এই প্রস্তাবের যথাস্থানে প্রদর্শিত হইল।

চৈনিক পরিব্রাজক হিয়াঙ সিয়াঙের (ফরাসীস অনুবাদিত) জীবনচরিতে লিখিত আছে, তিনি খৃষ্টীয় সপ্ত শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া পাণিনি ব্যাকরণের মূল সূত্র ও তাহার সংশোধিত সূত্র দর্শন করিয়াছিলেন। বর্ণেল মহোদয় এই কথায় আস্থা প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু আমাদিগের মতে এ কথা যুক্তি-সিদ্ধ নহে, কেন না পাণিনি-ব্যাকরণের পাঠ পরিবর্ত্ত হইলে তাহা অদ্যতনীয় আচার্য্যগণের গ্রন্থে অবশ্যই উল্লেখ থাকিত। বেদার্থ প্রকাশক সায়নাচার্য্য, ভট্টভাস্কর, ও ভরত স্বামী বেদ-ভাষ্যে পাণিনির অনেক সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে পরিবর্ত্তিত পাঠ কিছু মাত্র লক্ষিত হয় না।

কাত্যায়ন পাণিনি সূত্রের বার্ত্তিক-কর্ত্তা ইঁহার নামান্তর বররুচি, মেধাজিৎ, ও পুনর্ব্বসু। বৌদ্ধ কাত্যায়ন ও ধর্ম্মশাস্ত্র-বক্তা কাত্যায়ন হইতে ইনি পৃথক্ ব্যক্তি, কাত্যায়নের বার্ত্তিকের উপর পতঞ্জলি "মহাভাষ্য" লিখিয়াছেন। পতঞ্জলির অপর নাম গোনর্দ্দীয়। ইনি গোনর্দ্দ-বাসী এবং ইঁহার মাতার নাম গোণিকা; যোগশাস্ত্র-প্রণেতা পতঞ্জলি ও মহাভাষ্য-কর্ত্তা পতঞ্জলি উভয়ে পৃথক্ ব্যক্তি।

আচার্য্য গোল্‌ড্‌ষ্টুকেরের মতে কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি ১৪০ হইতে ১২০ খৃষ্ট-জন্মের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। পণ্ডিতবর রামকৃষ্ণগোপালভাণ্ডারকর পতঞ্জলিকে পাটলীপুত্রাধিপতি পুষ্পমিত্রের সমসাময়িক স্থির করিয়াছেন, এবং তাঁহার মতে মহাভাষ্যের তৃতীয় অধ্যায় ১৪৪ হইতে ১৪২ খৃষ্ট-জন্মের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু অধ্যাপক ওয়েবর ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি এই তিন জনে ব্যাকরণের পূর্ণ অবয়ব প্রদান করিয়াছেন। এই তিন জন সংস্কৃত ভাষায় যে কীদৃশ পণ্ডিত ছিলেন, তাহা আমাদিগের সামান্য বুদ্ধিতে বুঝিবার ক্ষমতা নাই।

পতঞ্জলির মহাভাষ্যের টীকার নাম ভাষ্যপ্রদীপ। কৈয়ট ইহার প্রণেতা। কৈয়টের টীকার উপর নাগোজী ভট্ট টীকা লিখিয়াছেন; তাহার নাম 'ভাষ্যপ্রদীপোদ্যোত'। কৈয়টের টীকার আর এক খানি টীকা আছে, তাহার নাম ভাষ্যপ্রদীপ-বিবরণ, উহা ঈশ্বরানন্দ কৃত।

কাত্যায়নের ন্যায়, বামন, পাণিনির এক খানি বৃত্তি লিখিয়াছেন, উহার নাম কাশিকা-বৃত্তি। ইহা অতি মান্য গ্রন্থ, এবং আদ্যোপান্ত প্রাঞ্জল ও প্রসাদ-গুণ-বিশিষ্ট। যিনি একবার এই গ্রন্থ দেখিয়াছেন, তাঁহার আর সিদ্ধান্ত-কৌমুদী স্পর্শ করিতে ইচ্ছা হয় না। সিদ্ধান্ত-কৌমুদীর গ্রন্থকার ভট্টোজি দীক্ষিত অষ্টক পাণিনীয় সূত্র-সমূহের ক্রম ভঙ্গ করিয়া বুৎক্রমে অর্থাৎ যেখানে সেখানে হইতে সূত্র আনিয়া সঙ্কলন করিয়াছেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, গ্রন্থ সহজ করিবেন; কিন্তু তাহা হয় নাই। "মনোরমা" "শেখর" প্রভৃতি ভূরি ভূরি টীকাতেও তাহার সাধুত্ব সম্পাদিত হয় নাই। তাহা পাঠ করিতে হইলে এখনও যেখানে সেখানে "ফাকি" উপস্থিত হয়। গ্রন্থ সকলের দোষেই ফাঁকি বা পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত হইয়া থাকে। বামন কাত্যায়ন অপেক্ষা ক্ষুদ্র-বুদ্ধি এবং হীন, তথাপি ইনি যেরূপ সরলভাবে সূত্রার্থ প্রকাশ করিয়াছেন; এরূপ সারল্য কাত্যায়নের বৃত্তিতে নাই। কাত্যায়নের বৃত্তি দেখিয়াই বামন বৃত্তি লিখিয়াছেন। এজন্য কাশিকা বৃত্তি প্রাঞ্জল হইয়াছে। কাশিকা-বৃত্তির দুই খানি টীকা আছে। হরদত্ত-মিশ্র কৃত পদমঞ্জরী ও জিনেন্দ্রকৃত কাশিকাবৃত্তি পঞ্জিকা।

উণাদি বৃত্তি—পাণিনির অংশ-বিশেষ, পরন্তু পাণিনির পূর্ব্বেও এতদ্বিষয়ের গ্রন্থ ছিল, কিন্তু তাহা কিরূপ ছিল বলা যায় না। ফল পাণিনি-কৃত কৃৎসূত্র এবং উণাদি-সূত্র এই বৃত্তির অবলম্বন। সর্ব্বসমেত ৩২৫টী প্রত্যয় আছে, তাহা "উণাদয়ো বহুলং" (পাণিনি) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা প্রকাশ আছে।

ব্যাকরণের উণাদি অংশের বৃত্তির মধ্যে উজ্জ্বল দত্তের বৃত্তিই প্রচলিত এবং মান্য। ইহার পরে দৌর্গসিংহীয় বৃত্তি। ব্যাকরণ মাত্রেরই উণাদি সূত্র আছে। সকল ব্যাক-

রূপে উহা সংক্ষেপ রূপে আছে। কেবল কলাপ ব্যাকরণের উণাদি কিছু বিস্তৃত এবং শৃঙ্খলা সম্পন্ন। তদ্ভিন্ন উণাদি কোষ নামক এক খানি কোষ অর্থাৎ আভিধানিক গ্রন্থ আছে, তাহাও মন্দ নহে।

বৃত্তিকার উজ্জ্বল দত্ত মুখবন্ধ শ্লোকে লিখিয়াছেন "আমি গণপতি, ঈশ্বর, গুরুর পাদপদ্মে নমস্কার করিয়া উত্তম বৃত্তি নির্ম্মাণ করিলাম। বৃত্তি ন্যাস, অনুন্যাস রক্ষিত, ভাগবৃত্তি ভাষা ধাতু প্রদীপ, তাহার টীকা, শরণ উপাধ্যায়ের সর্ব্বস্ব স্বরূপ সুভূতি, কলিঙ্গ, হডুচন্দ্র, ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থ অবলম্বন এবং আলোচনা করিয়া ইহা করিলাম। উণাদি বৃত্তি অনেক আছে, সে সকল এখন সূত্র শব্দ রূপ, ধাতুগত বৈলক্ষণ্য হইয়া পড়িয়াছে. তন্নিমিত্ত তন্মাত্রের উপর নির্ভর না করিয়া সে সকল এবং অন্যান্য গ্রন্থ বিচার করিয়া সে সকল হইতে সার আকর্ষণ করিয়া আমি এই বৃত্তি রচনা করিলাম।

উজ্জ্বল দত্তের অপর নাম জাজলি। ইনি সুভূতিকারের শিষ্য। উজ্জ্বল দত্ত কোন্ সময়ের লোক, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। কিন্তু ইনি অমরের পরবর্ত্তী, কেন না তাঁহার বৃত্তিতে অমরকোষের অনেক উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই বৃত্তিকার মুখবন্ধ শ্লোকে এইরূপ খেদ করিয়াছেন "যে ব্যক্তি আমার কৃত এই বৃত্তি দেখিয়া আপনার পৌরুষ কামনায় আমার নাম লোপ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহার সমস্ত পুণ্য ধ্বংস হইবে।" (৭ শ্লোক)।

উণাদি সূত্র ৫ পাদে বিভক্ত।

ইহা ভিন্ন, পাণিনি ব্যাকরণ অবলম্বন করিয়া বহুতর গ্রন্থ জন্মিয়াছে, তাহার কতকগুলির তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

পুরুষোত্তম দেবকৃত ভাষা বৃত্তি। সৃষ্টিধর ইহার টীকাকার। টীকার নাম ভাষা-বৃত্তার্থ বিবৃতি।

ভট্টোজি দীক্ষিত কৃত শব্দকৌস্তুভ। গ্রন্থকার এখানি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। বালাম ভট্ট ইহার টীকাকার। টীকার নাম প্রভা।

রামচন্দ্র আচার্য্যকৃত প্রক্রিয়া কৌমুদী। ইহাতে পাণিনি-সূত্র সকল ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থখানি পাণিনি ব্যাকরণ হইতে বিভিন্ন প্রণালীতে রচিত। ইহার বিঠঠল আচার্য্য-কৃত প্রসাদ এবং জয়ন্ত চন্দ্র কৃত তত্ত্বচন্দ্র নামক দুইখানি টীকা আছে।

ভট্টোজি দীক্ষিত কৃত সিদ্ধান্তকৌমুদী। ইহার মনোরমা* তত্ত্ববোধিনী, শব্দেন্দু শেখর, লঘু শব্দেন্দুশেখর † প্রভৃতি টীকা আছে।

লঘুকৌমুদী ও মধ্যকৌমুদী—বরদারাজ-কৃত।

---

* হরিদীক্ষিত মনোরমার টীকাকার, পুনরায় ইহার উপর ভাব-প্রকাশিকা নামক এক টীকা আছে।

† ইহার উপর এক টীকা আছে, তাহার নাম চিদস্থিমালা।

পরিভাষাসংগ্রহ ও পরিভাষাবৃত্তি।

পরিভাষেন্দুশেখর—নাগেশ ভট্ট কৃত। বৈদ্যনাথ পাগুণ্ড ইঁহার টীকাকার।

ভর্ত্তৃহরি-কারিকা বা বাক্যপদীয় *। ইহা আদ্যোপান্ত শ্লোকে রচিত। ইত্যাদি অনেক গ্রন্থ আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহাদের নামোল্লেখ করিলাম না।

কাতন্ত্র বা কলাপ ব্যাকরণ, অতি বিশদ এবং পাণিনি হইতে বিভিন্ন প্রণালীতে রচিত। ইহার প্রত্যয়, সংজ্ঞা, প্রভৃতি পাণিনির অনুরূপ। ইহাতে পাণিনি, পতঞ্জলি, ব্যাড়ি, ভাগুরি, প্রভৃতি ব্যাকরণের সারাংশ সঙ্কলিত হইয়াছে। পাণিনির ২। ৩ সূত্র একত্র করিয়া ইহার এক একটি সূত্র হইয়াছে ইহার উদাহরণ যথা

পাণিনি—

"কৃ বা পাজি মিস্বদি সাধ্য শুভ্যউণ্"

"ছন্দসীণঃ" দৃ সনি জনি চরি চটিভ্যোঞ্ণ্"

এই সূত্র একত্র করিয়া কাতন্ত্রের এক সূত্র, যথা

কাতন্ত্র—

"কৃক আজি মিস্বদি সাধ্য শূ দৃসনিজনিচরি চটিভ্য উণ্"

ইহার অনেক স্থলে পাণিনির অবিকল সূত্র আছে, এবং কোন কোন স্থলে কিছু কিছু প্রক্ষেপ নিক্ষেপ আছে। ইহাতে একটী পরিভাষা অংশ এবং একটী পরিশিষ্ট থাকাতে বড় সুগম হইয়াছে।

প্রয়োগ-রত্নমালা—ইহাতে পাণিনি এবং কলাপসূত্র একত্রে আছে। সূত্রগুলি পদ্য। এই সকল সূত্র পদ্যে রচনা করিতে গ্রন্থকার পুরুষোত্তম বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছেন। পুরুষোত্তম ভূমিকায় লিখিয়াছেন "শ্রীমল্লদেবস্য গুণৈকসিন্ধো মহীমহেন্দ্রস্য যথা নিদেশং। যত্নাত্ প্রয়োগোত্তম-রত্নমালা, বিতন্যতে শ্রীপুরুষোত্তমেন"।

এতদ্দ্বারা তিনি শ্রীমল্লদেব রাজার সময়ে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীমল্লদেব কুচবিহারের রাজা ছিলেন।

পাণিনি অষ্টাধ্যায়ী-সূত্র পাঠ ভিন্ন ধাতুপাঠ, লিঙ্গানুশাসন ও শিক্ষা-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ছিলেন। শ্রীধরদাস সঙ্কলিত সদুক্তি কর্ণামৃত গ্রন্থে পাণিনির প্রণীত বলিয়া কয়েকটী কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু তাহা বলবৎ প্রমাণাভাবে তদীয়লেখনী-প্রসূত বলিতে পারিলাম না।

এই প্রস্তাবে পাণিনির শিক্ষা-গ্রন্থ সম্বন্ধে কিছু বলা হইল না। তাহা স্বতন্ত্র প্রস্তাবে আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীরামদাস সেন।

* কোলব্রুক বাক্যপদীয় ভ্রমে বাক্যপ্রদীপ ভর্ত্তৃহরি প্রণীত লিখিয়াছেন। বাক্য-প্রদীপ হরি-বৃষভ কৃত, তাহার টীকাকার পুণ্যরাজ।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

কর্ণার্জ্জুন কাব্য। প্রথম খণ্ড। শ্রীবলদেব পালিত কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। ষ্ট্যানহোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১ টাকা মাত্র। কবি-কুল-তিলক মহর্ষি

দ্বৈপায়ন পাণ্ডবদিগের পক্ষপাতী হইয়া মহাভারতে পাণ্ডবপ্রতিদ্বন্দ্বী মহামতি কর্ণের চিত্র যথাযথ বর্ণে রঞ্জিত করেন নাই। কর্ণ প্রাচীন ভারতের একটী উজ্জ্বল মণি। বীরত্ব, দাতৃত্ব, ঔদার্য্য প্রভৃতি গুণে তিনি শুদ্ধ ভারতের কেন জগতের আদর্শ ছিলেন। তাদৃশ নরশ্রেষ্ঠের চরিত্র এরূপ বর্ণে চিত্রিত করা মহর্ষি দ্বৈপায়নের পক্ষে নিতান্ত অনুচিত কার্য্য হইয়াছে। কবিবর বলদেব পালিত মহর্ষি দ্বৈপায়ন কৃত এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কর্ণার্জ্জুন কাব্যে কর্ণের একটী সুন্দর ছবি চিত্রিত করিয়াছেন।

এই কাব্য খানি বীররস প্রধান। ইহা বিবিধ ছন্দে গ্রথিত। বলদেব বাবু লিখিয়াছেন যে এই কাব্য খানি 'সর্ব্বত্র একটী ছন্দে রচিত হয় নাই বলিয়া কেহ কেহ আপত্তি করিয়াছেন'। আমরা ইহা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। বাস্তবিক এই কাব্য খানির যদি বিশেষ কোন সৌন্দর্য্য থাকে, তাহা ইহার বিবিধছন্দোগঠিতত্ব। আমরা কালিদাস, ভারবি, মাঘ প্রভৃতি লব্ধ-প্রতিষ্ঠ কবিদিগের মহাকাব্য সকল আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে সে সকল মহা কাব্যের একটী বিশেষ ও প্রধান গুণ, তাহাদিগের বিবিধ-ছন্দ-ছটা। বিশেষতঃ কালিদাসের একটী অসাধারণ ক্ষমতা এই যে তিনি হৃদয়ের ভাব-স্রোতের গতি অনুসারে ছন্দঃ প্রয়োগ করিতে পারিতেন। বর্ণনীয় নায়ক নায়িকার হৃদয় যখন যে ভাবে উচ্ছ্বলিত হইত, তখন তিনি তদনুরূপ ছন্দঃ প্রয়োগ করিতে পারিতেন। তাঁহার রঘুবংশ ও কুমারসম্ভবের অনেক স্থল এবিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিবে। তাঁহার ছন্দঃ প্রণালীর এরূপ অদ্ভুত মহিমা যে কবিতা পাঠ করিবা মাত্র অর্থ বোধ হইতে না হইতেই, বর্ণনীয় ব্যক্তির হৃদয় শোকে অভিভূত কি সুখে উচ্ছ্বসিত, তাহা কিয়ৎপরিমাণে অনুধাবন করা যায়। ছন্দের এই অদ্ভুত শক্তি বাঙ্গালা কবিতায় পরিব্যক্ত হয় ইহা বোধ হয় বাঙ্গালা ভাষাহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিবেন। নানাবিধ ছন্দে কবিতা রচনা করার পদবীতে যে বলদেব বাবু সর্ব্ব প্রথম পদার্পণ করিতেছেন এরূপ নহে। কৃত্তিবাস, কাশীরাম, কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র, মদনমোহন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রাচীন বাঙ্গালা কবিগণ এই পথে অনেক দিন পূর্ব্বে বিচরণ করিয়াছেন। কেবল অল্পদিন মাত্র ইংরাজী কাব্য-সাধারণের অনুকরণে কতিপয় নব্য কবি এক-ঘেয়ে ছন্দের অবতারণা করিয়াছেন। তাহা সাধারণরুচির অনুমোদিত কি না বলিতে পারি না; কিন্তু আমাদিগের নিতান্ত অরুচিকর।

আমাদিগের বিশ্বাস যে সংস্কৃত কাব্যে যে সমস্ত সুললিত ও ওজস্বি ছন্দঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, বাঙ্গালা পদ্যে সেই সমস্ত ছন্দঃ প্রযুক্ত হইলে বাঙ্গালা কাব্যের শুদ্ধ যে ভূয়সী মাধুর্য্য বৃদ্ধি হইবে

এরূপ নহে; নির্জ্জীব বাঙ্গালা কবিতার ওজস্বিতা দশগুণ পরিবর্দ্ধিত হইবে। এদেশে স্বরবর্ণের লঘুত্ব বা গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কবিতা পাঠ করার পদ্ধতি প্রচলিত না থাকায়, আপাততঃ সে সকল ছন্দঃ সাধারণের প্রীতিকর না হইতে পারে। কিন্তু আমাদিগের বিশ্বাস যে সংস্কৃত ছন্দঃ বাঙ্গালা কাব্যে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইলে, স্বরবর্ণের লঘুত্ব বা গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কবিতা পাঠ করার পদ্ধতি আপনিই প্রবর্ত্তিত হইবে। কবিবর মধুসূদন দত্ত যখন বাঙ্গালা অমিত্রাক্ষর পদ্য প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন, তখন বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রাক্ষর পয়ারে গ্রথিত কবিতা কিরূপে পড়িতে হয় তাহা অনেকেই জানিতেন না। এই জন্য অনেকেই মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর-গ্রথিত-কবিতা মালাকে কবিতা বলিয়াই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহারা মধুসূদনের প্রতি এই জন্য রহস্য বিদ্রূপ করিতেও ক্রটী করেন নাই। কিন্তু মধুসূদন নির্ভীক চিত্তে সেই প্রণালীতে ক্রমাগত কবিতা লেখায় ক্রমে তৎপ্রবর্ত্তিত পদ্য বাঙ্গালা ভাষায় আদর্শ স্বরূপ হইয়া উঠিল। সেইরূপ বলদেব বাবু যদি এই নূতন পথে নির্ভীক চিত্তে বিচরণ করেন, তাহা হইলে অচিরকাল মধ্যেই সংস্কৃত ছন্দঃসমূহ বাঙ্গালায় আদর্শ হইয়া উঠিবে। আমরা আমাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কেও অনুরোধ করি তিনি যেন এই কার্য্যে বলদেব বাবুর সহযোগিতায় অবতীর্ণ হন। সংস্কৃত দুরূহ ছন্দে বাঙ্গালা কবিতা রচনায় তাঁহারও বিশেষ পারদর্শিতা আছে। ইহাঁরা দুইজনে এই ব্রতে সমব্রত হইলে এবিষয়ে সাধারণের রুচি নিশ্চয়ই পরিবর্ত্তিত হইবে।

বলদেব বাবু কর্ণার্জ্জুনকাব্যের প্রতিসর্গের শেষের দুইটী করিয়া কবিতা মালিনী বসন্ততিলক প্রভৃতি দুরূহ সংস্কৃত ছন্দে গ্রথিত করিয়াছেন। ইহা বলা বাহুল্যমাত্র যে তাঁহার এই উদ্যম সফল হইয়াছে। আমরা সহৃদয় পাঠকগণের প্রীত্যর্থ নিম্নে দুই তিনটী নমুনা উদ্ধৃত করিলাম।

মালিনীচ্ছন্দঃ।

দিনকর সমতেজাঃ, সত্যবান্ সত্যবাদী,
বলি-সমধিক দাতা ধীর বীরেন্দ্র কর্ণে
মনন করি' মহীক্ষিৎ সৈন্যভার প্রদানে,
ঘন ঘন 'জয়' শব্দে পূরিলা যুদ্ধ-শঙ্খ।

দ্বিতীয় সর্গ।

বসন্ততিলকচ্ছন্দঃ।

সংক্ষুব্ধ কৌরবসভা হইতে সদর্পে,
নিঃশঙ্ক সিংহসম বাহিরিলে ব্রজেন্দ্র,
দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীর সভাবসানে
কোলাহলে উঠিল উদ্ধত ক্রুদ্ধ চিত্তে।

তৃতীয় সর্গ।

উপজাতিচ্ছন্দঃ

দৈবানুকূলে বলহীন শক্ত;
বলী অশক্ত প্রতিকূল দৈবে।
দৈবে হবে নির্জ্জিত সূত-পুত্র;
তোমার ভাগ্যে ঘটিবে জয়শ্রী।

ষষ্ঠ সর্গ।

ANGLO INDIAN PRIZE POEMS. বা যুবরাজের ভারতে আগমন-বিষয়ক পারিতোষিক-প্রাপ্ত কবিতামালা। এই সৌবর্ণললাটধারী রঞ্জিতপার্শ্ব সুন্দর পুস্তকখানি সমালোচনার নিমিত্ত ইংলণ্ড হইতে আমাদিগের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। আমরা এই পুস্তকখানির মুদ্রাঙ্কন-পারিপাট্য দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছি। সংস্কৃত, বাঙ্গালা, উর্দ্দু, তেলুগু, ইংরাজী—এই কয় ভাষারই কবিতা ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রত্যেক ভাষার অক্ষরগুলি যেন এক একটী মুক্তা সাজান রহিয়াছে। বৈদেশিক ভাষার অক্ষরগুলিও ইংলণ্ডে এত সুন্দররূপে প্রস্তুত হয় তাহা ইংলণ্ডের পক্ষে সামান্য শ্লাঘার বিষয় নহে।

যুবরাজের ভারতে আগমন-সময়ে লণ্ডনস্থ ক্রাউন্ পার্ফিউমারি কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী মহোদয় যুবরাজের ভারতে আগমনবিষয়ে ভারতীয় বা ইংলণ্ডীয় ভাষায় যাঁহারা উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিতে পারিবেন, তাঁহাদিগকে একশত গিনি-পরিমিত মুদ্রা পারিতোষিক দিতে প্রতিশ্রুত হন। এই সংবাদ ইংলণ্ডে ও ভারতের সর্ব্বত্র উদ্‌ঘোষিত হয়। ইহার ফল যুবরাজের ভারত-ভ্রমণবিষয়ে সার্দ্ধ শত কবিতার উৎপত্তি। এই সার্দ্ধ শত কবিতার তৃতীয়াংশ ভারতীয় কবিগণ কর্ত্তৃক—সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দি, মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী, তামিল, তেলুগু, উর্দ্দু ও ইংরাজী প্রভৃতি নানা ভাষায় রচিত। এই ভারতীয় কবিগণের মধ্যে ভারতবাসী পর্টুগীজ, দেশীয় খৃষ্টান ইউরেসীয়ান, পার্সী, হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি সকল জাতিই আছেন। ভারতীয় ইংরাজী পদ্যগুলির জন্য দুইটী পুরস্কার প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে এই দুইটীই দুইজন বাঙ্গালী প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁহাদিগের নাম শচীশচন্দ্র দত্ত এবং রাম শর্ম্মা। আমরা আরও আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে বাবু নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার বাঙ্গালা স্তোত্রের জন্য ৫০০ শত টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ইংলণ্ডে অনেকের মনে সন্দেহ জন্মিয়াছিল যে ভারতের সুশিক্ষিত যুবকেরা রাজদ্রোহী। আমাদিগের অনুমান হয় যুবরাজের অভিপ্রায় মতে ক্রাউন পার্ফিউমারী কোম্পানীর অধ্যক্ষ সেই সন্দেহ ভঞ্জন করিবার নিমিত্ত এই কৌশল খেলিয়াছিলেন। যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে এইক্ষণে আশা করি যাঁহাদিগের মনে সেরূপ সন্দেহ জন্মিয়াছিল, এই যুবরাজ-স্তোত্রগুলি পাঠ করিয়া সে সন্দেহ ভঞ্জন হইবে।

এই যুবরাজ স্তোত্র গুলির গুণাগুণ নির্ব্বাচন করা আমাদিগের ইচ্ছা নহে। কারণ যে সুযোগ্য পণ্ডিত-মণ্ডলীর উপর এই গুরুভার অর্পিত হইয়াছিল, তাঁহারাই তাহা সুসম্পন্ন করিয়াছেন। আমরা কেবল জানিতে চাই ভারতীয় কবিগণ রাজস্তোত্রে যেরূপ অসাধারণ কবিত্ব-শক্তি

প্রদর্শন করিয়াছেন, স্বদেশীয় বা স্বজাতীয় উদ্দীপনা উপলক্ষে তাদৃশ কবিত্ব শক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন কি না? আমরা অনুমান করি ধনিগণ বা রাজগণের স্তোত্র উপলক্ষে ভারতীয় কবিগণের যাদৃশী কবিত্বশক্তি বিকাশ পায়, অন্য কোন উপলক্ষে তাদৃশ হয় না। যদি আমাদিগের এই অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা ইচ্ছা করি, যেন সরস্বতীর বীণা কিছুকালের জন্য ভারতে নীরব হয়। আমরা আর "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" শুনিতে চাই না! যথেষ্ট হইয়াছে। বীণাপাণি! এখনও বীণা সম্বরণ করিয়া ভারতের লজ্জা নিবারণ কর।

ব্যবসায়ী—কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে শ্রীশ্রীনাথ দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ভবানীপুর সোমপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা। আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম যে বাঙ্গালার এই এক মাত্র কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক পত্রিকার জন্য আমাদিগকে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যাপেক্ষী হইতে হইল। ইহা শুদ্ধ সম্পাদকের লজ্জার কথা নহে, জাতিসাধারণের লজ্জার কথা। কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি ব্যতীত যে ভারতের উন্নতির আশা নাই একথা কাহাকে বুঝাইতে এক্ষণে আর অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না। কারণ পুনঃ পুনঃ সমালোচনায় ইহা এক্ষণে স্বতঃসিদ্ধ সত্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ভারতের ভাবী উন্নতির মূল সেই কৃষি শিল্প ও ও বাণিজ্য বিষয়ে সুচারুরূপে উপদেশ প্রদানে সক্ষম শ্রীনাথবাবু ভিন্ন বাঙ্গালায় আপাতত: আর কাহাকেও দেখিতে পাইনা। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইনি ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডে কয়েক বৎসর অবস্থিতি করিয়া কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে উৎকৃষ্ট শিক্ষা ও বহুদর্শন লাভ করিয়া আসিয়াছেন। তিনি এক্ষণে সেই শিক্ষা ও বহুদর্শন স্বদেশের উপকারে পরিণত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা অন্তরের সহিত প্রার্থনা করিতেছি যেন তিনি স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই নিকট অনুকূল করাবলম্ব প্রাপ্ত হয়েন।

আমরা অতি বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি, বাতির উপকরণ, রবার, কৃষির উন্নতি-উপায়, কার্পাস প্রভৃতি ইহার কয়েকটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম। আমরা ইচ্ছা করি যেন শ্রীনাথবাবুর উপদেশগুলি অচিরাৎ কার্য্যে পরিব্যক্ত হয়। ভূম্যধিকারিগণ যেন অচিরাৎ শ্রীনাথ বাবু প্রদর্শিত প্রণালী অনুসারে তাঁহাদিগের ভূমি-সম্পত্তির উৎকর্ষ বিধান করিতে চেষ্টা করেন; এবং ব্যবসায়ীরা যেন অবিলম্বে এ দেশে সমস্ত জিনিস পত্র প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। শ্রীনাথ বাবু তাঁহাদিগের প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রদান করিবেন।

পরলোক ও সমাজ।

মৃত্যুর পর আত্মার জীবিত-কালকে পরকাল কহে। পৃথিবীর অতি প্রাচীন কাল হইতে লোকের এই পরকালে বিশ্বাস পরিদৃষ্ট হয়। এই বিশ্বাসের আদি ও উৎপত্তি কি তাহা নির্ণয় করা নিতান্ত অসাধ্য ব্যাপার। আত্মার পরকাল আছে এই মাত্র বিশ্বাস, কি প্রাচীন, কি আধুনিক সকল জাতিতেই পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু সেই পরকাল কিরূপ, আত্মার পরকালে কিপ্রকার অবস্থা হইবে তদ্বিষয়ে মতামতের ও বিশ্বাসের বিষম বৈষম্য দৃষ্ট হয়। তদ্বিষয়ে এক জাতির মতামত হয় তো অন্য জাতির মতামত হইতে সম্পূর্ণ প্রভিন্ন অথবা বিপরীত। আত্মার পরকালের অবস্থাকে আমরা পরলোক বলিলাম। আমাদিগের পরকাল ও পরলোক দুইটী স্বতন্ত্র বিষয়। পরকাল বলিলে—মৃত্যুর পর আত্মা জীবিত থাকে—কেবল এই মাত্র জ্ঞান অথবা বিশ্বাস বুঝাইবে; পরলোক বলিলে সেই জীবিত কালের অবস্থা, ভাব, বিকার, প্রকার প্রভৃতির জ্ঞান অথবা বিশ্বাস বুঝিতে হইবে। এই পরলোকের ভাব বিভিন্ন জাতিতে বিভিন্নপ্রকার হওয়াতে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে তাহা পরকালের জ্ঞান ও বিশ্বাস হইতে ক্রমশঃ স্ফুরিত হইয়াছে। ইতিহাস ইহাই সাক্ষ্য দেয়।

ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতি অতি প্রাচীন জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এই আর্য্য জাতির বৈদিক সাহিত্য বিলোড়ন করিয়া দেখ, তথায় পরলোকের ভাব অতি সামান্য ও সরল। অতি প্রাচীন বেদে এই ভাব নিতান্ত অস্ফুট। ক্রমশঃ বৈদিক সাহিত্য যেমন বিস্তৃত হইয়াছে এই ভাবও ক্রমশঃ ততই স্ফুরিত হইয়াছে। ঋগ্বেদ হইতে শ্রীমদ্ভাগবত পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া দেখ, পৌরাণিক সাহিত্যে এই পরলোকের ভাব যেমন সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল, যেমন পরিষ্কার ও বিস্তৃত, তেমন স্মৃতি শাস্ত্রে অথবা বৈদিক সাহিত্যে নহে। পুরাণে তুমি পরলোকের বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া জ্ঞাত হইতে পারিবে। কয়টী স্বর্গ, কয়টী নরক, কোন্ স্বর্গ ও নরক কিরূপ, কোন্ কর্ম্ম করিলে কিরূপ ফল হয়, কোন্ কর্ম্মে আত্মা পরকালে কোন্ যোনি প্রাপ্ত হয়, এই সমস্ত বিষয়াদির সম্পূর্ণ বিবরণ পুরাণাদিতে প্রকটিত আছে।

হিব্রু জাতিও একটি প্রাচীন জাতি। হিব্রুজাতির ধর্ম্মপুস্তক খুলিয়া দেখ তাহাও উক্ত মত সমর্থন করিতেছে। মোসেসের গ্রন্থখণ্ড অবধি ম্যাকাবিন গ্রন্থ পর্য্যন্তে ঈষৎ পরকালের জ্ঞান হইতে পরলোকের জ্ঞান ক্রমশঃ বিস্ফুরিত হইয়াছে। নিউ-টেষ্টমেণ্টে পরলোকের ভাব সম্পূর্ণ চিত্রিত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থখণ্ডে আমরা

পরকালের জ্ঞান ও বিশ্বাস দেখিতে পাই, কিন্তু পরলোকের ভাব অত্যন্ত অস্ফুট। তখন এই বিশ্বাস মনুষ্য-কার্য্যের প্রয়োজন কারণ (motive) রূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। মোসেসের বিধানাবলিতে ইহার উল্লেখ নাই; ইহুদী জাতির পুস্তকে ইহার চিহ্ন নাই। কেহ কেহ শরীরের শোণিতে, কেহ বা প্রাণবায়ুতে কেহ বা হৃদয় ও অন্ত্রাদিতে আত্মার অবস্থানের স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন *। প্রথমে আত্মার অমরত্বের জ্ঞান ও স্বর্গ নরকের জ্ঞান অতি অপরিষ্ফুট ছিল। নির্ব্বাসন হইতে স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে হিব্রুজাতির এই জ্ঞান বিস্তৃত হইল। তখন শরীরের পুনরুত্থান + মতের প্রথম প্রচার আরম্ভ হয়। মলমন এবং ম্যাকাবিসের চতুর্থ পুস্তকে এই মত পরিষ্কৃত রূপে প্রচারিত হইয়াছে। এই মত এবং পরলোকে যে আত্মা ইহলোকের পাপ পুণ্যের ফলাফল অবশ্য ভোগ করিবে এই বিশ্বাস জিসস পূর্ব্ব স্থাপিত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন।

পূর্ব্বতন গ্রীশ ও রোমে গিয়া দেখ হোমর হইতে সিসেরো পর্য্যন্ত পরলোকের ভাবে কত পরিবর্ত্তন। হোমরের পরলোকের ভাব নিরানন্দময় পরকাল মাত্র। এখিলিস বলিয়াছিলেন চিরদিন পরলোকবাসী হওয়া অপেক্ষা এক দিনের জন্যও ইহলোকে নৃপতি হওয়া সুখকর জ্ঞান করি। হিসিয়ডে পরলোকের ভাব উন্নত হইয়াছে। তিনি পুণ্যবান্‌দিগের জন্য স্বর্গ প্রস্তুত করিয়াছেন। পিণ্ডার সেই স্বর্গধামের বিবরণ দিয়াছেন; তিনি নরকেরও বিবরণ দিয়াছেন। তদনন্তর দার্শনিকগণ * আত্মার অমরত্ব মতের প্রচার ও শিক্ষা দিয়াছেন।

আধুনিক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা এই পারলৌকিক ভাবের কত প্রকার শাখা বিশাখা বিরচন করিয়াছেন। নিজে জিসস যে সকল মত জানিতেন না ইহাঁরা তাহার সৃষ্টি করিয়াছেন। ক্যাথলিকেরা অনন্ত নরকের ভাব কিছুই জানিতেন না; তাঁহাদিগের নরকের উদ্ধার আছে; কিন্তু ক্যালভিনের শিষ্যগণ অনন্ত নরকে জ্বলিয়া মরিতেছেন।

এক্ষণে প্রতিপন্ন হইতেছে পরকালের সংস্কার ক্রমশ: পারলৌকিক ভাব সমূহে পরিভূষিত হয়। কারণ ইহা মানবের কল্পনার কার্য্য। যে জাতির কল্পনা যে উপকরণ পায় সেই জাতি পরকালকে তদ্রূপ ভূষণে ভূষিত করে। যে জাতির সুখের ও দুঃখের প্রবৃত্তি যেরূপ, সেই জাতি সেই প্রকার সুখ ও দুঃখে

* See Theodre Parker's Discourse of matter pertaining to Religion. Book 1. chap. VI sec 11.

+ Resurrection of the body—a notion perhaps of Zoroastrian origin.

* Pherecydes, Plotinus, Thales, Pythogoras, Socrates, Plato, Aristotle, Cicero, Plutarch, Epictatus.

পরলোক পরিপূর্ণ করে। ইহলোকের সুখ দুঃখের কাল্পনিক ভাব সমূহ পরকালে আরোপ করিলেই পরলোক সৃষ্ট হয়। মানবের জ্ঞান যত বৃদ্ধ, সংস্কৃত ও পরিশুদ্ধ হইয়া আইসে তাহার পরলোকের ভাবও ততই উন্নত হইতে থাকে।

যেরূপে পরকালের সংস্কার ও পরলোকের ভাব উৎপন্ন হউক না কেন তদ্বিষয় আলোচনা করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। মনুষ্য-সমাজে পরলোকের কিরূপ প্রভাব তাহাই প্রদর্শন করা আমাদিগের উদ্দেশ্য। সমাজ মধ্যে যখন পরকালের সংস্কার মাত্র প্রচারিত থাকে, সেই সংস্কার দ্বারা মানবের জীবন কিছুই নিয়মিত ও চালিত হয় না। কিন্তু মনুষ্য যখন ক্রমশঃ বিশ্বাস করিতে থাকেন, যে ইহলোকের কার্য্যের ফলাফল পরলোকে গিয়া ভোগ করিতে হইবে, এবং যখন সেই ফলাফলের বিশেষ বিশেষ চিত্র তাঁহার মনোমধ্যে বিশ্বাসের সহিত অঙ্কিত হয়, তখন হইতে তাঁহার জীবন সেই ভাবাদির দ্বারা নিয়মিত ও চালিত হইবার সম্ভাবনা। পৃথিবীর জনসমাজের ইতিবৃত্ত তাহাই প্রতিপাদিত করে।

এই পারলৌকিক প্রভাবে মনুষ্য-সমাজের অধিক ইষ্ট কি অনিষ্টসাধন হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। মনুষ্য-সমাজ যখন বাল্যদোলায় অধিষ্ঠিত ছিল, যখন মনুষ্য আত্ম-অর্থ অধিক বুঝিত, তখন এই পারলৌকিক ভাবে মনুষ্যসমাজ অধিক বিচালিত হইত। যখন মনুষ্য-সমাজে ইহলোকের সুখ অত্যল্পই ছিল, তখন মানবের পারলৌকিক সুখভোগের ইচ্ছা বলবতী ছিল। দুঃখময় জীবন পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিলে লোকে অধিকতর সুখী হইবে বলিয়া জ্ঞান করিত। যে পরিমাণে মানবসমাজে ইহলোকের দুঃখ, সেই পরিমাণে পারলৌকিক ভাব প্রবল হয়। দুঃখের যেমন হ্রাস হইতে থাকে, মানব ততই ইহজীবনকে আদরণীয় জ্ঞান করিতে থাকেন, ততই তাঁহার মনে পারলৌকিক প্রভাব বিনষ্ট হয়। পূর্ব্বকার বর্ব্বরসমাজে সুখাংশের পরিমাণ অল্প ছিল, সুতরাং তখন লোকের মনে পারলৌকিক ভাব অধিক প্রবল ছিল। ইহজীবনে যিনি যত সুখী, মৃত্যুমুখে যাইতে তিনি ততই সঙ্কুচিত হন। নিশ্চিত সুখভোগ ত্যাগ করিয়া কে অনিশ্চিত সুখের জন্য অগ্রসর হইবে? বর্ত্তমান সুখ ত্যাগ করিয়া কে ভবিষ্যৎ সুখের জন্য লালায়িত হইবে? কিন্তু জীবন যত ক্লেশকর বোধ হয় মনুষ্য ততই মৃত্যুর ইচ্ছা করে। এন্টিগোনসের সৈন্যাবলীর মধ্যে এক জনের অদ্ভুত সাহস ছিল, কিন্তু তিনি সর্ব্বদা পীড়িত হইতেন এবং তাঁহার মুখ-কান্তি বিবর্ণ হইতেছিল। এতদ্দর্শনে এন্টিগোনস একদিন তাঁহাকে মুখ-বিবর্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। জিজ্ঞাসায় প্রকাশিত হইল, তাঁহার কোন গোপনীয় পীড়া ছিল। এন্টিগোনস তৎক্ষণাৎ চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। রোগী

ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিলেন। যখন তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেন, তখন তাঁহার জীবনে অধিকতর আদর বৃদ্ধি হইল। তাঁহার পূর্ব্বকার সাহস তিরোহিত হইল। তিনি আর আপদ্ বিপদে তত অগ্রসর হইতেন না। এনটিগোনস ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সৈন্যবর উত্তর দিলেন :—"আপনিই আমাকে এক্ষণে সাহসহীন করিয়া দিয়াছেন; যে রোগের হস্ত হইতে নির্ম্মুক্ত হইবার জন্য আমার জীবন মৃত্যু জ্ঞান ছিল না, আপনি সেই রোগ হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া আমার জীবন দান করিয়াছেন; আর আমি মরিতে চাহি না।" এই জন্যই স্পার্টানদিগকে দেখিয়া এক জন সাইবিরাইট * বলিয়াছিলেন "স্পার্টীয়েরা যে এত মৃত্যুমুখী ও সাহসী হইবে তাহা আশ্চর্য্য নহে। স্পার্টীয়েরা এত কষ্ট ভোগ করেন, এত ক্লেশে ও দুঃখে তাঁহাদিগকে জীবনাতিপাত করিতে হয় যে তাঁহারা সে জীবন হইতে মুক্ত হইবার জন্য যে অনায়াসে প্রাণ বিসর্জ্জনে উদ্যত হইবেন তাহা বিচিত্র নহে।" •

২। এই পারলৌকিক ভাবে পৃথিবীতে অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ, অনেক শোণিতপাত উৎপাদন করিয়াছে। যুদ্ধ-নিহত বীরগণকে সকল ধর্ম্মেই পুণ্যবান্ জ্ঞান করিয়াছে। রণোন্মত্ত ক্ষত্রিয় কি জন্য রুধিরময় রণক্ষেত্রে ধাবিত হইতেন? কি জন্য তিনি শত শত নরবলি দিয়া আপনি অকাতরে ও আনন্দ মনে শরশয্যায় প্রাণত্যাগ করিতেন? এরূপ ক্ষত্রিয়ের জন্য কি স্বর্গধামে উচ্চ স্থান সঞ্চিত থাকিত না? তাঁহারা সেই গৌরব লালাসায়, সেই পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য শত শত অরাতিকুল নির্ম্মূল করণে কি উদ্যত হইতেন না? সর্ব্বদা যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যাপৃত থাকিয়া ক্ষত্রিয় কুলের প্রকৃতি অবশেষে কিরূপ রণলোলুপ হইয়া পড়িয়াছিল, একজন সুলেখক † তাহা এই প্রকার উদ্দীপক বাক্যে বর্ণন করিয়াছেন। "যাহাদিগের যুদ্ধই বিনোদন, সমরে সাহস প্রকাশই আনন্দ হেতু, শত্রু দমনই গৌরবের নিদান, বিপদে ধৈর্য্য প্রদর্শনই কীর্ত্তি এবং অদ্ভুত পরাক্রম প্রকাশই এক মাত্র অভিলাষ, সেই মহোদ্যোগশালী দুর্জ্জয়-হৃদয় ক্ষত্রিয়দিগের কি সন্ধির সময় সুখে অতিবাহনীয় হয়! তাঁহাদিগের মন বিগ্রহের নিমিত্ত প্রদীপ্ত থাকে ও বিপদাগমের নিমিত্ত উৎসুক থাকে এবং পাণি শস্ত্র-গ্রহণের নিমিত্ত কণ্ডূতিযুক্ত থাকে। কার্য্যহীন তরবারি তাঁহাদিগকে কাপুরুষ বলিয়া

* পূর্ব্বকালে টারেণ্টমের উপকূলে যে গ্রীসীয় উপনিবেশ স্থাপিত হয়, তাহাদিগকে সাইবিরাইট্ বলিত। তাহাদিগের প্রধান নগর সাইবেরিস্। সাইবিরাইট জাতি, বিপুল ধন, ঐশ্বর্য্য এবং সুখের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন।

• See Plutarch's Life of Pelopidas.

† শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য। বিচিত্র বীর্য্য দেখ।

ভর্ৎসনা করে। বর্ম্মহীন দেহ সন্নদ্ধ হইবার নিমিত্ত মহোদ্বিগ্ন থাকে, ধাবনহীন রণতুরঙ্গ আন্তরিক তেজে জ্বলিত হইতে থাকে। যেরূপ সাগরের অগাধ পয়োরাশি নিরন্তর প্রচণ্ড বাত্যাঘাতে সংক্ষোভিত না হইলে দুর্গন্ধ ও দূষিত হইয়া যায়, সেরূপ ক্ষত্রিয়দিগের আলস্য-দ্বেষী দেহ সমরের মহাব্যাপারে ব্যাপৃত না থাকিলে শুষ্ক ও নীরস হইয়া যায়। লোক-সমাজে এরূপ বীরশ্রেণীর যে নিতান্ত আবশ্যক তাহা আমরা বিলক্ষণ জানি। ভারতবর্ষ যদি এইরূপ-বীর্য্যশীল-ক্ষত্রিয় হীন না হইত তাহা হইলে তাহা কখন যবন করে কবলিত হইত না, এবং ভারতবাসিগণও যবনের দাস হইয়া থাকিত না। কিন্তু পারত্রিক প্রবোধনায় উদ্বোধিত না হইলে কি অন্য কোন কারণেও উত্তেজনায় জাতিমধ্যে বীরকুলের উৎপত্তি হয় না? লাইকার্গসের নিয়মাবলী ও স্পার্টীয় জাতি এবং সোলনের নিয়মাবলী ও এথিনীয় জাতি কি সাক্ষ্য দেয়?

সেই গ্রীকগণের পারত্রিক আশা এবং প্রবোধনা তাদৃশ প্রবল ছিল না। সুপ্রবল স্বদেশানুরাগ স্পার্টীয়গণের জাতীয় ধর্ম্ম, এবং জাতীয় উন্নতি ও সামাজিক শ্রীবৃদ্ধি সাধনই এথিনীয়গণের সুপ্রধান ব্রত হইয়াছিল। তাঁহাদিগের পারত্রিক প্রবোধনা কিছুই ছিল না বলিলেও হয়। তাঁহাদিগের জাতীয় ও সামাজিক প্রবৃত্তিই প্রবল ছিল। যে বীরত্ব শুদ্ধ স্বদেশ ও স্বসম্পত্তি রক্ষণের জন্য আবশ্যক, তাহা মানবের স্বার্থপরতাই উৎপাদিত করে। কিন্তু যে বীরত্ব অকারণ পরদ্রোহী হইয়া উঠে, লোভই তাহার প্রণোদক, এবং পারত্রিক উদ্বোধনা তাহার সহায়তা করে। জাতি বিশেষে পারত্রিক প্রবোধনাই প্রধান কারণ হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা ইউরোপীয় গথ জাতি ও মুসলমানদিগের উল্লেখ করিলাম।

বীরগণের যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইতে কি কোন ধর্ম্মে বিধান আছে? যে খৃষ্টীয়ধর্ম্ম এক্ষণে পৃথিবীর সভ্যসমাজ মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে, সে ধর্ম্ম কি বীরগণকে, সৈন্যমণ্ডলীকে, এবং নরপালগণকে যুদ্ধকাণ্ড হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে? আয়র্লণ্ড এবং ফ্রান্সের ইতিবৃত্ত কি আরক্ত অক্ষরে লিখিত নহে? সেই শোণিত-পূর্ণ ইতিবৃত্ত অধ্যয়ন করিতে গিয়া একদা পাষণ্ডের মনও খৃষ্টান দিগের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠে। সমগ্র ইউরোপ মণ্ডলীতে, পৃথিবীতে যত রুধিরপাত হইয়াছে তুলনা করিয়া দেখিলে আর কোন স্থানে বোধ হয় ততোধিক হয় নাই। ক্রুসেডের যুদ্ধে কি সমগ্র ইউরোপ-মণ্ডলী একদা উন্মত্ত হইয়া পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য ধাবিত হয় নাই? পোপের ক্ষমতা ও লোভ নিবারণ জন্য খৃষ্টানমণ্ডলী মধ্যে কত সহস্র বার না ঘোর রণ-কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল! এই সমস্ত ধর্ম্মযুদ্ধে কত অসংখ্য খৃষ্টান পুণ্য-সঞ্চয়ের জন্য পোপের পক্ষাবলম্বন করিয়া নৃশংসরূপে নরহত্যায়, শত শত নর বলিদানে, বালবৃদ্ধ

বনিতা হত্যায়* দেশ বিদেশ রুধির-স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছেন। কি জন্য খৃষ্টানগণ এ সমস্ত ধর্ম্মযুদ্ধে উন্মত্ত হইয়া উঠেন? কি গূঢ় অভিপ্রায় তাঁহাদিগের মনকে উত্তেজিত করিয়াছিল? ইহার নিগূঢ় কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে আমরা কি দেখিতে পাই না, ইহারা পারলৌকিক ভাবে পূর্ণ হইয়া অগ্নি পক্লীত হৃদয়ে নির্দ্দয় হত্যাকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন?

খৃষ্টীয় শকের প্রারম্ভে ইউরোপের উত্তর প্রদেশ হইতে যে বর্ব্বর জাতির রণোন্মত্ত লোক প্রবাহ নদীবেগের ন্যায় দক্ষিণাভিমুখে বিসারিত হইয়া বিশাল রোমরাজ্য বিধ্বংশ করিয়াছিল, তাহারা কোন্ প্রবোধনায় উত্তেজিত হইয়া এরূপ বিসারী প্রাণি-সংহারে প্রবৃত্ত হয়? ওডিন ইহাদিগের প্রধান দেবতা ছিলেন। বৈরনির্য্যাতন ও নর-রুধিরেই ওডিনের আনন্দ। ইহাদিগের বীরগণ স্বর্গপ্রাপ্ত হইলে ভালহালার ভারজিন* নাম্নী একশ্রেণী সুরদেবী ইহাদিগের সেবার্থে নিযুক্ত থাকিত। যুদ্ধে অথবা স্বহস্তে যাঁহারা প্রাণত্যাগ করিতেন তাঁহারাই ওডিনের ভক্ত ও তাঁহারাই ওডিনের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইতেন। যাঁহারা রোগে, অথবা বয়োবৃদ্ধ হইয়া পঞ্চত্ব পাইতেন, স্বর্গে তাঁহাদিগের স্থান নাই, এবং তথাকার বিপুলানন্দ সম্ভোগে তাঁহারা অধিকারী নহেন। তাঁহাদিগের স্বর্গীয় সুখ কি ছিল? তাঁহাদিগের স্বর্গীয় সুখ অনিবার যুদ্ধ বিগ্রহ ও হত্যা ব্যাপার, এবং নরকপালে সুরাপান। এই সুখ চিরকাল সম্ভোগ করিবার জন্য বীরগণ বারম্বার জন্ম গ্রহণ করিতে পারিতেন। রেগনার লড্‌ব্রক* মৃত্যুশয্যায় যখন নিদারুণ যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইতেছিলেন, তখন তিনি তাঁহার অসংখ্য নরহত্যার গণনা করিয়া কথঞ্চিৎ সন্তোষলাভ ও যন্ত্রণার বিমোচন করিয়াছিলেন +। যে ড্রুইড ধর্ম্ম কেলট জাতির অবলম্বনীয় ছিল, সেই ড্রুইড ধর্ম্মেরও এইরূপ রুধিরময় ভাব। ড্রুইডেরা দেবতার নিকট নরবলি দিত। যে সাধুপুরুষ বলি হইতেন, তিনি দেবতার গ্রহণীয় হইয়া স্বর্গে অতুল সুখ সম্ভোগ করিতেন।

আর আমরা দৃষ্টান্ত বাড়াইতে চাহি না। মুসলমান ধর্ম্মের বিষয় সকলেই অবগত আছেন। যে কতিপয় দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে আমাদিগের কথার যাথার্থ্য প্রতিপাদিত করিতেছে। পারত্রিক

---

* See Irish Rebellion and Massacre of the Protestants in 1641 October 23, and Massacre of St Bartholomew in 1572 August 24.

* Virgins of the Valhalla.

* Regner Lodbrok, whose death song is a faithful picture of the Scandinavian character.

\+ Tytler's General history, section XLVII epitomized from Gibbon.

মঙ্গল লাভের জন্য এক এক জাতির প্রাকৃতজনগণ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া মনুষ্যকুল সংহার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অন্য কোন প্রবোধনায় এত দূর হইত না।

৩। পারলৌকিকভাবে পার্থিব ঔদাসীন্য ও বৈরাগ্য উৎপাদিত হইয়া পৃথিবীর অধিক ক্ষতি হইয়াছে। পৃথিবীর সুখে বিরাগী না হইয়া সন্ন্যাসিগণ যদি ঐহিক সুখ প্রবর্দ্ধনার্থ যত্নবান্ ও উদ্যোগী হইতেন, তাহা হইলে আজি পৃথিবীর অনেক দূর উন্নতি সাধন হইত। যে অবধি ইংলণ্ডের ধর্ম্মমঠসকল ভগ্ন হইয়াছে, সেই অবধি তাহার সহস্র উদাসীন ব্যক্তি পার্থিব কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া জাতীয় পরিশ্রমের * উন্নতি সাধন করিয়া ইংলণ্ডের শ্রীবৃদ্ধির সূত্রপাত করিয়াছে। যাহা ইংলণ্ডে ঘটিয়াছিল ইউরোপের সাধারণ ধর্ম্ম-সংস্কার † কাল হইতে সমগ্র ইউরোপ-মণ্ডলীতেও তাহাই ঘটিয়াছিল। এই সময় হইতে ইউরোপের ক্রমশঃই উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। তাহার জনসাধারণ আর ধর্ম্মমঠে প্রবেশ করে না। তাহারা যে স্বর্গীয় কাল্পনিক সুখের জন্য সমস্ত ঐহিক সুখ বিসর্জ্জন দিত, যে বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইবার জন্য পৃথিবীকে দুঃখ পূর্ণ করিয়াছিল, এখন সেই জনগণ পৃথিবীকেই স্বর্গধাম করিয়া তুলিতেছেন। আর তাঁহারা স্বর্গের জন্য ব্যস্ত নহেন; এখন মৃত্যু তাঁহাদিগের যন্ত্রণার কারণ এবং স্বর্গের সোপান নহে। এই বৈরাগ্য বিষয়ে আমার যাহা বক্তব্য, স্থলান্তরে * আমি তাহা ব্যক্ত করিয়াছি; এই স্থানে পড়িবার সুবিধার জন্য তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "মানবের কল্পনা ও আশা পরলোকের বৈকুণ্ঠধামকে সুবর্ণবর্ণে রঞ্জিত করিতেছে। তিনি ইহলোকের শোক সন্তাপ পরলোকে গিয়া দূরীকরণ করিবেন বলিয়া কতই সহিষ্ণুতার সহিত পৃথিবীর যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা অকাতরে বহন করিতেছেন। কেহ বা পরলোকের কাল্পনিক সুখে এত প্রমুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়াছেন যে ইহলোকের কোন সুখই তাঁহার নিকট সুখ বলিয়া বোধ হয় না। তিনি সমুদায় পার্থিব সুখকে অবহেলা করিয়া পরকালের কাল্পনিক সুখের প্রতি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। পূর্ব্বকালের যোগী ও ঋষিগণ এইজন্য সুখময় সংসার ত্যাগ করিয়া বনবাসী হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সুখ তাঁহাদিগের নিকট কিছুই নহে বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। পরলোকের আশা-রঞ্জিত সুখময় দেশ তাঁহাদিগের কল্পনার চক্ষে এত উজ্জ্বলবর্ণে দেদীপ্যমান হইয়াছিল যে তজ্জন্য তাঁহারা সংসারের সকল বাস্তবিক সুখকে হেয় জ্ঞান করিয়া বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তে কিছু মহত্ত্ব আছে বটে, কিন্তু সংসারের সুখ

* National Industry.

† Reformation.

* ১২৮৩ সালের জ্যৈষ্ঠমাসের আর্য্যদর্শনে "শরীর ও মন." নামক প্রস্তাবের শেষ ভাগ দেখ।

বৃদ্ধি করিলে যে মহত্ব হয় সে মহত্ব, কি সংসারের সুখত্যাগের মহত্ব অপেক্ষা গরীয়ান্ নহে? সহস্র জনকে সুখী করাতে যে মহত্ব সে মহত্ব কি আপনাকে সংসার সুখে বিরাগী দেখাইয়া স্বতঃই কষ্ট ও যন্ত্রণাকে আলিঙ্গন করার মহত্ব অপেক্ষা উচ্চতর নহে? কিন্তু যোগী ও ঋষিগণের বৈরাগ্যমহত্বের কি ফল ফলিয়াছে? সেই অলীক মহত্বের জন্য অনেকে লালায়িত হইয়া তাঁহাদিগেরই অনুসারী হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাহাতে সংসারের অনেক অনিষ্ট সাধন হইয়াছে। যে দিন হইতে এই সাংসারিক ঔদাসিন্য ভাব সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াছে, সেই দিন অবধি পৃথিবীর অবনতি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যে মানব পৃথিবীর অলঙ্কার স্বরূপ, যে মানব পৃথিবীকে সুখ সৌভাগ্যে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে পারেন, যে মানব পৃথিবীকেই বৈকুণ্ঠধাম ও ইন্দ্রালয় করিতে পারেন, সেই মানব সেই পৃথিবীর প্রতি উদাসীন! ভারতে এই ঔদাসীন্য ও বৈরাগ্যের উপদেশে ইহার কতই না সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। আমরা ধার্ম্মিক ও সাধুজনের সহিষ্ণুতার মহত্ত্ব ভাবিয়া তাঁহাকে সাধুবাদ দিতে প্রস্তুত আছি বটে, কিন্তু তাঁহার বৈরাগ্য ভাবকে আমরা কিছুমাত্র প্রশংসা করিতে প্রস্তুত নহি। তিনি যদি সংসারের সুখ বর্দ্ধনের নিমিত্ত সেই অসহ্য ক্লেশ বহন করিয়া সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেন, আমরা তাঁহার সহিষ্ণুতাকে শতমুখে আনন্দরবে সাধুবাদ দিতাম। তিনি যে বৈরাগ্য লইয়া বনবাসী হউন। তিনি সংসারে থাকিবার উপযুক্ত নহেন। তিনি যেমন সংসারধামকে হেয়জ্ঞান করিয়াছেন, সংসারও তাঁহাকে হেয়জ্ঞান করিয়া বনবাসে পাঠাইতে প্রস্তুত আছেন। তাঁহার দ্বারা সংসারের কিছুই মঙ্গল সাধিত হইবে না। বরং তাঁহার উপদেশে ও দৃষ্টান্তে অনেক অনিষ্ট হইবারই সম্ভাবনা।”

খৃষ্টানধর্ম্ম এই বৈরাগ্যের অনেক গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। জিসস ইহার উপদেশ দিয়াছিলেন; এবং পল বৈরাগ্যের প্রধান ভক্ত ছিলেন। চৈতন্যের বৈরাগ্য-ধর্ম্মে বঙ্গদেশে যে সমূহ অনিষ্টোৎপাদন হইয়াছে, পলের বৈরাগ্য উপদেশেও তদ্রূপ ইউরোপের অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। ইউরোপে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারিত হইলে পলের বৈরাগ্য-ধর্ম্মকে গ্রীশীয় দর্শন * আনিয়া বলীয়ান্ করিয়া তুলিল। সিনেকার উপদেশ চারিদিকে বৈরাগ্য-ধর্ম্ম প্রচারিত করিতে লাগিল। ইউরোপের অর্দ্ধভাগ বৈরাগ্যাবলম্বন করিল। চারিদিকে ধর্ম্মমঠ প্রতিষ্ঠাপিত হইল। মানবসমাজের অর্দ্ধভাগ সংসার পরিত্যাগ করিল। যে অর্দ্ধভাগ সংসারে অবশিষ্ট ছিল, তাহারা ও ধর্ম্মযুদ্ধে ব্যাপৃত। এক দিকে ঔদাসীন্য অন্যদিকে ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ। ইহাতে ইউরোপের যে অবনতি ঘটিয়াছিল তাহা ইতিবৃত্তে বর্ণিত আছে। এই সময় স্কুলমেন নামক পণ্ডিতগণ

* Stoicism.

উত্থিত হইয়া কুতর্কজালে পৃথিবীর অজ্ঞানান্ধকার আরও প্রবর্দ্ধমান করিয়া সংসারকে অধিকতর দুঃখের আলয় করিয়া তুলিলেন। তাঁহারা প্রচলিত ধর্ম্ম ও মতামত সংরক্ষণ জন্য এরিষ্টটেলের মহাস্ত্র সকল গ্রহণ করিলেন। বৈরাগ্যের শতগুণ বৃদ্ধি হইল, এবং সংসার আরও ক্রমশঃ উৎসন্ন যাইতে লাগিল। অন্যান্য কারণে ইউরোপ হইতে যদি এই বৈরাগ্য তিরোহিত না হইত, আজি ইউরোপের যে কতই দুর্দ্দশা ঘটিত কে বলিতে পারে? আজি ইউরোপীয় সভ্যসমাজ হয়তো উদাসীন ভারতীয় সমাজের দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইত।

৪। পারলৌকিক ভাবে ধর্ম্ম ও মানব সমাজ অধিকতর স্বার্থপর হইয়াছে। ইহা মানবের স্বার্থপরতা ও লোভ প্রবৃত্তিকে বিলক্ষণ পরিপুষ্ট ও চরিতার্থ করিতেছে। নিষ্কাম ধর্ম্ম পৃথিবী হইতে লোপ হইতেছে।* যে ব্যক্তি ও যে সমাজ যত ধর্ম্মপরায়ণ, সেই ব্যক্তি ও সেই সমাজ তত স্বার্থপর। সাধুজনে ধর্ম্মকার্য্যে ব্রতী নহেন। তিনি আপনার পরকালের কার্য্য করিতেছেন। দাতা পরকালের দিকে চাহিয়া দান করিতেছেন। উপকারী প্রত্যুপকার পাইবার জন্য কষ্ট স্বীকার করিতেছেন। নিস্বার্থ উপকার ও নিষ্কাম দান কয়জন করিয়া থাকেন? জনসাধারণই স্বর্গের দিকে পুরস্কারের জন্য তাকাইয়া আছেন। লোকে শতগুণ লাভের জন্য একগুণ বিসর্জ্জন দেয়। পৃথিবীতে ধর্ম্ম যে মহা বাণিজ্যাগার প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন, আপনার লাভের জন্য কয় জন না সেই আগারে প্রবিষ্ট হয়েন? যিনি পৃথিবীর মধ্যে হয় তো শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্ম-পরায়ণ ও সাধু ব্যক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ, তিনি ন্যায়বানের নিকট হয় তো ঘোর বিষয়ী, প্রধান ব্যবসায়ী, ও বিষম লোভী বলিয়া তিরস্কৃত এবং ঘৃণিত হইয়া দাঁড়াইবেন। তিনি ধর্ম্ম-বাজারে একগুণ দিয়া শতগুণ ক্রয় করিতে গিয়াছিলেন। তিনি এক মুষ্টি অন্নদান করিয়া স্বর্গে চিরদিনের জন্য শতমুষ্টির প্রার্থী হইয়াছিলেন। সংসারের ধূলি তিনি স্বর্গে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, স্বর্গে গিয়া দেখিতে পাইবেন তাঁহার জন্য সে ধূলিও নাই। নিষ্কাম ধর্ম্মকে যদি যথার্থ ধর্ম্ম বলা যায়, তবে পৃথিবীতে, যতদিন পরলোকের বিশ্বাস জীবিত থাকিবে, যতদিন মানব পরলোক না ভুলিবে, ততদিন তিনি ধার্ম্মিক বলিয়া গণনীয় হইবেন না। তিনি এক জন লোভী ব্যবসায়ী মাত্র, অধিক লাভের জন্য অল্প লাভে বিসর্জ্জন দিতেছেন। ধর্ম্ম তাঁহার নিকট ক্রেয় সামগ্রী ব্যতীত আর কিছুই নহে। নিষ্কাম ধার্ম্মিক ব্যক্তি পৃথিবীতে দুর্ল্লভ। ইহা যদি সত্য হয় তবে পারলৌকিক ধর্ম্মদ্বারা পৃথিবীকে অধিকতর স্বার্থপর করিয়া তুলিতেছে। যিনি যত ধার্ম্মিক তিনি তত স্বার্থপর। তিনি হয় পৃথিবীর যশঃপ্রার্থী, না হয় পরলোকের ঐশ্বর্য্য ও সুখাভিলাষী। এই প্রকার ধর্ম্মশীল ব্যক্তির স্বার্থপরতা সাংসারিক অন্যান্য কার্য্যে

বিলক্ষণ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তিনি সকল বিষয়ে ন্যায় বুঝিতে যান। তাঁহার ন্যায় বুঝার অর্থ স্বার্থ বুঝা। তিনি আপনার স্বার্থ ও ন্যায় বুঝিবার সময় এত দৃঢ়হৃদয় ও দুর্দমনীয় হইয়া বসেন যে অতি দুর্জ্জনেও ততদুর হইতে পারে না। তাঁহার তিলার্দ্ধ অর্থ বিপুল-সম্পত্তি-সমান। ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ ধর্ম্মকার্য্যে কেবল স্বার্থের অনুসারী হইয়া আপনাদিগের প্রকৃতিকে কতদূর কলুষিত করিয়া বসেন, ধর্ম্ম ভিন্ন সামান্য সাংসারিক কার্য্যে তাহা বিলক্ষণ প্রতীত হয়। তখন তাঁহাদিগকে এতদূর আত্মসার জ্ঞান হয়, যে তাঁহাদিগকে সাধু ব্যক্তি বলিতে ঘৃণা বোধ হয়। আমরা এই প্রকার আত্মসার সাধু ব্যক্তির অনেক দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। সমাজ মধ্যে তাঁহাদিগেরই সংখ্যা অধিক। স্ত্রী-মণ্ডলীতে তাঁহাদিগের গণনা করা যায় না; কারণ স্ত্রীলোকে স্বাভাবিকই অধিকতর ধর্ম্মপরায়ণা ও পারত্রিক-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী হইয়া থাকেন। এই স্বার্থপর ধর্ম্ম কর্ম্ম দ্বারা যে জন-সমাজের উপকার হয় নাই, আমি একথা বলি না; তদ্দ্বারা সমাজের বিলক্ষণ উপকার দর্শিয়াছে, জনসমাজের অনেক দুঃখ মোচন হইয়াছে, কিন্তু সেই ধর্ম্ম কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের প্রকৃতি যেরূপ স্বার্থপর হইয়াছে তাহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে।

৫। পারলৌকিক ভাব দ্বারা জনসমাজে প্রতারণার বৃদ্ধি হইয়াছে। চতুর ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতীয় পুরোহিতশ্রেণী এই পারলৌকিক ভাব দ্বারা জনসমাজের নানা খেলা খেলিয়াছেন। তাঁহারা জানেন মনুষ্যজাতি স্বাভাবিকই স্বার্থপর; এই স্বার্থপরতার সুবিধা লইয়া তাঁহারা নানাপ্রকার চাতুরীজাল বিস্তার করিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন, মানব ধর্ম্মের নামে আপনার স্বার্থসাধন জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া বেড়ান। যে গুলি বাস্তবিক সৎকার্য্য ও ধর্ম্ম তাহাদিগকে তো অগ্রেই ধর্ম্মের নাম দিয়া স্বার্থের বাজারে প্রচালিত করিয়াছেন; অথবা তাহারা আপনায়ই প্রচলিত হইয়া আছে। তাঁহারা দেখিলেন ধর্ম্মের নামে মনুষ্য যাহা পান, তাহার জন্য সর্ব্বত্যাগী হইতেও স্বীকৃত হন। তাঁহার ধর্ম্ম কি কি মনুষ্য একবার জানিতে পারিলে, অমনি তাহার জন্য সকলই বিসর্জ্জন দিতে ধাবিত হয়েন; একগুণ দিয়া শতগুণ ক্রয় করেন। যাহা দেন তাহা প্রকৃত পদার্থ, যাহা লইতে চান তাহা কাল্পনিক বিষয়। তাহা ভবিষ্যতে অলীক ও কাল্পনিক স্বর্গধামে সঞ্চিত রহিল। যাহা বিসর্জ্জন দিলেন তাহা প্রকৃত সুখ অথবা সুখোৎপাদক পদার্থ, যাহা পাইবেন তাহা কাল্পনিক সুখ এবং তাহা স্বর্গের অলীক রাজ্যে অদৃষ্টভাবে সঞ্চিত থাকিবে। মনুষ্য পরকালে তাহা পাইবেন। তাঁহারা দেখিলেন, জনসমাজ নির্ব্বোধের ন্যায় এই প্রকার অলীক চক্রে ঘুরিতেছেন। তখন তাহাদিগকে ধঞ্চিত করা দুঃসাধ্য নহে; মনে করিলেই হইতে পারে। সেই

ধঞ্চিত করিবার ক্ষমতাও তাঁহাদিগের হস্তে। অতএব জনসমাজকে প্রতারণা করিতে অধিক কৌশলের প্রয়োজন নাই। তাঁহারা এইজন্য অনেক অলীক কার্য্য ধর্ম্মনামে চালাইয়া দিলেন। কেবল অর্থদান সেই ধর্ম্মসঞ্চয়ের উপায়। ইহার জন্য জনসমাজ যে অর্থ বিসর্জ্জন দিতে লাগিলেন, যে প্রকৃত সুখের সাধন পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, পরজন্মে ও পরকালে তাহার ফলভোগী হইবেন। এই কৌশলে পুরোহিতবর্গ জন-সমাজ হইতে অর্থ বাহির করিয়া আপনারাই সুখভাগী হইতে লাগিলেন, জনসমাজ দুঃখে নিমজ্জিত হইল। জনসমাজের সুখ এখন নয়, সেই পরলোকে গিয়া। অগ্রে পুরোহিতগণ সুখী হউন, পরে জনসমাজ সুখী হউক আর নাই হউক তাহাতে পুরোহিতগণের কি? তাঁহারাতো কৌশল পূর্ব্বক পৃথিবীর সুখভোগ করিয়া লইলেন। এই বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, পৃথিবীতে যাহা যাহা ধর্ম্ম কর্ম্ম বলিয়া প্রচলিত আছে, একবার দেখা উচিত তাহা বাস্তবিক ধর্ম্ম কর্ম্ম কি না? যাহা চিরকাল শুনিয়া আসিতেছি তাহাই যে ধর্ম্ম, এরূপ বিবেচনা করা নির্ব্বোধের কার্য্য। কারণ যে যে সমাজে পুরোহিত-শ্রেণীর প্রভুত্ব ছিল সেই সেই সমাজে অনেক অপধর্ম্মও ধর্ম্ম নামে প্রচলিত থাকিতে পারে। পৃথিবীর ইতিবৃত্তে দেখা যায়, সমস্ত প্রাচীন সভ্য সমাজেই ধর্ম্মপুরোহিত বর্গের আধিপত্য ছিল, এবং সকল প্রাচীন সমাজের ব্যবস্থা মতেই ধর্ম্মীয় ব্যবস্থা আধুনিক সমাজে চলিয়া আসিতেছে। অতএব এই ধর্ম্মের স্রোত মূলদেশেই আবিল হইয়াছে; এবং সেই স্রোত সর্ব্ব সমাজেই প্রবিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে পৃথিবীতে যে ধর্ম্ম-ব্যবস্থা প্রচলিত রহিয়াছে তাহা কতদূর পরিশুদ্ধ তাহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। মনুষ্য-সমাজ যে প্রতারিত হয়েন নাই, এরূপ কখনই নহে। যে সমস্ত সুকৃতি-অভিধেয় কার্য্যের পাপ-মলিনতা স্পষ্ট দেখা গিয়াছে এবং আজিও দেখা যাইতেছে, তাহারা তৎক্ষণাৎ ধৃত হইয়া পুরোহিত-বর্গের কৌশল চিহ্ন বলিয়া কলঙ্কিত ও চিহ্নিত হইয়াছে। জনসাধারণের বুদ্ধিবৃত্তি যতই উন্মেষিত হইবে, ততই তাঁহারা এই কৌশল বাগুরার ভেদ করিতে পারিবেন। কে জানে ভবিষ্যতের ধর্ম্ম-ব্যবস্থা ও ধর্ম্ম-প্রণালী কি হইবে? মনুষ্য-সমাজের জ্ঞানোদয়ের এই তো প্রভাত-কাল। প্রভাত-কালের আলোক দেখিয়া কি আশা হইতেছে না, দ্বিপ্রহরের প্রভাগামে সত্যের কত শত সুবর্ণময় বিশাল রাজ্য প্রকাশিত হইয়া পড়িবে!

শ্রীপূঃ—

বিবিধ সমালোচন।*

জাগ্রতি ও বিস্মৃতি মানবজীবনের এই দুইটিই বর্ত্তমান ভাব; দুঃখ এবং সুখ এই উভয় ক্ষেত্রেরই সমুৎপন্ন ফল; তন্মধ্যে জাগ্রতির যে কার্য্যমাত্র তাহাই দুঃখ, এবং বিস্মৃতির যে কার্য্য মাত্র তাহাই সুখ। সুমধুর বীণা বাদিত হইতেছে, অন্তর তাহাতে আকৃষ্ট, ক্রমে আত্ম বিস্মৃত ও উহার সহিত লয়-প্রাপ্ত হইল। আত্ম-জ্ঞান-শূন্য অন্তরের এই বিস্মৃতি দশাই সুখের দশা; শব্দ যেমন বীণার সপ্তস্বরে ক্রীড়া করিতেছে, অন্তরও তেমনি অপর বীণার ন্যায় প্রতি শব্দে তাহার সহিত সমক্রীড়া করিতেছে—সুন্দর ঐকতান! সুন্দর সুখ-লয়! তৎপরেই চেতন, সৌন্দর্য্য বা সুখ-বস্তু-বিচ্যুত অন্তর আত্ম গত; আত্ম-চৈতন্যে অন্তরের এই দশা, ঘোর বিকৃত বিশৃঙ্খল দুঃখের দশা। অন্তর আত্ম-গত হইবা মাত্র সুখের অনুসন্ধানে ব্যাকুল। যে স্থলে যাহার অভাব সেই স্থলেই তাহার অনুসন্ধান; আত্মস্থলে আসিবা মাত্র অন্তর সকলি শূন্য দেখে, সে যেন কিছু চায়, যাহা সে চায় তাহার অভাবে তাহার জীব জল-বিচ্যুত মৎস্যের জীবের ন্যায় যন্ত্রণা-পীড়িত, উহা যেন উহার প্রাণ-প্রয়োজন। অন্তর যাহা চায়, উহা কি অন্তর তাহা জানে না, অন্তর তদ্বিষয়ে অন্ধ; তবে অন্তর আপাততঃ চাহে কি?—মুক্তি, আত্ম-চেতনার যন্ত্রণা হইতে মুক্তি; সেই মুক্তির উপায় কি, তাহা অন্তর জানে,—বিস্মৃতি। কিন্তু সেই বিস্মৃতি কোথায়, তাহাই তাহার অনুসন্ধান।

মানব-অন্তরে একটি সম-তৌলতা ভাব বিদ্যমান আছে; উহার একদিকে জাগ্রতি, অপর দিকে বিস্মৃতি। জাগ্রতি ও বিস্মৃতি অন্তরের এই দুইটি ভাবকে পৃথক্ সংজ্ঞা দেওয়া হইলেও, উহারা একই প্রকৃতির, উভয়ই চিন্তা। বস্তুর সহিত অন্তরের নিত্য সম্বন্ধ; অন্তর নিত্যই বস্তু-আশ্রিত। অন্তর বস্তু-বিরহিত বিশুদ্ধ আত্ম চিন্তা করিতে অক্ষম, সুতরাং বিশুদ্ধ জাগ্রতি কাহাকে বলে তাহা আমরা জানি না। আবার ইন্দ্রিয় দ্বারা বস্তুর সহিত অন্তরের সম্বন্ধ জাত যে জ্ঞান, তাহার অতীত বিশুদ্ধ বস্তু যে কি তাহাও আমরা জানি না; সুতরাং বিশুদ্ধ বস্তু যে কি, তাহাও আমরা জানিতে অক্ষম। যাহা আমাদিগের চিন্তা বা জ্ঞান, তাহা বস্তুর সহিত অন্তরের সম্মিলন-জাত ভাব মাত্র; এই নিমিত্ত মানবীয় জ্ঞান সকলি একই-চিন্তা-ময়; তবে জাগ্রতি ও বিস্মৃতি অর্থে আমরা এখানে

* বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত।

এই বুঝাইতে চাই যে অন্তর ত নিত্য বস্তু-আশ্রিত, তবে সমতুলায় উহার আশ্রিত বস্তু যেখানে লঘু এবং চৈতন্য-ভাব প্রবল, আমরা সেই অবস্থাকে উহার জাগ্রতি অবস্থা কহিতেছি। আর যেখানে চৈতন্য-ভাবের লঘুত্ব বস্তুরও প্রাবল্য হইয়া দাঁড়ায় আমরা সেই অবস্থাকে অন্তরের বিস্মৃতি অবস্থা কহিতেছি, নচেৎ এক কালে বস্তু-বিরহিত চৈতন্যভাব বিদ্যমান থাকিতে পারে না। সাংখ্যকার বিশুদ্ধ চৈতন্য ও বিশুদ্ধ বস্তুকে ক্রমান্বয়ে পুরুষ এবং প্রকৃতি সংজ্ঞা দিয়াছেন, এবং ইহাদিগের সম্মিলনই জীবন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি দেহ এবং দেহের আশ্রিত আত্মার উল্লেখে ঐ কথা বলিয়াছেন, আমরা মন এবং মনের আশ্রিত বস্তুর উল্লেখে সেই কথাই বলিলাম। যেমন পুরুষ নিত্য প্রকৃতি-আশ্রিত, তেমনি অন্তরও নিত্য বস্তু-আশ্রিত। পুরুষ এবং প্রকৃতির সম্মিলন-ফল যেমন জীবন, অন্তর এবং বস্তুর সম্মিলন ফল তেমনি চিন্তা, এই চিন্তা ও জীবন একই কথা।

জাগ্রতি ও বিস্মৃতি অর্থে আমরা কি বুঝাইতে চাই তাহা বলিলাম। অন্তর অতি তরল পদার্থ, ক্ষুদ্রাশ্রয়ে উহা সদত টলমল করে ও ভ্রষ্ট হয়, ইহাই দুঃখ; আশ্রয়-বস্তু উহার ঠিক্ অনুরূপ হইলেও উহাতে উহা তিষ্ঠিতে পারে না, কারণ উহার গতি আছে; আশ্রয়-বস্তু যেথানে উহা অপেক্ষা প্রশস্ততর সেই খানেই উহা প্রকৃতিস্থ ও সুখী। অন্তর কোন সীমাবদ্ধ আশ্রয়ে গতি রুদ্ধ হইয়া কূপবদ্ধ বারির ন্যায় ক্রমে মলিন, দূষিত হইয়া আত্ম প্রকৃতির নাশ করিতে থাকে; কিন্তু অন্তর যেখানে ব্যাপক আশ্রয়ে নিত্য গতি-শীল সেইখানেই উহা বিশুদ্ধ এবং ক্রীড়া-মত্ত। কিন্তু অন্তরের স্বাভাবিক-গতি সৌন্দর্য্য-পথ বিনা অপর কোন পথে নাই; ঐ পথে উহা অক্লান্ত ক্রীড়ায় উন্মত্ত; যেহেতু ঐ পথে উহা আত্ম-বিস্মৃত। অন্তর আত্ম-চেতনায় পীড়িত হইলে এই বিস্মৃতির নিমিত্ত ব্যাকুল হয়; এই বিস্মৃতি কেবল সৌন্দর্য্য-পথে, অতএব ইহা বলিতে পারা যায় জীবের জীবনীই (vital element) সৌন্দর্য্য। আবার যাহাতে জীবের অন্তর আশ্রয়, গতি এবং মিলন বা লয় পাইতে পারে তাহাই সৌন্দর্য্য। মেঘমালা, মন্দাকিনী, নক্ষত্র, চন্দ্র পরিমণ্ডিত শরৎযামিনীর শোভায় নিশীথ-বিহারী যে ভাবুকের মন আত্ম-বিস্মৃত বা লয়-প্রাপ্ত ও দুঃখ-বিবর্জ্জিত, সেই ভাবুকই সুখী, এবং শরৎ-যামিনীর সেই বিচিত্র সাজই সৌন্দর্য্য। রমণীয় মনসিজ গুণের আধার ঐশিকভাবে বিজন-কানন-বাসী যোগ-মগ্ন যে যোগীর মন আত্ম-বিস্মৃত বা লয়-প্রাপ্ত ও দুঃখ-বিবর্জ্জিত, সেই যোগীই সুখী, এবং সেই মনসিজ-গুণাধার রমণীয় ঐশিক ভাবই সৌন্দর্য্য। জীবিত বা গত প্রণয়-পাত্রের অনন্ত-মাধুরীময় মুখচ্ছবি দর্শনে বা ধ্যানে যে প্রেমিকের মন আত্ম-বিস্মৃত বা লয়-প্রাপ্ত ও দুঃখ-বিবর্জ্জিত, মনীষী

কোমৎ বা মিলের ন্যায় সেই প্রেমিকই সুখী, এবং সেই প্রণয়-পাত্রের মাধুরীময় মুখচ্ছবিই সৌন্দর্য্য। স্বদেশবাসী বা সমস্ত-পৃথিবীবাসী মানবমণ্ডলীর উৎকৃষ্ট সুখের বিশাল সুন্দরভাবে যাহার মন আত্ম-বিস্মৃত বা লয়-প্রাপ্ত ও দুঃখ-বিবর্জ্জিত, সেই দেশহিতৈষী বা নরহিতৈষীই সুখী; এবং মানবমণ্ডলীর সেই উৎকৃষ্ট মনসিজ সুখের জ্ঞানই সৌন্দর্য্য।

অন্তর এই সকল মহৎ সৌন্দর্য্যে ভাসিত হইলে তাহা ক্রমে আত্মত্ব-রহিত হইতে থাকে। যে পরিমাণে অন্তর সৌন্দর্য্যগত, সেই পরিমাণে উহার আত্ম-জ্ঞান ক্রমে সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্মতর; অবশেষে আত্মজ্ঞান রহিত হইয়া অন্তর সৌন্দর্য্যেই মিলিয়া যায়, ইহাই জীবনের চরম সুখ। স্বার্থের পূর্ণ মূলোচ্ছেদে জীবের সুখোদ্দেশ্যের পূর্ণ অধিকার! এই যোগ-সাধনের দুইটি মাত্র উপায় আছে, একটি সংসারকে অনন্ত সৌন্দর্য্যে পূর্ণ করা, অপরটি অন্তরকে সৌন্দর্য্যের বিচিত্র গূঢ় এবং অনন্ত দূর পথে প্রবেশের উপায় শিক্ষা দেওয়া। কাব্য-কলা বা কল্পনা বুদ্ধি প্রথম উপায়টি সাধন করে, এবং তত্ত্বানুসন্ধিৎসু বুদ্ধি দ্বিতীয় উপায়টি সাধন করে। কল্পনা বুদ্ধি বা কাব্য কলার চরম লক্ষ্য এমন সৌন্দর্য্য সকল সৃষ্টি করা—যাহা অতল, অসীম, ও অনন্ত; অন্তর যেন একবার উহাতে নিমগ্ন হইলে আর উহার তল, সীমা ও অন্ত না পায়, চিরকালই যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া উহাতে নিমগ্ন থাকিতে পারে, বিস্মৃতি ভঙ্গে আত্ম-চেতনার যন্ত্রণা আর যেন তাহার উপস্থিত না হয়; কাব্য কলার চরম লক্ষ্যই অসীম ও অনন্ত। যাহা কিছু সৌন্দর্য্য তাহাই কাব্য, আবার যাহাকিছু সর্ব্বাঙ্গীন ও পূর্ণ, তাহাই সৌন্দর্য্য; আবার যাহাকিছু সর্ব্বাঙ্গীন ও পূর্ণ তাহাই অনন্ত ও অসীম; এই নিমিত্ত কাব্য মাত্রই অনন্ত। ভিক্টর হিউগো কহিয়াছেন "Poetry cannot grow less, because it cannot grow greater." কাব্যের কখন হ্রাস হইতে পারে না, কারণ, কাব্য কখন বৃদ্ধি পাইতে পারেনা।

তত্ত্বানুসন্ধিৎসু বুদ্ধির চরম লক্ষ্য এই অনন্ত কাব্যের গভীর অনন্ত পথে হৃদয়কে লইয়া গিয়া হৃদয়ের প্রত্যেক কবাট ভাঙ্গিয়া প্রতিপদে সৌন্দর্য্যের পূর্ণ-বিকশিত তরঙ্গমালা উহার অভ্যন্তরে পুরিয়া দেওয়া, সৌন্দর্য্যের সেই সিক্ত-কারী তরল রসে হৃদয়ের প্রতি অণুকে বিশ্লিষ্ট করিয়া উহার সহিত সম্পূর্ণ মিলিত ও একীভূত করা, অনন্ত সৌন্দর্য্যের ক্ষেত্রে হৃদয়কে অনন্ত প্রসারিত করা, এবং কলুষিত ক্ষুদ্র মানব-হৃদয়কে উজ্জ্বল অনন্ত ভাব প্রদান করা। ধন্য সেই আরাধ্য বুদ্ধি! ধন্য তাহার কার্য্য-ফল!

সেই কল্পনা-বুদ্ধি ব্যক্তিই কবি, সেই তত্ত্বানুসন্ধিৎসু বুদ্ধি ব্যক্তিই সমালোচক। এই উভয় বুদ্ধিরই সীমা আছে, কিন্তু এই উভয় বুদ্ধির কার্য্য-ফলের সীমা নাই। কাব্য-কলার সীমা আছে, কিন্তু কাব্যের সীমা

নাই, কাব্য অনন্ত। যেমন সূর্য্যের সীমা আছে, সূর্য্যালোকের সীমা নাই; তেমনি কাব্য-কলার সীমা আছে, কিন্তু তদুৎপন্ন সৌন্দর্য্যের সীমা নাই। তত্ত্বানুসন্ধিৎসুবুদ্ধি কাব্য-কলার রচিত পথ সকলেই গমন করিতে পারে, তাহা ছাড়াইয়া সৌন্দর্য্যের পথে উহার গতি নাই; সৌন্দর্য্যের পথে কেবল মাত্র হৃদয়ই যাইতে পারে। হৃদয়ের গতি অতিব্যাপ্ত; হৃদয় এবং সৌন্দর্য্য ইহারাই অনন্ত।

অস্থি নাড়ী, শিরা সকলের সংযোজন-কৌশলে যেমন দেহ ও দেহের লাবণ্য, তেমনি কাব্যকলার স্থূল এবং সূক্ষ্ম কৌশল সকলের সংযোজনে কাব্য ও কাব্যের সৌন্দর্য্য। সমালোচন-বুদ্ধি কাব্য-কলার এই সকল স্থূল এবং সূক্ষ্ম পথে বিচরণ করে এবং তথা হইতে হৃদয়কে দূরব্যাপ্ত সৌন্দর্য্য-ক্ষেত্র দেখাইয়া দেয়, হৃদয় উহাতে ছুটিয়া পড়ে, এবং উহার সহিত মিলিত হইয়া ক্রীড়ায় মত্ত হয়।

বুদ্ধি এবং হৃদয় উভয়ে স্বতন্ত্র প্রকৃতির; বুদ্ধি সংযত এবং সূক্ষ্ম, হৃদয় তরল এবং প্রশস্ত; বুদ্ধি খঞ্জ, হৃদয় অন্ধ; উভয়ে উভয়ের অর্দ্ধাঙ্গ, উভয়ের মধ্যে একাত্মা সখিত্ব ভাব; কেহ কাহাকে ছাড়িয়া চলে না, চলিতে পারেও না। বুদ্ধি উচ্চ নীচ ও বিবিধ বক্র পথে ধীরগতি, হৃদয় সমক্ষেত্রে বিদ্যুৎ-গতি। কোন সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির বাহ্য সমক্ষেত্রে হৃদয় গিয়া আগে পতিত হয়, কিন্তু কাব্যকলার উচ্চনীচ বা বক্র কৌশল পথে উহার গতি রোধ হয়, বুদ্ধি তখন উহার অভ্যন্তর হইতে উত্থিত হইয়া উহাকে ঐ সকল পথে আরোহিত অবরোহিত বা প্রত্যাগত করিয়া দেয়, তখন উহা আবার যত টুকু সমক্ষেত্রে ধাবিত হইয়া থাকে। এইরূপে কোন কাব্য বা সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির আদ্যন্ত অনন্ত পথে উভয়ে নেতা। যাঁহারা বিবেচনা করেন উভয়ের বুদ্ধির উন্নতি ও হৃদয়ের উন্নতি স্বতন্ত্র কথা, তাঁহারা ভ্রান্ত; বুদ্ধি ও হৃদয়ের একের উন্নতি অপরের উন্নতির অপরিহার্য্য কারণ। যেখানে হৃদয়ের আকর্ষণ নাই সেখানে বুদ্ধিও উত্থিত হয় না। জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর উজ্জ্বল বিভায় আগে মানবের অন্তর মুগ্ধ হইয়াছিল, পরে বুদ্ধি তাহা হইতে উত্থিত হইয়া জ্যোতিষ শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছে। এইরূপে পার্থিব সাগর, নদী, তরু, লতা পল্লবাদির বিবিধ শোভার আকর্ষণ হইতেই বিবিধ বিদ্যার উৎপত্তি। যে বস্তুর কোন গুণে অন্তর আকৃষ্ট হয়না, তাহার তত্ত্ব নিরূপণে বুদ্ধির স্বাভাবিক গতি হয় না, আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্য উপভোগের আশা দেখাইয়া বল-পূর্ব্বক বুদ্ধিকে ইহাতে নিযুক্ত করিতে হয়। এক্ষণে বোধ হয় বুঝা গিয়া থাকিবে হৃদয়ের ও বুদ্ধির শিক্ষা, একই শিক্ষা। যিনি কাব্য বা সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির পূর্ণ-উপভোগাভিলাষী, সমালোচন-বুদ্ধি তাঁহার শিক্ষক; আর যিনি জীবনের প্রকৃত যোগ-সাধন আত্ম-বিস্মৃতি শিক্ষা করিতে অভিলাষী, কল্পিত কাব্য তাঁহার শিক্ষক। এক্ষণে বুঝা গেল কাব্যের উদ্দেশ্য মান-

বীয় সারাংসার শিক্ষা। এক্ষণে বুঝা গেল কল্পনা-বুদ্ধি কবিই সকল শিক্ষার গুরু।

যিনি কবি তিনিই সমালোচক; যাঁহার সৃষ্টি-বুদ্ধি আছে, তাঁহার সৃষ্টির কৌশল-বুদ্ধি অবশ্যই আছে। এই নিমিত্ত কবিই পূর্ণ ব্যক্তি। কবির শিক্ষার উদ্দেশ্য কতদূর?—জনসাধারণকে মনসিজ পূর্ণ ভাব প্রদান করা। যিনি কবির রচিত কোন কাব্য-পথে বিচরণ সমাধা করেন, তাঁহার হৃদয় এবং বুদ্ধি কবির ন্যায় সমান হইয়া যায়। কবি সকলকেই কবি করিতে থাকেন। ধন্য তাঁহার কল্পিত কাব্য-কলা! ধন্য তাঁহার মহদাশয়! কবি জনসাধারণ হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। সেক্সপিয়র, কালিদাস—ইঁহারা মনসিজ পুরুষ। জনসাধারণ ইঁহাদের অবস্থাপন্ন নহে। সাধারণ লোকে ইঁহাদিগের কাব্য-কলার কৌশল সকলে প্রবেশ করিতে পারে না, এই নিমিত্ত যাঁহারা উন্নত-বুদ্ধি, এবং উন্নত-হৃদয় তাঁহারাই কবির কৌশল-পথে সাধারণের নেতা হইয়া থাকেন; ইঁহারাই সাধারণ সমালোচক। সাধারণ অর্থে আমরা কেবল কবি হইতেই প্রভেদ করিলাম। যিনি কোন কবির প্রকৃত সমালোচক হইতে পারেন, তিনি সেই কবির কবিত্বের দ্বিতীয় মুখযন্ত্র স্বরূপ। সাধারণ সমালোচক-সকল কবির প্রতিনিধি, দ্বিতীয় কবি, তাঁহারাই সাধারণের শিক্ষক।

এই সকল সমালোচকেরা কবিকৃত-সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির কৌশল-পথে আমাদিগের নেতা, এবং সৌন্দর্য্য-ক্ষেত্রের প্রদর্শক। কাব্যের দোষ গুণ বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া সমালোচকের ধৃষ্টতা মাত্র, উহাতে উহঁার অধিকার নাই। যাহা কাব্য-কলার সুসম্পন্ন ফল তাহা বিচারের অধীন নহে। যাহা সৌন্দর্য্য তাহা অপার, তাহার গুণ-ব্যাখ্যা হইতে পারে না; আর যাহা খুঁত, তাহা অভাব পদার্থ, তাহার দোষ ব্যাখ্যা হইতে পারে না। যাহা কাব্যের বস্তু কিন্তু কাব্যাকারে পরিণত হয় নাই, এমন অসম্পূর্ণ সৌন্দর্য্যই সমালোচকের বিচারের শিক্ষা দেওয়ার বস্তু। অসম্পূর্ণ হইতে সম্পূর্ণ কতদূরবর্ত্তী তাহাই দেখাইয়া দেওয়া, সেই সকল ক্ষেত্রে কাব্য-কলার বিস্তারের চরম সীমা ইঙ্গিতে দেখাইয়া দেওয়া, উৎফুল্ল প্রতিভা-কলিকার পূর্ণ বিকাশের সহায়তা করা। এরূপ সমালোচক তুমি আমি নই, যিনি হৃদয়ে এবং বুদ্ধিতে বিশারদ তিনিই।

ইউরোপে প্রকৃত সমালোচনার জীবনদাতা জর্ম্মনেরা; বঙ্গভাষায় প্রকৃত সমালোচনের জীবনদাতা বঙ্কিমবাবু। বঙ্গভাষায় দুই একটি প্রকৃত কবি দেখা দিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃত সমালোচক এপর্য্যন্ত দেখা দেন নাই। এইটি বঙ্গদেশের অজ্ঞানতা ও অনুন্নতিরই পরিচয় দিতেছে। কবি সর্ব্বকালেই জন্ম গ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহার শক্তি তত শিক্ষা-সম্ভূত নহে, কবি বিশেষ ব্যক্তি; কবি-সংখ্যানুসারে আমরা দেশের উন্নতি বা

অনুপ্রতি ধরিতে পারি না। যে দেশে যে পরিমাণ সমালোচন-বুদ্ধি, সে দেশ সেই পরিমাণে শিক্ষিত ও উন্নত; কারণ সমালোচন-বুদ্ধি শিক্ষার ফল। বঙ্গদেশের সাধারণ সমালোচনের আলোচনা যাহা কিছু বঙ্গদর্শনই সূত্রপাত করিয়াছে। বিবিধ সমালোচনের সমালোচনা গুলিই তাহার দৃষ্টান্ত।

উত্তর চরিতের সমালোচনে বঙ্কিমবাবুর অবলম্বিত উপায় উপযুক্ত সমালোচকের ন্যায় হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যাহা কিছু সুসম্পন্ন কাব্য-কলার ফল তাহা দোষ-গুণ-বিচারের অধীন নহে; ভবভূতির উত্তর-চরিত কাব্যকলার চূড়ান্ত শক্তির ফল। উহা দোষ-গুণ-বিচারের অধীন নহে। আমাদিগের সুবুদ্ধি, সমালোচক ইহার দোষ-গুণ-বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া কেবল ইহার সৌন্দর্য্য-পথের নেতা হইয়াছেন মাত্র। চিত্র-দর্শন নামক প্রথম অঙ্কে কবির কৌশল খেলা কি, তাহা তিনি উত্তমরূপে বুঝাইয়াছেন। সহজ-বুদ্ধি লোকে সহসা এই অনুমান করিতে পারেন, চিত্র-দর্শন কাণ্ড লইয়া বুঝি ভবভূতি রাম সীতার পূর্ব্ববৃত্তান্তের পরিচয় দিতে বসিলেন; কিন্তু আমাদের সুবিজ্ঞ সমালোচক তৎ সম্বন্ধে কি বুঝাইয়াছেন, এবং কেমন সুন্দররূপে উহা বুঝাইয়াছেন, আমরা সেই ভাগটুকু উদ্ধৃত করিলাম।

"এই চিত্র-দর্শন কবি-সুলভ কৌশলময়। ইহাতে চিত্র-দর্শনোপলক্ষে রাম সীতার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। ইহার উদ্দেশ্য এমত নহে যে কবি সংক্ষেপে পূর্ব্বঘটনা সকল বর্ণন করেন। রাম সীতার অলৌকিক, অসীম, প্রগাঢ়, প্রণয় বর্ণন করাই ইহার উদ্দেশ্য। এই প্রণয়ের স্বরূপ অনুভব করিতে না পারিলে, সীতা-নির্ব্বাসন যে কি ভয়ানক ব্যাপার তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় না। সীতার নির্ব্বাসন সামান্য স্ত্রী-বিয়োগ নহে। স্ত্রী-বিসর্জ্জন মাত্রই ক্লেশকর—মর্ম্মভেদী। * * * * *" তৃতীয়াঙ্কে সেই যন্ত্রণার উপযুক্ত চিত্র প্রণয়নের উদ্যোগে প্রথমাঙ্কে কবি এই প্রণয় চিত্রিত করিয়াছেন। এই প্রণয় সর্ব্ব-প্রফুল্লকর মধ্যাহ্ন সূর্য্য—সেই বিরহ-যন্ত্রণা ইহার ভাবী করাল কাদম্বিনী,—যদি এ মেঘের কালিমা অনুভব করিবে, তবে আগে এই সূর্য্যের প্রখরতা দেখ। যদি সেই অনন্ত বিস্তৃত অন্ধকারময় দুঃখ-সাগরের ভীষণ স্বরূপ অনুভব করিবে, তবে এই সুন্দর উপকূল—প্রাসাদশ্রেণীসমুজ্জ্বল, ফলপুষ্পপরিশোভিত বৃক্ষবাটিকা-পরিমণ্ডিত এই সর্ব্ব-সুখময় উপকূল দেখ। এই উপকূলেশ্বরী সীতাকে রামচন্দ্র নিদ্রাবস্থায় ঐ অতলস্পর্শী অন্ধকার-সাগরে ডুবাইলেন।"

বঙ্কিমবাবু এইরূপ প্রণালীতে আপূর্ব্ব গ্রন্থের সমালোচনা করেন নাই, কৌশল-খেলার তাৎপর্য্য বুঝান ছাড়িয়া দিয়া কেবল মাত্র সৌন্দর্য্য পথে আমাদিগকে বিচরণ করাইয়াছেন; যেখানে যাহা কিছু সৌন্দর্য্য তাহার অবতারণা করিয়া দেখাইয়াছেন; কিন্তু তত্রাচ তাঁহার সমা-

লোচন অসম্পূর্ণ; কেন অসম্পূর্ণ তাহা তিনি আপনিই পরিশেষে স্বীকার করিয়াছেন। এক একটি করিয়া সৌন্দর্য্য দেখাইয়া বহু-সৌন্দর্য্য-সমাবেশোৎপন্ন মহৎ সৌন্দর্য্যের ভাব দেখান যায় না। সাধারণ পাঠকে একটি একটি করিয়া সৌন্দর্য্য দেখিয়া স্মৃতিপটে সমস্ত-সৌন্দর্য্য-সন্নিবেশোৎপন্ন মহৎ সৌন্দর্য্যের ভাব মনে ধারণা করিতে পারে না, উহার মাধুর্য্য তাহাদিগকে একত্র সাজাইয়া দেখাইতে হয়। কাব্যের মূর্ত্তি ও দৃশ্য সকল লইয়া, কাব্যের পার্শ্বে তাহার প্রতিচিত্র চিত্রিত করিয়া দেখাইতে হয়; এই চিত্রন-কালে সহজ-বুদ্ধি লোকেরা কবিকৃত কৌশলের পুনঃ-সন্নিবেশ প্রত্যক্ষ দেখিয়া উহার তাৎপর্য্য ও মাধুর্য্য শিখিয়া ও অনুভব করিয়া লয়। এবং তৎপরে পূর্ণ মূর্ত্তির ব্যাপক সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া অভিভূত হয়। কাব্যের এরূপ প্রতিচিত্র না দেখাইলে তাহার উদ্দেশ্য মূল-সৌন্দর্য্যের কিছুই দেখান হয় না। বঙ্কিম বাবু এরূপ চিত্র প্রদর্শন করণে অপটু নহেন, কারণ তিনি নিজে সুন্দর কবি; তবে তাঁহার উহাতে প্রবৃত্ত না হওয়ার কারণ তিনি কহেন সমালোচনা দীর্ঘ হওয়ার ভয়ে; কিন্তু সে দীর্ঘতায় আমরা অসন্তুষ্ট হইতাম না। তিনি কাব্যের উপর মোটামুটি যে দুই চারিটি কথা বলিয়াছেন তাহা উক্ত কাব্যের প্রতিচিত্র অঙ্কিত করার রেখাকর্ষণ নয়, কাব্য-সাধারণের সার লক্ষণ সকলের বিচার মাত্র, ঐ সকল লক্ষণানুসারে ভবভূতিকে পৃথিবীর অপরাপর কবিগণের সহিত শ্রেণীবিশেষ-ভুক্ত করা মাত্র। উত্তর চরিতের সমালোচন বঙ্কিম বাবু কর্ত্তৃক সর্ব্বাঙ্গীন সুসম্পন্ন না হইলেও তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা বঙ্গ-ভাষায় অতুল্য। উহার আদ্যন্ত পাঠে যে কোন ব্যক্তির কাব্যানুরাগ পরিবর্দ্ধিত ও সৌন্দর্য্য-গ্রাহিণী শক্তির উন্নতি সাধিত হইতে পারে।

বিবিধ সমালোচনের প্রবন্ধ গুলির মধ্যে গীতিকাব্য, এবং প্রকৃত ও অতি-প্রকৃত নামক দুইটি প্রবন্ধে, কাব্যের সার ও বিবিধ মূল-তত্ত্ববিচার দেখান হইয়াছে। এই বিচারগুলি গভীর-চিন্তা-প্রসূত এবং মার্জ্জিত বুদ্ধির ফল। ইহাতে অসার ও অলীক কাব্যরসতরঙ্গে তাড়িত বঙ্গীয় যুবকগণের মনকে কাব্যের মহতী ও গম্ভীর মূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করাইতে পারিবে।

বিদ্যাপতি ও জয়দেব নামক প্রবন্ধে—নিয়মের ফলে, কালের গতিতে, মানব প্রকৃতির পরিবর্ত্তনে, কাব্যের প্রকৃতিও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, এই সিদ্ধান্ত অতিসুন্দর রূপে বিবৃত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তটি নূতন না হইলেও, বঙ্কিম বাবু ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের গতি—কালের গতি ক্রমে যেরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাহা উল্লেখ করিয়া ইহাকে যেন একটা নূতন আকার প্রদান করিয়াছেন।

আর্য্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প নামক প্রবন্ধটির মুখবন্ধ ভাগ কিছু অপরিস্ফুট, আমরা

উহার সহিত সম্পূর্ণ এক-মত হইতে পারি নাই। সুখদায়ী বস্তু হইতে সৌন্দর্য্য পৃথক্ ইহা আমাদের বোধ হয় না। যাহাতে সুখ পাওয়া যায় তাহাই সুন্দর, তুমি ধ্যানে সুখ পাও, ধ্যানের বস্তু অবশ্যই তোমার পক্ষে সুন্দর; আমি ভোজনে সুখ পাই ভোজ্য দ্রব্যের রস আমার পক্ষে সুন্দর; কেহ ভোগে সুখ পায়, উপভোগের বস্তু তাহার কাছে সুন্দর। তৎপরিবর্ত্তে কেবল কতক গুলি উজ্জ্বল ভাবকেই সৌন্দর্য্য বোধ করিয়া সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যা করিতে গেলে বিবিধ গোলযোগ উপস্থিত হয়। যাহাহউক তদ্বিষয়ে আমাদিগের অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই।

কৃষ্ণ চরিত্রে বিদ্যাপতি ও জয়দেব প্রবন্ধের তাৎপর্য্য ভাগ পুনর্ব্বার অতি সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে।

বঙ্কিম বাবু দ্রৌপদী-চরিত্রের বীর সৌন্দর্য্য-ভাব, বর্ত্তমানকালের প্রচলিত কোমলতা সহিষ্ণুতা প্রভৃতি স্ত্রীগুণের সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের মধ্য হইতে উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শন করায় অতি অপক্ষপাতদর্শন, সূক্ষ্মদর্শী বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। আমাদিগের বিশ্বাস বঙ্কিম বাবু সুকবি, ও সুন্দর বুদ্ধি সমালোচক বলিয়া বঙ্গ সাহিত্যে অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিবেন। পরিশেষে আমাদিগের এই বক্তব্য যাঁহারা কাব্যানুশীলন ও কাব্যের রসাস্বাদন করিতে অভিলাষী, তাঁহারা বঙ্কিম বাবুর এই সমালোচনা গুলি বিশেষরূপে পুনঃপুনঃ আলোচনা করুন, তাহা হইলে অন্ততঃ তাঁহাদের কিয়ৎ-পরিমাণেও কাব্যবুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হইয়া দাঁড়াইবে।

শ্রীরামঃ—

মেহের আলি।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

অরণ্য-মধ্যে রজনীতে একটী ক্ষুদ্র পর্ণাচ্ছাদিত সামান্য কুটীরে একটী রমণী বসিয়া ভাবিতেছেন। মধ্য স্থলে বসিয়া আছেন, নতুবা চালের জঙ্গল তাঁহার মাথায় লাগিত। রমণী একমাত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া আছেন এবং নির্জ্জন ব'লে তাহা দ্বারাও যথোচিত শরীর আবৃত করেন নাই। বস্ত্র খানি মলিন চীর মাত্র; কিন্তু কোন উত্তম বস্ত্রের অবশেষ বিলক্ষণ জানা যায়। এক ধারে একটী প্রদীপ মিট্ মিট্ করিতেছে। তাহাতে রমণীর মলাচ্ছাদিত গৌরবর্ণ ঈষৎ আভা প্রকাশ করিতেছে দেখা যায়। বস্ত্রের অপ্রাচুর্য্য হেতু রমণীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের শোচনীয় অস্থিসার অবস্থা বিলক্ষণ প্রকাশমান। বদনের আকার ব্যতীত বয়সের পরিচয় আর কোথাও হইতে পাওয়া ভার। তাহাতেও প্রকৃত বয়স জানা ভার।

অন্নাহারাভাব জন্য শীর্ণ দেহে, তৈল-বিহীন মলিনীভূত গৌরবর্ণে ও বস্ত্রাভাবে অর্দ্ধো-লঙ্গ শরীরে, সহসা ভূতযোনি বলিয়াও বোধ হইতে পারে; আবজানি দেখিলে অনায়াসে ভূতের গৃহিণী বোধে পলায়ন করিত।

আমীরজান কুটীর-দ্বারে উঁকি মারিয়া দেখিলেন; দেখিয়া অবাক্ হইলেন। নিরীক্ষণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে আমীর-জান চিনিলেন ও স্বীয় অঞ্চলে অশ্রুধারা মোচন করিতে করিতে মুখ ফিরাইলেন। পরে কম্পিত গদগদ স্বরে বলিলেন "কে ও মেহেরন্নিসা না কি? এমন দশা কেন?" মেহেরন্নিসা শব্দাকর্ণনে অপেক্ষিত প্রাণ-সখী আমীরজান আসিয়াছেন বুঝিয়া কুটীর হইতে বাহির হইলেন এবং আমীরজানের হাত ধরিয়া এক বৃক্ষতলে বসিলেন। উভয়ে উভয়ের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরের স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া কিয়ৎকাল নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। উহাতে তাঁহাদের পরস্পর পরিচয় এবং পরস্পরের পূর্ব্বকথা স্মরণ হইতেছে এইরূপ বোধ হয়। চতু-র্দ্দিকে অন্ধকারময় ঘোর অরণ্য। উভয় রমণী এমনি পরস্পর আলিঙ্গনে ও মিলনে হতজ্ঞান, যে তৎকালে যদি এক ব্যাঘ্র সম্মুখে আসিয়া আক্রমণ করিত কিম্বা ধরিত তাহাও হয়ত তাঁহারা জানিতে পারিতেন না। অনেকক্ষণের পর আমীর জান বাক্য স্ফূরণ করিলেন ও কহিলেন; "একি বন্, এ দশা কেন? এ বনেই বা কেন? আর কি দোষেই বা এ হত-ভাগিনী সখী হইতে এতদিন গোপন ছিলে? বল বল বন্ সব কথা বল আমার বুকটা ধড়ফড় করিতেছে।"

তখন অতি ক্ষীণস্বরে মেহেরন্নিসা কহিলেন, "ভাই, এ বনে যদি আহার-যোগ্য ফল পাইতাম গ্রাম অপেক্ষা এ সুন্দর নিরাপদ স্থল। পুরুষের যন্ত্রণায় পৃথিবী ছাড়িতে সাধ যায়; ইচ্ছা হয় আর মানুষের মুখ না দেখি।"

আমীরজান স্বভাব-সুলভ চাপল্য সহ কহিলেন "সেই পোড়া পুরুষের জন্যই তোমার এত দুঃখ।"

মেহের। সত্য বলেছ, যার যে মনের পুরুষ সে ছাড়া অন্য গুল জালাতন করে কেন? আমরা ত অন্য কাহাকে বিরক্ত করিতে যাই না?

আমীর। ঐত মজা, আমরা বিরক্ত হতেই জন্মেছি। যাহা হউক তোমার গল্পটা বল। এ বনেই বা কতদিন এলে ও কেন এলে?

মেহের। দুই দিন বনে এসেছি; একটী রাখাল বালক দিয়া এই কুটীর ক'রে লয়েছি।

আমীর। আহার?

মেহের। কলা জল-পানীয় কিছু ক্রয় করিয়া আনাইয়া খাইয়াছি।

আমীরজান অমনি স্মরণ হইলে এই ভাবে আপনার পুটুঁলী আনিলেন ও তাহার একাধার হইতে রন্ধন করা কিঞ্চিৎ আহারীয় দ্রব্য মেহেরকে খাইতে অনুরোধ করিলেন। মেহের আহার করিয়া কুটীর

হইতে জলানয়ন পূর্ব্বক পান করিলেন এবং আমীরজান আঁচল হইতে একটী পান দিলেন। কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া মেহেরন্নিসা আপন গল্প সখীকে বলিতে লাগিলেন।

যে রজনীতে মেহের আমীরজানের বাটী ত্যাগ করেন, ও যে ঘটনা জন্য ত্যাগ করেন, সেই রজনীর ব্যাপার আনুপূর্ব্বিক মেহেরন্নিসা বর্ণন করিলে আমীরজান বুঝাইলেন তিনি নিদ্রিত ছিলেন নচেৎ প্রাণ থাকিতে ঐ ব্যাপার ঘটিত না। মেহেরও কহিলেন তিনি প্রথম প্রথম মনে করেছিলেন সখী স্বামীর উত্তেজনায় অবসন্ন হইয়াছিলেন; কিন্তু যখন সখীর ভাব হৃদয়ে উদয় হয় তখন সে সন্দেহ থাকে না। তথাপি কেন আর সখীকে যন্ত্রণা দিবেন ভেবে যতদিন পারিয়াছিলেন সংবাদ দেন নাই এখন আর থাকিতে পারিলেন না।

আমীরজান কহিলেন "তবু ভাল এত দিনের পর হতভাগিনীকে মনে পড়েছে, এও সুখ। এখন কোথা ছিলে বল।" মেহের কহিলেন, "ভাই বৃষ্টির ও তমসাময় রজনীর সাহায্যে আমি এক বাঁশবনে লুকাইলাম। প্রাতে কোথা যাইব জানি না। এমন সময় এক প্রাচীনা দৃষ্টিগোচর হইলে আমি তাঁহার পদানত হইয়া কাঁদিলাম। বলিলাম আমি সদ্য বিধবা হইয়াছি; আমার ভাশুর আমাকে বিষয় লোভে বিবাহ করিতে চাহেন, তিনি অসচ্চরিত্র, আমি আর বিবাহ করিব না বিষয়ও চাহি না। ভয়ে পলায়ন করে এসেছি আশ্রয় পেলে বাঁচি। বৃদ্ধা আপন বাটীতে লয়ে গেলেন এবং তাঁহার এক মাত্র কন্যা আমার সখী হইলেন। কএক মাস তথায় সুখে ও নির্ব্বিঘ্নে কালযাপন হইল। পুরুষের সংস্রব সে বাটীতে ছিল না।"

আমীর। সে বাটী ছাড়িলে কেন?

মেহের। কিয়ৎকাল পরে সেই বৃদ্ধার জামাতা বিদেশ হইতে ঘরে আসিল। বৃদ্ধা ও তৎকন্যা ঐ জামাতার বিদ্যা ধর্ম্ম ও সচ্চরিত্রের প্রভৃত প্রশংসা করিলেন। আমিও দেখিলাম যুবাটী সহৃদয় ও ভদ্র বটে। আমার কথায় যুবা অনেক অনুকম্পা প্রকাশ করিলেন। যুবার মতে স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা বিদ্যালোচনা এবং ধর্ম্ম-চর্চ্চা একান্ত প্রয়োজনীয় যুবা আপন বন্ধুর সহিত স্বীয় স্ত্রীর আলাপ করাইলেন। আমার সহিত আলাপ করিবার তাঁহার নিতান্ত বাঞ্ছা। যুবার সরলতা দৃষ্টে এবং বিদেশ হইতে যদি এই ব্যক্তি দ্বারা জীবিতেশ্বরের বার্ত্তা পাই এই আশায় আমি তাঁহার সহিত আলাপ করিতে সম্মত হইলাম। আলাপেও যুবার প্রতি আমার শ্রদ্ধা জন্মিল।

আমীর। পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা বড় ভাল কথা নহে, তার পর।

মেহের। বলেছ ভাল, সে শ্রদ্ধার উচিত ফল পাইয়াছি। একদা প্রথম রজনীতে আমার সখী ও আমি সখীর শয্যায় শয়িত হইলাম। আমি তথায়

নিদ্রা যাইলাম; কিন্তু তাঁহায় বলে রাখি সখী যেন আমাকে তাঁহার স্বামী এলে উঠাইয়া দেন। সহসা নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া দেখি শয্যায় সখী নাই এবং তাঁহার স্বামী আমার পার্শ্বে বসিয়া আছে। যেমন ধড়মড়িয়া উঠিতে যাব, যুবা হাত ধরিয়া থামাইল ও কহিল ভয় কি, আমি তোমার বন্ধু. তোমার অহিতাশঙ্কা কি? সে আশ্বাস বাক্যে বিশ্বাস না করিয়া আমি সখীর নাম করিয়া ডাকিলাম। উত্তর নাই—অথচ গৃহ-পার্শ্বে চুড়ীর শব্দে সখির আবির্ভাব ও গোপন জানিলাম। তখন বুঝিলাম, স্ত্রী পুরুষের ষড়যন্ত্র। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া শয্যা হইতে উঠিলে যুবা বলপূর্ব্বক হাত ধরিয়া বসাইল। মুখমধুর বাক্যে তুষ্ট কহিতে লাগিল; "সুন্দরী তুমি বিধবা অসহায়া, তোমার রক্ষার জন্য আমি তোমাকে বিবাহ করিতে আসিয়াছি এবং ইহাতে আমার সরলা স্ত্রীরও অভিমত আছে।" আমি হাত ছাড়াইয়া কহিলাম "বিবাহ কি গোপনে হয়, না বলে হয়?" যুবা কহিল "না না, বল কি? গোপন কি?"—আজ যদি তোমার হৃদয় পাই কাল প্রকাশ্যে বিবাহ করিব; আর স্ত্রীলোকের উপর একটু কৃত্রিম বল প্রকাশ না করিলেও লজ্জা ভাঙ্গে না।"

আমি দেখিলাম সমূহ বিপদ্, কিন্তু জানি যুবা একপ্রকার নির্ব্বোধ চাটুকার বংশ। আমি তখন—সচ্ছন্দ হইয়া বসিয়া বলিলাম—"তবে তোমাকে ভয় করিতে হইবে না, তুমি আমার ধর্ম্মনাশ করিতে এস নাই। হবেইত তুমি এমন বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক। আমার অপরাধ হইয়াছে স্ত্রী-সুলভ সন্দেহে তোমার উপর কলঙ্কপাত করিতেছিলাম।"

যুবা কহিল, "সত্যইত, তুমি সুবোধ, আমি যে তোমার উপযুক্ত পাত্র ও তোমার হৃদয় পাইবার অধিকারী তাহা বোধ হয় বুঝাইতে হইবে না। আর নির্ব্বোধেরাই বল প্রকাশ করিতে যায়।

আমি কহিলাম, "সুন্দর পুরুষ, জানিয়াছি, তুমি আমার বন্ধু তোমাকে বিবাহ করিতে আমার কোন আপত্তি নাই; তবে কি না আমার এক প্রতিজ্ঞা আছে যে আমি পুস্তকে এক সমস্যা পড়িয়াছি এবং প্রাচীনগণের মুখে শুনিয়াছি উহা প্রকৃত ঘটনা। সেই সমস্যার বিবরণ যে বলিতে পারিবে আমি তাহাকে বিবাহ করিব।"

যুবা কহিল—"সমস্যা কি?"

আমি অনেক দিন হইতে এক শ্লোক করে রেখেছিমাম, বলিলাম,

"নবীন সন্ন্যাসী এক বসি বৃক্ষোপরি।
কাঠকুড়ানীরে করে রাজরাজেশ্বরী॥
হৃদে প্রেম থাকে ছাড়ি অসাধ্য সাধন।
পথ চেয়ে আছে তারে করহ বরণ॥

যুবা কহিল। "একি? কোথায় ইহার অর্থ জানা যাইবে বল?"

আমি কহিলাম, রেঙ্গুণে যে চট্টগ্রামীয়েরা আছে ইহার বিবরণ তাহার মধ্যে

কেহ না কেহ জানে শুনেছি। অনায়াসে তাহা লব্ধ হইতে পারে।

যুবা কহিল "আচ্ছা ইহাতে তোমার লাভ কি?" আমি কহিলাম, "সব আপনাকে বলিব? ইহার গূঢ় অর্থ আছে। যে আমার জন্য বিদেশে একটা সন্ধানে বেড়াইবে ও সফল হইবে, অবশ্য তাহার প্রণয় গাঢ়।"

যুবা কহিল "হুঁ। বটে। আচ্ছা আমি কল্যই রেঙ্গুনে যাইব।"

এইরূপে সহজে দুষ্ট যুবার হাত এড়াইলাম। কোথা যাই ভাবিয়া কিছুদিন সেই বাটীতেই রহিলাম যতদিন যুবা বিদেশে থাকে। কিয়ৎকাল নির্ব্বিঘ্নে রহিলাম।

আমীরজান। আবার কি সে মিন্‌সেটা এল? বাড়ী ছাড়িলে কেন?

মেহের। সেই আমার সখী, নাম করিম বিবি, স্বামীর আদেশমত স্বামীবন্ধু একযুবার পাঠনায় নিযুক্ত হইল। একদা দেখিলাম যুবা ও করিম এমত ভাবে বসিয়াছে এবং চুম্বনাদি কার্য্যে এরূপ লিপ্ত আছে যে গুরু শিষ্য সম্বন্ধ অসম্ভব। বৃদ্ধাকে কহিলাম, বৃদ্ধা কহিলেন "ছেলে মানুষ উহারা আমোদ করে তাহাতে দোষ কি?" বৃদ্ধা ও তাঁহার কন্যার আবরণ দেখে সংসারে হত শ্রদ্ধা করিয়া সেই সুখের কাঠকুড়ানী অবস্থা মনে ভাবিয়া এই বনে এসে পড়িলাম।

আমীরজান কহিল, "তোমার তিতিক্ষা হতে পারে কিন্তু ভাই এখন এ যৌবনকালে বনে অসহায়া থাকাও নিরাপদ নহে।"

মেহের। কেন আহারের উপায় হইলে ভয় কি?

আমীর। আমি থাকিতে সে উপায়ের ভাবনা নাই। তবে যদি তোমার সন্ধান পেয়ে দুষ্ট লোক আসে।

মেহের। আর কিছু উপায় আছে?

আমীর। আমার এক বুড় দাদা আছেন তাঁহার কেহ নাই—তাঁহার আশ্রয়ে থাকিলে গোপনে নিরাপদে থাকিবে।

মেহের। না ভাই, আর সাহস হয় না, বনে থেকে দেখি। মরিলে হয় কিন্তু ক্রমে ক্রমে তুমি থামাইলে, আর সেদিকে সাহস হয় না।

আমীর। "আচ্ছা বনের সাধ মিটুক চল্ ভাই, একবার তোর কুঁড়ে দেখি।" কুটীর-মধ্যে কষ্টে উভয়ের সমাবেশ হইল। দীপালোকে আমীরজানকে দেখিয়া মেহের আশ্চর্য্য হইলেন ও কহিলেন "সেকি বন্! তোমায় চেনা ভার, এদশা কেন?" তখন আমীরজান স্বীয় পতির ব্যবহার বর্ণন করিয়া কহিলেন, "পুরুষ কি লোক, বিবাহ কি সুখ, তা কি জান নাই তাই আশ্চর্য্য হইতেছ। আমিও নূতন দুর্দ্দশায় পড়েছি তাই এমন; এরপর সহে যাবে ও যেমন তেমনি হইব।"

আমীরজান সখীর সহায়ার্থ এক বৃদ্ধ ফকীরকে অর্থ দ্বারা বস করিয়া মেহেরের রক্ষক করিয়া দিলেন এবং সতত তাঁহাদের আহারীয় পাঠাইতে লাগিলেন। এক রাখাল

বালক দ্বারা সর্ব্বদা সংবাদ লইতে লাগিলেন। একদা ঐ বালক কহিল "বাকরআলি জন কএক লোকদ্বারা বৃদ্ধকে বাঁধিয়া রাখিয়া মেহেরকে বনের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছে সন্ধ্যার পর বাকরআলি স্বয়ং আসিয়া রমণীর ধর্ম্মনাশ করিবে।"

তৎকালে ফজরআলি ও মোক্তার উভয়ে বিদেশে। বাকর আলি দেশের কর্ত্তা, তাহার প্রভূত ক্ষমতা। আমীরজান আবজানি দ্বারা বাকরকে অনুনয় করিয়া পাঠাইলেন, সে কহিল ও সব কথায় ভদ্রঘরের মেয়ের কাজ নাই। আমীরজান মনে করিলেন, বাকর তাঁহার নিজকথায় ভয় করিবে; অতএব সন্ধ্যার পর আবজানি সহ বনে গিয়া দেখিলেন, মেহেরন্নিসা নিজবস্ত্রে এক বৃক্ষে বাঁধা আছেন এবং চতুর্দ্দিকে প্রহরী নিযুক্ত আছে। সম্মুখে আলোক জন্য অগ্নিকুণ্ড জলিতেছে। আমীরজান অর্থদ্বারা প্রহরীদের বশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন এমত সময় বাকর উপস্থিত। বাকরকে দেখিয়া আমীরজান ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন, "বাকুরে! তোর আক্কেল কি? আমার স্বামীর পত্নীর প্রতি অত্যাচারে প্রবৃত্ত হয়েছিস্, জানিস্ না বাবা এলে আজ্ তোর কি দশা করিতাম।"

বাকুরে ভয় পাইবার লোক নহে—মান্য করিবার লোকও নহে, তবে নিজের বিপদ করিতেও চাহেনা। সে ভাবিল কুলবধূ আমীরজান বনে এসেছে একথা সে বলিতে পারিবেনা এবং এখন যাহা কর তাহা ফজর ও মোক্তারের গোচর হইবেক না, ভয় কি? বাকর কহিল; "তুই কেরে ছুঁড়ি, মোক্তারের মেয়ে বলে পরিচয় দিতেছিস্, মোক্তারের মেয়ে কি বনে আসে? ও ছুঁড়ীকেও বাঁধ, ছুটো জুটলো, ভাল হল।" আমীরজান বৃথা তিরস্কার গর্জ্জন করিয়া পলায়নোন্মুখী হইলে, বাকরআলি স্বয়ং তাঁহাকে ধরিয়া বিবস্ত্র করিয়া বৃক্ষে বাঁধিল। আবজানি কাঁদিতে কাঁদিতে ঝরঝর‍্যা বটতলাভিমুখে দৌড়িল।

তৎকালে দুই. তিন দিন হইল বটতলা বাগানে এক দল মগ তাঁবু খাটাইয়াছিল। ক্রন্দনের কারণ শুনে আবজানি সহ মগেরা বন্দী রমণীদের কাছে গেল এবং আততায়ীরা পলায়ন করায় বন্দীদের উদ্ধার করিয়া মগেরা তাঁবুতে এল। পরে পরিচয় লইয়া লোক সহ আমীরজানকে স্বভবনে পাঠাইল, কিন্তু মেহেরন্নিসাকে সমভিব্যাহারে রামগড়াভিমুখে লইয়া গেল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

জগন্নাথ পুরীর দক্ষিণাংশে চিলকা নামক এক বিস্তীর্ণ সরোবর আছে। তাহা একটী বালুচরে সমুদ্র হইতে বিভিন্ন হইয়াছে। সমুদ্রের সহিত যোগে এই সরোবরের উপকূলে কএকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্দর আছে। বড় বড় জাহাজ মুখ দিয়া প্রবেশ করিতে পায় না; তাহাতে এ সকল বন্দরে অর্ণবপোত আসে না।

ঐ চিলকার দক্ষিণে গঞ্জাম বন্দর। জগন্নাথ-পুরীর দক্ষিণে এইটীই প্রধান বন্দর বলিতে হয়। বন্দরের নগরটী অতি সামান্য। খড়ো দোকান ঘরই অধিক। একটী ক্ষুদ্র নদী এই স্থলে বঙ্গোপসাগরে মিশ্রিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা দুরদেশাভ্যন্তরের পণ্য দ্রব্য সকল সাগরকূলে নীত হয়। মাজী মাল্লা চড়নদারগণের জন্য গঞ্জামে দুই একটী চটী আছে। এ সকল স্থলে বারনারীদেরও বড় ভিড়। জাহাজের মাল্লা ও নৌকার মাল্লারা তাহাদেরই লয়ে আমোদ প্রমোদ করে ও রাত্রি কাটায়।

দোকান ঘরের শ্রেণীর পশ্চাৎ ও বারনারীদের দোকানের সম্মুখে অপেক্ষাকৃত একটী প্রশস্তস্থলে, বহুলোকের সমাবেশ হইয়াছে। দর্শক-মধ্যে বারনারী, মাজীমাল্লা ও দোকানদারই অধিক। "কুমুর" নামক অতি অশ্লীল স্ত্রী-যাত্রা যে বাঙ্গালার দক্ষিণ দেশে প্রচলিত আছে, তদনুরূপ উড়িয়া স্ত্রী-যাত্রা হইতেছে। অন্ধকার রজনী; মশাল জ্বালিয়া নৃত্যগীত হইতেছে। মণ্ডলীর কিঞ্চিৎ দূরে একটী গৃহের পশ্চাতে দুইটী ব্যক্তি কথোপকথন করিতেছে।

১ম ব্যক্তি। সত্য জান, ধ'রে বনবাড়ীতে আটক করেছে? এইবারে মারিবে। আহা! লোকটী বড় ভাল ও নবীন বয়স। তবে শত্রুর হাতে কি দয়া আছে।

২য় ব্যক্তি। দয়া!—অমন দজ্জাল খড়িবাজের উপর দয়া করিলে আর সংসারে টেঁকা দায়। বল কি? শঙ্করসিং তার ভয়ে বনবাস আছে। আর আমাদের কর্ত্তা এই বুড় বয়সে অস্থিচর্ম্ম সার,—কেবল তারই জন্য। ছোঁড়াটাকে তিনি পুত্রবৎ ভাল বাসিতেন, ছোঁড়াটা এখন তার প্রাণ লয়ে টানাটানি কর্‌ছে! একে ছোঁড়া একাই সিংহ-অবতার, আবার বেন্‌কাটা চারিলু তাহার সহায়। মেহের আলি ও বেন্‌কাটা যাঁর শত্রু, তাঁর তিলার্দ্ধ বিশ্রাম নাই।

১ম। মেহের আলিকে লয়ে গেল কেমন করে? তারত মাজিমাল্লা সহায় অনেক।

২য়। ভাই! হাজার হোক বুড় হাড়। মোক্তার সাহেব দুষ্টচর দ্বারা মেহেরকে সংবাদ দেওয়ান যে শঙ্করসিং বনবাড়ীর নিকটে আছে। ঐ গুপ্তচর প্রত্যয়ার্থ মেহের আলিকে তথায় ল'য়ে যায়। একটী বনবাসী বুড়াকে এমনি গ'ড়ে রেখেছিল, যে উহারা যাইবা মাত্র সে কহিল, লোকজন অনেক দেখে, শঙ্করসিং নামক যে ব্যক্তি এই বন-বাড়ীতে ছিল, এই পলাইল। অনেক অনুসন্ধানে পাওয়া গেলনা। গুপ্তচর বলিল "আপনি গোপনে আমার সহিত রজনীতে আসিবেন ধরাইয়া দিব ও পুরস্কার লইব।" সেই বিশ্বাসে মেহেরআলি গেল ও এক ঘরে যেমন প্রবেশ করেছে—অমনই গুপ্তচর বহির্দ্বার বন্ধ করিল।

১ম। তার পর, মেহের আছে না মরেছে?

২য়। অদ্য রাত্রিতে মোক্তার দলবল সহ গিয়া মারিবে। মেহের আজ পাঁচদিন অনাহারে আবদ্ধ আছে। বাছাধন!—(কিঞ্চিৎ শিহরিয়া সহসা স্থগিত হইল ও কহিল)—"রও, কে যেন নিঃশ্বাস ফেল্‌ছে না?

১ম। কে? কেহ নহে স্থানটা খারাপ, সরে চল; সাপ থাকিতে পারে।

কিঞ্চিৎ ফাঁকে আসিয়া পুনশ্চ কথোপকথন আরম্ভ হইল।

১ম। আচ্ছা, মেহেরত চারিলুর সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন কাজ করেনা;—একথা তাহাকে বলে নাই কি?

২য়। গুপ্তচর কৌশল করে অতি-তাড়াতাড়ি করিল এবং কাহাকেও প্রকাশ করিলে, টের পাবে এবং পলাইবে বলে জানাতে দেয় নাই। নয়ত;—রহ,! কার পার শব্দ?

১ম। ভিড়ের লোক কে কোথায় যাইতেছে।

২য়। না না, যেন দুইজন লোক আমাদের কথা শুনিতেছিল।

বলিতে বলিতে শুভ্রবেশী একজন ত্রস্ত ভাবে চলে গেল, আলোকের আভায় দেখাগেল। কথোপ-কথন করিয়া অনুসরণ করিল। দ্বিতীয় ব্যক্তির হস্তে ছুরিকা ছিল, শপথ করিল পাইলে গোপন-শ্রোতা গণকে জীবিত রাখিবেনা, রহস্য ভেদ না হয় এই ইচ্ছা। ভিড়ের মধ্যে একটু বহির্ভাগে একজন শুভ্রবেশী দাঁড়াইয়া ছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি সহসা তাহার উদরে ছুরিকা আঘাত করিল সে চীৎকার করিল। কে খুন করিল বলে যাত্রা ভেঙ্গে গেল ও খুনের কাছে ভিড় হইল। দ্বিতীয় ব্যক্তি পলাইয়াছে, প্রথম ব্যক্তি দাঁড়াইয়া দেখিল। শুভ্র-বেশী পুরুষ আর কেহ নহে, সেই গুপ্তচর, যে মোক্তারের পরম বন্ধু। মোক্তারের জাহাজের লোক তাহাকে ধরে জাহাজে লইয়া গেল এবং আঘাতকারী পর্য্যন্ত তাহার শুশ্রূষা করিল। অল্পক্ষণেই পুলিস এসে খুনী ব্যক্তিকে, ও যাহারা ধরে আনে, স্বাক্ষী বলে, তাহাদের লয়ে গেল। গুপ্তচর মরিবে, ডাক্তার কহিল আঘাত সাংঘাতিক। পুলিসের গোলোযোগে সে রাত্রি ও পরদিন মোক্তার ও দলবল বনবাড়ীতে চির-শত্রু মেহের আলিকে মারিতে যাইতে পারিল না। গুপ্তচর মনোহর বস্ত্রে মণ্ডিত হয়ে আহ্লাদে যাত্রা শুনিতে গিয়া আপন দলের হাতে বিপদে পড়িল। পাপের শাস্তি।

পরদিন বৈকালে নিকটবর্ত্তী নদী দিয়া এক ক্ষুদ্র নৌকায় তিনটী আরোহী যাইতেছিল। দুইটী মাঝি প্রাণপণে দাঁড় টানিতেছে ও গান করিতেছে। আরোহী একজন, ছইএর বাহিরে তামাকু সাজিতেছে। আর দুইজন চুপি চুপি কথা কহিতেছে। একজন ভদ্রবেশী, একজন ইতর।

ভদ্র। তুমি কেমন করে জানিতে পারিলে ও সন্ধান পাইলে?

ইতর। মহাশয়! আমি যাত্রা শুনিতে-

ছিলাম, প্রস্রাব জন্য ঘরের কানাচে যাই। তথায় কাহারা ফুস্ ফুস্ করিতেছে শুনিলাম এবং আপনার ও মেহেরের নাম করিতেছে শুনে আপনাকে সংবাদ দিলাম।

ভদ্র। ভাগ্য! ঐ দিন দোকানে গিয়াছিলাম তাই বন্ধুর বিপৎ-রহস্য সময়ে জ্ঞাত হইলাম। ভাগ্য! আমাকে না পেয়ে, গুপ্তচরকে দুষ্ট আঘাত করেছিল তাই আজ বন্ধুর সাহায্যে যাইতেছি। ভাগ্য! পুলিসের গোলোযোগে মোক্তার আবদ্ধ ছিল, তাই এখনও বন্ধু জীবিত আছেন। এখন বন্ধুকে মুক্ত করিতে পারিলে হয়!

ইতর। আর ভয় নাই, মোক্তার বোধ হয় এখন আসিতে পারে নাই।

ভদ্র। যদি এসে থাকে, এবং দলবল আনে কি করে কার্য্য সিদ্ধ হইবে?

ইতর। আপনি একা সহস্র লোক; হরিদাসও কম নয়! এবং ক্ষুদ্র মুদ্র আমি ও বড় কম নহি। তিন জনে যদি ৩০ জনের মওড়া না লইতে পারি, মাএর দুধ খেয়েছি কেন?

হরিদাস তামাকু সাজিতেছিল, তাল ঠুকে বলিল হাজার লোককে পারি।

নদীর ঘাটের দশ ক্রোশ উপরিভাগে পাহাড়ের অঞ্চলে একটী কুটীর আছে। এক সন্ন্যাসী তথায় থাকিত। সময়ে সময়ে গ্রামবাসীরা বন-ভোজনে গিয়া তথায় আশ্রয় লইত। এজন্য ঐ কুটীরের নাম বনবাড়ী। বহুদিবস তথায় আর লোক জনের গতায়াত নাই। বনবাড়ী পরিত্যক্ত ও অরণ্য-বেষ্টিত হইয়াছে। রাখালেরা তাহা মেরামত করিত ও সময়ে সময়ে তাহাতে বিশ্রাম লইত। অধুনা শঙ্কর সিংহকে, মেহেরের ও চারিলুর আক্রোশ হইতে রক্ষার জন্য তথায় লুক্কায়িত করে রেখেছিল। যে অবধি মেহের ধৃত হয়েছেন, শঙ্কর গগ্রামে গিয়াছিল। "বনবাড়ী" নাম প্রসিদ্ধ, কিন্তু দেখিতে অতি সামান্য কুটীর মাত্র।

কুটীরের অভ্যন্তরে মেহেরআলি মৃতবৎ পড়িয়া আছে। ৫ দিন জল ও ফল বিনা কোন আহার পান নাই; অনাহারে অচেতন প্রায় রহিয়াছেন। তাহাতে আবার বন্ধন দশা। পার্শ্বে আসগরআলি মোক্তার, ফজরআলি, শঙ্কর সিং ও আরও জন কএক লোক পরামর্শ করিতেছে। মেহেরকে তিরস্কার গালি ত যথেষ্ট দিয়াছে; তাহারা ও মেহের উভয়েই ক্লান্ত হয়ে নীরব হয়েছে। এখন কিরূপে মনের মত যন্ত্রণা দিয়ে পরম শত্রুকে বধ করা হইবে তাহারই পরামর্শ হইতেছে। জাহাজটী লইবার অভিপ্রায়ে একটী বিক্রয় পত্র সহি করাবার জন্য অনেক ধস্তাধস্তি করা হইয়াছিল, হইল না। মেহেরআলি নিরুপায় হয়ে মরিতে স্বীকার; কিন্তু কাপুরুষ হইয়া কোন বিষয়ে অনিচ্ছাস্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। আরও বিরক্ত হইয়া, আততায়ীরা যন্ত্রণা স্থষ্টির উপায় ভাবিতেছে। পরামর্শে স্থির হইল অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া, প্রত্যেক বৈরী ক্ষুদ্র ছুরিকা দ্বারা মেহেরের শরীরের কোন

কোন অংশ আপন বৈরনির্যাতন স্বরূপ লইয়া অগ্নিকুণ্ডে ফেলিবে। শেষে লবণ দিয়া, ক্ষত-স্থল দিগুণ-যন্ত্রণা-দায়ক করিয়া, অগ্নিতে দেহাবশেষ ক্ষেপ করিবে।

বহির্ভাগে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বালিত হইল। অস্ত্র, লবণ, সংগৃহীত হইল। মেহেরকে ধরিয়া তথায় আনা হইল। যেমন বক্তৃতা শেষ করে স্বীয় স্বীয় দুরভিসন্ধি সাধনে প্রবৃত্ত হইবে, সহসা অরণ্য হইতে কয়েক ব্যক্তি লগুড় প্রহারে আততায়ীদের ভয়-ত্রস্থ করিল ও তাহারা পলায়ন করিল। কত লোক, কোথা হইতে, কি জন্য, আসিল কেহ জানিতে না পারায় আরও ভয় পাইল। পলায়ন-কারীদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অজ্ঞাত ব্যক্তিরা ধাবমান হইল। শঙ্কর সিংহ ধরা পড়িল এবং অগ্নিকুণ্ডের কাছে নীত হইল। আসগরআলি মোক্তার-ও ধরা পড়িতেন কিন্তু তাঁহাকে অপরে সাহায্য করায় পলাইতে সক্ষম হইলেন। তথাপি তাঁহার দক্ষিণ হস্তে বিলক্ষণ আঘাত লাগিয়াছিল এবং বোধ হয় সে আঘাত চিরস্থায়ি হইবে।

অজ্ঞাত ব্যক্তিরা আর কেহ নহে, চারিলু ও তাহার দুই অনুচর। তিন জনের দাপটে বহু লোকের ন্যায় প্রভাব প্রকাশ হয়। চারিলু আসিয়াই অগ্নি-কুণ্ডের কাছে গিয়া ভয়ানক ব্যাপার দেখিলেন। দেখিয়া অরণ্য হইতে বৃক্ষশাখা কাটিয়া লগুড় প্রস্তুত করিয়া দুষ্টগণকে দূর করিয়া দেন। মেহেরকে বন্ধন-মুক্ত ক'রে, শঙ্করকে বন্ধন করিলেন। পরে সেই অগ্নিকুণ্ডে শঙ্করকে নিঃক্ষেপ করিয়া মেহেরকে নৌকা করিয়া লইয়া গেলেন। মেহের তখনও অচেতন।

শঙ্কর সিংহের অপরাধ অধিক, যাঁহার অধিক অপকার করেছে, তিনিই আজ তাহার প্রাণদণ্ড দিলেন। যাঁহার প্রতি বৈরনির্যাতন জন্য শঙ্কর সিং নিয়োজিত হইয়াছিল, সেই মেহের আলি আজ অচেতন। অচেতন না হইলে হয়ত শঙ্করের প্রাণ বিনাশ হইত না, দুর্গাপতির ন্যায় দূর-নিঃক্ষিপ্ত হইত মাত্র। মেহেরও হয় ত আসগর আলির দুরভিসন্ধি-জাল মৃত্যু-শয্যায় শঙ্কর সিং হইতে কতক শুনিয়াছিলেন। মরণকালে শঙ্কর স্বীকার করিল আসগর আলির প্ররোচনায় সে ঐ গর্হিত কার্য্য করিয়াছে এবং তাহার সমুচিত প্রতিপ্রতিফলও পাইল।

ক্রমশঃ।

পাণিনি।

বাবু রামদাস সেন মৎপ্রণীত "পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির আবির্ভাব-কাল-নির্ণায়ক প্রস্তাবের" "সমালোচন উদ্দেশে" যেরূপ যুক্তি ও তর্কের আশ্রয়-গ্রাহী হইয়া পাণিনি-বিচার পরিসমাপ্ত করিয়াছেন, তাহা কতদূর সঙ্গত হইয়াছে, বিবেচনা

করিবার জন্য প্রত্নতত্ত্ব-প্রিয় সহৃদয় পাঠক-বর্গের সমক্ষে এই প্রস্তাবটী উপস্থাপিত করিতে ব্রাধ্য হইলাম।

প্রাচীন বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান অনায়াস-সাধ্য নহে। মানব কল্পনা-সম্ভূত-কিম্বদন্তী উপকথা প্রভৃতিতে এই বিষয় এরূপ সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে যে, ইহা হইতে সত্য সংগ্রহ করিতে হইলে পদে পদে দিশাহারা হইতে হয়। ঈদৃশ সংশয়-তরঙ্গায়িত বিষয়ের সিদ্ধান্ত যে সম্পূর্ণরূপে দোষ-সম্পর্ক-শূন্য ও প্রমাদরহিত হইবে, এরূপ প্রত্যাশা করা যায় না। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতগণ প্রাচীন বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া যে যে মত উপন্যস্ত করিতেছেন, কালক্রমে তাঁহার কোনটী যথার্থ কোনটী বা অযথার্থ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। আমি এইরূপ মত-বিসম্বাদিতাকে স্থূলক্ষ্য সত্যের প্রসূতি মনে করি। মতের পার্থক্য নিবন্ধন ভিন্ন ভিন্ন যুক্তি ও ভিন্ন ভিন্ন বিচার-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইবে; এইরূপ যুক্তি ও বিচারের সংঘাতে সর্ব্ব প্রকার সংশয়-জাল বিচ্ছিন্ন হইয়া পরিণামে সিদ্ধান্ত-ক্ষেত্র পরিষ্কৃত ও অনায়াস-গম্য হইতে পারে।

এই কারণে আমি রামদাস বাবুর পাণিনি-বিষয়ক প্রবন্ধ আদর-সহকারে পড়িয়াছি। এক্ষণে রামদাস বাবু যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা বিশুদ্ধ যুক্তির কতদূর অনুমোদিত, একবার বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক।

রামদাস বাবু "পাণিনির কাল-নির্ণয়ের বিশেষ প্রমাণাভাবে" বৌদ্ধ পণ্ডিত তারানাথ ও পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতির মতানুবর্ত্তী হইয়া বৃহৎকথার প্রমাণানুসারে পাণিনিকে মগধরাজ নন্দের সমসাময়িক ও খৃষ্টের চারি শত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

বৃহৎকথা উপন্যাস গ্রন্থ। ইহা অবলম্বন করিয়া কোন বিষয়ের কাল বিনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হওয়া সঙ্গত নহে। রামদাস বাবু স্বপ্রণীত ঐতিহাসিক রহস্যের স্থানান্তরে লিখিয়াছেন, "কেহ কেহ 'বৃহৎ কথার' রামায়ণ ও মহাভারতের ন্যায় সম্মান করিয়া থাকেন, কিন্তু মিথ্যা গল্পের পুস্তকের এত মান্য (১) করিতে হইলে আরব্যোপন্যাসও প্রকৃত ইতিহাস বিবেচনা করিতে হয়। বিশেষতঃ পাণিনি মুনি কখনই কাত্যায়ন বররুচির সমকালবর্ত্তী ছিলেন না। এজন্য 'বৃহৎ কথার, প্রমাণ অগ্রাহ্য হইতেছে" (২)। রামদাস বাবু এক স্থলে বৃহৎ কথাকে মিথ্যা গল্পপূর্ণ ও আরব্যোপন্যাসের সমশ্রেণীক

(১) 'মান্য' পদটী বিশেষণ। সুতরাং "পুস্তকের মান্য করা" বাক্য ব্যাকরণ ও রীতি-বিশুদ্ধ নহে। এস্থলে 'মান্য' পদের পরিবর্ত্তে 'সম্মান' লিখিলেই বিশুদ্ধ বাঙ্গলা হইত। রামদাস বাবু বাঙ্গালা লিখিতে যাইয়া চ্যুতসংস্কৃতি দোষে পতিত হইয়াছেন।

(২) ঐতিহাসিক রহস্য। প্রথম ভাগ। ৬০ পৃষ্ঠা।

বলিয়া তৎপ্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন; পুনর্ব্বার অন্য স্থলে সেই মিথ্যা গল্পের পুস্তককেই "বিশেষ প্রমাণাভাবে" সত্য-পূর্ণ পবিত্র ইতিহাসের সম্মানিত পদে স্থাপন করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয়েন নাই। প্রত্ন-তত্ত্ব-প্রিয় সত্যানুসন্ধায়িগণ এক জনের লেখনী-বিনির্গত পরস্পর এইরূপ বিরুদ্ধ বাক্যে কিরূপ আস্থা প্রদর্শন করিবেন, বলিতে পারি না।

কোন বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া প্রতিকূল-বাদীর মত খণ্ডন করিতে হইলে সর্ব্বাদৌ তাঁহার প্রধান যুক্তির মূলোচ্ছেদ করিতে হয়। বিচারের এই চিরন্তন পদ্ধতির বহিশ্চর হইয়া বিষয়ান্তরের তর্ক উপস্থিত করা উচিত নহে। গোলড্‌ষ্টুকর ৮। ২। ৫০ সংখ্যক "নির্ব্বাণোহবাতে" সূত্র অবলম্বন করিয়া যে ভাবে পাণিনিকে বুদ্ধের পূর্ব্বসাময়িক স্থির করিয়াছেন, রামদাস বাবু তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই, অথচ "আরণ্যক" প্রভৃতি কয়েকটী শব্দের উল্লেখ করিয়া গোলড্‌ষ্টুকরের মত ভ্রান্তি-পূর্ণ বলিয়াছেন। এস্থলে রামদাস বাবুর প্রবর্ত্তিত বিচার অব্যাপ্তি-দোষাভ্রাত হইয়াছে।

গুণাঢ্যের উপকথা (৩) পাণিনি, ব্যাড়ি ও কাত্যায়নকে এক সময়ে সন্নিবেশিত করিয়াছে। আচার্য্য গোলড্‌ষ্টুকর এই মতের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক পাণিনি ও কাত্যায়নের আবির্ভাব-সময়ের পার্থক্য প্রমাণ করিতে যাইয়া এই কয়েকটী যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেনঃ—

১ম। পাণিনির সময়ে যে সমস্ত বৈয়াকরণিক নিয়ম প্রচলিত ছিল, তাহা কাত্যায়নের সময়ে অপ্রচলিত বা অবিশুদ্ধ হইয়া উঠে।

২য়। পাণিনির সময়ে শব্দ সমূহ যে যে অর্থদ্যোতক ছিল, তাহা কাত্যায়নের সময়ে অনেক রূপান্তরিত হইয়া যায়।

৩য়। পাণিনি-প্রযুক্ত শব্দার্থ-সমূহ কাত্যায়নের সময়ে অপ্রচলিত ছিল।

৪র্থ। কাত্যায়নের সময়ে যে শব্দশাস্ত্র প্রচলিত ছিল, তাহা পাণিনির সময়ে পরিজ্ঞাত ছিল না।

এই যুক্তি চতুষ্টয়ের প্রথমটীর উদাহরণ স্থলে ক্লীবলিঙ্গান্ত একতর প্রভৃতি শব্দের রূপ করিবার প্রণালী, দ্বিতীয়টীর উদাহরণ স্থলে আশ্চর্য্য প্রভৃতি শব্দের অর্থ, তৃতীয়টীর উদাহরণ স্থলে প্রত্যবসান প্রভৃতি শব্দ এবং চতুর্থটীর উদাহরণ স্থলে আরণ্যক প্রভৃতির অর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে। গোলড্‌ষ্টুকর এই উদাহরণ গুলি দেখাইয়া প্রমাণ করিয়াছেন, পাণিনি ও কাত্যায়ণ এরূপ বিভিন্ন সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন যে, শব্দ-শাস্ত্রের যে যে অংশ পাণিনির সময়ে প্রচলিত ছিল, তাহা কাত্যায়নের সময়ে অপ্রচলিত এবং যাহা পাণিনীর সময়ে অপরিজ্ঞাত ছিল, তাহা কাত্যায়নের সময়ে

(৩) বৃহৎ কথা ভূতভাষাখ্যো গ্রন্থভেদঃ। গুণাঢ্যস্তৎকর্ত্তা। ভূতভাষাপ্রণীতাসৌ গুণাঢ্যঃ কবিরুচ্যতে।"

বাসবদত্তা টীকায় নরসিংহ বৈদ্যধৃত বাক্য।

প্রচলিত হইয়া উঠে। সুতরাং গোলড্‌ষ্টুকরের উপন্যস্ত এই দৃষ্টান্ত গুলি, পাণিনি কাত্যায়ন যে, বিভিন্ন সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহারই সমর্থন করিতেছে, পাণিনি যে বুদ্ধের পূর্ব্ব-সাময়িক তাহার পোষকতা করিতেছে না।

রামদাস বাবু পাণিনির "কাল-নির্ণয়ের বিশেষ প্রমাণাভাবে" বৃহৎ কথার মত বলবৎ রাখিবার নিমিত্ত 'আরণ্যক' প্রভৃতি কয়েকটী শব্দ লইয়া বিচার আরম্ভ করিয়াছেন। গোলড্‌ষ্টুকর, উদাহরণ স্থলে যে "আরণ্যক" প্রভৃতি শব্দ দেখাইয়া পাণিনি ও কাত্যায়নের আবির্ভাব-সময়ের পার্থক্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন, রামদাস বাবু সেই, 'আরণ্যক' প্রভৃতি শব্দ লইয়া গোলড্‌ষ্টুকরের মত খণ্ডনে প্রয়াস পাওয়াতে স্পষ্ট বোধ হয়, রামদাস বাবুও বৃহৎ-কথার মতানুসারে পাণিনি ও কাত্যায়নকে সমসাময়িক স্থির করিয়াছেন। কিন্তু তিনি স্বপ্রণীত ঐতিহাসিক রহস্যের প্রথম ভাগে বৃহৎকথার প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়া স্পষ্ট লিখিয়াছেন, "পাণিনি মুনি কখনই কাত্যায়নের সমকালবর্ত্তী ছিলেন না।" রামদাস বাবু এক স্থলে বৃহৎ কথার প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়া পাণিনি ও কাত্যায়নকে বিভিন্ন সময়ের লোক বলিয়াছেন, পুনর্ব্বার অন্য স্থলে বৃহৎ কথার প্রমাণ গ্রাহ্য করিয়া গোলড্‌ষ্টুকরের "কতিপয় বাক্য খণ্ডনে বাধা পাইয়াছেন।" এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ মতে কি সিদ্ধান্ত হইবে? রামদাস বাবু পুরাবৃত্তের অন্ধকার দূর করিতে যাইয়া নিজেই অন্ধকারে দিশাহারা হইয়াছেন।

ক্রমোন্নতি ভাষার একটী প্রধান ধর্ম্ম। উহা এক সময়েই সম্যক্ পরিপুষ্টি লাভ করে নাই। সময়ের পরিবর্ত্তনশীল-লহরী-লীলার সহিত ভাষাও ক্রমে পরিবর্দ্ধিত, পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া আসিয়াছে। ভাষার এইরূপ ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণও ক্রমে উন্নত ও পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। গোলড্‌ষ্টুকরের মতে পাণিনি যে সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, সে সময়ের ভাষা অনেক স্থলে সঙ্কুচিত বিষয়ের সঙ্কুচিত সীমায় আবদ্ধ ছিল। পরে কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির সময়ে ক্রমে তাহা সম্প্রসারিত হইয়া আসিয়াছে। এই সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন শব্দ ক্রমে বহু অর্থ-বোধক কোন কোন শব্দ বা অন্যার্থ-প্রতিপাদক হইয়া উঠিয়াছে।

এই মতের সমর্থন জন্য পাণিনির সময়-সম্মত "আশ্চর্য্য," "ভোজ্য" প্রভৃতি শব্দের অর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে। পাণিনি ৬।১।১৪৭ সূত্রে আশ্চর্য্যের অর্থ অনিত্য ও ৭।৩।৬৯ সূত্রে ভোজ্যের অর্থ ভক্ষ্য বলিয়াই নিবৃত্ত হইয়াছেন। রামদাস বাবু স্বীয় প্রবন্ধের এক স্থলে লিখিয়াছেন, "পণ্ডিতবর গোলড্‌ষ্টুকরের তর্কের অনুসরণ করিয়া রজনী বাবু পাণিনি পুস্তকের ৫৪ পৃষ্ঠার টীকায় "আশ্চর্য্যমনিত্যে" পাণিনি সূত্র ও "আশ্চর্য্যমদ্ভুতমিতিবক্তব্যম্' এই বার্ত্তিক উদ্ধৃত করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পাণিনির সময় ও তাঁহার

পূর্ব্বে অনিত্য শব্দ বিনশ্বর-বোধক ছিল।" রামদাস বাবু এস্থলে নিতান্ত অনবধানতার পরিচয় দিয়াছেন। আমি কখনও গোলড্ষ্টুকরের মতানুসরণ করিয়া অনিত্য শব্দ বিনশ্বর-বোধক বলিয়া সিদ্ধান্ত করি-নাই। "পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির আবির্ভাব-কাল-নির্ণায়ক-প্রস্তাবে" স্পষ্ট-লিখিত আছে, অনিত্য শব্দের অর্থ কাদাচিৎক, অর্থাৎ যাহা সচরাচর সঙ্ঘটিত হয় না। গোলড্ষ্টুকরেরও এই মত। পানিনি পুস্তকে এ বিষয়ে যাহা লিখিত আছে, তাহা এই স্থলে যথাবৎ উদ্ধৃত হইল :—

"পাণিনি, ৬। ১। ১৪৭ সংখ্যক সূত্রে আশ্চর্য্য শব্দের অনিত্য (যাহা সচরাচর সংঘটিত হয় না, কাদাচিৎক) অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। কিন্তু এদিকে কাত্যায়ন স্ববার্ত্তিকে আশ্চর্য্য' শব্দ অদ্ভুত অর্থ-প্রতিপাদক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (৪)।" এরূপ স্পষ্ট নির্দ্দেশ থাকাতেও রামদাস বাবু কি ভাবিয়া বিনশ্বর শব্দ প্রয়োগ করিলেন? কাদাচিৎক ও বিনশ্বর, এই-শব্দ-দ্বয় সম্পূর্ণ ভিন্নার্থ-বোধক।

গোলড্ষ্টুকর এই কাদাচিৎক অর্থ দেখাইয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কাত্যায়ন যখন স্ববার্ত্তিকে আশ্চর্য্য শব্দ অদ্ভুত অর্থ-বোধক বলিয়াছেন তখন পাণিনির সময়ে উক্ত অর্থের প্রচার ছিলনা, অন্যথা পাণিনি স্বীয় সূত্রে উহার উল্লেখ করিয়া যাইতেন। পাণিনির সময়ে আশ্চর্য্য শব্দ অনিত্য অর্থবোধক ছিল, পরে কাত্যায়নের সময়ে উহা অনিত্যের পরিবর্ত্তে অদ্ভুত অর্থ দ্যোতক হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং পাণিনি ও কাত্যায়ন সমসাময়িক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না।

রামদাস বাবু গোলড্ষ্টুকরের এই যুক্তির খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়া লিখিয়াছেন, "পাণিনির সময় যদি আশ্চর্য্য অদ্ভুত, চিত্র আদি শব্দ এক পর্য্যায়াক্রান্ত না থাকিত, তবে পাণিনি আশ্চর্য্য অর্থে চিত্র শব্দের প্রয়োগ করিতে পারিতেন না, তিনি "চিত্রঙ্ আশ্চর্য্যে" এই একটী সূত্র করাতে আচার্য্য গোলড্ষ্টুকরের সিদ্ধান্তের মূলোচ্ছেদ হইতেছে"। রাম দাস বাবুর এইরূপ লিখন-ভঙ্গী আমাকে যুগপৎ বিস্মিত ও দুঃখিত করিয়া তুলিয়াছে। তিনি যে সূত্রটী পাণিনির প্রণীত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা অষ্টাধ্যায়ী পাণিনীয় সূত্র পাঠের কোনও স্থলে দৃষ্ট হইল না। রামদাস বাবু এই অপাণিনীয় সূত্র অবলম্বন করিয়া অসঙ্কুচিত ভাবে "গোলড ষ্টুকরের সিদ্ধান্তের মূলোচ্ছেদ" করিয়াছেন !!

পাণিনি ৩।১।১৯ সংখ্যক সূত্রে উ[illegible] করিয়াছেন, 'নমস্ শব্দ, রবিবস্[illegible] ও চিত্র শব্দের উত্তর কাচ্ প্রত্যয় হ[illegible]

(৪) পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির আবির্ভাব কাল-নির্ণায়ক প্রস্তাব। ৪৪ পৃষ্ঠা। রামদাস বাবুর প্রবন্ধে ৪৫ পৃষ্ঠার স্থলে ৫৪ পৃষ্ঠা লিখিত আছে।

পতঞ্জলি এই সূত্রের ব্যাখ্যাস্থলে লিখিয়াছেন, "পূজার্থক নমস্ শব্দ, পরিচর্য্যার্থক বরিবস্ শব্দ ও আশ্চর্য্যার্থক চিত্র শব্দের উত্তর ক্যচ্ প্রত্যয় হইবে।" অন্যান্য সূত্রে (যথা; আশ্চর্য্যমনিত্যে, ভোজ্যং ভক্ষ্যে ইত্যাদি) পাণিনি যেমন অর্থের নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, এস্থলে, "নমস্, বরিবস্ ও চিত্র শব্দের সেরূপ কোনও অর্থের উল্লেখ না থাকাতে পতঞ্জলি স্বীয় ভাষ্যের স্থলান্তরে লিখিয়াছেন "আচার্য্যের (পাণিনির) কি বিচিত্র নিয়ম। তিনি কোন কোন সূত্রে অর্থের উল্লেখ করিয়াছেন, কোন কোন সূত্রে করেন নাই (৫)।" পতঞ্জলির এই বাক্যে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, পাণিনি, নমস্ বরিবস্ ও চিত্র শব্দের কোন অ[র্থ] নির্দ্দেশ করেন নাই। পতঞ্জলি পাণিনীয় সূত্রের ভাষ্য স্থলে উহার উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। পতঞ্জলিকৃত পাণিনীয় সূত্রোক্ত চিত্র শব্দের ব্যাখ্যা, "চিত্রঙ আশ্চর্য্যে (৬)" অর্থাৎ কেবল আশ্চর্য্যার্থক চিত্র শব্দের উত্তর ক্যচ প্রত্যয় হইবে, যে স্থলে 'চিত্র' শব্দ আলেখ্যের দ্যোতক হইবে, সে স্থলে এই প্রত্যয় হইবে না।" পাণিনি যে, চিত্র, অদ্ভুত, আশ্চর্য্য প্রভৃতি শব্দ এক পর্য্যায়াক্রান্ত বলিয়া জানিতেন, তাহা পতঞ্জলির এই ব্যাখ্যায় প্রকাশ পাইতেছে না। পাণিনিও স্বয়ং এসম্ব[ন্ধে] কোনও সূত্রের বিধান করেন ন[াই।] প্রত্যুত পতঞ্জলি স্পষ্ট লিখিয়াছেন, [পাণিনি] স্বীয় সূত্রে "চিত্র" শব্দের [অর্থের উল্লেখ] করেন নাই। ইহাতে ...

(৫) ৩।১।১৯:—নমোবরিবশ্চিত্রঙঃ ক্যচ্। ভাষ্য:—নমসঃ পূজায়াম্। বরিবসঃ পরিচর্য্যায়াম্। চিত্রঙ আশ্চর্য্যে। * * * মঙ্গলাচার্য্যঃ চিত্রয়তি কচিদর্থানাদিশতি কচিন্ন। এবমর্থাদেশনং কর্ত্তব্যম্।

পাণিনির এই সূত্রানুসারে আশ্চর্য্যার্থক চিত্র শব্দের উত্তর ক্যচ প্রত্য[য়] ...

(৬) রামদাস ... আশ্চর্য্যে," সূ...

ব্দের অদ্ভুত অর্থ জানিতেন, কিরূপে তাহা সপ্রমাণ হইল? এতদ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, রামদাস বাবুর সিদ্ধান্ত নিরবচ্ছিন্ন ভ্রান্তি-পূর্ণ। রামদাস বাবু স্বীয় অনবধানতা-দোষে পতঞ্জলির ব্যাখ্যা বিশেষকেই পাণিনির সূত্র বলিয়া নির্দ্দেশ পূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে আচার্য্য গোলড্ষ্টুকরের সিদ্ধান্ত অমূলক বলিয়াছেন!! এরূপ এরূপ অব্যবস্থিতা ও হঠকারিতা প্রদর্শন রামদাস বাবুর ন্যায় শাস্ত্রদর্শী ব্যক্তির উচিত হয় নাই।

রামদাস বাবু ৭।৩।৬৯ সংখ্যক "ভোজ্যং ভক্ষ্যে" সূত্র অবলম্বন করিয়া যে ...ম সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, ...ও নিতান্ত অসঙ্গত হইয়াছে। ...'গ' বর্ণে পরিণত করা এই সূত্রের ...দশ্য মাত্র, কিন্তু সূত্রের রচনায় ... রহিয়াছে, রামদাস বাবু ...বন নাই। পাণিনি ...ব্দ ভক্ষ্যার্থ-বাচক ...হার মতানুসারে

আর এক অর্থ, তাহা নহে।" কি প্রকারে এই বাক্যের সমর্থন হইতে পারে? রামদাস বাবু কি এক্ষণে "মণ্ড ভক্ষণ করিতেছে" এরূপ লিখিতে পারেন? পাণিনি যখন 'ভোজ্য' শব্দ ভক্ষ্যার্থ-বাচক বলিয়াছেন, তখন তদানীন্তন সময়ে তরল ও কঠিন উভয় বিধ খাদ্যকেই 'ভক্ষ্য' বলিত ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে। গোলড্ষ্টুকর এস্থলে কেবল অর্থের পার্থক্য দেখাইয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, পাণিনীয় সময়-প্রসিদ্ধ অর্থ যখন কাত্যায়নের সময়ে রূপান্তরিত হইয়া অন্য বিষয়-দ্যোতক হইয়া উঠিয়াছে তখন উভয়ে কখনই একসময়ের লোক হইতে পারেন না। রামদাস বাবু "অভ্যবহার্য্য" (রামদাস বাবুর প্রবন্ধে "অব্যবহার্য্য" লিখিত আছে, প্রস্তাবিত স্থলে এটী বিশুদ্ধ কথা নয়) শব্দের অর্থ সম্বন্ধে যেরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা প্রমাণ-সিদ্ধ নয়। কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি উভয়েই "অভ্যবহার্য্য" শব্দ তরল ও কঠিন উভয় বিধ অর্থে নির্দ্দেশ করিয়া ... (২)। কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির প্রতি

আস্থা প্রদর্শন, কতদূর সঙ্গত বলিতে পারি না। এস্থলে বলা আবশ্যক, গোলড্‌ষ্টুকর যে যুক্তি দেখাইয়া পাণিনি ও কাত্যায়নকে বিভিন্নসাময়িক বলিয়াছেন, রামদাস বাবু তাহার খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সুতরাং রামদাস বাবুর মতানুসারে এস্থলেও পাণিনি ও কাত্যায়ন সমসাময়িক হইতেছেন। সহৃদয় পাঠকবর্গ স্মরণ করিবেন, রামদাস বাবু অন্য স্থলে পাণিনি ও কাত্যায়নকে বিভিন্ন সময়ের লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই।

রামদাস বাবু স্বীয় প্রবন্ধের স্থলান্তরে লিখিয়াছেন, "পাণিনি কেবল সূত্রস্থান রচনা করিয়াছেন, বৃত্তি বা উদাহরণ তাঁহার নহে, তবে কি প্রকারে অন্যের দত্ত উদাহরণ দ্বারা পাণিনির সময়ের ব্যবহারিক ভাব নির্ণয় করা যাইতে পারে?" প্রশ্নটী নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। একজন প্রগাঢ়-শাস্ত্রবিশারদ কোন বিষয়ের সমালোচন করিলে, সেই সমালোচন দ্বারা সমালোচিত বিষয়টী অনেকাংশে প...

পতঞ্জলির ভাষ্য দ্বারা শব্দ শাস্ত্রের ত... বিশেষের আন্দোলন করিয়া পাণিনি... কাল-নির্ণয়ের বিচার করা হইয়াছে... এজন্য এ স্থলে কেবল শব্দ-শাস্ত্র-ঘটিত অর্থের ব্যবহারই উল্লিখিত হইল। রামদাস বাবুর "ব্যবহারিক ভাব" অন্য অর্থেও প্রয়োজিত হইতে পারে, কিন্তু এস্থলে তদ্বিষয়ক আন্দোলনের কোনও সার্থকতা দেখা যাইতেছে না। রামদাস বাবু যে বিচার উত্থাপন করিয়াছেন, স্বয়ং যুক্তি প্রদর্শন করিয়া তাহার চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন নাই।

রামদাস বাবু ৬।৪।১৭৪ "দাণ্ডিনায়ন হাস্তিনায়নাথর্ব্বণিক" ইত্যাদি (৮) ... আথর্ব্বণিক শব্দের ও ৪।১।১০৭ ... 'কপিবোধাদাঙ্গিরসে' সূত্রে ... শব্দের উল্লেখ দেখিয়া স্থির... পাণিনি অথর্ব্ব বেদ ... সুতরাং তদীয় ... পুস্তকের এতদ্বি... হইয়াছে। রাম... খানি মনো...

[illegible]খিত আছে, "পাণিনীয় ৪।৩।১৩৩ ও ৪।২।৭৪ সংখ্যক সূত্রে 'আথর্ব্বণিক" শব্দ বিনিবেশিত হইয়াছে বটে. কিন্তু চতুর্থ বেদ-প্রতিপাদক 'অথর্ব্বন্' শব্দ কোন স্থলে সুস্পষ্ট রূপে উল্লিখিত হয় নাই। সবার্ত্তিক সূত্রের ভাষ্যকার পতঞ্জলি এই 'আথর্ব্বণিক' শব্দ ঋত্বিক বিশেষের ধর্ম্মাদি প্রতিপাদক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ২।৪।৬৫ সংখ্যক সূত্রে (৯) অথর্ব্ব বেদোক্ত অঙ্গিরস্ ঋষির নাম আছে বটে, কিন্তু প্রকৃষ্ট পদ্ধতি ক্রমে 'অথর্ব্বাঙ্গিরস' শব্দের উল্লেখ কোনও স্থলে দৃষ্ট হয় না। এই সমস্ত কারণে [illegible]থর্ব্ব বেদ পাণিনির পর-সাময়িক বলিয়াই [illegible] হয়" (১০)। এক্ষণে পাঠকগণ দেখুন, [illegible] বাবু যে 'আথর্ব্বণিক' শব্দ প্রভৃতির [illegible]রিয়া স্থির করিয়াছেন, অথর্ব্ব [illegible] পরিজ্ঞাত ছিল, 'পাণিনি' [illegible]র্ব্বণিক শব্দ প্রভৃতির [illegible]ন্তু উহা এবিষয়ে [illegible]স্ত হইয়াছে, [illegible] করেন নাই [illegible] বলি-

য়াছেন। এরূপ যুক্তি শূন্য বিচারে রামদাস বাবুর সিদ্ধান্তের সত্যতা রক্ষিত হইতেছে না (১১)

---

(১১) ৪।৩।১৩৩ :—আথর্ব্বণিকস্যেকলোপশ্চ।

বার্ত্তিক :—আথর্ব্বণিকস্যেকলোপশ্চাণ্ বক্তব্যঃ। আথর্ব্বণো ধর্ম্মঃ। আথর্ব্বণ আম্নায়ঃ।

ভাষ্য :—ইদমাথর্ব্বণার্থমাথর্ব্বণিকার্থঞ্চ চতুর্গ্রহণং ক্রিয়তে। বসন্তাদিষ্বাথর্ব্বন্ শব্দ আথর্ব্বণিকশব্দশ্চ পঠ্যতে, ষষ্ঠাধ্যায়ে প্রকৃতিভাবার্থং গ্রহণং ক্রিয়তে। ইদং চতুর্থমিকলোপার্থং। * * এবমাথর্ব্বণমধীত ইতি বিগৃহ্য আথর্ব্বণিক ইতি ভবিষ্যতি। ইত্যাদি।

কৈয়ট :—* * * যদেবাথর্ব্বণা প্রোক্তং আথর্ব্বণং শাস্ত্রং তদেবাথর্ব্বণিকানামাম্নায়ো নতু তেষামাম্নায়ান্তরমাথর্ব্বণশব্দবাচ্যং। ধর্ম্মস্ত্বাথর্ব্বণ সাদৃশ্যাদাথর্ব্বণ শব্দেনাভিধীয়তে।

এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, [illegible] যে আথর্ব্বণিক শব্দের

রামদাস বাবু যাজ্ঞবল্ক্যকে পাণিনির পর-সাময়িক বলিয়াছেন, কিন্তু "যাজ্ঞবল্কানি ব্রাহ্মণানি" স্থলে 'যাজ্ঞবল্ক্যানি' পদ কিরূপে সিদ্ধ হইবে, তদ্বিষয়ে কোন কথা বলেন নাই। কাত্যায়ন পাণিনির ৪।৩।১০৫ সংখ্যক "পুরাণপ্রোক্তেষু ব্রাহ্মণকল্পেষু" সূত্রে যাজ্ঞবল্ক্যাদির উত্তর গিন্ প্রত্যয়ের প্রতিষেধ করিয়া গিয়াছেন।
যাজ্ঞবল্ক্য যদি পাণিনির পূর্ব্ব সাময়িক
হইতেন, তাহা হইলে পাণিনি অব
তাঁহাকে প্রাচীন জ্ঞান করিয়া কাত্যায়
ন্যায় একটী বিশেষ বিধির নির্দ্দেশ ক
যাইতেন। পাণিনি যে শতপথ
ণের ন্যায় একটী প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণের
বিস্মৃত হইয়া যজ্ঞবল্ক্য-প্রোক্ত ব
বাচক পদকে চ্যুতসংস্কৃতি দো
করিয়া যাইবেন, তাহা সম্ভাবিত না
রামদাস বাবু এযুক্তির উচ্ছেদ
নাই, সুতরাং তাঁহার
শূন্য বোধ হইতেছে

কিম্বদন্তী অনুস
ভাগুরি-প্রোক্ত বলি
প্রাচীন হইতে
বলিয়াই মার্ক
প্রাচীন হই
প্রোক্ত বলি

এস্থলে পাণিনি 'আথর্ব্বণিক শব্দের' কোনও অর্থ করেন নাই, কেবল পতঞ্জলি, কৈয়ট প্রভৃতিই উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এস্থলে আপত্তি হইতে পারে, পাণিনি 'নমোবরিবশ্চিত্রঙঃ ক্যচ্' সূত্রে নমস্ প্রভৃতি শব্দের কোনও অর্থ করেন নাই পতঞ্জলি উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন মাত্র। পতঞ্জলি, আশ্চর্য্য, অদ্ভুত, প্রভৃতি শব্দ এক পর্য্যায়াক্রান্ত বলিয়া জানিতেন, এক্ষণে পতঞ্জলির ব্যাখ্যা ধরিয়া পাণিনীয় সময়-সম্মত অর্থ নির্দ্ধারণ করিতে হইলে পাণিনির সময়ে যে "আশ্চর্য্য' অদ্ভুত "প্রভৃতি শব্দ এক পর্য্যায়াক্রান্ত ছিল না, কিরূপে তাহা অস্বীকার করা যায়? এ আপত্তি অকিঞ্চিৎকর। পতঞ্জলি চিত্র শব্দের 'আশ্চর্য্য অর্থ করিয়াছেন মাত্র। 'আশ্চর্য্য চিত্র, অদ্ভুতাদি যে এক পর্য্যায়ে নিবদ্ধ এরূপ কোন কথা বলেন নাই। বিশেষতঃ পাণিনির ৬।১।১৪৭ "অ

আধুনিক তন্ত্রকেও অতি প্রাচীন বলিতে হইবে? প্রাচীন মুনিদিগের নামে প্রচার করিলে স্বীয় গ্রন্থ সাধারণের নিকট সমা- ত হইবে ভাবিয়াই বোধ হয় গ্রন্থকার- স্বীয় স্বীয় গ্রন্থ অমুক অমুক ঋষি- ক্ত বলিয়াছেন। অথবা এরূপও তে পারে, মার্কণ্ডেয় পুরাণে সময়ান্তরে বক্যের নাম প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। যে কেবল বংশময়ী লেখনীর ব্যায়াম- য় গ্রন্থ সমূহের উৎপত্তি হইত, সে এরূপ ঘটনা অসম্ভাবিত বলিয়া ত হইতে পারে না। কেবল দর উপর আস্থা দেখাইয়া পাণিনিকে অপদস্থ করা ।

ক' সম্বন্ধে কোন কথা ণে তদ্বিষয়ক বিচার একটী পদের বহু অর্থ বশ্য পরিভাষার কিন্তু যেস্থলে কোন একটী , সে স্থলে

আরণ্যকের অর্থ কেবল অরণ্যবাসী মনুষ্য বলিয়াছেন। অরণ্যবাসী মনুষ্য অর্থে যে আরণ্যক শব্দ প্রয়োজিত হয়, ইহা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য। কেবল অরণ্যবাসী মনুষ্য নয়; অরণ্যেচর হস্তী, অরণ্য-প্রসূত পথ প্রভৃতি অর্থেও আরণ্যক শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু এসকল অপেক্ষাও ইহার অন্য একটী গুরুতর অর্থ আছে। সচরাচর পণ্ডিত- সমাজে অরণ্যগীত বেদাধ্যায় বিশেষ 'আরণ্যক' অর্থে অভিহিত হইয়া থাকে। 'আরণ্যক; শব্দ যেমন অরণ্যবাসী মনুষ্য, অরণ্যেচর হস্তী প্রভৃতি অর্থে পরিভাষিত, সেইরূপ অরণ্যগীত বেদাধ্যায় অর্থেও পরিভাষিত। পাণিনি স্বীয় সূত্রে এই প্রচলিত অর্থের উল্লেখ না করিয়া অপে- ক্ষাকৃত অপ্রচলিত অর্থের উল্লেখ করি- ছেন কেন? এস্থলে বলা আবশ্যক, পাণিনি "আরণ্যক' শব্দ অরণ্যেচর হস্তী প্রভৃতির বোধক বলেন নাই, তাই বলিয়া যে তদানীন্তন সময়ে হস্তী, পথ প্রভৃতি ছিলনা, তাহা নহে।। গোলড্- ষ্টুকর এস্থলে কেবল এই যুক্তি দেখা- ... অভিজ্ঞ খ্রীষ্ট ধর্ম্মাব-

ণ্যক, শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি অবশ্যই প্রথমে স্বসম্প্রদায়মান্য পবিত্র বেদাধ্যায়ের উল্লেখ করিয়া পরে অরণ্য-বাসী মনুষ্য প্রভৃতির নির্দ্দেশ করিবেন। পাণিনি একজন শাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিত হইয়াও যখন আরণ্যক শব্দে কেবল অরণ্যবাসী মনুষ্যের উল্লেখ করিয়াই তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছেন, তখন 'আরণ্যক' নামক পবিত্র বেদাংশ তাঁহার পরিজ্ঞাত ছিল, ইহা কিরূপে স্বীকার যায় (১৪)? রামদাস বাবু যুক্তি দেখাইয়া ইহার উত্তর দেন নাই।

মহাভারত ও মনু সংহিতায় বেদাধ্যায় অর্থে 'আরণ্যক' শব্দের উল্লেখ আছে। 'পাণিনি' পুস্তকের ৫১ পৃষ্ঠার ৫৩ সংখ্যক টিপ্পনীতে আমি মনুসংহিতা মহাভারত হইতে উক্ত বিষয়ক বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। মনুসংহিতা ও মহাভারতের সমুদয় অংশ সমান প্রাচীন নয়। বিপ্লবের পর বিপ্লবে উহা অনেক পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত হইয়া অদ্যতন পাঠক-সমাজে উপস্থিত হইয়াছে। এই ...র্ত্তিত
মনুসংহিতা ও মহাভারত
মতে খ্রী· পূ· পঞ্চ

ণ্যকের উল্লেখ আছে বলিয়াই যে পাণি-নীয় সময়ে উহার অস্তিত্ব ছিল, এরূপ স্থির করা সর্ব্বথা অসঙ্গত।

কেবল পাণিনির কাল নির্ণায়ক বিচার-প্রসঙ্গেই আমাকে এতদূর অগ্রসর হইতে হইল। আমি এই বিষয় লক্ষ্য করিয়াই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা একরূপ সাঙ্গ হওয়াতে এই স্থলেই উহার উপসংহারে বাধ্য হইলাম।

গোল্‌ড্‌ষ্টকরের মতানুবর্ত্তী হইয়
আমি যাহা লিখিয়াছি, তাহা যে সর্ব
সম্পূর্ণ ও প্রমাদ-রহিত হইয়া
কারে এরূপ কথা বলি
অধিকার নাই।
যুক্তি-পূর্ণ সূক্ষ
মতভ্রান্তি-পূর্ণ
পারে। আ
পক্ষপাতী।

আমি জিগী
হইয়া রামদা
চনে প্
যদি

না করিয়া কতকগুলি অবান্তর তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ বৃহৎকথার মতানুবর্ত্তী হইলে পাণিনি, ব্যাড়ি ও কাত্যায়ন তিন জনকেই এক সময়ের লোক বলা উচিত। কারণ, বৃহৎকথা এই তিন জনকেই এক সময়ে সন্নিবেশিত করিয়াছে। রামদাস বাবু এক স্থলে বৃহৎ কথার প্রমাণানুসারে পাণিনিকে মহারাজ নন্দের সমসাময়িক বলিয়াছেন, স্থলান্তরে আবার বৃহৎকথায় উপেক্ষা করিয়া পাণিনি, কাত্যায়ন ও ব্যাড়িকে বিভিন্নসাময়িক বলিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই। সুতরাং তাঁহার সিদ্ধান্ত যে সংশয়-বহিশ্চর ও প্রমাদ শূন্য হয় নাই। ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে এক-বিষয়ক মতের একাংশ গ্রহণ করিয়া অপরাংশে হতাদর হইলে সিদ্ধান্তের স্থিরতা রক্ষিত হয় না। * শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

* রামদাস বাবুর প্রস্তাবের খণ্ডন করিতে গিয়া রজনী বাবু দুই একটী অপ্রাসঙ্গিক গত দোষের উল্লেখ করিয়াছেন ইহা আমাদিগের মতে সুরুচিসঙ্গত হয় নাই। স

ভারতীয় ইতিহাস *।

প্রথম প্রস্তাব।

...তের শিক্ষক ... সাহিত্য, দর্শন, ...শ্চর্য্যা মৌলি- ... কেবল ...ছিল

কিছুতেই বুঝিতে পারি নাই কেমন করিয়া এই প্রকাণ্ড জাতি বিনা ইতিহাসে থাকিতে পারিয়াছিল। ভারতবর্ষে আর্য্য উপনিবেশ সংস্থাপনের পর হইতে থানে-শ্বরে পৃথ্বীরাজের নিধন পর্য্যন্ত এই বিস্তৃত ...ভারতীয় আর্য্যাদিগকে যে কত ...ত হইয়াছিল তাহা

পর্ব্ব মহাভারত পরিপূরিত হইয়াছিল, যে জাতির আর একটী সময়ের বিবরণে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই জাতির অসংখ্য সময়ের কোন লিখিত বিবরণ ছিল না একথা অশ্রদ্ধেয়। যে জাতির এক একটী সামান্য ঘটনা লইয়া, এক একটী বংশ উপলক্ষ করিয়া, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহাকাব্য বিরচিত হইয়াছে, সে জাতির আনুপূর্ব্বিক ঘটনাবলীর কোন ইতিহাস ছিল না, উন্মাদগ্রস্ত ব্যতীত একথা আর কে বলিবে; এবং বিকারগ্রস্ত ব্যতীত আর একথা কে বিশ্বাস করিবে?

আমরা পক্ষপাত-দূষিত বা অসম্বদ্ধ-প্রলাপীর ন্যায় একথা বলিতেছি এরূপ নহে; আমরা এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও অনুমান উভয়বিধ প্রমাণই প্রদর্শন করিতে পারিব। আমরা সর্ব্বপ্রথমে অনুমাণ-প্রমাণেরই অনুসরণ করিলাম।

প্রথমতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে নিতান্ত অসভ্য দেশেও কি পুরাকালে কি আধুনিক সময়ে যুদ্ধ বিগ্রহাদি রাজকীয় ঘটনাবলীর লিখিত বা ধারাবাহিক রূপে শ্রৌত বিবরণ উপলব্ধ হওয়া যায়; অধিক কি অমুক রাজা এই কাজ করিয়াছিলেন, অমুক রাণী এই কথা বলিয়াছিলেন, ইত্যাদি সামান্য সামান্য রাজকীয় বিষয়ও তাহাদিগের লেখনী ও পুরুষ-পরম্পরায় তাহাদিগের জিহ্বার বিষয় হইয়া থাকে। যখন নিতা[illegible] অসভ্য জাতির মধ্যেও রাজকীয় ঘটনাব[illegible] পরিরক্ষণের প্রথা প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়, তখন সুসভ্য আর্য্যজাতির মধ্যে যে সে প্রথা প্রচলিত থাকিবে না ইহা একান্ত অসম্ভব।

দ্বিতীয়ঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে গ্রীস্, রোম্, মিসর, আরব প্রভৃতি যে যে প্রাচীন জাতি সভ্যতা-শৈলের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ইতিহাস বিষয়ে অসাধারণ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন; ভারতীয় আর্য্যেরা অন্যান্য সকল বিষয়েই হয় তাঁহাদিগের অগ্রণী নয় তাঁহাদিগের সমকক্ষ ছিলেন; এরূপ স্থলে ভারতীয় প্রাচীন আর্য্যেরা যে কেবল ইতিহাস বিষয়েই সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিবেন ইহা একান্ত অসম্ভব।

তৃতীয়তঃ দেখিতে পাওয়া য[illegible] সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্[illegible] শাস্ত্র সকল এত পরস্পরাক্[illegible] উন্নতিতে অন্যান্যের [illegible] অবনতিতে অন্যা[illegible] একের উদ্ভবে [illegible] ধ্বংসে অন্যান্যের [illegible] রানুবর্ত্তিতার ভূ[illegible] গ্রীস্, রোম, [illegible] এবং [illegible] পর্য্যা[illegible] য[illegible]

উদ্ভব ও উন্নতি পরিদৃষ্ট হয়, তখন শুদ্ধ ইতিহাসেরই প্রাগ্ভাব কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে?

চতুর্থতঃ। সকলেই জানেন বিখ্যাত সম্রাট্ আকবরের আবুল ফজল্ নামে এক মন্ত্রী ছিলেন। ইনি প্রাচীন ভারতের একখানি ইতিহাস লিখেন। এই ইতিহাস হয় স্বকপোলকল্পিত, নয় প্রকৃত ঘটনামূলক। যদি স্বকপোলকল্পিত হইত তাহা হইলে তৎকালে কখনই ইহা প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া ...দৃত হইত না; বিশেষতঃ তাদৃশ সত্যপ্রিয় সম্রাটের কখনই অনুমোদিত হইতে পারিত না। সুতরাং বলিতে হইবেক নিশ্চয়ই ইহা প্রকৃত-...নামূলক। যদি প্রকৃতঘটনা-মূলক ...বে আবুল্ ফজল্ সেই সকল ...মগ্রী কোথায় পাইলেন? ...ক এক বা বহু প্রাচীন ...করিয়া ইহা লিখিতে ...হাকে ত্রিকালজ্ঞ ...য়।

...তে আমরা এক্ষণে ...প্রমাণে অবতীর্ণ ... সপ্তম শতা-...ত চীন ...রেন। ...n

ধারণাশক্তি-সম্পন্ন, অসামান্য প্রতিভাশালী ও অতিশয়-সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন। তিনি ক্রমান্বয়ে পঞ্চদশ বৎসর ভারতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এই দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া তিনি সংস্কৃতের অনুশীলনে, বৌদ্ধ ধর্ম্মপুস্তক সকলের অনুবাদে, এবং সেই প্রকাণ্ড আর্য্যজাতির রীতি নীতি ও আচার ব্যবহারের অধ্যয়নে নিমগ্ন ছিলেন। এই গভীর ও দীর্ঘকাল-ব্যাপী পরিদর্শন ও পর্য্যবেক্ষণের পর তিনি ভারতভ্রমণবৃত্তান্ত নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। মসো ষ্টানিস্লাস্ জুলিয়ান্ (Monseur Stanislas Julien) নামক একজন ফরাশিস্ এই গ্রন্থখানি ফরাশিভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ ভারতের পুরাবৃত্ত বিষয়ে অনেক আলোক বিকীর্ণ করে। তিনি লিখিয়াছেন পুরাকালে ভারতের প্রতি রাজসভায় একজন করিয়া লেখক নিযুক্ত থাকিতেন, যাঁহাকে সেই রাজসম্বন্ধীয় যাবতীয় ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতে হইত। এই লিখিত বিবরণগুলি নীলপীঠ নামে আখ্যাত হইত। অতীত ঘটনাবলীর এই সকল বিবরণ ইতিহাস ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

দ্বিতীয়তঃ পাঠকগণ সকলেই বোধ হয় চাঁদ কবির নাম শুনিয়া থাকিবেন। যে পৃথুরাজ হিন্দুনরপতিগণের শেষ শৃঙ্খল ছিলেন, যে পৃথুরাজ স্বদেশীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য থানেশ্বর সমরে আত্মদেহ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন; চাঁদ সেই শেষ হিন্দু

সম্রাটের সহচর ও নিয়োজিত কবি ছিলেন। এই চাঁদ কবি যবনদিগের সহিত পৃথুরাজের সমর বিষয়ে এক অপূর্ব্ব কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। রাজাদিগের যুদ্ধ বিগ্রহাদির পদ্যে বর্ণনা যে শুদ্ধ চাঁদ কবি একাই করিয়াছিলেন এরূপ নহে; তিনি অন্যান্য অনেক কবির নাম করিয়াছেন যাঁহারাও তাঁহার ন্যায় এই ব্রতে দীক্ষিত ছিলেন। স্নুতরাং স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে রাজাদিগের যুদ্ধ বিগ্রহাদির বিবরণ ছন্দোবন্ধে গ্রথিত করার প্রথা পুরাকালে ভারতে বিশ্বজনীন ছিল। এই ছন্দোবন্ধে গ্রথিত যুদ্ধবিগ্রহাদির বিবরণ ইতিহাস ভিন্ন আর কি হইতে পারে? প্রত্যুতঃ পুরাকালে সকল দেশেই যুদ্ধ বিগ্রহাদির বিবরণ ছন্দোবন্ধে গ্রথিত করার প্রথা প্রচলিত ছিল। তৎকালে ইহাই প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া পরিগৃহীত হইত।

তৃতীয়তঃ, চাঁদ ও অন্যান্য কবিকর্ত্তৃক ছন্দোবন্ধ-গ্রথিত ইতিহাস ভিন্নও আরও [illegible]

সাহআলম্ বাদসাহ পর্য্যন্ত সমস্ত সময়ের আনুপূর্ব্বিক ইহিবৃত্ত লিখিত আছে। বৃহৎকথায় অসংখ্য রাজবৃন্দের কথা লিখিত আছে। কথাসরিৎসাগর বৃহৎকথার সারসংগ্রহ মাত্র; ইহাতে বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি অনেক নৃপতির ইতিবৃত্ত লিখিত আছে। নীলপুরাণে পাণ্ডবদিগের পরবর্ত্তী নরপতিবৃন্দের ইতিবৃত্ত লিখিত আছে। এই কয়েকটী প্রকাণ্ড ধ্বংশাবশেষ কি প্রমাণ করিতেছে না যে পুরাকালে ভারতে রীতিমত ইতিহাস ছিল?

চতুর্থতঃ, আর একটী প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যে 'ইতিহাস' শব্দের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীনতম ঋক্‌বেদ হইতে আধুনিক কাব্য পুরাণ পর্য্যন্ত সমস্ত সংস্কৃত স[illegible] 'ইতিহাস' শব্দের উল্লেখ দে[illegible] যায়। এই 'ইতিহাস' [illegible] ঘটনাবলীর বিবরণ ভি[illegible] প্রযুক্ত হইত এরূপ [illegible] কারণ [illegible]

তাহার বিলয় সাধন কিরূপে হইল? যদি ইহার উত্তরে বলা যায় যে যবনদিগের আক্রমণ সময়ে সে সমস্ত তাহাদিগের কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে; তাহা হইলে এই উত্তরের এই বলিয়া খণ্ডন হইতে পারে যে যখন নানাশাস্ত্র-বিষয়ক অসংখ্য সংস্কৃত গ্রন্থ যবনদিগের করকবল হইতে পরিরক্ষিত হইয়া আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, তখন কেবল ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলি বিলুপ্ত হইল কিরূপে?

আমাদিগের শ্র... স্পদ বন্ধু বাবু সুরেন্দ্রনাথ তদীয় বক্তৃতায় এই জটিল প্রশ্নের যেরূপ মীমাংসা করিয়াছেন তাহা আমাদিগের নিকট অতি সমীচীন বোধ হওয়ায় আমরা তন্মর্ম্ম নিম্নে প্রদান করিলাম। তিনি ... পুরাকালে যাঁহারা প্রবহমান বা ...টনাবলীর বিবরণ লিখিতেন, ... কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইতেন, ... হইতে তাঁহাদিগের ...তরাং তাঁহাদিগের ...

কোন কোন বৈদেশিক ইতিবেত্তা ভারতের পুরাবৃত্ত ছিল ইহা স্বীকার করিয়া তাহার অসম্পূর্ণতা বিষয়ে কটাক্ষপাত করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের নিকট আমাদিগের জিজ্ঞাসা—সুপ্রসিদ্ধ প্রথম ফরাশি বিপ্লবের পূর্ব্বে ইউরোপীয় ইতিহাসের কি অবস্থা ছিল? প্রত্যুতঃ ফরাশি বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে ভীষণ জ্ঞান-সংঘর্ষ বা জ্ঞান-বিপ্লব উপস্থিত হয়, সেই সংঘর্ষ ও বিপ্লব হইতেই আধুনিক পরিপুষ্ট ও উৎকর্ষ-প্রাপ্ত ইতিহাসের উৎপত্তি। ইহার পূর্ব্বে ইউরোপীয় ইতিহাসের অতি শোচনীয় অবস্থা ছিল। অধিক কি ইউরোপে ইতিহাস ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

যাহা হউক ভারতের পুরাবৃত্ত অসম্পূর্ণই হউক আর দুষ্প্রাপ্যই হউক, তাহার অনুশীলন যে আমাদিগের পক্ষে একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে তাহা বোধ হয় প্রত্যেক স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি মুক্তকণ্ঠে স্বী...

ধাবন পূর্ব্বক প্রকৃত ঔষধ প্রয়োগের জন্য। রোগ নির্ণয় না হইলে ঔষধ প্রয়োগ বিফল। ভারতের অসংখ্য অধিবাসী যে অসহ্য কষ্ট যন্ত্রণা পাইতেছে, যে রোগে তাহারা অস্থি চর্ম্মাবশেষ হইয়াছে, তাহা এক দিনের পাপের ফল নহে; তাহার মূল অনুসন্ধান করিতে হইলে আমাদিগকে সুদূর পশ্চাতে গমন করিতে হইবে। ভারতের পুরাবৃত্তের অনুশীলন ব্যতীত ভারতের সঞ্জীবন অসম্ভব। সুতরাং প্রত্যেক স্বদেশানুরাগী ও প্রত্যেক সংস্কারকের ভারতের পুরাবৃত্তের অধ্যয়নে নিমগ্ন হওয়া সর্ব্ব প্রথম কর্ত্তব্য কার্য্য।

ভারতের সঞ্জীবন কার্য্যের নিমিত্ত ভারতের পুরাবৃত্তের অনুশীলন যেমন একান্ত প্রয়োজনীয়, সেইরূপ ভারতের আধুনিক ইতিবৃত্ত পাঠও সম্পূর্ণরূপে অপরিহার্য্য। ভারত এক্ষণে বৈদেশিক শাসনের অধীন। বৈদেশিক রাজনীতি দ্বারা ভারতের বিংশতি কোটী অধিবাসীর অদৃষ্ট-চক্র নিরন্তর পরিভ্রমিত হইতেছে। বৈদেশিক রাজনীতি দ্বারা ভারতের বিংশতি কোটী অধিবাসীর জাতীয় চরিত্র সংগঠিত হইতেছে। সুতরাং সেই বৈদেশিক রাজনীতি বুঝিতে না পারিলে আমরা আমাদিগের অদৃষ্ট-চক্রের গতি অনুধাবন করিতে পারিব না; আপনাদিগের নিজ জাতীয় চরিত্রের সম্যক্ অন্তর্ভেদ করিতে পারিব না। কিন্তু স্বদেশীয় ইতিহা[...] অধ্যয়ন ব্যতীত আমরা কখনই [...] বৈদেশিক রাজনীতির মর্ম্মাবধারণ করি[...] পারিব না। সুতরাং স্বদেশীয় ইতিহাস পাঠই আমাদিগের সর্ব্ব প্রথম কর্ত্তব্য কার্য্য।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এক দিকে যেমন ভারতের পুরাবৃত্ত লুপ্ত প্রায়, তেমনই অন্য দিকে আবার ভারতের আধুনিক ইতিবৃত্ত বৈদেশিক হস্তে সংগঠিত। বৈদেশিকেরা অনেক সময় ইহাতে ইচ্ছানুরূপ বর্ণ প্রয়োগ করিয়া থাকেন[...] এই জন্য ভারতের আধুনিক ই[...]হাস অনেক সময় অতিরঞ্জিত বা অ[...]ত্য বর্ণে রঞ্জিতে হইয়া পড়ে। সু[...]রাং তৎপাঠে আমাদিগের ইতিহাস পাঠের প্রকৃত ফল দর্শে না। এই অতিরঞ্জন বা অসত্য বর্ণে রঞ্জনের দুটি কত উদাহরণ সুরেন্দ্র বাবু তাঁহার বক্তৃতায় প্রদান করিয়াছেন[...] তাহা আমরা সংক্ষেপে নিম্নে [...] করিলাম।

মরে এবং সিউএল প্রভৃ[...] অন্ধকূপ-হত্যার অভিনা[...] কিন্তু বাস্তবিক [...] হত্যা ব্যাপারে[...] না। সকলেই অ[...] ২০এ জুন [...] দ্দৌলার [...] অধিক[...] বন[...]

এই বলিয়া আশ্বাস দেন যে তাঁহাদিগের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করা হইবে না। এই আদেশ ও আশ্বাস বাক্য প্রদান করিয়া নবাব শয়ন-শিবিরে প্রবেশ করেন। নবাবের প্রস্থানের পর ধৃত ব্যক্তিদিগের রজনী-বাসের উপযোগী গৃহের স্থিরীকরণ লইয়া তদীয় কর্ম্মচারিগণের মধ্যে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হয়। ... ৪৬ জন লোক বিনা কষ্টে রজনী যা... করিতে পারে, ফোর্ট ইউলিয়ম্ দুর্গের ভিতর এমন একটী প্রশস্ত গৃহ পাওয়া গেল না। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া কর্ম্মচারীগণ দুর্গকারাকেই এই কার্য্যের জন্য মনোনীত করিল। এই ক্ষুদ্র গৃহটীর আয়তন অষ্টাদশ বর্গ পাদ মাত্র। ভীষণ নিদাঘ-

... ভীষণতম রজনীতে এই সঙ্কীর্ণ

... সেই শতাধিক ষট্‌চত্বারিংশৎ

... পুরুষ মেষপালের ন্যায়

... হইল। এই নৃশংস

...ম পাঠকমাত্রই

... প্রভাত হইল,

...ান ধীরে ধীরে

... হৃদয়বিদারি

... অতীত।

... প্রচার

... জন

না হয়, আমরা তাহাকে মানুষ বলিতে পারি না। যে নরাধম নবাব-কর্ম্মচারিগণ অবরুদ্ধদিগের ক্রন্দনে উপেক্ষা করিয়াছিল, তাহারা নরকের কীট। যতদিন মানবস্মৃতিপটে এই ভীষণ হত্যাকাণ্ড জাগরুক থাকিবে ততদিন সেই নরাকার পিশাচদিগের নাম তাহাতে রুধিরাক্ষরে লিখিত থাকিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ভীষণ রাক্ষসদিগের সহিত সিরাজুদ্দৌলার নাম কেন মিশ্রিত করিব? সিরাজুদ্দৌলার সহস্র দোষ থাকিলেও এ ব্যাপারে তাঁহাকে কেন সংশ্লিষ্ট করিব? সিরাজুদ্দৌলা কারারুদ্ধদিগকে শৃঙ্খলমুক্ত করিতে আদেশ দেন এবং তাঁহাদিগকে অভয় প্রদান করেন। যে ব্যক্তি কারারুদ্ধদিগকে শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া অভয় প্রদান করেন, তাঁহা হইতে তাঁহাদিগের তাদৃশ নিদারুণ হত্যা অসম্ভবনীয়। সিরাজুদ্দৌলা ইচ্ছা করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের প্রাণদণ্ড করিতে পারিতেন, ইচ্ছা করিলে শৃঙ্খলবদ্ধ অবস্থায় তাঁহাদিগকে নানাপ্রকারে নির্য্যাতন করিতে পারিতেন। শৃঙ্খলমোচন পূর্ব্বক অভয় প্রদান করিয়া সেরূপ নৃশংস ব্যবহার করায় তাঁহার কি প্রয়োজন ছিল? তবে এই বিতর্ক উঠিতে পারে, সিরাজুদ্দৌলা তাদৃশ পাষাণহৃদয় কর্ম্মচারীদিগের গুরুতর পাপের গুরুতর দণ্ডবিধান করিলেন না

...? এই বিতর্কের একই উত্তর একই

...মাংসা। সিরাজুদ্দৌলা অপরিণতবয়স্ক

... আশৈশব দুর্বিনীত স্তাবকমণ্ডলী পরি-

বেষ্টিত। এরূপ যুবকের হৃদয়ে নীতিশাস্ত্রের সূক্ষ্মতম ভাব সকল অঙ্কিত হইতে পারে না। আর এরূপ সামান্য অপরাধে সিরাজুদ্দৌলাকে নৃপতিকুলাধম বলিতে হইলে আমরা ভীষণতর গ্লেঙ্কো হত্যাকাণ্ডের অধিনায়ক ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় উইলিয়মকে মানব-নামের যোগ্য বলিয়াই মনে করিব না।

ইংরাজ ইতিহাস-লেখকগণের ভারতীয় ইতিহাস বিষয়ে দ্বিতীয় ভ্রান্তিস্থল শীকযুদ্ধ। ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা বলেন দ্বিতীয় শীক যুদ্ধের জন্য শীকেরাই একমাত্র দায়ী। তাহাদিগেরই কৃতঘ্নতা ও রাজবিদ্রোহিতার শাস্তি দিবার জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের রাজ্য পঞ্জাব আত্মসাৎ করেন। শীকেরা ব্রিটিশ সিংহের সংরক্ষণী শক্তির আশ্রয়ে বাস করিতেছিল। তাহারা সেই শক্তির আশ্রয়ে বাস করিয়া তাহার বিরুদ্ধে রণস্থাপন করিল। সেই রণে তাহারা পরাস্ত হইল। ইহার অনিবার্য্য পরিণামস্বরূপ পঞ্জাব ব্রিটিশ সিংহের করকবলিত হইল। অপক্ষপাতী ঐতিহাসিকের মত অন্যরূপ। তিনি বলিবেন দ্বিতীয় শীকযুদ্ধের জন্য শীকেরা যেমন দায়ী, ইংরেজেরাও তেমনই দায়ী। শীকেরা বিনা উত্তেজনায় এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই। তাহাদিগের উত্তেজনার কারণ তিনটী। (১) বিধবা রণজিৎ-মহিষী মহারাণী ঝিন্দনকুমারী[...]
নির্ব্বাসন; (২) মহারাজা দলীপসিং[...]
বিবাহের দিন স্থির করণে ব্রিটি[...]

মেণ্টের অসম্মতি, এবং (৩) রাজা শেরসিংহের পিতা সর্দ্দার ছত্রসিংহের নির্য্যাতন। এই সকল ঘটনায় শীকদিগের মনে প্রতীতি জন্মিল যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট রক্ষাব্যপদেশে তাহাদিগের স্বাধীনতা হরণ পূর্ব্বক ক্রমে সমস্ত পঞ্জাব আত্মসাৎ করিয়া লইবেন। এই ভয়ে তাহারা রণমত্ত হইয়া উঠে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন ইংরাজ ইতিহাস-লেখক শীকযুদ্ধের এই প্রকৃত ও গূঢ় কারণের উল্লেখ করেন নাই।

অযোধ্যার আত্মসাৎ করণসম্বন্ধে আর একটী ঐতিহাসিক ভ্রম চলিয়া আসিতেছে। ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা বলিয়া থাকেন যে মুষলমান নবাবের অধীনে অযোধ্যা অতিশয় কুশাসিত হইয়া আসিতেছিল, এই জন্য ব্রিটিশ সিংহের সংর[...]
ক্ষণী শক্তি বাধ্য হইয়া তাহাকে করক[...]
করিল। কিন্তু অযোধ্যার কুশাস[...]
ইতিহাস-লেখকদিগের [...]
প্রকৃত-ঘটনা-মূলক বলি[...]
কারণ অযোধ্যা যদি[...]
হইলে অযোধ্যা[...]
পরিত্যাগ করি[...]
বাসার্থে অবশ্য[...]
জেনারেল [...]
নামক [...]
শ্রে[...]

নিশ্চয়ই ইহার অধিবাসীরা ব্রিটিশ-সিংহের আশ্রয় গ্রহণ করিত।"* অযোধ্যা যে ব্রিটিশরাজ্য অপেক্ষা অধিকতর কুশাসিত হইত না তাহার আরও অনেক প্রমাণ আছে। (১) ১৮০১ খৃষ্টাব্দে, লর্ড ওয়েলেসেলী অযোধ্যার কিয়দংশ ব্রিটিশ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। কর্ণেল স্লীমান বলেন, যে সকল জমিদার-বংশ নবাবের অধীনে অক্ষত ও সমৃদ্ধিশালী ছিল, ব্রিটিশ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর তাহাদিগের চিহ্ন মাত্র রহিল না। অবিশ্রান্ত নির্যাতনই এই পূর্ণ বিলোপের একমাত্র কারণ। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ব্রিটিশ রাজ্যের সুশাসন ও অযোধ্যার কুশাসন সম্বন্ধে আমাদিগের সংস্কার সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত [illegible]। (২) মিষ্টার হার্মান্ মেরিভেল [illegible]ন্‌রী লরেন্সের জীবনচরিতের [illegible] লিখিয়াছেন—"অযোধ্যার [illegible]০ বর্গমাইল অর্থাৎ প্রায় [illegible]র সমান। ১৮৪৫খৃষ্টাব্দে [illegible]ীর সংখ্যা ৩০ লক্ষ [illegible]হার তিন কি [illegible]নীত হয় যে [illegible]০ লক্ষ (অর্থাৎ [illegible]তি বর্গ মাইলে [illegible]৬৯। ৭০ [illegible]তবর্ষের [illegible]ংখ্যা [illegible]র্ণ

হয়। কিন্তু সিপাহী যুদ্ধ জনিত ভীষণ বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই বিপ্লবকেন্দ্র অযোধ্যার লোকসংখ্যা এরূপ তাড়িত বেগে কখনই পরিবর্দ্ধিত হইতে পারেনা। সুতরাং অপক্ষপাতিতার সহিত বলিতে হইলে বলিতে হইবে যে ব্রিটিশ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওন কালে অযোধ্যা সমৃদ্ধিশালী লোকপূর্ণ ও বাণিজ্যবহুল ছিল।" * (৩) বিশপ হিবার ১৮২৪-২৫খৃষ্টাব্দে তদীয় অযোধ্যা ভ্রমণ বিষয়ক বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন "অযোধ্যার কুশাসন ও দুরবস্থাবিষয়ে আমরা অনেক শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু আমি দেখিয়া সন্তুষ্ট ও বিস্মিত হইলাম যে অযোধ্যার একটী ক্ষেত্রও অকৃষ্ট নাই।" (৪) মিষ্টার শোর তদীয় ভারত-বিবরণে লিখিয়াছেন "অযোধ্যার কুশাসন ও তজ্জনিত দুরবস্থা-বিষয়ক মত লক্ষ্ণৌস্থিত রেসিডেণ্টাদগের অতিরঞ্জিত বিবরণ হইতেই সঞ্চারিত হইয়াছে। কিন্তু আমি স্বয়ং অযোধ্যার অনেক স্থল ভ্রমণ করিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে অযোধ্যার সর্ব্বত্রই বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অনুষ্ঠিত হইতেছে। যদি অযোধ্যা বাস্তবিকই কুশাসিত ও উৎপীড়িত হইত তাহা হইলে কৃষি ও বাণিজ্যের এরূপ অবস্থা কখনই উপলক্ষিত হইত না।"* এই সকল বৈদেশিক হিতবেত্তৃগণ দ্বারাই সপ্রমাণ হইতেছে যে অযোধ্যা দেশীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে কুশাসিত হয় নাই। তবে আত্মসাৎ করণের বৈধতা প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কুশাসনের ছল তুলিয়াছিলেন।

* Herman Marivale's Life of Sir Henry Lawrence Vol. II. pp. 288.

* Shore on Indian affairs Vol. [illegible]. 152—156.

সাময়িদ্ জাতি।

ধর্ম্মবিশেষ, আচার বিশেষ, সকলেই এই মত ঘোষণা করিয়া থাকে যে তদনুবর্ত্তী হও হাতে হাতে স্বর্গ পাইবে, অননুবর্ত্তী হও নরকে যাইবে। স্নধু এখানে ক্ষান্ত নহে, তৎসহ পুনঃ নিয়ন্তার নাম যোজিত করিয়া আত্মবিধি দৃঢ়ীকৃত করিয়া থাকে, পালক তাহাতে ভীত হয়, নেত্রনিবদ্ধ ভাবে যথা প্রদর্শিত পথে বিনা বাক্যব্যয়ে গমন করিয়া থাকে। নিয়ন্তার কি এই ইচ্ছা, বিধি কি এবম্ভূত? বুঝিতে পারি না। যদি তাহাই হয়, তবে সঙ্কেত-শূন্য, ইঙ্গিতশূন্য, এ অস্থিত পঙ্কে মানবীয় বুদ্ধিকে হাবুডুবু খাওয়াইয়া নিয়ন্তার কি অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়, তাহা তিনিই জানেন, আমরা জানিনা, বুঝিতে পারিনা। যদি ধর্ম্মবিশেষ, আচার-বিশেষ, নিয়ন্তার একান্তই অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে সমগ্র জগৎ এক প্রকৃতির, সমস্ত মানব একস্বভাবের, সমস্ত ঐশ্বরিক মায়া ও অবতার সর্ব্বজনীন, সর্ব্বকালীন ও সর্ব্বব্যাপী করিলেন না কেন? তাহা হইলে স্নধু বুঝিতে পারিতাম তাহা নহে, পৃথিবী স্বর্গভূমি হইত, শোক তাপ পাপ অবিশ্বাস প্রভৃতি অসুখের মূলীভুত কারণ সমূহ [illegible]মাত্র পৃথিবীতে স্থান পাইতনা। যখন এ জগতে [illegible] ভাবেরও অভাব [illegible] এইমাত্র বুঝিতে পারি যে য[illegible] যথা স্বভাব ও তদুৎপন্ন যথারীতি জীবনলীলা নির্ব্বাহ করিলেই জীবনকার্য্যের প্রথম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। ইহার পরে সুখাতিরেক মুখ্য উদ্দেশ্য, তদভাবে জীবন-কার্য্য একরূপ বিফল বলিতে হইবে; যদি তাহা চাও, তবে জগৎ-বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন স্বাভাবিক জীবন-তত্ত্ব সংগ্রহপূর্ব্বক সামঞ্জস্য বিধান দ্বারা সাধারণ জীবনতত্ত্ব নিরূপণ করিয়া, তদ্দ্বারা বিচালিত হও। এখানেও অভীষ্টসাধন পক্ষে নিয়ন্তা যদিচ অস্থিত পঙ্কে ফেলিয়াছেন বটে, কিন্তু এ অস্থিত পঙ্ক সঙ্কেত-শূন্য, ইঙ্গিত-শূন্য নহে।

আধুনিক ইউরোপীয়দিগের অনেকেই [illegible]
কিয়ৎ পরিমাণে এ সাধারণ জীবন-ত[illegible]
তত্ত্বী, তাই তাঁহাদিগের এতদূর [illegible]
আমাদিগের অব্যবহিত পূর্ব্ব[illegible]
পুরুষদিগের এ তত্ত্ব-পরি[illegible]
ছিল না বলিতে [illegible]
আত্মদেশ-নিবদ্ধ [illegible]
ত্রিকোণময়ী [illegible]
বীর সমাবেশ [illegible]
পার্শ্বস্থ ভূমি[illegible]
যেখানে[illegible]
দে[illegible]

একপদ, এককর্ণ ইত্যাদি জীবের আবাস এবং কিন্নর মিথুনের বিচরণ স্থল। প্রাচীনেরা বহির্জগৎ হইতে এতদূর ছেদ-সম্বন্ধ ছিলেন যে, নিয়ন্তার নিয়ম বশে এবং তাঁহার রোষ তোষের সমবশবর্ত্তী হইয়া, এই পৃথিবী-মণ্ডল ব্যাপিয়া মানবীয় স্রোত নিরন্তর পরিভ্রামিত ও বিচালিত হইতেছে এবং অনুরূপ কার্য্যে অনুরূপ ফলোৎপাদন করিতেছে, ইহা তাঁহাদের বুদ্ধিতেই কখন আসিত না। তাঁহাদের আত্ম-প্রকৃতি দৃষ্টে জীবন-কার্য্যের সমস্ত তত্ত্ব নিরূপিত হইত। তাঁহারা তদনুসারে চলিতেন এবং অপরকে কোন গতিকে প্রাপ্ত হইলে তদনুসারে চালাইতে বাধ্য করিতেন। তাঁহারা যে ইহা কুমনে করিতেন তাহা নহে, ...নে করিতেন; দোষ তাঁহাদের নহে, ...ার্য্যোৎপাদিকার মূল ভাগে; কিন্তু ...কা সঙ্কীর্ণ দর্শন বশতঃ দেখিতে ... তাঁহারা জানিতেন না ...তত্ত্ব কার্য্য কারণ বশে ... উৎকর্ষাভিলাষী ... প্রাপ্ত হইয়া ... লোপ-যোগ্য ...পালকেরা ... হয়। ...তি- ...

করিয়া জীবনতত্ত্ব নিরূপিত না হইল, সে তত্ত্বের প্রয়োজন নাই, তাহা সর্ব্বজনীন ভাবে হৃদয়-গ্রাহক ও সাধারণ হয় না, তাহার প্রতি সকলের সহানুভূতি জন্মায় না, তাহা ফলে মঙ্গলকর হয় না। দেখ, তুমি বঙ্গসন্তান, তোমার পক্ষে তোমার জাতীয় অখাদ্য-ভোজন-নিষেধ নিতান্ত দোষের নহে, বরং মঙ্গলকর, কিন্তু অনুকূল-দেশস্থ তদ্রূপ অখাদ্য-ভোজীকে যদি ভ্রাতৃভাবে গ্রহণ না কর, ঘৃণা কর, সংস্পর্শে আসিতে না দেও, তাহা দোষের। এ দোষ প্রাকৃতিক, পারলৌকিক ও কি না তাহা ধর্ম্ম জানেন, এপ্রস্তাবে পারলৌকিক দোষ গুণের কোথাও বিচার হইতেছেনা। যাহাহউক, প্রত্যেক বিষয়ের এইরূপ দোষ যথায় যথায় পরিহার হইয়া থাকে, তথায় তথায় জীবনতত্ত্ব সর্ব্বজনীন, এবং সেই তত্ত্ব অনুচরেরা মঙ্গল পথে প্রধাবিত হইয়া অচিরে ফল লাভে সমর্থ হয়। তুমি এই জগতের হিত কার্য্যে রত হও, এবং জগৎকে তোমার কার্য্যে নিয়োজিত কর, অভীষ্ট লাভ হইবে। কিন্তু এই উদ্দেশ্য অনুধাবনের পূর্ব্বে বিভিন্ন জাতীয় জীবনের সমালোচনা আবশ্যক। তাহাতে পুণ্য আছে।

আজিকার প্রস্তাবে আমরা ভারতের সহ সর্ব্বপ্রকারে সম্বন্ধ-বিহীন এবং পৃথিবীর ...প্রান্ত-নিবাসী একটি নগণ্য জাতি... ...ত্ত্বের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হ...।

পৃথিবীর অতি উত্তর প্রান্তে হীম সমুদ্র তীরে সাইবিরিয়া নামে এক দেশ আছে।

এই দেশের উত্তরভাগ প্রায় চির-নিহারাবৃত বৈধব্য-ধবল-বেশময় বিস্তৃত ক্ষেত্র, এখানে উদ্ভিজ্জাবলী অতি বিরল ও ক্ষুদ্রতর, কেবল মাত্র কোথায় ক্ষুদ্র গুল্ম, কোথায় ঈষদুন্নত বৃক্ষ মূর্ত্তিমান্ হ্রাসতারূপে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এই দেশ নিস্তব্ধ, ভীষণ ও ভয়ানক, অন্তর যেন পক্ষ বিস্তার করিয়া ইহাকে স্বক্রোড়ে স্থাপন পূর্ব্বক মুহুর্মুহুঃ ইহার প্রতি দৃষ্টি-পাত করিতেছেন। প্রকৃতি সতী বস্তুতঃ এখানে চিরবৈধব্য-বেশে কালাতিপাত করিয়া থাকেন। ইহার মূর্ত্তি শীতাগমে সহস্র গুণে ভীষণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তখন ইহা দেখিতে বর্ণনাতীত ভয়ঙ্কর। দিক্ সমস্ত তমসাচ্ছন্ন, রাত্রিমান অসম্ভব পরিমাণময় ও নিরন্তর নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন, কেবল মধ্যে মধ্যে অরোরা বোরিয়েলিস নামক উত্তর কেন্দ্রস্থ বৈদ্যুতাগ্নিভাসে কদাচ কদাচ প্রতিভাসিত হইয়া দিক্ সকল ঈষৎ আলোকে আলোকিত হইয়া থাকে। এই সময়ে নিরন্তর তুহিন পাতে পৃথিবী আকুলিত এবং শৈত্য কম্পিত হইয়া থাকেন। উদ্ভিজ্জাবলী একে বিরল, আরও বিরলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, গুল্মাবলী বরফে প্রোথিত হইয়া অস্তিত্ব-শূন্য হয়, বৃক্ষাবলী একে ক্ষুদ্র, তাহাতে এক্ষণে [illegible] হিমানীপাতে পল্লবদল [illegible] শ্বেতবর্ণতা [illegible] নিবীড় শ্বেতভূমিরূ[illegible] প্রতারণা[illegible] এসময়ে জীব নাই, জন্তু নাই, [illegible]

নির্গত শব্দ নাই, সকলেই নিদ্রাভিভূত; কেবল উত্তরকেন্দ্রজাত দক্ষিণবাহী ভীষণ শীতবায়ুর শন্ শন্ শব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয় এবং মধ্যে মধ্যে শীতাগমে বিদেশগমনোন্মুখ বিহঙ্গরবে দিগ্বলয় সুপ্ত-চমকিত হইয়া থাকে। এই দেশে ঋতুভেদ দুইপ্রকার, শীত ও শরৎ। অপেক্ষাকৃত ক্ষণস্থায়ী। শরদাগমে প্রকৃতির এই ভীষণ মূর্ত্তি কিয়দংশে দূরীভূত হয়। তখন দিক্ সকল কথঞ্চিৎ পরিষ্কার হইতে থাকে, বরফরাশি কিয়দংশ বিগলিত হইয়া প্রোথিত গুল্মাবলী পুনঃ প্রকাশিত করিয়া থাকে, এবং বিটপ-দেহে কৃষ্ণকায় পল্লবপুঞ্জ হিমানীমুক্ত হইয়া প্রকাশমান হয়। বরফ-আস্তরণে শৈবালদল উদ্ভূত হইয়া, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, ক্ষুদ্রকায় নানা পুষ্পে পুষ্পিত হইয়া, বৈধব্যবেশিনী প্রকৃ[illegible] যেন তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও, ক[illegible] অলঙ্কৃত করিয়া থাকে। উষ্ক[illegible] ভল্লুক প্রভৃতি জীবকুল চ[illegible] হইয়া আহারান্বেষণে [illegible] বন্য হরিণের প[illegible] হয়। এসম[illegible] মন্দ ন[illegible] সমূহকে [illegible] এই [illegible]

কৌশল অপরিসীম, এখানেও মনুষ্য বাস স্থাপন পূর্ব্বক তোমার ন্যায় আহ্লাদ, আমোদ, শোক, দুঃখ, বিলাস, কলা, কৌতুকাদি বিস্তার করিয়া মানবীয় শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে।

এই সাইবিরিয়া দেশের উত্তর প্রান্তে এবং ইউরোপীয় রুসিয়ার উত্তরখণ্ডে, শ্বেতসমুদ্রের পূর্ব্ব তীর হইতে ইনিসী নদীর পশ্চিম তট পর্য্যন্ত সমগ্র তন্দ্রা প্রদেশে সাময়িদ্ নামে একজাতীয় মানব বসতি করে। ইহারা দেখিতে ক্ষুদ্রকায়-ঈষৎ ধূম্রাভ ও পীতবর্ণ। ইহাদের ওষ্ঠ স্থূল, চক্ষু ক্ষুদ্র, ললাটদেশ অল্পায়তন ও নিম্ন। গণ্ডাস্থি অতিশয় উচ্চ, নাসিকা এত চাপা যে অগ্রভাগ গণ্ডাস্থির সহ সম-সূত্রস্থ। ইহাদের শ্মশ্রু বিরল-উদ্ভূত, ... মস্তকের কেশাবলী ঘন, কৃষ্ণ এবং ... ইহারা স্বভাবতঃ যদিও কুরূপ ...র্য্য এই যে সাধারণ মানবীয় ...ীতে বেশভূষা প্রভৃতি ...কল্পে সর্ব্ব প্রকারে ... যতদিন অবি- ...ন্নতি করি- ...থঞ্চিৎ ... এক- ...দিল-

উভয়ই ইহারা বিনা পাকে কাঁচা অবস্থায় ভক্ষণ করে। ইহাদের ঘ্রাণ-শক্তি এত ক্ষীণ যে যত বড় দুর্গন্ধই হউক না কেন, তাহাতে তাহাদের কিছুমাত্র অসুখ বোধ নাই। এই নিমিত্ত অগ্রাহ্য ভাবে তাহাদের গৃহের চতুষ্পার্শ্বে চর্ম্ম, মাংস বা অন্ত্রাদি নিরন্তর পচিতে দেখা গিয়া থাকে।

মানবীয় মনোবৃত্তি বহিঃপ্রকৃতির অনুসরণ করিয়া থাকে, এবং তাহার পরিমাণ অনুসারে সুখ দুঃখ মায়া মমতা প্রভৃতি বৃত্তি-সমূহ পরিমিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সাময়িদেরা এই দূর স্থানে বাস হেতু শিক্ষা অভাবে এবং আত্ম-শিক্ষার অপকর্ষ হেতু নিরন্তর অজ্ঞানতায় ও আহার্য্য-বিরলতায় সর্ব্বদা দুঃখ ও ক্লেশে বিদ্ধ, এজন্য ইহারা জীবনের উপর এক প্রকার মমতা-শূন্য। বস্তুতঃ ইহাদের এ পৃথিবীতে এমন কোন বস্তুই নাই, যাহাতে জীবনের উপর ইহাদের মমতা জন্মিতে পারে, এ নিমিত্ত ইহাদের আকৃতি ও মুখশ্রী সর্ব্বদা ম্লান এবং স্বভাব ম্রিয়মাণ। ইহাদের প্রকৃতি তাহা বলিয়া নিতান্ত অসৎ নহে। ইহাদের পূর্ণ মূর্খতা হেতু সত্যাসত্য, ও সদসদ্ জ্ঞান যদিও অতি সামান্য, কিন্তু নিষ্ঠুরাচার, ক্রূর কর্ম্ম হেতু বিপক্ষ পক্ষে প্রতিবিধান চেষ্টা, ...যঙ্কর পাপ... ... ...ই বলিলেই ... ইহাদের কষ্ট-সহিষ্ণুতা-গুণ অপ- ... হৃদয় অকৃতজ্ঞ নহে, ইহাদের

কেহ কোন আহারীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে দুঃখী প্রতিবেশিবর্গের সহিত অংশ না করিয়া আহার করে না। কিন্তু ইহাদের অন্তঃকরণ সর্ব্বদা সন্দেহযুক্ত, তাহা ইহাদের দোষ নহে, পরপদে দলিত ও প্রতারিত জাতি মাত্রেরই এই দশা। এরূপ ঘোরতর-মূর্খতা-পূর্ণ জাতি মাত্রেরই আশু উন্নতি কল্লে এক মাত্র সভ্যজাতির সংস্রব ফলপ্রদ। কিন্তু ইহাদের প্রভু যাহারা, ও ইহারা যে সভ্যজাতির সংস্রবে আসিয়া থাকে, তাহারা কেবল ব্যবসাদার রুসিয়ান্। এই রুসিয়ান্দিগের দ্বারা সাময়িদেরা এতদূর প্রপীড়িত প্রতারিত ও উত্ত্যক্ত হইয়া থাকে যে, তাহাদিগের দ্বারা যদিও কখন সাময়িদ্দিগের মঙ্গল-কল্পে কোন সৎকার্য্য কৃত হয়, তাহাও ইহারা প্রতারণা ও প্রপীড়নের পন্থা বলিয়া তাহার প্রতি অবিশ্বাস এবং তাহা যত্ন পূর্ব্বক পরিহার করিয়া থাকে। সুতরাং এ সভ্যজাতির সংস্রবে ইহাদের কোন উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, বরং স্বাভাবিক সদ্গুণ গুলির বহুলাংশ দূষিত হয়।

ইহাদের ধনবত্তা অবস্থা-অনুরূপ। প্রত্যেক ব্যক্তি বা গৃহস্থের ভোগ দখলে বন্য হরিণের সংখ্যা অনুসারে ধনী বা নির্ধনী নির্ব্বাচিত হয়। যাহার যত সংখ্যক আছে [illegible] ধনী। ইহারা অঙ্কুরস্ক ও [illegible] বাৎসরিক মেলায় পশুচর্ম্ম [illegible] কখন কখন বিনিময় ও ব্যবসায় ক[illegible]

থাকে। কিন্তু হতভাগ্যেরা এস্থানে রুসিয়ান্ ব্যবসাদার দ্বারা অপরিমিত ভাবে প্রতারিত হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, সাধারণতঃ শিকারই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। ইহাদের কি শ্রবণেন্দ্রিয় কি দর্শনেন্দ্রিয় উভয়ই অতিশয় তীক্ষ্ণ থাকায়, এবং বাহুর স্থিরতাবশতঃ ইহারা শিকারে অতিশয় পারগতা দেখাইয়া থাকে। ইহাদের অস্ত্রের মধ্যে ধনুর্ব্বাণ প্রধান, কিন্তু তাহা অতি কৌশল সহকারে ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহারা দৌড়িতেও অত্যন্ত পটু। ইহাদের শ্বেত ভল্লূক শিকার অতি কৌতুকাবহ। ইহাদের এরূপ জ্ঞান আছে যে শ্বেত ভল্লূক যদিও পশুর আকার-বিশিষ্ট, কিন্তু সেই পশ্বাকারের মধ্যে লোকাতীত জ্ঞান ও দর্শন অবস্থান করিয়া থাকে। এ নিমি[illegible] তাহারা অন্তরের সহিত ভল্লূককে ভ[illegible] ভক্তি করিয়া থাকে এবং ভল্লূক-[illegible] যাইবার পূর্ব্বে বহুবিধ রূপে [illegible] বাদ করিয়া তবে পদক্ষেপ[illegible] দের এরূপ বিশ্বাস[illegible] অগোচরে যাহ[illegible] সকলই জ[illegible] স্তুতিবাদ [illegible] শিকা[illegible] ভ[illegible]

প্রান্ত-নিবাসী প্রায় সমস্ত জাতির মধ্যেই এইরূপ। তন্মধ্যে ওস্তয়াক নামক জাতির মধ্যে শ্বেত ভল্লুকের প্রতি ভক্তি এত প্রবলা যে, ইহাঁরা প্রথমে তাহার যথা রীতি পূজা না করিয়া তৎ-শিকারে বাহির হয় না। আবার শিকারিরা যতক্ষণ অনুপস্থিত থাকে, ততক্ষণ স্ত্রীগণ চিৎকার স্বরে ভল্লুকের মহিমা গান করে এবং ভল্লুকের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকে যেন তিনি শিকারিগণ কর্ত্তৃক ধৃত হয়েন। যখন শিকারিরা শিকার সহ ফিরিয়া আইসে, তখন স্ত্রীগণ ভল্লুকের মহিমা গান করিতে করিতে বহুদূর অগ্রগামী হইয়া তাহাদিগকে লইয়া আইসে। তৎপরে যথা রীতি ভল্লুকের মাংস বন্ধু বান্ধব সহ মিলিয়া আহার করে।

সাময়িদ্‌দিগের গৃহকার্য্য যথা নিয়মে ...ন্পন্ন হয়। পিতা গৃহ-স্বামী, আর সমস্ত ... আজ্ঞানুবর্ত্তী। এবং গৃহস্বামী ...গের জীবন মরণের কর্ত্তা। রুসি- ... এ ক্ষমতার এক্ষণে অধি- ... বটে, কিন্তু এখনও ... স্থানের তুল- ... বিবাহ কার্য্য ... কর অবস্থা ... কন্যার ...ল,

পূরণ প্রত্যাশা করিয়া থাকে। এ নিমিত্ত জামাতাকে যথাযোগ্য মূল্য দিয়া আত্ম-স্ত্রী ক্রয় করিতে হয়। এরূপ ক্রয়-কার্য্যের দ্বারা স্ত্রীর উপর স্বামীর অপরিমিত ক্ষমতা জন্মিয়া থাকে, এমন কি স্ত্রীর জীবন মরণ স্বামীর রোষ তোষের উপর নির্ভর করে। ইহারা আত্ম-স্ত্রী হত্যাকে এতদূর সামান্য অপরাধ মনে করে যে, একদা এক জন সাময়িদ্‌ স্ত্রী-হত্যার অপরাধে রুসিয়া আদালতে আনীত হইলে, সে তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া প্রকাশ করে যে, সে স্ত্রী-হত্যা দ্বারা এমন কি দোষ করিয়াছে যে তদ্দ্বারা দোষী সাব্যস্ত হইয়া আদালতে আনীত ও দণ্ডনীয় হইতে পারে, কারণ সে যখন যথোপযুক্ত মূল্য দানে আপন স্ত্রী ক্রয় করিয়াছে তখন সে স্ত্রীর রক্ষণে বা বধ সাধনে তাহার সম্পূর্ণ অধিকার। ফলতঃ অসভ্য জাতি মাত্রেই স্ত্রীজাতির দুর্দ্দশা পশুবৎ, এবং পুরুষগণ কর্ত্তৃক অতি নিকৃষ্ট ভাবে প্রপীড়িত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে আবার অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে এবং উত্তর মার্কিণ দেশস্থ ডগ্‌রিব্‌ ইণ্ডিয়ানদিগের মধ্যে স্ত্রীজাতির দুরবস্থার চরমাবস্থা।

যে সকল বিজ্ঞ চূড়ামণিরা মনে করেন যে, এই পৃথিবীতে যদি আইন আদালত না থাকিত তবে মানবসমাজ উচ্ছিন্ন যাইত, তাঁহারা ভ্রান্ত ... একদেশ-দর্শী। ... আইন আদা- ... নাই। অর্দ্ধ-সভ্য ...ন জর্ম্মাণ জাতির মধ্যেও ছিল না,

কিন্তু তাহাতে তাহাদের কি ক্ষতি? যদি এক মাত্র চিত্ত-প্রসাদই সুখের পরিমাণ হয়, তাহা হইলে তোমাপেক্ষা এক জন নিকৃষ্ট অসভ্য অধম হইবে না। যদি অপরাধের প্রকৃতি এবং অপরাধীর সংখ্যা সামাজিক উৎকর্ষ অপকর্ষের পরিচারক হয়, তাহা হইলেও এক জন নিকৃষ্ট অসভ্য তোমাপেক্ষা অপকৃষ্ট হইবে না। আইন আদালতের আবশ্যকতা না আছে এমন নহে, কেবল সভ্যতা-যুক্ত সমাজেই তাহার আবশ্যকতা। অপরাধের বৃদ্ধি সহ তাহার নিবারণ-উপায় নিত্য এবং বহুতর সৃষ্টি হইয়া থাকে, এবং পর পর যত বৃদ্ধি হয়, সেই উপায় পর পর ততই কঠোরতর হয়। কিন্তু যেখানে যেখানে এরূপ বৃদ্ধির অভাব, এবং সমাজ অক্লিষ্ট, তথায় তথায় সামান্য মাত্র উপায়ে শান্তি রক্ষণ হয়,—এরূপ সমাজে যে অপরাধের সংখ্যা অতি সামান্য, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আর তোমার সমাজ?—তোমার সমাজ যে অত্যন্ত অপরাধি তাহার প্রমাণ তোমার আইন আদালত। সভ্যতার সহ পাপ-স্রোত বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সভ্যতা যেমন লৌকিক এবং মানবীয়, তদ্দ্বারা বৃদ্ধ পাপও সেইরূপ অ[illegible] কৃতিক[illegible] অপ্রাকৃতিক উ[illegible] ইহা বলিয়া কি স[illegible] যদি বল, তবে তুমি[illegible] মাত্র স্বর্ণ-রেণুতে মল[illegible] এবং সাধারণ রকমের[illegible]

অল্প যত্ন প্রয়োগ করিলেই কার্য্য সুসাধিত হয়, কিন্তু এখানে যেমন মলভাগ অল্প, রত্ন-ভাগও সেইরূপ অল্প। আর দেখ স্বর্ণরেণু যদি পর্ব্বত-প্রমাণ হয়, তাহার মলভাগও সেইরূপ বেশি এবং বিকট রকমের এবং তাহা পরিষ্কারার্থে নানাবিধ যন্ত্রেরও আবশ্যক; কিন্তু সে সকলই কষ্ট-দায়ক ও কষ্ট-সাধ্য হইলেও রত্নাধিক্যে প্রার্থনীয়। যাহাহউক সমাজ যথায় সঙ্কীর্ণ এবং অপেক্ষাকৃত অকলুষিত, তথায় অপেক্ষাকৃত প্রাকৃতিক শাসনেই শান্তি রক্ষণ হইয়া থাকে। এই প্রাকৃতিক শাসন দৈবে ভর ও ভয়। ইহার সুন্দর দৃষ্টান্ত-স্থল সাময়িদ্‌দিগের অপরাধের প্রতিবিধান-প্রণালী। ইহাদের মধ্যে গুপ্ত অগুপ্ত সর্ব্ব-প্রকার অপরাধ শপথের দ্বারা প্রতিবিধানিত হইয়া থাকে। যদি কোন ব্যক্তি কোন অপরাধে অপরাধী বলিয়া তাহাকে সন্দেহ করে, তাহা হইলে তাহাকে শপথ দিবার জন্য প্রতিপক্ষ ব্যক্তির সম্পূর্ণ অধিকার। স[illegible] দ্বারা দোষ সপ্রমাণের রীতি না[illegible] দ্বারা দোষ সপ্রমাণ হয়[illegible] সাব্যস্ত হয়, সে অপর[illegible] রূপ মূল্য প্রদান[illegible]

অপরাধী হও, তাহা হইলে স্বীকার কর, নতুবা তুমিও এই কুক্কুরের ন্যায় ধ্বংস-প্রাপ্ত হইবে।" অতঃপর অপরাধী সর্ব্বজ্ঞ ভল্লুকের চর্ম্মে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক শপথ করিয়া থাকে। ইহাদের মিথ্যা কথায় বড় ভয়, এ ভয় পরলোকের দুঃখাতিরেক আশঙ্কায় নহে, তাহাদের বিশ্বাস আছে যে মিথ্যা কহিলে হয় তাহাদের বিকট মৃত্যু হইবে, নতুবা তাহাদের হরিণ চুরি যাইবে; এ নিমিত্ত যথার্থ অপরাধী যাহারা, তাহারা প্রায় আত্ম-দোষ অস্বীকার করে না।

সাময়িদ্‌দিগের ধর্ম্মতত্ত্ব অতি সামান্য। ইহাদের মধ্যে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার হইতে ত্রুটি হয় নাই, এবং খৃষ্টানও অনেক হইয়াছিল, কিন্তু নামে মাত্র। কার্য্যত ইহারা সর্ব্ব প্রকারে প্রাচীন ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া থাকে। ইহাদের সর্ব্বপ্রধান দেবতার নাম নুম বা জিলিবিয়াম্‌বিয়া-...জি (Jilibiambœrtji), এই দেবতা ...লে বাস করেন, বিদ্যুৎ ও বজ্র ... রামধনু ইহার অঙ্গবস্ত্রের ... দেবতা মনুষ্য হইতে ... করেন, যে দূরস্থ ... করা ইহাঁর

বিধান করিয়া থাকেন। ইহাঁরা মানবের আবশ্যক বোধে প্রার্থনা বা পূজার দ্বারা বা যাদুগুণে বশীভূত হইয়া অভীপ্‌সিত ফল প্রদান করিয়া থাকেন। সাময়িদেরা এক পার্থিব আবশ্যক না পড়িলে ইহাঁদিগের কোন তত্ত্বই লয় না।

সাময়িদ্‌দিগের প্রধান দেবমূর্ত্তি বেগাৎস নামক দ্বীপে স্থাপিত আছে। এই মূর্ত্তি একটি বৃহৎ প্রস্তর, ইহার ঊর্দ্ধভাগে মোচাগ্রবৎ কোণাকারে মস্তক ও মুখ। সাময়িদেরা এ নমুনা অনুসারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তি সকল প্রস্তুত করিয়া আপনাদের নিকট রাখে, এবং হরিণ-চর্ম্ম ও রং-রঞ্জিত বস্ত্র বা চর্ম্ম-খণ্ড দ্বারা সুশোভিত করিয়া থাকে। ইহাদের স্থান হইতে স্থানান্তর গমন কালিন যদি এই মূর্ত্তির কোনটি বেশি ভার বোঝা বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে পথিমধ্যে কোন স্থানে তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া যায়, এরূপ পরিত্যক্ত দেবতা যেখানে পড়িয়া থাকে তাহাও দেবস্থান মধ্যে গণ্য হয়। এরূপ পরিত্যক্ত দেবতাকে সাদারি বলে। যে যে মূর্ত্তি বহন-সুলভ হয়, তাহাদিগকে হোহি কহে। প্রত্যেক ব্যক্তির আবশ্যক অনুযায়ী তাহার নিকট তত-সংখ্যক ... কোনটি হরিণের পাল ... কোনটি উপা-... কোনটি দাম্পত্য ... কোনটি উপাসকের ... কামনায়, ইত্যাদি ...ত ও পূজিত হইয়া

থাকে।—কোনটি হরিণের পাল সুরক্ষিত হওন কামনায়, কোনটি উপাসকের স্বাস্থ্য কামনায়, কোনটি দাম্পত্য প্রণয় বন্ধন কামনায়, কোনটি উপাদকের জাল মৎস্যে পরিপূরণ কামনায়, ইত্যাদি অর্থে স্থাপিত, রক্ষিত ও পূজিত হইয়া থাকে। এই সকল দেবতার পূজা নিত্য হয় না, আবশ্যক অনুযায়ী দেবতা বিশেষ ঝুলি হইতে বাহির হইয়া উপাসিত হয়। আবশ্যক পূরণ হইলে, আবার ঝুলিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া আর পাঁচ দ্রব্যের সহ অতর্কিত ভাবে পড়িয়া থাকে। পূজার পদ্ধতি এইরূপ। পূজার সময় ঝুলির বাহির করিয়া মুর্ত্তিটিকে নিকটস্থ কোন বৃক্ষতলে স্থাপিত করা হয়, তাহার মুখ তৈল ও রক্তের দ্বারা ম্রক্ষিত হয়, তৎপরে তাহার সম্মুখে এক পাত্র কাঁচা মৎস্য স্থাপন পূর্ব্বক যথা অভীপ্সিত বস্তুর কামনা সহ উপাসনা কার্য্য শেষ হইয়া থাকে। পূর্ব্বকথিত দেবতাগণ ব্যতীত, আরও বহুতর অনিষ্টকারী দেবতা আছেন, ইহাঁরা কেবল যাদুকার্য্যের দ্বারা বশীভূত হইয়া দুষ্ট স্বভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুভ ফল প্রদান করেন।

ঘোরমূর্খ সাময়িদ্‌দিগের উপরিউক্ত মত দৈবে বিশ্বাস, তদ্দ্বারা সমাজ পরিচালন এবং উৎকৃষ্ট খৃষ্টধর্ম্মে অনাস্থা, এতৎত্রয়ে আমাদিগের কি অনুভূত হয়? ঈশ্বর থাকুন আর নাই থাকুন, নিত্য নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবনে পটু মানসিক বৃত্তি বিশিষ্ট মনুষ্য সমাজে যদি ধর্ম্মবন্ধন না থাকিত, তবে এসংসারে না জানি কি বিশৃঙ্খলাই ঘটিত, হয়ত মনুষ্যজাতি এতদিন পৃথিবী হইতে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইত। মনুষ্য হইতে অধম জীব পশুমধ্যে গণ্য, পশুদিগের তাদৃশ মানসিক বৃত্তির অভাব বলিয়াই ধর্ম্ম বন্ধন না থাকিলেও তাদৃশ বিশৃঙ্খলতার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং যথা বিচালিত ভাবে তাহাদের জীবন-প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া থাকে। মানুব-জাতির এ ধর্ম্মবন্ধন ভ্রমবন্ধন হইতে পারে; কিন্তু এ ভ্রম সুখের, শুভসাধক, কল্যাণকর! যাহা মানবজীবন-প্রবাহ পক্ষে কল্যাণকর, প্রকৃতি যাহার বিরুদ্ধবাদিনী নহে, তাহাইত সত্য। প্রকৃতি অসত্য সহনে অপটু, অসত্যের আবির্ভাব হইলে তখনই তাহার প্রতিকারে উদ্যত। কিন্তু কখনও দেখিলাম না যে প্রকৃতি ধর্ম্মবন্ধন রূপ ভ্রমের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছে, বরং ইহাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহার সপক্ষতাচরণ করিয়া থাকে। অতএব এ ধর্ম্মবন্ধনকে ভ্রম না বলিয়া সত্য বলিতে ক্ষতি কি? সত্যই ঈশ্বর। যে চক্রের মধ্যবিন্দু সর্ব্বত্রই বিদ্যমান্, সেণ্ট আগস্তিন্ তাহাকেই ঈশ্বর পদের বাচ্য করিয়াছেন। সে ঈশ্বর সত্য, সত্য ব্যতীত আর কিছুই নহে।

মানবীয় ধর্ম্মবন্ধনের মূল জনসমূহ সঙ্ঘটনে প্রতিজ্ঞা বন্ধনের ফল বা শিক্ষকের শিক্ষাদ্বারা উদ্ভূত নহে, উহা প্রাকৃতিক। ঈশ্বরে বিশ্বাস বা বিশেষ দেবতায় বিশ্বাস লৌকিক কারণ হইতে উৎ-

পন্ন হয় নাই, মনোমধ্যে লোকাতীত শক্তির অস্তিত্ববোধই উহার মূল, উহা হইতে ধর্ম্মবন্ধন উৎপন্ন হইয়াছে। ডারবিনের মতে এ লোকাতীত শক্তির অস্তিত্ববোধ আদিম মানবের স্বপ্নদর্শন ক্রিয়া হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। হইতে পারে তাহাই, কিন্তু সে আদিম কাল নিরেখ হইয়া বিলুপ্ত হইয়াছে, সুতরাং সে সময়ের এ বিষয় নিরূপণ কেবল প্রমাণ-শূন্য অনুমানের দ্বারা। এরূপ শূন্যগর্ভ অনুমানের দ্বারা চিরপোষিত ও বিশ্বাসিত বিষয়ের অপলাপ করা আবশ্যক বোধ করি না। সে যাহা হউক বর্ত্তমানে এই পৃথিবীতে যত জাতি মানব বসতি করে, উচ্চ-হইতে অধমতম সকল জাতিতেই কোন না কোন আকারে লোকাতীত শক্তির অস্তিত্ব বোধ বিরাজিত আছে। পাদ্রি দব্রিসফার প্রভৃতি অনেকানেক প্রচারক ও ভ্রমণকারীবর্গ বলিয়াছেন যে তাঁহারা এমন অনেক অসভ্য জাতি দেখিয়াছেন, যাঁহাদের মধ্যে ঈশ্বর-বাচক কোন শব্দের অস্তিত্ব নাই, কিন্তু ইহা কোথাও বলেন নাই, যে লোকাতীত শক্তিতে বিশ্বাস-শূন্য মানবজাতি কোথাও দেখিয়াছেন। আমাদের বোধশক্তির অনুরূপ ঈশ্বরকে তাহারা চিনেনা বটে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে অনেকানেক অলৌকিক দেবতা বা ভূতের উপাসনা বা তাহাতে বিশ্বাস করিয়া থাকে। এক্ষণে যত হীন প্রকৃতির মানব এ জগতে বাস করে, তন্মধ্যে ফিজি-দ্বীপবাসীরা সর্ব্বাপেক্ষা হীনতম এবং পশু হইতে অতি অল্পই বিভিন্নতা-যুক্ত, তাহাদের মধ্যেও, মঙ্গলময়, ঈশ্বর যদিও অপ্রচারিত, অমঙ্গলময় দেবতার বহুলতা দেখা গিয়া থাকে। সভ্যতম সমাজে প্রাচীনকাল হইতে এ পর্য্যন্ত অনেক নাস্তিকের কথা শুনা যায় বটে, কিন্তু প্রকৃত নাস্তিক আছে কিনা সন্দেহ। সন্দিগ্ধ-চেতা হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত নাস্তিক হয় না ইহা বোধ হয়। ঘোর নাস্তিক বলিয়া যাহারা আপাততঃ ভান করিয়া থাকে, কোন দুরন্ত বিপদে তাহা রক্ষা করিতে পারে না, হইতে পারে ইহা বাল্যশিক্ষার ফল। অতএব বলিতে হইবে যে স্বপ্ন হইতেই হউক আর যে কারণেই হউক, মনুষ্য-বংশের উৎপত্তিদিন হইতে অলৌকিকত্বে বিশ্বাস এ জগতে একাধিপত্য করিতেছে। এই বিশ্বাস হইতেই সমাজ এবং সমাজের উন্নতি অনুসারে ধর্ম্মবন্ধন উদ্ভব ও পরিপুষ্টতা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে।

মানবের মানসিক উন্নতি বা অবনতি অনুসারে ধর্ম্ম ভাব ও দৈবে বিশ্বাস উন্নত বা অবনত ভাব প্রাপ্ত হয়। উহা অবস্থা ভেদে পাঁচভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমে মনুষ্যময় রক্তদন্তী অমঙ্গলকর দেবতায় বিশ্বাস। মন্দ কার্য্য করাই এসকল দেবতার বৃত্তি, কেবল উপাসনা বা যাদুবশে বশীভূত হইয়া তাহাতে নিরস্ত থাকে বা শুভ ফল দেয়। ইহা ঘোর মূর্খতাময় পশুবৎ আদিম সমাজের ধর্ম্ম। লোকচরিত্র এবং দেবচরিত্র একই ছাঁচে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। সামাজিক শান্তিরক্ষণে

এক্ষণে একমাত্র ভয়ই কার্য্যকর। দ্বিতীয় অবস্থায় ভয় ও ভক্তি, তদুন্নতিতে ভক্তি, পরে ভালবাসা, তাহার পরে জগৎকে আত্মাধার জ্ঞান, ইহাই চরম মানসিক বৃত্তি ও ধর্ম্মবুদ্ধির উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা। মানব-চিত্তের উৎকর্ষও উক্ত বিভাগ সহ সহানুভূতি বশতঃ পঞ্চবিভাগে বিভক্ত হইতে পারে। উভয়ের সম পর্য্যায় পরস্পর পরস্পরের অবলম্বন, তদন্যথায় সম্মিলন অসম্ভব। যে মানসিক উৎকর্ষে হীন তাহাকে কোন উচ্চরূপ ধর্ম্মতত্ত্ব প্রদান কর, কিন্তু সেই হীনোৎকর্ষ মানব যতক্ষণ সে তত্ত্ব আপন সমতায় না আনিবে ততক্ষণ তাহার ক্ষান্তি নাই, সুতরাং সে তত্ত্বের হীনতা সাধন করে, বলিতে হইবে। পুরাতন বাইবেল অনুসারে ঈশ্বর স্বয়ং বারম্বার ভয় প্রদর্শন, উত্ত্যক্ত উত্তেজনা করিয়াও, য়িহুদি জাতির পৌত্তলিকতা নিবারণ করিতে পারেন নাই।

এক্ষণে মূলপ্রস্তাবের অনুসরণ করা যাউক। সামযিদ্দিগের নষ্টবুদ্ধি দেবতা দিগকে যাদুদ্বারা বশ করিবার নিমিত্ত যাহারা নিয়োজিত হয়, তাহাদিগকে তাদিবী বলে। ইহাদের কার্য্য আমাদিগের দেশীয় ভূতের ওঝার ন্যায়। ইহারা হরিণ-চর্ম্ম এবং রক্ত বস্ত্রে ভূষিত হইয়া, ঢক্কারব ও গীত দ্বারা দেবতার আবির্ভাব কামনা করিয়া থাকে। ক্ষণেক এইরূপ করিয়া সমস্ত নিস্তব্ধ হয় এবং সেই সময় তাদিবীর সহ দেবতার কথা-বার্ত্তা চলিতে থাকে। কখন কখন ইহারা দীপ নির্ব্বাণ পূর্ব্বক অন্ধকার মধ্যে আগত দেবাতকৃত অভূতপূর্ব্ব শব্দ ও নানাবিধ দৌরাত্ম্য দেখাইয়া থাকে।

যাহারা তাদিবী, তাহারা বংশ পরম্পরা ঐ কার্য্য করিয়া থাকে। অপরাপর ব্যক্তিও আবশ্যকমত নিয়ম রক্ষা করিলে তাদিবী হইতে পারে। নির্জ্জন স্থানে বাস, নিরন্তর বিভীষিকা চিন্তা, রাত্রি জাগরণ, উপবাস, মাদক সেবন ইত্যাদি দ্বারা শরীর সংশোধন করিতে হয়। তৎপরে যখন তাহার মনে প্রত্যয় হয় যে সে বস্তুতই দেবতাদের সাক্ষাৎ পাইয়া থাকে, তখন সমাদর পূর্ব্বক কোন এক নিস্তব্ধ নিশীথ সময়ে নির্জ্জন স্থানে ঢক্কারব ও বিবিধ দেবতা মহিমা গণ মধ্যে তাদিবী শ্রেণীতে গৃহীত হয়। তাদিবীরা সচরাচর দেখিতে রক্তচক্ষু, তীব্রদৃষ্টি, অস্থিরপদে গতি এবং নিস্তব্ধ ও ম্রিয়মাণ। হৃত হরিণের অনুসন্ধান, কোন সংক্রামক পীড়া নিবারণ, অধিক পরিমাণে মৎস্য প্রাপণ বা কোনরূপ পীড়া নিবারণার্থে তাদিবীর সাহায্য গৃহীত হয়। পীড়া উপস্থিত হইলে, সামযিদেরা তাদিবীর দ্বারা ভূত ঝাড়ান ভিন্ন অপর কোন প্রকার ঔষধ প্রাণান্তে গ্রহণ করিবে না। শারীরিক নিয়মভঙ্গে রক্তদূষিত হইলে যে পীড়া উপস্থিত হয়, তাহা তাহারা বুঝে না। তাহারা জানে যে কোন অপরাধ হেতু কোন দেবতা তাহাদের এরূপ শারীরিক ক্লেশ দেয়,

সেই দন্ত ক্লেশই পীড়া, সুতরাং ঝাড়ান প্রভৃতি উপায় দ্বারা সে দেবতাকে বশীভূত না করিলে কেমন করিয়া সে পীড়ার উপশম হইতে পারে? এ বিশ্বাস কেবল এখানে নহে, দক্ষিণ-সমুদ্র-গর্ভস্থ প্রায় সমস্ত দ্বীপাবলীতেই প্রবল।

পরলোক সম্বন্ধে সাময়িদ্‌দিগের এরূপ বিশ্বাস যে কেবল তাদিবী ও যাহারা অপঘাত মৃত্যু সহ্য করিয়া থাকে, তাহাদের আত্মাই মৃত্যুর পরেও ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না এবং বায়ুভর করিয়া ভ্রমণ করে। ইহাদিগের বিশ্বাস যে এরূপ মৃতব্যক্তির আত্মা, জীবিতাবস্থায় যেরূপ, মৃত্যু অবস্থায়ও তদ্রূপ ক্ষুৎপিপাসা অভাব প্রভৃতির বশবর্ত্তী থাকে। এ নিমিত্ত ইহারা তদ্রূপ কোন ব্যক্তি মৃত হইলে, বরফময় ভূমিতে ভ্রমণের উপযুক্ত ডোঙ্গা, বল্লম, রন্ধন-পাত্র, ছুরি ও কুঠার পরলোকে আবশ্যক হইবে বলিয়া ঐ ব্যক্তির দেহ সহিত ভূমিসাৎ করে এবং কয়েক বৎসর করিয়া এক একটি হরিণ সমাধিস্থানে বলি দেয়। যখন কোন প্রধান ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তখন তাহার সমাধিকালীন মহা সমারোহ হয়, এবং জীবিতাবস্থায় তিনি যেরূপ সম্মানিত ছিলেন তদ্রূপ সম্মান প্রদত্ত হয়। ইহার একটি মূর্ত্তি প্রস্তুত করা হয়, এবং প্রতি দিন ঐ মূর্ত্তির নিকট আহারীয় দ্রব্য প্রদান, উহার বেশভূষা করণ, এবং শয্যাশায়ী করণ প্রভৃতি জীবনের নিত্য কার্য্য সকল সম্পন্ন করা হইয়া থাকে। এইরূপে তিন বৎসর অতীত হইলে ঐ মূর্ত্তিও সমাধিসাৎ করা হয়।

এই জাতির প্রধান আমোদকর বস্তু প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপ-বর্ণিত গীত শ্রবণ। এই গীত শুনাইবার নিমিত্ত জাতীয় কবি নিয়োজিত আছেন। যখন এই গীত আরম্ভ হয়, তখন নিয়োজিত কবি তাম্বুর মধ্যস্থলে আসন গ্রহণ করেন, এবং শ্রোতৃবর্গ চতুর্দ্দিকে তাহাকে ঘিরিয়া বসে। অনন্তর কবি, পূর্ব্বপুরুষগণ ওসিয়াক, তাতারপ্রভৃতি জাতির সহিত কিরূপ যুদ্ধ করিয়াছিল ও যুদ্ধে কিরূপ জয় পরাজয় লাভ করিয়াছিল, তাহা স্থল বিশেষে রসোদ্ভাবন-অনুরূপ অঙ্গভঙ্গি দ্বারা গান করিতে থাকেন। শ্রোতৃবর্গ নিস্তব্ধ ভাবে শ্রবণ করে। গীত মধ্যে যখন শত্রুবর্গের ষড়যন্ত্রে নায়কের মৃত্যু ঘটনা হয়, তখন শ্রোতৃবর্গ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, ডাক ছাড়িয়া একেবারে চীৎকার স্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠে। আবার যখন শুনে যে নায়ক মৃত্যু দ্বারা শত্রু হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া বায়ুভর পূর্ব্বক মেঘমণ্ডল মধ্যে ভ্রমণ করিতেছে, তখন আর আনন্দের সীমা থাকে না, হরি ধ্বনি করিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

বঙ্গসন্তান! বলিতে পার এ হতভাগ্য জাতিরা এরূপ হইল কেন?—ইহাদের জীবন-তত্ত্বের সহিত কি তোমাদের সহানুভূতি জন্মায়?

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরলোক ও সমাজ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

মনুষ্যের পারলৌকিক বিশ্বাস পরীক্ষা করিতে গেলে ইহাতে দুইটি স্বতন্ত্র বিশ্বাস পরিদৃষ্ট হয়। পরলোকে পুণ্যের পুরস্কার হয় এবং পাতকের সমুচিত দণ্ড হয়। এই বিশ্বাসদ্বয় পারলৌকিক বিশ্বাসের নিদানভূত। পুণ্যের পুরস্কার এবং পাপের দণ্ড কিরূপ হয়, তাহা বিভিন্ন ধর্ম্মে বিভিন্নরূপে কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু সকল ধর্ম্মেই ইহলোকের সুকৃতির পারত্রিক মঙ্গলের আশা দিয়া জনসমাজকে প্রলোভিত করে এবং দুষ্কৃতির ফলাফল স্বরূপ পারলৌকিক অকল্যাণের ভয় প্রদর্শন করিয়া মানবগণকে উদ্বেজিত এবং পাপনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। অতএব প্রতি জনসমাজমধ্যে পারলৌকিক ভাব এই বিবিধ কার্য্য করিতেছে। ইহা একদিকে পুরস্কারের প্রলোভন দিয়া মনুষ্য-মণ্ডলীকে সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে চাহে, অন্যদিকে পাতকের দণ্ড দেখাইয়া তাহাদিগকে ভয়চকিত এবং অসৎকার্য্য নিবৃত্ত করিতে চাহে। জনসমাজে পারলৌকিক বিশ্বাসের এই দ্বিবিধ প্রভাব। এই দ্বিবিধ প্রভাবে সমাজের কতদূর ইষ্টানিষ্ট সাধিত হইয়াছে, অথবা জনসমাজে এই প্রভাবের শক্তি কতদূর, তাহাই নির্দ্ধারণ করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। প্রথমতঃ পারলৌকিক আশার প্রভাব; দ্বিতীয়ত পারলৌকিক ভয়ের প্রভাব। প্রথমতঃ পারলৌকিক আশায় উত্তেজিত হইয়া মনুষ্যগণ কতদূর সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। সামাজিক সমাদর ও সম্মান প্রত্যাশা এবং যশোলিপ্সা যে মানবগণকে সৎকার্য্যে প্রধানতঃ প্রবৃত্ত করে তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। ইহলোকের সামাজিক পুরস্কারে মনুষ্যগণ যত প্রলোভিত ও উদ্বোধিত হয়, পারলৌকিক আশায় ততদূর নহে। দশজনের মধ্যে আমি গণনীয় হইব, সকলেই আমাকে সাধু বলিয়া প্রশংসা করিবে, সকলের নিকট আমি আদরণীয় হইব, এবং সকলেই আমার দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী হইবে এই ইচ্ছা প্রতিব্যক্তির মনে অত্যন্ত প্রবল। ইহা যত প্রবল অন্য সাধু ইচ্ছা তত প্রবল কি না সন্দেহ। দশজনের মধ্যে গণনীয় হইলে, সমাজমধ্যে প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠাপিত হইলে, অনেকের প্রীতিপাত্র এবং প্রশংসা ভাজন হইলে, ইহলোকে জীবনযাত্রা যে প্রকার পরমসুখে এবং প্রভুত্ব সহকারে নির্ব্বাহিত হয়, অন্য উপায়ে বোধ হয় ততদূর হইবার সম্ভাবনা নাই। এই কারণে এই উপায় অবলম্বন করিতে অনেকেই তৎপর দেখা যায়। এই উপায়ে অনেকে জনসমাজ

মধ্যে উচ্চপদে আরোহণ করিতেছেন, অনেকে লোকমণ্ডলীর মধ্যে প্রধানতঃ প্রভুত্ব লাভ করিতেছেন এবং অনেকে সমাজের নায়ক ও সাধারণজনগণের নেতা স্বরূপ হইয়া আছেন। এই প্রকার উচ্চপদ, প্রভুত্ব এবং সামাজিক প্রভাব লাভের জন্য কি অনেকের উচ্চাকাঙ্ক্ষা উত্তেজিত হইয়া উঠেনা? এমত কি, সাধুব্যক্তিগণ যে আত্মপ্রসাদে সুখী হইয়া থাকেন, সেই আত্মপ্রসাদ কি অধিকাংশ সাধারণ জনগণের সাধুবাদের উপর নির্ভর করে না? দশজনে যখন প্রশংসা করে, তখন আত্মহৃদয় মধ্যে যে আনন্দ উৎসারিত হয় তাহা কি মধুর ও অমৃতময় নহে? এই সমস্ত বলবৎ কারণে মনুষ্য সৎকার্য্যে স্বাভাবিকই নীত হন। তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহের একবিধ উপায় যখন স্থিরীকৃত হয়, তখন তিনি পৃথিবীর যশের জন্য প্রার্থী হন; সাধারণজনগণের প্রতিষ্ঠাভাজন হইবার জন্য তাঁহাদিগের মুখাপেক্ষী হইয়া কতই সামাজিক হিতকর ব্রতে এবং লোকমণ্ডলীর মঙ্গল সাধনে ব্যাপৃত হয়েন। এই প্রবৃত্তি মনুষ্যকে সৎকার্য্যে কতদূর নিয়োজিত করে, তাহা প্রত্যেকেই নিজ অন্তরে অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারিবেন। যিনি নিরপেক্ষভাবে আত্মহৃদয় এই রূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, তিনি দেখিতে পাইবেন যে তাঁহার সাধুপ্রবৃত্তি সকল নিকটবর্ত্তী বর্ত্তমান সামাজিক মঙ্গলাশয়ে যেমত উত্তেজিত; সুদূরস্থ, ভবিষ্য পারলৌকিক শুভাকাঙ্ক্ষায় ততদূর উত্তেজিত নহে।

প্রভুত্ব, প্রতিষ্ঠা, এবং সমাদর লাভার্থ মানবকুল যেমন সর্ব্বদা ব্যাকুল ও সদনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকে, আত্মশুভান্বেষণেও তদ্রূপ। অনেকে আপনার প্রতি ভদ্রব্যবহার প্রত্যাশায় অপরের প্রতি ভদ্র ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়। অনেকে আপনার অসময়ে উপকার লাভার্থ আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, এবং প্রতিবেশীর অসময়ে উপকার করিয়া থাকেন। পরস্পরের উপকার সাধন এবং পরস্পরের প্রতি সদাচার, জনসমাজের একটি সুদৃঢ় বন্ধন। মানবের প্রতি মানবের সহানুভূতি, সৎকার্য্য উৎপাদনের আর একটী কারণ। অপরের দুঃখ দেখিলে স্বভাবতই সকলের মনে পরদুঃখ কাতরতা সমুদিত হয় এবং স্বভাবতই মানব সেই দুঃখ মোচনের জন্য হস্ত প্রসারণ করেন। এই স্থলে পারলৌকিক প্রভাব তত অনুভূত হয় না। যে স্থলে অনুভূত হয়, তাহা কেবল সুপ্রবৃত্তিকে অধিকতর উত্তেজিত করে মাত্র, কিন্তু তাহা সেই সুপ্রবৃত্তির প্রথম উৎপাদনের মূল কারণ নহে। মূল কারণ মানবীয় প্রকৃতিকেই বলিতে হইবে। প্রকৃতি স্বভাবতই সুপ্রবৃত্তিকে প্রণোদিত করিয়া দিলে, হয় পরলোকের ভাব আসিয়া তাহাতে যোগ দেয়, না হয় অন্যবিধ স্বার্থপরতা সেই প্রবৃত্তিকে কার্য্যক্ষেত্রে লইয়া যায়। জনসমাজে যখন আমরা দেখিতে পাই, আত্মীয় স্বজন, কুটুম্ব, প্রতিবেশী এবং বন্ধুবান্ধবের মধ্যে সক-

লেই পরস্পর পরোপকারে ব্রতী হইয়া আছেন, তখন তাহাদিগের মধ্যে কোন্ প্রবৃত্তি ও প্রবোধনা সমধিক প্রবলতর? পারলৌকিক মঙ্গলোদ্দেশে এস্থলে কয়জন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন? এস্থলে কি দেখিতে পাই না মানবের সুপ্রবৃত্তি স্বাভাবিকই আত্মীয়তাভাবে সমবেদনায় সমুত্তেজিত হইয়া উঠে, পরে ভবিষ্য আত্মহিত চিন্তায় তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে যান? পারলৌকিক প্রভাব অনুভূত হয় কিনা সন্দেহ। যদি হয়, অতি অল্প লোকেরই হইয়া থাকে।

ঐহিক মঙ্গলোদ্দেশেই সংসারীজনগণ সৎকার্য্যে অধিকাংশই প্রবৃত্ত দেখা যায়। পারলৌকিক সাত্ত্বিকভাবে পরিপূর্ণ হইয়া মনুষ্য যে সমস্ত সৎকার্য্য করে সেরূপ সৎকার্য্যের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক ন্যূন। যে হেতু সাধারণ জনগণের পারত্রিক আশা তত প্রবল নহে। যাহাদিগের নিকট এই আশা প্রবল, তাহাদিগের নিকট ইহা সকল সময় এবং সর্ব্বাবস্থায় ও প্রবল নহে। লোকে বৃদ্ধবয়সে পরলোকের প্রতি যত দৃষ্টিপাত করে, তরুণ বয়সের বিষয়োন্মত্ততায় তত করিতে পারে না। বার্দ্ধক্য কয়জনের ঘটিয়া থাকে? যাহাদিগের ঘটে তাহাদিগের মধ্যে কয়জন আবার পারলৌকিক সাত্ত্বিক ভাবে পূর্ণ রহেন? যে কতিপয় সাধুপুরুষ জীবনের সর্ব্বাবস্থায় এবং সকলকালেই পারলৌকিক ভাবে পূর্ণ থাকেন তাহাদিগের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। তাহারা আবার একটী বিষম পাশে পরিনিপ্ত হয়েন; তাঁহারা সাধু ও ধর্ম্মশীল হইতে গিয়া একান্ত সংসারবিরাগী হইয়া পড়েন। পূর্ব্বকালে যে রূপ বিবেচিত হউক, বৈরাগ্যে যে মহা অধর্ম্ম আছে, তাহা এক্ষণে সর্ব্বজনেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

পারলৌকিক মঙ্গলাশয়ে জনসমাজ যে কখন প্রণোদিত হয় না আমরা একথা বলি না। সময়ে সময়ে এই ভাবের বিক্রম সাতিশয় প্রবল হইতে দেখা গিয়াছে। এক এক সময় জন সমাজকে ইহা উন্মত্ত প্রায় করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু সেই উন্মত্ততায় পৃথিবীর যেঅনিষ্ট সাধন হইয়াছে তাহা আমরা পূর্ব্বে বিবৃত করিয়াছি। যদ্দ্বারা পৃথিবীর এত অনিষ্ট সাধন হয় সেই ভাবকে প্রবল হইতে দেওয়া উচিত কি না, অনায়াসে উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

পারলৌকিক মঙ্গলোদ্দেশে মনুষ্য যে সমস্ত সৎকার্য্য সাধন করিয়াছেন তদ্দ্বারা যে পৃথিবীর ইষ্টসাধন হয় নাই, আমি এমত কথা বলি না; আমি বরং মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে, পুণ্যবানদিগের সৎকার্য্যদ্বারা পৃথিবীর বিলক্ষণ ইষ্ট সাধন হইয়াছে, জনসমাজের অনেক দুঃখের অপনোদন হইয়াছে, এবং অনেক কষ্টের মোচন হইয়াছে। কিন্তু ইহা স্বীকার করিলেও অবশ্য বলিতে হইবে যে ইহাদ্বারা পৃথিবীর যেমন কথঞ্চিৎ মঙ্গল সাধন হইয়াছে তদপেক্ষা অধিকতর অনিষ্ট সাধন হইয়াছে। ইহাদ্বারা পৃথি-

বীর যে অনিষ্ট সাধন হইয়াছে তাহা পূর্ব্বে একাদিক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। আমি আর ও প্রদর্শন করিয়াছি যে, যে সমস্ত সৎকার্য্য পারলৌকিক ভাবে আরোপিত করা হয়, তাহার অধিকাংশই মানবের অন্যান্য প্রবৃত্তি সম্ভূত হইবার কতদূর সম্ভাবনা এবং বাস্তবিকই তাহা হইয়া থাকে কি না তাহা প্রত্যেকেই বিবেচনা করিতে পারেন। অতএব এই পারলৌকিক পুরস্কার আশায় পৃথিবীর সৎকার্য্যের বৃদ্ধি হইতেছে কি অনিষ্টের অধিকতর বৃদ্ধি হইতেছে তাহা এক্ষণে অনায়াসে উপলব্ধি হইতে পারে।

মিল বলেন, পৃথিবীর মধ্যে যাহারা ধর্ম্মবীর বলিয়া গণনীয় হইয়া গিয়াছেন, যাঁহাদিগকে সাধারণ জনগণ বিবেচনা করিয়াছেন যে তাঁহারা পারলৌকিক আশয়ে প্রলুব্ধ হইয়া অকাতরে ইহজীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন, কেবল পরকালের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সকল যন্ত্রণা সহ্য করিতেছেন এবং অবশেষে বধ্যভূমিতে অনায়াসে দারুণ যন্ত্রণায় প্রাণত্যাগ ও করিয়াছেন, সেই মহাত্মাগণের ধর্ম্মবীরত্বের যে গৌরব তাহার আমি অপ্রশংসা করিতে চাহিনা। আমি বলিতে চাহিনা তাঁহারা পৃথিবীর যশ প্রত্যাশায় প্রাণ পর্য্যন্ত ও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পৃথিবীর যশপ্রার্থী হইয়া উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানগণ, (যাহারা অন্যকিছুতেই ধর্ম্মশীল বলিয়া পরিচিত হয়েন নাই) যে সমসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছেন তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত ইতিহাসে লিখিত আছে। পৃথিবীর যশ প্রত্যাশা যদি খৃষ্টীয় ধর্ম্মবীরগণকে প্রাণপর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে উত্তেজিত না করিয়া থাকে, তবে তাঁহারা যে কেবল পারলৌকিক সাত্বিকভাবে পরিপূর্ণ হইয়া ততদূর ত্যাগস্বীকার করিয়া গিয়াছেন আমি একথা ও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিনা। এই প্রাণবলিদান কালে তাহাদিগের মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল তাহাকে এক প্রকার ধর্ম্ম-উন্মত্ততা ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। এই উন্মত্ততায় পরিপূর্ণ হইয়া তাঁহারা আত্মবিস্মৃত হইয়া ছিলেন। তাহাদিগের মনে একটি ভাব তখন এত সুপ্রবল হইয়াছিল, যে সেই ভাবে নিমগ্ন হইয়া তাহারা প্রাণত্যাগকেও তুচ্ছজ্ঞান করিয়াছিলেন। ধর্ম্মেতে এই উচ্চ ভাব উদিত করিয়া দেয় কেবল। ধর্ম্মেতে এরূপ উচ্চভাব উদিত করিয়া দেয় এমত নহে; সকল মহৎ কার্য্যেই এই ভাব সঞ্চারিত করিয়া দেয়। মনুষ্যের ত্যাগস্বীকার প্রয়োজন হইলে অমনি এই ভাবের উদয় হয়; ইহার সহিত মনুষ্য নামের যে গৌরব আছে, সৎকার্য্যের মাহাত্ম্য এবং ফলোপধায়িতার যে প্রকার বৃদ্ধি হয় তাহাতে যে এই ভাব সমুৎপাদনে সহায়তা করেনা এমত বলিতে পারি না। ইহা সচরাচর সকল সময় বর্ত্তমান থাকে না; ইহা কেবল মনুষ্যের পরীক্ষার সময় উদিত হয়, এবং মনুষ্যনামের গৌরব বর্দ্ধি-

করে*।

আমাদিগের প্রস্তাবের একভাগ পরিসমাপ্ত হইল। আমরা এই প্রস্তাবকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া লইয়াছি। পারলৌকিক পুরস্কার আশায় জনসমাজের কতদূর ধর্ম্মের বৃদ্ধি ও মঙ্গল সাধন হইয়াছে তাহা এক ভাগের বিষয়; এবং এতক্ষণ আমরা সেই ভাগেরই আলোচনায় প্রবৃত্ত ছিলাম। ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে পারলৌকিক আশায় জনসমাজে অতি অল্প পরিমাণেই ধর্ম্মের উন্নতি সাধন হইয়াছে এবং এই অল্প পরিমাণ ধর্ম্মোন্নতি সাধন জন্য জনসমাজ মধ্যে আনুষঙ্গিক সমধিক অকল্যাণেরই উদয় হইয়াছে। এক্ষণে পারলৌকিক ভাবের দ্বিতীয় বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক।

দ্বিতীয়তঃ। জনসমাজে পারলৌকিক ভাবের প্রভাব কত দূর অথবা পারলৌকিক ভাব দ্বারা পাপের কতদূর দমন হয় তাহাই আলোচিত হইতেছে। পৃথিবীর অতি প্রাচীন কালে লোকের বিশ্বাস ছিল, যে, ইহলোকেই পাপের সমুচিত দণ্ড হয়। যখন লোকে প্রকৃতিকেই দৈবীশক্তি মনে করিত, তখন প্রতি দুর্ঘটনাকে লোকে পাপের দণ্ড বলিয়া নিশ্চয় গণনা করিত। তখন লোকের বিশ্বাস ছিল পাপ করিলে নিশ্চয় কোন দৈব অভিসম্পাতে পতিত হইতে হয়, হয়তো মৃত্যু আসিয়া অকস্মাৎ আক্রমণ করে, না হয় কোন অপ্রতিবিধেয় পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইতে হয়, অথবা পুত্র-কলত্রবিহীন হইয়া দারুণ শোকাবেগে অনতিবিলম্বে অকালে জীবন যাত্রা পরিসমাপ্ত করিতে হয়। যখন এই প্রকার বিশ্বাস ছিল তখন লোকে সহসা পাপ পথে পদার্পণ করিতে সাহসী হইত না। তখন লোকের পাপজ্ঞানও তত মার্জ্জিত ছিল না। কিন্তু লোকে যখন দেখিতে লাগিল অনেক ব্যক্তি পাপাসক্ত হইয়াও চিরজীবন সুখে এবং নিরুপদ্রবে অতিবাহিত করিয়া গেলেন তখন ক্রমশঃ লোকের ভ্রমদূর হইতেন লাগিল। ইহুদী জাতির ধর্ম্ম ইতিবৃত্তে এই বিষয় স্পষ্টাক্ষরে প্রমাণিত করে। পুরাতন বাইবেল খুলিয়া দেখ, ইহুদীরা প্রথমে বিশ্বাস করিত প্রত্যেকের জীবিত কাল মধ্যেই তাহার পাতকের দণ্ড ভোগ হয়। ক্রমে এই দণ্ড পুত্র পৌত্রে অবনীত হইতে লাগিল। এই বিশ্বাসের অসারতা দিন দিন প্রতিপাদিত হইলে পাপের দণ্ড ভোগ পরকালে প্রচালিত হইল। ইহলোকের প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে কৌশল পূর্ব্বক তাহা অপ্রত্যক্ষ পরলোকে অপসারিত হইল। মানবের চর্ম্মচক্ষু হইতে তাহা অপনীত হইয়া, জ্ঞানচক্ষুর বিষয়ীভূত করা হইল। প্রবল বিশ্বাস এই জ্ঞাননেত্রের দৃষ্টি শক্তি। ধর্ম্ম-বিশ্বাস সুরক্ষিত হইল বটে কিন্তু সেই বিশ্বাস স্থাপনের উদ্দেশ্য বিফল হইতে লাগিল। সেই পাপদণ্ড পরকালে আনীত হইলে

* Vide J. S. Mill—'Three essays on Religion'

তাহা এত দূরস্থ ও দৃষ্টি-বহির্ভূত বোধ হইতে লাগিল যে তাহাতে লোকের আস্থা আর তত প্রবল রহিল না। আধুনিক ধর্ম্মেতিবৃত্তে এখন ইহাই প্রতিপাদন করিতেছে যে সমস্ত লোককে ভয় প্রদর্শন না করিলে কোন কার্য্যসিদ্ধি হয় না তাহাদিগের ও নিকট পারলৌকিক ভয় বিফল হইয়া থাকে। তাহারা সে ভয়ে অনুমাত্র ভীত হয় না। বাস্তবিক "যদি নরকের বহ্নিতাপ লোকের তত ভয়ানক বোধ হইত, তাহা হইলে পৃথিবীতে পাপকর্ম্মের এত বাহুল্য থাকিত না। কোন্ জাতির কবিতা ঐহিক পাপের ভীষণ পরিণাম বিষয়ে লোক দিগকে প্রতিবোধিত না করিয়াছে? যদি একবার নরকের যন্ত্রণাবর্ণন পাঠ কর, হৃদয় কম্পিত হইবে, গাত্র উৎপুলক হইবে, এবং সংসারের সমুদয় দুঃখ লঘু বোধ হইবে। তথাপি মানসে সেই ভয়ের তত সংস্কার হয় না, তথাপি সে সমুদায় দুঃখ কাল্পনিক ও অপরিস্ফুট বোধ হয়, তথাপি পরদ্রব্য হরণার্থ যখন হস্ত বিসারিত কর, তখন তাহা স্বভাবতঃই সঙ্কুচিত হয় না; তথাপি তোমার জিঘাংসার আবির্ভাব হইলে, পাপ দণ্ড মনে পড়িয়া দারুণ ব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করে না; তথাপি পাপে বিষের ন্যায় অপরক্তি হয় না" *। ইহার অর্থ কি? পারলৌকিক আশা যেমন, মানব-মনে পারলৌকিক ভয়ও তাদৃশ প্রবল নহে ইহা কি এই কথারই যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিতেছেনা? আর এক কারণেও পারলৌকিক ভয়ের বিভীষিকা ন্যূনকল্প হইয়া গিয়াছে। পাপদণ্ডের অনিশ্চয়তা হেতু তাহা মানবকুলের তত ভয়প্রদ হয় নাই। মৃত্যুর পর পাপভোগ নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে তাহার অনিশ্চয়তা ঘটিয়াছে। কারণ মৃত্যুর পর যে ফলাফল ঘটিবে তাহা কোন কার্য্য বিশেষের ফলভোগ নহে, তাহা সমস্ত জীবিত কালের পাপ পুণ্যের ফলভোগ এই জন্য সকলেই মনে করেন, তাহাদিগের দুষ্কৃতি যত অধিক হউক না কেন, সুকৃতির সঙ্গে তুলদণ্ডে তাহার পরিমাণ হইলে সুকৃতি পরিমাণই অধিকতর হইবে। এই আশা লোকের মনে অত্যন্ত প্রবল। যে ধর্ম্মে পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে, সে ধর্ম্মাবলম্বীদিগের আবার পাপের ভয় কি? কিন্তু যে ধর্ম্মে তাহা নাই, সেই ধর্ম্মাবলম্বিগণ করুণাময় পরমেশ্বরের অপার করুণার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আশা করিয়া থাকেন। তাহাদিগের জীবনের অল্পপাপ পরিমাণ অবশ্য উপেক্ষিত হইবে, এবং অবশেষে তাঁহারা নিশ্চয় স্বর্গবাসী হইবেন। মৃত্যুর পর পাপদণ্ড নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে তাহার দূরত্ব এবং অনিশ্চয়তা হেতু মানব কল্পনায় এই প্রকারে তাহার ভীতি অপনীত হইয়াছে। অপনীত হইয়াছে কিনা প্রমাণ স্বরূপ, তুমি পাপীর মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত হইয়া দেখ, সেই অন্তিমকালে যখন তাঁহার পাপময় জীবনের ফলভোগের কাল তদীয় কল্পনা চক্ষে

* বিচিত্রবীর্য্য হইতে উদ্ধৃত।

অতি নিকটবর্ত্তী বোধ হইতেছে, তখনও তাঁহাকে দেখিবে তিনিও পুণ্যবানের ন্যায় অতি নিশ্চিন্ত এবং শান্তভাবে জীবনযাত্রা সম্বরণ করিতেছেন; বিগত পাপপুঞ্জ স্মরণে তাঁহার কল্পনা বিশেষ কিছুই নিপীড়িত ও ভয়ত্রস্ত হয় নাই, তিনিও ঈশ্বরের কৃপাগুণ স্মরণ করিয়া এবং স্বকীয় জীবিতকালের পুণ্য রাশি লইয়া সহাস্য আস্যে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে অনায়াসে সাহসী হইয়াছেন, এবং নিশ্চয় বিশ্বাস আছে, তাঁহার প্রসাদভাজন হইবেন। জীবিতকালে তিনি যেমন পাপভয়ে অণুমাত্র শঙ্কিত হয়েন নাই, এখনও সে ভয় তাঁহার কিছুই যন্ত্রণার কারণ হইল না। তিনি অনায়াসে কৃপাময়ের শরণাগত হইলেন।

স্বভাবতঃই মানবের আত্মম্ভরিতা প্রবল; ভয় অপেক্ষা মানবের আশা প্রবলতর। কেহই আপনার নিকট আপনি অপ্রিয় বলিয়া গণনীয় নহেন। সুতরাং কেহই আপনার নিকট আপনি দারুণ পাপী বলিয়া গণনীয় নহেন। কেহ জ্ঞানসত্বে কোন পাপকর্ম্ম করিলে মনে করেন, করুণাময় তাঁহার ক্ষুদ্র কলঙ্ককে দুর্ব্বলতা ও প্রমাদবশাৎ জ্ঞান করিয়া অবশ্য মার্জ্জনা করিবেন; মনে করেন তাঁহার অসংখ্য পুণ্য পুঞ্জে সে পাপকলঙ্ক অবশ্য ক্ষালিত হইবে, তিনি পাপদণ্ডে দণ্ডার্হ হইবেন না।

প্রতিব্যক্তির নিকট পাপভয় কেমন প্রবল তাহা আমরা প্রদর্শন করিলাম। এক্ষণে একবার লোকসমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখা যাউক, লোকমণ্ডলী এই ভয়ে ভীত হইয়া কতদূর পাপনিবৃত্ত হইয়াছে। জনসমাজের প্রতি অবলোকন করিলে পরিদৃষ্ট হইবে, যে তাহার অধিকাংশ লোকই পরকাল স্বীকার করেন, এবং পরলোকে তাহাদিগের বিলক্ষণ বিশ্বাস আছে, কিন্তু সেই বিশ্বাস এত প্রবল নহে যে তাহাদিগকে ইহলোকের সুখসম্ভোগ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে। অধিকাংশ লোকেই ইহলোকের সুখ সম্ভোগে নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া বেড়ান। তাঁহারা পৃথিবীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আছেন। তাঁহাদিগের নিকট বর্ত্তমান সুখ যত প্রবল, ভাবী সুখ তত প্রবল নহে। তাঁহারা ইহজীবনের কষ্ট ও দুঃখ যত ক্লেশকর জ্ঞান করেন, পরলোকের কষ্ট ততদূর জ্ঞান করেন না। ইহাই মানবজাতির নৈসর্গিক ভাব। যাঁহারা অলীক ধর্ম্মের প্রবোধনায় প্রকৃতিকে অস্বাভাবিক ও বিকৃত করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহারাই পারলৌকিক ভাবে অধিকতর উত্তেজিত হইয়া পড়েন, এবং তদ্দ্বারা আপনার ও সমাজের যে অনিষ্টসাধন করেন তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। যে পরিমাণে সমাজে পারত্রিক ভাব প্রবল হইয়াছে, সেই পরিমাণে মনুষ্যসত্ব স্বার্থপর, প্রতারিত এবং পার্থিব বিষয়ে উদাসীন হইয়াছেন। রক্ষা এই, যে জনসমাজের অধিকাংশ লোকের বিশ্বাস থাকিলেও তাঁহারা এই ভাবে প্রচালিত হয়েন না। প্রচালিত হইলে সমাজের অমঙ্গলের আর

অবধি থাকিতনা। আজি পৃথিবীর উন্নতি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর উন্নতি পর্য্যন্ত পরিবদ্ধ হইত; পৃথিবীর দুঃখের আর পরিচ্ছেদ হইত না। বাস্তবিক জনসমাজ যদি ধর্ম্ম-দ্বারা পরিশোধিত ও পারলৌকিক ভাবে উত্তেজিত হইয়া পরিশুদ্ধ হইতে পারিত, তবে সমাজে পাপের এত প্রাবল্য থাকিত না। পারলৌকিক ভয় যদি জনসমাজকে পাপপথ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিত, তাহা হইলে বোধ হয় খৃষ্টধর্ম্মীয় সমাজ সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পাপক্ষালিত হইত। কারণ কোন ধর্ম্মে পাপদণ্ড ও পারলৌকিক ভয় তাদৃশ ভয়ঙ্কররূপে চিত্রিত হয় নাই। অথচ আমরা কোন জনসমাজকে এত পাপনিরত দেখিনা। খৃষ্টীয় মণ্ডল ইউরোপ যত সভ্যতার শিখরে উন্নত হইয়াছে তাহার পাপভাগের তত বৃদ্ধি হইয়াছে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মে ভীষণ নরকের অনন্ত যন্ত্রণা যেরূপ উদ্দীপক বাক্যে চিত্রিত হইয়াছে এরূপ আর কোন ধর্ম্মে নহে। এই ধর্ম্ম-পরিস্থাপকেরা বোধ হয় অনুমান করিয়াছিলেন, যে পৃথিবীতে পাপভয় যত সঞ্চারিত হইবে জনসমাজ ততই পাপ-নিবৃত্ত হইতে থাকিবে। কিন্তু ফলতঃ কি ঘটিল? ফলতঃ কি আমরা দেখিতে পাই, খৃষ্টীয় ইউরোপ অতি পুণ্যবান সাধুজনগণের আবাস ভূমি হইয়া পরম পবিত্র তীর্থস্থান হইয়াছে? না ঠিক ইহার বিপরীত হইয়াছে? খৃষ্টীয় ইউরোপ পৃথিবীর মধ্যে যে কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়াছে, আর কোন দেশ কোনকালে তদ্রূপ হয় নাই। আর কোন মহাদেশকে যেন তদ্রূপ হইতে না হয়! খৃষ্টীয় ইউরোপ জগতে বিভীষণ দস্যু ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অতীত সাক্ষী ইতিহাসে কি বলে? ইতিহাসে কি বলে না সেখানে পারত্রিক ভাব জনসমাজে কিছুই বিদ্যমান নাই। এক কালে যখন পারত্রিক ভাব খৃষ্টীয় ইউরোপকে উন্মত্ত-প্রায় করিয়াছিল তখন ইউরোপ পাপে পূর্ণ হইয়া অতি করাল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। তখন তাহার চারিদিকে নরহত্যা, ব্যভিচার, দস্যুবৃত্তি, প্রবঞ্চনা, এবং পাপের যত প্রকার মূর্ত্তি আছে সকল মূর্ত্তিতেই পাপ ইউরোপময় বিচরণ করিয়া বেড়াইয়াছে এবং নররুধিরে ইউরোপকে প্লাবিত করিয়াছে। এখন পারত্রিক ভাব ইউরোপের জনসমাজ হইতে একেবারে তিরোহিত হইয়াছে। এখন সেই পাপ অতি প্রচ্ছন্ন ভাবে গোপনে গোপনে সমাজকে কলুষিত করিতেছে। এখন পাপ তথায় উপরে একটি সভ্যতার ও বাহ্যধর্ম্মের অবগুণ্ঠন রচনা করিয়াছে; এবং সেই প্রচ্ছন্ন বেশে ইউরোপের জন-সমাজের ওতোপ্রোত হইয়া আছে। এখন সভ্যতার নামে ইউরোপীয় জন সমাজকে পাপ নানাবিধ দুষ্কর্ম্মে পরিলিপ্ত করিতেছে এবং দিন দিন সভ্যতার বাহ্যা-ড়ম্বরে পরিশোভিত নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কার করিতেছে। সভ্য ইউরোপীয় সমাজ ধর্ম্মের নাম মুখে করিয়া সেই পাপ-পথে এমচ সভ্য ভাবে বিচরণ করিতেছেন যে কে তাহাদিগের গোপনীয় পাপস্রোত

ধরিতে পারে? যিনি বহুদিন তাঁহাদিগের সহিত ব্যবহার করিয়াছেন, যিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অভিনিবেশ সহকারে বহুকাল ধরিয়া তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবেন, তিনিই দেখিতে পাইবেন ইউরোপীয় সমাজ পয়োমুখ বিষকুম্ভ স্বরূপ। পাপ তাহার স্তরে স্তরে প্রবিষ্ট হইয়া আছে; কেবল উপরে ধর্ম্ম এবং সভ্যতার আবরণ। স্বার্থপরতা, লোভ, প্রতারণা, খলতা, তাহার সর্ব্বাঙ্গে প্রবিদ্ধ হইয়া আছে। ঐ দেখুন সেই লোভপরতন্ত্র ইউরোপীয় জাতি পৃথিবীর এক কোণ হইতে অন্য কোণে বাহুবিস্তার করিয়াছেন। ঐ রুধিরাক্ত দস্যুহস্ত যেখানে প্রবেশপথ লাভ করিয়াছে সেই খানেই সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে। তাহাদিগের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে ও নৃশংসতার ভয়ে পৃথিবীর অন্য খণ্ডের লোক সমাজ সর্ব্বদাই সশঙ্কিত ও কম্পিত হইতেছে। তাঁহারা লোভের রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া যেন সর্ব্বগ্রাসী হইয়া উঠিতেছেন। সর্ব্বত্রে দারুণ দস্যুবৃত্তি বিস্তারিত করিবার জন্য কেবল ছিদ্র অন্বেষণ করিতেছেন। ইউরোপকে শোণিতপাতে তো শতবার কলঙ্কিত করিয়াছেন; বোধ হয় খৃষ্টীয় ইউরোপে যত শোণিত পাত হইয়াছে, পৃথিবীর আর কোন খণ্ডে তত হয় নাই। কিন্তু তাহাতেও খৃষ্টীয় জনসমাজ সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহাদিগের সেই রুধিরাক্ত ভীষণ হস্ত কি আফ্রিকা, কি এসিয়া, কি আমেরিকা পৃথিবীর সর্ব্বস্থানেই এবং অন্যান্য সাগরের শেষ সীমান্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপাবলিতেও প্রসারিত হইয়াছে, এবং ভয়ানক রুধিরপাতে পৃথিবীকে প্লাবিত করিয়াছে। যে দিকে চাও, খৃষ্টীয়গণের ভীষণমূর্ত্তি এবং লোভপূর্ণ সবল দেহ অস্তকের প্রায় দেখিতে পাইবে। তাঁহারা সর্ব্বগ্রাসী হইয়া বেড়াইতেছেন। পৃথিবীতে নূতন নূতন চাতুরী, জাল, ও পাপের নূতন নূতন পথ প্রদর্শন করিতেছেন। স্পেনীয়েরা যে নৃশংস ব্যাপারে পিরু, মেক্সিকো, এবং আমেরিকার অন্যান্য স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাহার সাদৃশ্য ও দৃষ্টান্ত ইতিহাসের আর কোন্ অধ্যায়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়? ইংরাজ জাতি ভারত বিজয় কালিন যে চাতুরী, জাল, ও অসংখ্য খেলা খেলিয়া গিয়াছেন, যদ্দারা ভারতবাসিগণের চক্ষে নূতন নূতন পাপপন্থা প্রকাশিত হইয়াছে, সে রূপ দৃষ্টান্ত আর কোথায় পাওয়া যায়? রুশীয়া সর্ব্বগ্রাসী হইয়া পৃথিবীতে যে শোণিত পাত করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা কোথায়? যে উন্নত খৃষ্টীয় ধর্ম্মের শিক্ষা—সাধু, তোমার এক গণ্ডে কেহ চপটাঘাত করিলে তুমি অন্য গণ্ড তাহাকে ফিরাইয়া দিও——ইউরোপের আধুনিক শোণিত ময় ও পাপময় ইতিবৃত্ত কি সেই ধর্ম্মের পরিণাম? জিসস্, এস, আসিয়া দেখিয়া যাও তোমরা যে বীজবোপণ করিয়াছিলে, তদুৎপন্ন বৃক্ষে কি ফল ফলিয়াছে। এই পরিণাম দেখিয়া তোমরা কি তারস্বরে জগৎময় ঘোষণা করিবে না, জনসমাজে

ধর্ম্মের নাম বৃথায় বাগাড়ম্বর মাত্র? সেই ধর্ম্মনামে সকলই কৃত হইতে পারে। খৃষ্টীয় পাদ্রিগণ,——তোমরা এই ইতিহাস লইয়া গৃহে ফিরিয়া যাও; আর খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারের জন্য, অন্ধের মত, উন্মত্তের মত দেশে দেশে ভ্রমণ করিও না। স্বদেশ কিসে প্রকৃত রূপে সভ্য হয়, সেই উদ্দেশে স্বদেশে ফিরিয়া যাও। অগ্রে স্বদেশকে প্রকৃত প্রস্তাবে সভ্য ও ধর্ম্মপরায়ণ কর, পরে অন্য দেশে ভ্রমণ করিও। তোমরা সভ্যতাভিমানী; কিন্তু তোমাদিগের স্বদেশীয়গণ পৃথিবীর চারিদিকে বর্ব্বরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অগ্রে এই বর্ব্বরতা নিবারণ কর। কিন্তু জানি ও তাহা ধর্ম্ম ও পরলোকের আশা বা ভয় দ্বারা প্রচার হইবে না। তজ্জন্য অন্য উপায় অনুসন্ধান কর। ধরণীতে বহুকাল ধরিয়া ধর্ম্মের পরীক্ষা হইয়াগিয়াছে। সে উপায় ব্যর্থ হইয়াছে; আর অধিক কাল এ পরীক্ষার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে অন্য সাধনের আবশ্যক।

কিসে তবে জনসমাজের অধিকাংশলোকেই পাপকার্য্য হইতে বিরত হয়, এখন ইহাই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। ইহলোকেই অসৎকার্য্যের যে সমস্ত ফলাফল ঘটে, সেই বর্ত্তমান ও প্রত্যক্ষ অমঙ্গল ভয়ে লোকপরম্পরা পাপ হইতে নিবৃত্ত হয়। কারণ লোকের ইহজীবনের কষ্ট ও দুঃখ, নিন্দা ও অপবাদ, অপমান ও লাঞ্ছনা তাহার অতিমাত্র অসহ্য বোধ হয়। যখন লোকে পাপকার্য্যে প্রলোভিত হয়; তখন তিনি একদিকে সেই দুষ্কৃতিজনিত ক্ষণিক সুখ এবং অন্যদিকে ভবিষ্যজীবনের অবনতি, অপযশ রাজদণ্ড প্রভৃতি সেই পাপকার্য্যের অশেষ কুফল গণনা করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়েন। পাপের যদি ইহলোকেই এই প্রকার সামাজিক শাসন এবং রাজদণ্ডভয় না থাকিত, আজি জনসমাজ নিশ্চয় উচ্ছৃঙ্খল ও লণ্ড ভণ্ড হইয়া যাইত।

জনসমাজের অধিকাংশই কেমন পরলোকের প্রতি উদাসীন তাহা বোধ হয় অনেকদূর প্রদর্শিত হইয়াছে। তবে পারলৌকিক মতামত প্রচার করা কাহাদিগের জন্য? সমাজের যে অল্পভাগ পারলৌকিক আশায় উৎসাহিত হইয়া সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত থাকেন, আমরা স্বীকার করি তাঁহাদিগের সৎকার্য্যদ্বারা কখন; কখন ভূমণ্ডলের কথঞ্চিৎ ইষ্টসাধন হয়। কিন্তু অন্যদিকে যখন বিচার করিয়া দেখি, সেই আশা প্রণোদিত ধর্ম্মোৎসাহ জনিত পৃথিবীর যে সমস্ত ভয়ঙ্কর অনিষ্টাপাত হয়, মানবপ্রকৃতি যে রূপ স্বার্থপরতায় কলুষিত হয়, পার্থিব মঙ্গলের প্রতি মানবের যাদৃশ ঔদাস্য জন্মে, এবং জনসমাজ যে রূপ প্রতারিত হয়েন, তখন অবশ্য বলিতে হইবে যে, এই পারলৌকিক আশা জনসমাজের একান্ত শুভকরী প্রবৃত্তি নহে; ইহা সমূহ-অমঙ্গল-প্রসবিনী। বাস্তবিক এই প্রবৃত্তিজনিত পার্থিব মঙ্গলের সহিত অমঙ্গলের তুলনা করিয়া দেখিলে

প্রতীত হয়, যে ইহাদ্বারা পৃথিবীর মঙ্গলাপেক্ষা অমঙ্গলেরই ভাগ অধিকতর উৎপন্ন হইয়াছে। আবার যখন দেখিতে যাই পারলৌকিক ভয় দ্বারা জনমণ্ডলীর পাপপ্রবৃত্তির কতদূর দমন হইয়াছে, তখন কি আমরা দেখিতে পাই না, যে জনসমাজ পারলৌকিক ভয়ে ভীত হইয়া অণুমাত্র পাপকর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই। তৎপক্ষে পার্থিব ক্লেশ ও দুঃখ ভয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক শাসন অপ্রতিম প্রতাপে মানব হৃদয়কে নিয়মিত রাখিতেছে। পারলৌকিক ভয় প্রভাবে যদি জনসমাজ পাপনিবৃত্ত হইত, তবে খৃষ্টানমণ্ডলীর প্রধান আবাসভূমি ইউরোপ আজি পৃথিবীর তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু ইউরোপ ঠিক ইহার বিপরীত নামে কলঙ্কিত হইয়াছে। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী জনসমাজ পারত্রিক ভয়ে কতদূর পাপনিবৃত্ত হইয়াছে, তাহা ইউরোপের ফলাফল ও দৃষ্টান্ত বিবেচনা করিলেই অনায়াসে অনুমিত হইতে পারে। তজ্জন্য স্বতন্ত্র প্রস্তাবনার আবশ্যক নাই।

জনসমাজের অধিকাংশই যখন পরকালের প্রতি উদাসীন হইয়া কার্য্য করিতেছে, তখন তাহাদিগের পক্ষে সে পরকাল থাকা আর না থাকা সমান। না থাকিলে তাহাদিগের কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। থাকিলে বরং ক্ষতিই অধিকতর। যাঁহাদিগের বিশ্বাস যেমনই হউক না, ইহলোক পরিত্যাগ করিতে কেহই ইচ্ছা করেন না। মৃত্যু সকলের নিকটই সমান অপ্রিয়। কেবল সংসারের প্রতি উদাসীন হইয়া যাঁহারা বিরাগী হইয়া গিয়াছেন, অথবা সংসারেই বৈরাগ্যাবলম্বন পূর্ব্বক মৃৎপিণ্ডবৎ অবস্থান করিয়া আপনাদিগেরই কার্য্যফলে ইহজীবনকে দুর্ব্বহ ভার স্বরূপ করিয়া তুলিয়াছেন, সেই ঘোর ভ্রমান্ধ এবং অধার্ম্মিক জনগণই মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছেন। নহিলে যাঁহারা ইহজীবনে নিতান্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, তাঁহাদিগের সেই যন্ত্রণাও এরূপ অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে তাহাকে আর নিতান্ত ক্লেশকর জ্ঞান হয় না, এবং তাঁহারাও তাদৃশ মৃত্যুর প্রত্যাশী নহেন। কেবল যাঁহারা প্রাণান্তিক পীড়ায় এবং বার্দ্ধক্যের অথর্ব্বতায় জীবনকে ভারবহ ও কেবল ক্লেশের কারণ বিবেচনা করিতেছেন তাঁহাদিগের কথা ছাড়িয়া দিউন। তাঁহাদিগের ইহজীবনের সুখ একবারে নিঃশেষিত হইয়াছে; আর অধিককাল জীবনধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। নহিলে অবশ্য বলিতে হইবে, আয়ুঃস্পৃহা সাধারণ সকলেরই সমান। পরলোকের প্রতি যাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, ইহলোক পরিত্যাগ করিতে তাঁহার যেমন অনিচ্ছা, ঘোর বিষয়ী এবং সংসারীরও তদ্রূপ অনিচ্ছা। কিন্তু পারত্রিক সুখের আশা যদি মানবের তত প্রবলতর হইত, তাহা হইলে কি এরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। মানবপ্রকৃতিনিহিত যে আয়ুঃস্পৃহা বলবতী আছে, তাহা এই পারলৌকিক প্রবৃত্তির প্রতীপগামিনী হইয়া কার্য্য করিতেছে। সুতরাং

বলিতে হইবে এই পারলৌকিক প্রবৃত্তি মানবপ্রকৃতির উপযোগিনী নহে, এবং মানব-প্রকৃতির সহিত ইহার সঙ্গতি নাই। মানব প্রকৃতির অসঙ্গত বলিয়া ইহা মানব-মণ্ডলী মধ্যে কার্য্যকারী হয় নাই। জনসমাজের অধিকাংশই যখন পরকালের প্রতি উদাসীন হইয়া কার্য্য করিতেছে, তখন তাহাদিগের পক্ষে সে পরকাল থাকা আর না থাকা সমান। ইহলোকেই জীবনের ও জীবাত্মার শেষ হওয়া বাস্তবিক অমঙ্গলের কারণ নহে। মনুষ্য, আত্মব্যতীত কোন জীবেরই পরকাল নির্দ্দেশ করেন নাই। পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গাদির যে পরকাল নাই, অধিকাংশ লোকে এইরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকেন। মনুষ্য আত্মশ্লাঘায় পূর্ণ হইয়া কেবল আপনারই পরকাল অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু সে অনুমান ও বিশ্বাস দ্বারা তাঁহার চরিত্রের কিছু বৈষম্য ঘটে না। তবে মনুষ্য চিন্তাশীল প্রাণী; ইহ-লোকেই জীবাত্মার পরিসমাপ্তি হইবে— এই চিন্তাই তাঁহার পক্ষে ক্লেশকর, ভয়ানক ও নৈরাশ্যজনক। ইহা ভাবিতে গেলেই আমাদিগের মনে হয়, যেন আমরা জীবিত রহিয়াছি অথচ আমাদিগের সকলই শেষ হইয়াছে। জীবিত থাকিতেই মৃতকল্প জ্ঞান হওয়া যে নিতান্ত নৈরাশ্যজনক, তাহার আর সন্দেহ নাই। আমি আছি, অথচ আমি নাই; এই আসিয়াছি, কিছু-কাল পরে আমার কিছুই থাকিবে না, এইরূপ কল্পনা ও স্বপ্নই ভয়ঙ্কর। এই রূপ আত্মঘাতিনী কল্পনা স্বভাবতঃই নৈরাশ্য-জনক হইয়া থাকে। মানবের যখন এই প্রকার জীবিতমৃত জ্ঞানহয়, তখন মানব পরকাল কল্পনা না করিয়া থাকিতে পারেন না। নহিলে ঈশ্বর যদি কোটি কোটি প্রাণীর পরকাল না দিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিতে পারেন, মনুষ্যকে কেন পারিবেন না, আমরা বুঝিতে পারি না। ঐশী শক্তির বিদ্যমানতা স্বীকার করিতে গেলে, অপ-রাপর প্রাণীর ন্যায় মনুষ্যও সেই শক্তির ক্রীড়া পদার্থ অবশ্য মানিতে হইবে। অপরাপর প্রাণীর পরকাল না থাকিযা যদি তৎসমুদায় সেই ঐশীশক্তির ক্রীড়া পদার্থ হইয়া থাকে, মনুষ্য তবে কেন হইবে না আমরা বুঝিতে পারিনা। সেই অনন্তকাল-ব্যাপিনী ঐশীশক্তির নিকট ৭০ বৎসর-পরমায়ু বিশিষ্ট মনুষ্যজীবন মধ্যে যাহা সম্ভবিতে পারে সেই জীবন পরলোকে বিস্তৃত করিলেও তাহাই সম্ভবিতে পারে। তাঁহার অনন্ত কৌশলে, অনন্তময় মঙ্গল উদ্দেশ্য ৭০ বৎসরে যেমন সুসম্পন্ন হইতে পারে, শত সহস্র বৎস-রেরও ঠিক তদ্রূপ হইবার সম্ভাবনা। যদি না হয়, না হইবার সম্ভাবনা, তবে সেই ঐশীশক্তি অনন্ত-কৌশলময়ী নহে। মনু-ষ্যের জ্ঞানচক্ষু অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন বলিয়া তিনি জগৎকৌশলের সমস্ত প্রহেলিকার রহস্য ভেদ করিতে পারেন না। রহস্য-ভেদ না করিতে পারিয়া মনে করেন, ইহ-লোকে যাহা অসম্পন্ন রহিল পরলোকে তাহা সুসম্পন্ন হইবে। ইহা মনুষ্যেরই মিথ্যাদৃষ্টি। এই মিথ্যাদৃষ্টি তাঁহার ঐশী-

শক্তির কল্পনার সহিত সুসঙ্গত নহে। হয় এই দৃষ্টি মিথ্যা, না হয় তাঁহার ঐশ্বরিক কল্পনা মিথ্যা, তিনি জগৎকারণকে ঠিক কল্পনা করিতে পারেন নাই। কারণ যে কল্পনা স্থির করিয়াছেন তাহা তাঁহার সমগ্র বিশ্বাসের সহিত সুসঙ্গত নহে। তাঁহার আত্মঘাতিনী কল্পনা নিত্য বিপ্রিয়করী বলিয়া তিনি ইহজীবনকে বিস্মৃত করিতে গিয়াছেন এবং জগৎকৌশলানভিজ্ঞ অজ্ঞানতা সেই পারলৌকিক বিশ্বাসের প্রয়োজন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। নহিলে মানবজীবনের পরকালের কিছুই প্রয়োজন নাই। যাঁহারা বলেন আছে, তাঁহাদিগের তর্কজাল ও যুক্তির বিচার করিয়া দেখ, সেই যুক্তি ও তর্কের মূলে এই আত্মবিনাশের অনিচ্ছা বিদ্যমান রহিয়াছে; এবং সেই যুক্তি ও তর্কের উপকরণ সমুদায় মনুষ্যের অজ্ঞানতার পরিচায়ক। মনুষ্য আত্মবিনাশ চায় না বলিয়া নানাবিধ অনুকূল তর্কজাল বিরচন করিয়া আত্মার অমরত্ব ও পরকালের সৃষ্টি করিয়াছে—ধরিতেগেলে এই ইচ্ছাকেই পরকালসৃষ্টির মূল কারণ বলিতে হইবে। মনুষ্যের এই বাসনা চরিতার্থ হউক আমাদিগেরও ইচ্ছা; ইহাতে আমাদিগের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু মনুষ্যের ন্যায় বুদ্ধিশীল জীব কি শুদ্ধ বাসনা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিবেন? এই বাসনার প্রতিপোষক বলবৎ প্রমাণ কই; যদি প্রবল যুক্তি দ্বারা এই বাসনা ও মত সমর্থিত হইত, তবে ইহা বাস্তবিক মানবের পক্ষে বড়ই আনন্দের বিষয় হইত। এই বিশ্বাসের যৌক্তিকতা আজি পর্য্যন্ত কেহই প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই। তত্ত্ববিৎ লক (Locke) বলিয়া গিয়াছেন যে যুক্তিদ্বারা পরকাল প্রতিপাদিত হয় না। মেষ্টর ষ্ট্রস ও (Strauss) বলেন "পরকাল কেহ প্রতিপাদন করিতে পারেন নাই।" লক প্রাচীন কালের যুক্তির অসারতার সাক্ষ্য দিয়াছেন, ষ্ট্রস আধুনিক পণ্ডিতগণের তর্কজালে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। এই মত তবে কেবল বিশ্বাসমূলীয় বলিতেহইবে। কিন্তু এই বিশ্বাসকে এত প্রবল রূপে প্রতিপোষণ করার আবশ্যক কি? এতদ্দ্বারা জগতের কি ইষ্টসাধন হইতেছে? এ বিশ্বাস না থাকিলে মনুষ্যের ক্ষতিই বা কি! এই দেখুন চিন্তাশীল মিল কি বলিতেছেন:—

"The mere cessation of existence is no evil to any one; the idea is only formidable through the illusion of imagination which makes one conceive oneself as if one were alive and feeling oneself dead."*

মানবের কল্পনা যদি মানবের মনে এই বিপ্রিয় ও নৈরাশ্যজনক স্বপ্ন উদিত না করিত তাহা হইলে তাহার পরকালের বিশ্বাস তাদৃশ প্রবল হইত না। মানবের কল্পনা তাহার হৃদয়কে স৹ আতঙ্ক ও

* Vide Mill's essay on the Utility of Religion

মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখে, তাহার বুদ্ধি ততদূর সমর্থ নহে। হৃদয়কে অধিকার করিবার কল্পনায় যতদূর ক্ষমতা আছে, বুদ্ধির তত দূর নাই। আমরা মানবজাতিকে বুদ্ধিশীল জাতি কি কল্পনাশীল জাতি বলিব অনেক সময় স্থির নিশ্চয় করিতে পারিনা। কারণ দেখি, বুদ্ধি অপেক্ষা তাহাদিগের কল্পনা প্রবলতর। সাধারণ মানবজাতি কল্পনা দ্বারা যত প্রচালিত হয়, বুদ্ধি দ্বারা তত হয় না। এই কল্পনা-প্রবল মানবজাতির অনেক সংস্কার বুদ্ধির প্রতিপোষক নহে। সেই সংস্কার নিচয়কে এক প্রকার কুসংস্কার বলিলেও বলা যাইতে পারে। আমাদিগের প্রস্তাবিত পরকালের বিবাদকে এই প্রকার একটি কুসংস্কার বলা যাইতে পারে কিনা অনায়াসে অনুমিত হইতে পারে।

মনুষ্যের ইতিবৃত্তে প্রতিপন্ন করিতেছে যে, পারলৌকিক বিশ্বাস না থাকিলেও জনসমাজের জীবনযাত্রা সুনির্ব্বাহিত হইতে পারে। সামাজিক শাসন, এবং যশোলিপ্সা প্রভৃতি সামাজিক প্রবৃত্তি সকল জনসাধারণকে যেমন পাপ হইতে নিবৃত্ত এবং পুণ্যকর্ম্মে উত্তেজিত করে এমত আর অন্য কোন প্রবোধনায় করে না; আমরা তাহা পূর্ব্বেই সুস্পষ্ট প্রতিপাদন করিয়াছি। প্রাচীন গ্রীক দিগের স্বর্গনরকের ভাব কিছুই ছিল না বলিলে হয়, অথচ তাহারা উত্তমরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত করিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য জাতির মত তাহাদিগেরও মৃত্যুভয় ও আয়ুঃস্পৃহা প্রবল ছিল। অন্যান্য জাতির ন্যায় তাহারাও ইহলোকের সুখে সুখী হইতেন, এবং যাহাতে সামাজিক সুখের বৃদ্ধি হয় তাহারই চেষ্টা করিতেন। তাহাদিগের সামাজিক প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল। এই প্রবৃত্তি প্রবল থাকিলেই যথেষ্ট হইতে পারে, তাহা হইলেই সমাজ সুনিয়মে চলিতে পারে। বৌদ্ধ সমাজ ইহার আর একটি উদাহরণ। কি খৃষ্টিয়, কি মহম্মদীয় ধর্ম্ম, আজি কোন ধর্ম্মের উপাসক-সংখ্যা বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপাসক-সংখ্যার সমান হইতে পারে না। বৌদ্ধের লোক-সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর। বৌদ্ধধর্ম্মে স্বর্গের ভাব কি? জীবাত্মার নির্ব্বাণই বৌদ্ধেরা সুখের পরাকাষ্ঠা ও চরম সীমা জ্ঞান করেন। "বৌদ্ধেরা পরলোক স্বীকার করেন না। ইহাঁদিগের মতে নির্ব্বাণ শব্দের অর্থ বিনাশ; যে রূপ প্রদীপ নির্ব্বাণ হইয়া যায় সেই রূপ আত্মার ও নির্ব্বাণ অর্থাৎ ধ্বংস হইয়া থাকে। কোন কোন সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরা স্বর্গ ও নরকের অস্তিত্ব স্বীকার করেন যথার্থ বটে, কিন্তু সে সকল কেবল হিন্দুধর্ম্মের সহিত সংস্রবে সংঘটিত হইয়াছে সন্দেহ নাই।" বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী শতসহস্র জনগণ এই বিশ্বাস চিরকালই ধারণা করিয়া আসিতেছেন, আবার তাহাদিগের সমাজ সংস্থান অতি পরিপাটি এবং জীবনযাত্রা সুনির্ব্বাহিত হইতেছে। এই বিশ্বাস না থাকাতে কি তাহাদিগের সমাজ বিশৃঙ্খল ও বিধ্বংস হইয়াছে? অপরাপর ধর্ম্মাবলম্বী

জনসমাজের সাধারণ জনগণ যেমন পরলোকের প্রতি উদাসীন থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত করিতেছে, বৌদ্ধেরা তদপেক্ষা কিছু হীনতর নহে। যাঁহারা বলেন, পারলৌকিক বিশ্বাস না থাকিলে, নরকের ভয় ও স্বর্গের আশা না থাকিলে সমাজ বিশৃঙ্খল হইয়া যায়, বৌদ্ধসমাজ তাহাদিগের মতের অসারতা প্রতিপাদন করিতেছে।

আমাদিগের প্রস্তাব অভিপ্রেত বিস্তৃতির সীমা অতিক্রম করিয়াছে; এক্ষণে ইহার উপসংহার করা উচিত। পারলৌকিক আশা দ্বারা জনসমাজের অধিক শুভ কি অশুভ হইয়াছে তাহার আমরা বিচার করিয়াছি। পারলৌকিক ভয়ে জনসমাজ কতদূর পাপনিবৃত্ত ও শাসিত হইয়াছে তাহাও আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। বাস্তবিক সাধারণ জনগণ পারলৌকিক বিষয়ে কেমন উদাসীন তাহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে। পারলৌকিক বিশ্বাসের যুক্তিমূল কত দুর্ব্বল তাহা চিন্তাপরায়ণ তত্ত্বদর্শিগণই বলিয়া দিতেছেন। সমাজে এই বিশ্বাসের ফলাফল কিরূপ তাহা আমরা প্রদর্শন করিলাম। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারিনা। যাঁহারা এই মত প্রতিপোষণ করেন, ইহার বিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন, যাঁহারা এই মত প্রচার করিতে ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছেন তাঁহারা যদি ইহার যৌক্তিকতা এবং সামাজিক শুভকারিতা প্রতিপাদন করিতে পারেন আমরা তাঁহাদিগের নিকট চিরবাধিত হইব। নহিলে আমরা জানি না, যে বিশ্বাস দ্বারা সমাজের অনেক অমঙ্গল সাধিত হইতেছে, জন-সমাজে যাহার উপকারিতা কিছুই উপলব্ধি হয় না, যুক্তি যে বিশ্বাসকে সমর্থন করে না, সেই অমঙ্গলকর, অমূলক মত ও বিশ্বাস পরিবর্জ্জনে তাঁহারা আজিও কেন অগ্রসর নহেন।

শ্রীপূঃ—

বৃন্দাবন-দৃশ্যাবলি।

সময় প্রথম রাত্রি।

রাধিকা ও ললিতা বিসখা ইত্যাদি সখীগণ আসীনা; কুসুম সজ্জিতা শিলায় রাধিকা অর্দ্ধ শয়িতা ও গাঢ় চিন্তায় নিমগ্না।

ললিতা—(ব্যজন করিতে করিতে)
সখীলো! আজ কাঁহে মলিন চন্দ্রমা?
আলু থালু ঘাঘরি খেলত মাধুরী
কাঁচলি কি ডোর কাঁহে খুলল স্বজনি!
নাহি প্রভাকর নাহিত নিদাঘ
শশিকরে সুশীতল বহত সমীর।

তবেঁ কোন তাপ ভেয়ল তোহার ?
কোন পাপ রোগ আজি গরানল তোমার ?
হের হের বিসখে ! হের কিবা রঙমে
নাচি নাচি গুঞ্জরি আয়ত ভ্রমর
ফিরত ঘোমত বৈঠনে চাহত
মধুলোভে পাগল মধুময় অধরে !

বিসখা ।—কইসন কহব ? মালুম না মোয়
আজ নহে সই নিত নিত করই
চাঁদমুখে হাসি সতত নিরখই
শ্রবণমে শুনই সুস্বর লহরী ।
আজ কোন ভাবে কিবা অনুরাগে
হের সখী পয়োধর কাঁপত থর থর
নাসা শ্বাস বহত প্রবল সমীর ।
কাঁহে গিরি অধীর ? কইসন কহব
কোন ভূকম্পনে এই সব ভেয়ল —

রাধিকা ।—সখীলো আজি কিবা নব
যোগ ভেয়ল !
যমুনামে আজি কিবা হৃদয়মে বিঁধল !
ভীষণ হুতাশন পৈঠল হৃদয়ে
কি ফণী দংশল কহন না যায় !—
মরি মরি সখীলো সহন না যায়
চরণমে গিরত কহলো উপায় !—

ললিতা ।—যমুনামে যাওয়া অব ভেয়ল
বালাই,
কদম্ব তরুতটে রহত বালাই !
নিঠুর নটবর কঠিন কপটে
কুটিল বিলোকনে বিঁধব দারুণ ।
মদন শরাসন বঙ্কিম লোচন
খর তর সন্ধানে হৃদয় বিদরে !—
হৃদি-রোধ টুটই বাসনা তরঙ্গ
চলত অবিরত প্রবোধ না মানে ।
বিসরি গুরুজন হেন মনে হোয়
চরণ কোকনদে যদি পাই ঠাঁই ।
সখীলো !
যমুনামে যাওয়া অব ভেয়ল বালাই !—

রাধিকা ।—সখীলো !
পুরুখ রতন শাম অতুল ভুবনে !
শাম মদন তরু হৃদয় কাননে
প্রেম-কিসলয়ে সুললিত শোভিত
দোলত অবিরল বাসনা হিল্লোলে !—
শাম-অমল শশি প্রতি মধু মূরতি
হৃদিসরে নিতই নাচত হমারি !
সখিলো শামরূপ ভেয়ল কাল হমারি !—
(দীর্ঘনিশ্বাস)—
কিবা সুঠাম সুন্দর রতি মন রঞ্জন
ত্রিভঙ্গে বঙ্কিম মোহন মূরতি !
কিবা শিখি পুচ্ছে খচিত চিকুর-রঞ্জিত
অনিলে প্রতাড়িত দোলত মধুরে !—
নবীন গোপাবলি কোমল সুন্দর
সুরাগে রঞ্জিত ঘেরই অধরে !—
সখীলো রাই হৃদে হেন কয় !
শাম সুন্দর চারুমদন তরু বরে
প্রেম লতা ভেয়ই জড়াই তাহারে !
সুরনর দুর্লভ অধরে অধর
দানই অমরতা লভই ভূতলে !—
উরস বিশাল ভৃগু পদ-চিহ্নিত
চরচিত চন্দনে নয়ন নন্দন !—
সার্থক রে কদম্ব তরু বর
জীবন তোমার !—
তোম শিখাও হমারে

গুরু পদে আজ হম বরিণু তোমারে !—
কোন পুণ্য ফলে কিবা বাহু-বলে
লভলি দুর্ল্লভ শাম-আলিঙ্গন?
রাধা আরাধনা যোগ-তপ-ধন !—
(দীর্ঘনিশ্বাস)—

বঙশী বঙশে রচিত
বঙশ তব বঙশ পবিত্ত
রাধা লভল না যায় পরাণ প্রদানে
তুহু লভলি তাহারে বিনা আরাধনে—
(দীর্ঘনিশ্বাস)—

পীত বাস স্মরইলে তোয়
অযুত কাল ফণী দংশয়ে মোয়—
চিতে মোর হোয়ত অনল মে ডারি
পীত বাস—ভসম ফেকই সাগরে
বৃন্দাবন মাঝে নারাখি তাহারে—
ইম রতনাবতী রতন অম্বর
আবরব ভেরই শ্রীঅঙ্গ মোহনে—
লাজ সতিনী এক সাপিনী ফণা হেন
বৃন্দাবন মাঝে ডরাই তাহারে,
লোকালয় তাজই হিমাদ্রি শেখরে
পসব তম ময় কন্দর মাঝারে,
আধার না রহব ভেয়ব দূর
শাম সুরয চারু মোহন কিরণে
সখীলো মনে মোর হেন আস তোয় –
সে নীল রতন ধনে দৃঢ় তর বাধই
নীল আচল মূলে রাখই যতনে—
(তমাল শেখরে কোকিলধ্বনি)

অই হানত কুহু বাণ !—
পিকবর তমালে নিঠুর নিদারুণ
রাধা হৃদয় ভেদি বারিখত বাণ !—
ললিতে হাকাও তাহারে
রাধা নিকুঞ্জে পুন পসইতে নারে !
বা কহও তাহারে
হম গজ মতি হার দিয়ব তাহারে !
পাকড়ি নটবরে কুহু বাণে বিঁধই
নীল রতন ধনে আনি দেয় মোয় !—

বিসখা।—পিকবর হম তোরে কহব বাট
তু'গিয়বি নহে দূর যমুনা-কিনারে—
পেখবি নৃপ বর কিসলয়ে শোভিত
প্রতি বিম্ব সুবিম্বিত যমুনা তরগে !
উঠই শেখরে বহবি গুমারে।

পেখবি এক

নীল রতন ময় ত্রিভঙ্গ নাগর !
শ্রীঅঙ্গ শোভিত সুভাগ চন্দনে
বন মালা লম্বিত উরস বিশালে !
শ্রবণ যুগলে যুগল কুণ্ডল
যুগল কাম-কেতু খেলত তায়।
যুগ করে পাকড়ি মোহন মুরলী
মদন উদ্ধভি অধর কিনারে !
তু' পেখবি নয়নে কালিন্দী জীবনে—
কালিন্দী জীবন বহবে উজন
বৃন্দাবন ভরবে মধুর আরবে !

পিকবর !

কুহু শরে বিতহ তাহারে !
ক্ষম ব্রজ-গোপিনী গিরত চরণে ! —

রাধিকা।—সখীলো !— (দীর্ঘ নিশ্বাস)—
সখীলো !—সামরূপ ভেয়ল কাল হমারি
হম যায়ত যমুনা কিনারে !
পেখই নীল নীর অন্তর অর জুর
সাম সুন্দর রূপ হৃদয়মে জাগে !

যমুনা প্রতি তরঙ্গ

কাল ফণী ভাই দংশয়ে হমারে! —
সখীলো!—সামরূপ ভেয়ল কাল হমারি।
হম, গিয়ল যমুনা কিনারে!
কদম্ব তরুতটে পেখনু তাহারে!
লাজ সতিনী আয়ি সাধল বাদ
পূরণ না ভেয়ল মোর মন সাধ!
কদম্ব তরু মূলে পলকে পলকে
নিরখই নটবরে নয়ন ফিরাই
ভাবনু যৌবন যমুনা সলিলে
রাখই মন প্রাণ নৃপবর মূলে—
যমুনা তেয়াজই উটনু আবার
বাসনা পেখব মদন মোহনে
চারি আঁখি মিলল!—ভেয়ল কাল
লাজ সতিনী পুন—পূরল না আশ।
কুণ্ডল তেয়াজই চলনু আবার
ছলে ফিরি পেখব বাসনা হৃদয়ে
কুণ্ডল ছলে সই ফিরনু আবার
মৃদু-পদে তাকই মদন মোহনে—

সখীলো

পলক পেখনু পলকে অমনি
মিলল চারি আঁখি পলকে খেলল
অযুত তরঙ্গ হৃদয় সাগরে—
কুন্তল তেয়াজই ফিরনু আবার
শরমে থর থর মৃদু দর চরণে
হের সখি!—(বাম কর্ণ দেখাইয়া)
কুণ্ডল,হীন মোর বাম শ্রবণে—
(দীর্ঘনিশ্বাস)
কেশবে পেখব কেশব না,মোর
আসই পসনু,গহন বিপিনে—

রসাল তরু-রাজ আড়ে তনু ঢাকই
পেখনু সুর-নর-মোহন মুরতি

সখীলো!—

যদি সহস্র লোচন তেয়ত হমার—
সহস্র বরখ অবিরত পেখই
রাধা হৃদি সাধ পূরত কদাচ—
(দীর্ঘনিশ্বাস)
ভুবন-মোহন চঞ্চল লোচনে
চৌদিকে নিরখই পলকে বৈঠল
কদম্ব তরু মূলে—পলকে ফেলল
ব্রজ-মন-মোহন মুরলী ভূতলে—
পলকে উঠল মৃদু মৃদু চলল
পলকে গিরল যমুনা সলিলে—
সার্থক রে যমুনা সলিল
আ! হম নাহি কাহে ভেয়নু সলিল—
(দীর্ঘনিশ্বাস)
(তমাল শেখরে কোকিল ধ্বনি)
চন্দ্রাবলি।—অই সখী পিকবর কুহরত পুন
তমাল শেখরে
তমাল শেখরে পঞ্চমে কুহরে
বিধই জর জর প্রবোধ না মানে
হানত কুহু বাণ পিক বড় দরুণ
বিধব ফুল-বাণে আজি মোরা তায়।

চল সখী

দূরে খেদায়ব নাশব ভয়—
(বিসখা ললিতা চন্দ্রাবলি ইত্যাদি সখীগণ কুসুম স্তবক লইয়া প্রস্থান।
(নেপথ্যে বংশীধ্বনি)
রাধিকা।—অইরে বংশী ফুকরে
উহু মরি পরাণ বিদরে—

উরু দুরু দুরু জঘন সঘনে
কাঁপত ঘাঘরি খুলল রে!
গুরু নিতম্ব গিরি পয়োধর
ভরে অধীরা গিরই রে!
হার ভুজঙ্গিনী কালকুটময়ী
দংশত মোর পয়োধরে রে
নীল বসনে জলন জলত—
জলনে হৃদয় জলত রে।
মলয় অনল গরল ঢেউ
হৃদয় কিনার টুটল রে।
রতন নিচোল পাথাণ ভেয়ল
হৃদয়ে চাপান ভেলয় রে।
চরণ নূপুর খর কুশাঙ্কুর
ভেয়ল—চরণে বিধতরে।—
বেণী ভুজঙ্গিনী অযুত বদনা
অযুত বদনে দংশতরে!
মেখলা কুণ্ডল কঙ্কন বলয়
ভূষণ ভেয়ই অশনি রে
হানত।—বাঁশরী বাজত সপ্তমে
রাধার পরাণ বিদরে রে।—
(কুসুম শয্যায় পতিতা
কুসুম শয্যার প্রতি কুসুম
শর সম মোর বিধত রে।
খরতর পুন কুসুম শরের
বিসল শরে প্রাণ যায়ত রে।—
(ক্ষণকাল নিস্তব্ধা; বৃন্দার প্রবেশ)—
(উঠিয়া বৃন্দার হস্ত ধারণ করত—)
কাঁহা পেখলি তাহারে?—
বৃন্দা।—পেখনু তাহারে যমুনা কিনারে
ঝর ঝর ঝর নয়নমে ঝরে;
কুটিল বিলোকন বিহীন নয়ন
বদন বাম করে ধরায় নেহালি।
শ্বাসে শ্বাসে হেলত শিখি পুছ দোলত
পদতলে শোভত গিরই মুরলী।
রাহু গরাসল চাঁদ বন মাঝী—
মলিন পীতাম্বর পতিত ধরায়
নীল রতন খানি ভূতলে শোভয়।
আছড়ে পাছড়ে 'রাই রাই' স্বরে
নাসায় নিসরে প্রবল সমীর।
বনমালা দোল দোল কুন্তল ঝলমল
রুণ রুণ ঝুন ঝুন চরণ নূপুরে।
রাধানাথ সুধু "রাধা রাধা" স্বরে।
রাধিকা।—গজমতি হার আজি শিরপি তোহারে—
(বৃন্দার গলায় গজমতি হার প্রদান)
হম যায়ব বৃন্দা পেখব তাহারে
নীল রতন ধোব নয়ন আসারে।
বাম কর হতে তুলই যতনে
চাঁদবদন খানি দাগব অধরে।
পতিত মুরলী পুনরপি তুলই
অঞ্চলে পুছই ধরব অধরে।
বৃন্দে রহ তোম
হম পেখব তাহারে।—(গমনোদ্যত)—
বৃন্দা।—(নিবারণ করিয়া)
ধৈর্য্য ধর শুন মোর বাত
ধৈর্য্য ধর রাই যায়ব মত
সেই নিজে আয়ব চরণমে গিরব
তু' রহবি আপন গুমারে
তু' কাঁহে যায়বি নিজ মান খোয়াবি
এ নহে রমণী কি রীত
যব নলিনী বিকাসত ভ্রমর জুঠত

নলিনী না যাত তার ? ত।
বাধে—রমণী রীতি কোর কই—
ফাটবে বুক এ হবে • ামথ
ভীরণ ছকাশন ভূবনে অন্তরে
মুখ ফুটি নাহি কহব নাগরে—
আপনি আয়ব পায়ে ধরি সাধার
গুমারে না কহব বাত
যদি ভব জব মুখে বড়া কড়
তাত নাড় ফের শুনায়ব বাত—
যব অসাধ্য সাধনে নাসিকা • বনে
নীরে নীরে মিলব মানবে হাব
মৌনম' তাব শেষ কাহলো তোহাব—

রাধিকা বৃন্দে তোর বাত বাণা নাই মানে
রাধা মনন সেই যুগল চরণে।
কুল ভয় পাসরি শরম পরিহরি
যায়ব পেখব মদন মোহনে।
রাধা মনন সেই যুগল চরণে—

বৃন্দে।—বাই ধৈর্য্য ধর না যায়বি তুই
তুই গিয়লে নারী মানে গিরবে ছুই
মুখে কাঁহে কহবি? অন্তরে রাখবি
মুখে দেখায়বি আপন গুমার
হম পুন যায়ব সাথে পাকড়ব
ডারব সোপর চরণে তোহার
সাবধান ভাঙবি আপন গুমার
পীরিতি কইসন দেখায়ব পার।—

গমনোদ্যত)

রাধিকা।— (নিবারণ করিয়া এবং কণ্ঠ হার লইয়া)
ধর বৃন্দে এই ধর মন হার
পার যদি কৌশলে দিও গলে তার
মোর কিবা মোর হার না কহবি তায়
শরম পড়ুক বাজ শরম যে তোয়
বাসনা এই মন করি শরম পরিহরি
পাপ শরম তবু ছোড়তনা মোয়।

বৃন্দে।

নীল কলেবরে কইসন শোভত
বন মালা মোর পেখবি তাহারে
মোর কিবা ফের আর কহবি হমারে—

(বৃন্দার প্রস্থান)

যবনিকা পতন।

ক্রমশঃ—

পাণিনি সমালোচন।

গত-সংখ্যক আর্য্যদর্শনে বাবু রজনী কান্ত গুপ্ত আমার পাণিনি সমালোচনে যে সকল দোষারোপ করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত প্রত্যুত্তর নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহাতে বৃথা বাক্য ব্যয় না করিয়া কেবল আলোচ্য প্রবন্ধের সারাংশ মাত্র বিচার করা হইয়াছে।

৩৬৫ পৃষ্ঠা, ২য় স্তম্ভ।—"পুস্তকের মান্য করিতে হইলে" এইরূপ লেখাতে রজনী বাবু আমার ভাষায় দোষারোপ করিয়াছেন কিন্তু সেটী অযৌক্তিক, কেন না "ভাবে কর্ম্মণি যন্নাতৌ" মান্য পদটী ভাব ও কর্ম্ম উভয়বিধ-বাচ্যে নিষ্পন্ন হইতে পারে। ভাব-নিষ্পন্ন করিলে

"পুস্তকের মান্য করা" এইরূপ প্রয়োগ সাধু না হইবে কেন? রীতিবিশুদ্ধ বা হইবে না কেন? "পুস্তকের মান্য করা" এইরূপ লেখা বিশুদ্ধ না হইলেও "পুস্তকের মান্য করিতে হইলে, যখন আছে তখন তাহা বিশুদ্ধই হইয়াছে, কারণ উহার প্রতিবাক্য কল্পনা করিতে হইলে "মান্যকারী" হইলে এইরূপই হইবে। 'করিতে' 'হইলে'—করা ও হওয়া এই ক্রিয়াদ্বয় থাকাতেই মান্যপদ উভয়ান্বয়ী হইয়াছে। আমার ভাষা চ্যুতসংস্কৃতি দোষে দূষিত বলা রজনী বাবুর অনুকূল যুক্তি নহে সুতরাং তিনি অপ্রাসঙ্গিক বিষয় উল্লেখ করিয়া নিজের প্রগল্ভতা প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। বঙ্গভাষার রচনাবলীর ভাষাগত সামান্য দোষের এত সূক্ষ্ম বিচার করিতে হইলে তাহাতে কোন বিশেষ লাভ নাই এবং তাহা হইলে প্রসিদ্ধ পুস্তকের গ্রন্থকারগণের রচনাও এতদূর সূক্ষ্মানুসন্ধানকারিগণের সমীপে দোষাশ্রিত বলিয়া প্রতীয়মান হইবেক। রজনী বাবু নিজে এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুলেখক কিন্তু তাঁহার গ্রন্থেও এইরূপ ভাষাগত দোষ দেখান যাইতে পারে। তিনি আলোচ্য প্রস্তাবের ৩৮৩ পৃ, ১ম স্তম্ভে লিখিয়াছেন "এইরূপ যুক্তি ও বিচারের সংঘাতে সর্ব্বপ্রকার সংশয় জাল বিচ্ছিন্ন হইয়া পরিণামে সিদ্ধান্তক্ষেত্র পরিষ্কৃত ও অনায়াস গম্য হইতে পারে"। পাঠকগণ বিবেচনা করুন এরূপ ভাষা সদোষ কি না? আনন্তর্য্যবোধক অসমাপিকা ক্রিয়া আর সমাপিকা ক্রিয়া এই উভয় ক্রিয়ার কর্তা অভিন্ন হওয়াই নিয়ম। এই নিয়মের অন্যথা হয় না। যদি ঐরূপ দৃঢ় নিয়ম সত্ত্বেও "হইয়া হইতে পারে" লেখা যায়—তবে তাহা অসাধু ও অর্থবোধের ব্যাঘাতজনক হয়। "সংশয়জাল-বিচ্ছিন্ন হইয়া" এখানে "হইয়া" এই আনন্তর্য্যবোধক ক্রিয়ার কর্তৃত্ব সম্বন্ধ "সংশয়জাল-বিচ্ছিন্ন" এই পদের সহিত হইতেছে সুতরাং আনন্তর্য্যবোধক অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তার সহিত "হইতে পারে" ইত্যাদি সমাপিকা ক্রিয়ার কর্তার সহিত ঐক্য না থাকাতে নিয়ম ভঙ্গ ও সদোষ হইয়াছে সন্দেহ নাই। "হইয়া" প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃতের "ভূত্বা" প্রভৃতি শব্দের তুল্য-কার্য্যকারী সুতরাং ক্ত্বাচ্ প্রত্যয়ের এককর্তৃকত্ব নিয়ম আছে কি না তাহা সংস্কৃতজ্ঞ মাত্রেই অবগত আছেন।

বৃহৎ কথা আখ্যোপন্যাসের তুল্য বলিয়াছি বটে কিন্তু তাহার লক্ষ্য গল্পাংশ মিথ্যা হইলেও তাহার অবলম্বন দেশকাল পাত্র মিথ্যা না হইলেও হইতে পারে, কেননা পাণিনির অধ্যাপক উপবর্ষ ও বর্ষ পণ্ডিতের নাম যেমন ইহাতে পাওয়া যাইতেছে তেমনি অন্যান্য প্রামাণিক গ্রন্থেও তাঁহাদের নাম ও মত দেখিতে পাইতেছি যথা—

"যদাহ ভগবানুপবর্ষঃ"

(শারীরিক ভাষ্য ২ অধ্যায়)

এইজন্যই আমরা বৃহৎ কথার উল্লেখ

অনুসারে পাণিনিকে নন্দের সমসাময়িক বলিয়াছি। পণ্ডিতবর গোলডষ্টকারের পাণিনির কাল নির্ণয় অযৌক্তিক বিবেচনা হওয়াতে আমাদিগকে অগত্যা এই প্রমাণ গ্রহণ করিতে হইতেছে। রজনী বাবু কিম্বা অন্য কোন প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ী মহোদয় বলবৎ প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা এই মত খণ্ডন করিতে পারিলে, আমরা তাঁহার বাক্য সাদরে গ্রহণ করিব।

রজনী বাবু কহেন (৩৬৬ পৃষ্ঠা ১ম স্তম্ভ) "নির্ব্বাণো বাতে" এই সূত্রানুযায়ী সিদ্ধান্তের যুক্তি উল্লেখ করিয়া আমি তাহাতে কিছু বলি নাই, এজন্য আমার প্রবর্ত্তিত বিচার অব্যাপ্তি-দোষাক্রান্ত হইয়াছে। রজনী বাবু কি অবগত নহেন যে অব্যাপ্তি দোষ লক্ষণ সমন্বয়ের কাল ব্যতীত অন্যকালে স্বরূপ লাভ করে না? অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভব, এই ত্রিবিধ দোষ লক্ষণ সমন্বয় করিতে হইলে অবশ্য পরিহার্য্য। বিচারের সহিত ইহার সম্পর্ক কি? "লক্ষ্যৈক দেশে লক্ষণাগমনমব্যাপ্তিঃ, অলক্ষ্যে লক্ষণস্য গমনম্ অতিব্যাপ্তিঃ" অর্থাৎ লক্ষ্য পদার্থে লক্ষণ স্পর্শ না হইলে সেই লক্ষণ অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হয় এবং লক্ষণ অলক্ষ্য বস্তু স্পর্শ করিলে অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হয়। আমি নির্ব্বাণ শব্দের বিচার ত্যাগ করিয়াছি বলিয়া আমার বিচার অব্যাপ্তি-দোষাক্রান্ত কিরূপে হইল? যদি বলেন, লক্ষ্য পদার্থের ন্যায় বিচার্য্য পদার্থেও বিচারের স্পর্শ না থাকিলেও সে বিচার অব্যাপ্তি-দোষযুক্ত হয় কিন্তু তাহাতেই বা অব্যাপ্ত হইবে কেন? নির্ব্বাণোহবাতে এই সূত্রের সিদ্ধান্ত (পাণিনি বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী) আমার বিচার্য্য নহে সুতরাং অবিচার্য্য পদার্থের বিচার করাই দোষ—তাহা না করা দোষ নহে।

৩৬৭ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভে তিনি লিখিয়াছেন 'আমি চিত্রঙ আশ্চর্য্যে" এই সমুদায় বাক্যকে সূত্র বলিয়াছি এবং ইহা আমার লিখন ভঙ্গীতেও প্রতীত বটে কিন্তু তাহা আমার মনোগত নহে এবং তাহা আমি রজনী বাবুকে বিস্মিত বা দুঃখিত করিবার জন্য লিখি নাই। পাণিনি মুনি যখন চিত্র শব্দের অর্থ বিশেষ অবধারণ করেন নাই, তখন লোকপ্রসিদ্ধ অর্থই যে তাহার অর্থ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ইহা ভাষ্যকারের প্রতীক দিয়া বুঝাইয়াছি মাত্র, আশ্চর্য্যার্থক চিত্র শব্দের উত্তর ক্যচ্ বিধান করা যদি পাণিনির অভিপ্রেত না হয় এবং চিত্র শব্দের অর্থ পাণিনির পরিজ্ঞাত না থাকে, তবে ভাষ্যকার বা বার্ত্তিককার কিরূপে আশ্চর্য্যার্থক চিত্র শব্দের উত্তর ক্যচ্ প্রত্যয় করিতে অনুমতি দিলেন? পাণিনির অভিপ্রায় ব্যক্ত করা ভিন্ন স্বতন্ত্র ব্যাকরণ করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। চিত্র শব্দের আশ্চর্য্য অর্থ যদি পাণিনির পরিজ্ঞাত থাকে তবে পাঠকগণ বিবেচনা করুন যে গোলডষ্টকরের সিদ্ধান্তের মূলোচ্ছেদ হয় কি না? অর্থাৎ চিত্র আশ্চর্য্য অদ্ভুত এই

সকল শব্দ পরস্পরার্থ হয় কি না এবং তাহা পাণিনির সময়ে জানিত কি না? যদি তাহার বিপরীত তর্ক উপস্থিত করেন তবে বহু পূর্ব্বের এই ঋক্ মন্ত্রের চিত্র শব্দের উপায় কি হইবে?—

চিত্রম্ দেবানামুদাদগানীকম্
চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ
সামবেদীয় সন্ধ্যা মন্ত্র।

দেবানাং দ্যোতমানানাং রশ্মীনাং অনীকং সমূহঃ
সূর্য্য উদগাৎ উদয়ং প্রাপ্তঃ চিত্রং যথাস্যাৎ তথা

এই স্থানে চিত্র শব্দ কখনই নানা চিৎক অর্থে প্রয়োগ হইতে পারে না সুতরাং আশ্চর্য্য অর্থ বলা হইয়াছে সন্দেহ নাই সুতরাং কাজে কাজেই পাণিনির পূর্ব্বেও চিত্র শব্দ আশ্চর্য্য অর্থে ব্যবহৃত হইত, সুতরাং পাণিনি তাহা জ্ঞাত ছিলেন।

আমি যাজ্ঞবল্ক্যকে পাণিনির পর সাময়িক বলি নাই। পাণিনিই তাঁহার পরবর্ত্তী। রজনী বাবু "যাজ্ঞবল্কানি ব্রাহ্মণানি" পদ কিরূপে সিদ্ধ হইবেক তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝেন নাই। তাহা "কণ্বাদিভ্যো গোত্রে ৪।২।১১১ সূত্র দ্বারা শৈষিক অণ্ প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ হইবেক। যদি বলেন "পুরাণপ্রোক্তেষু ব্রাহ্মণকল্পেষু" ৪,৩।১০৫ সূত্র দ্বারা ণিনি প্রত্যয় হইল না কেন? তাহার প্রত্যুত্তর পাণিনি তাঁহাকে অতি পুরাতন বলিয়া জানিতেন না। (একবারে জানিতেন না এরূপ নহে। ২০০ শত বৎসর আগে হইলেও আমরা রঘুনন্দনের স্মৃতিকে নব্যস্মৃতি বলিয়া থাকি, তাই বলিয়া কি আমরা তাঁহাকে জানিনা বলিব?) এটী কাশিকায় বিশদ করিয়া লিখিত হইয়াছে যথা "পুরাণপ্রোক্তেম্বিতিকিম্ যাজ্ঞবল্কানি ব্রাহ্মণানি। আশ্মরথ্যঃ কল্পঃ। যাজ্ঞবল্ক্যাদয়ঃ অচির কালা ইত্যাখ্যানেষু বার্ত্তা। তদা ব্যবহরতি সূত্রকারঃ।" তয়া বাধিতা ইত্যর্থঃ। কি আশ্চর্য্য। যে ছান্দোগ্যে যাজ্ঞবল্ক্য ভিন্ন কিছুই নাই পাণিনি সেই ছান্দোগ্যের নাম নির্বাচন করিলেন অথচ তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে জানিতেন না ইহা কি সম্ভব হইতে পারে? পাণিনি "ছান্দোগ্যৌক্থিক যাজ্ঞিক বহ্বৃচ নটাঞ্ঞ্যঃ" ৪।৩।১২৯ সূত্র করিয়া ধর্ম্ম বা আম্নায় অর্থে ছান্দোগ্য শব্দ নিষ্পন্ন করিয়া দিয়াছেন—ছন্দোগানাং ধর্ম্মো বা আম্নায়ো বা ছান্দোগ্যম্।" অপিচ, পাণিনি ব্যাস শিষ্য বৈশম্পায়ন বৈশম্পায়নের শিষ্য ৯ জনকে চিনিলেন কিন্তু তিনি তৎসাময়িক যাজ্ঞবল্ক্যকে চিনিলেন না ইহা কি সম্ভব হইতে পারে? বিশেষতঃ কঠ ও চরক বৈশম্পায়নের শিষ্য, যাজ্ঞবল্ক্যও তাহার অপর একজন শিষ্য। আথর্ব্বণিক ও অথর্ব্ব ও বেদোক্ত আঙ্গিরস ঋষির নাম পাণিনি উল্লেখ করাতেও পণ্ডিতবর গোল্ডষ্টকরের কথা অনুসারে রজনীবাবু কি জন্য বলিতেছেন যে পাণিনি অথর্ব্ব বেদ জ্ঞাত ছিলেন না—ইহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। তিনি ঋত্বিক বিশেষের ধর্ম্ম দি এই আদি পদ দিয়া আম্নায় শব্দের

আচ্ছাদন করিয়াছেন। আম্নায় শব্দ বেদ ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না এবং ধর্ম্ম বলিলেও তাহাতে বেদ বুঝাইবে। যদি অথর্ব্ববেদ না থাকিত তবে তাহাদের ধর্ম্ম বা ঋত্বিক কি প্রকারে হইবেক? বাশিকাকার স্পষ্ট লিখিয়াছেন 'আথর্ব্বণো ধর্ম্ম আম্নায়ো বা" মনু প্রভৃতি যখন বেদার্থায় বাচক আথর্ব্বণ শব্দ অবগত ছিলেন তখন পাণিনি তাহা জানিতেন না এ কথা রজনী বাবু পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করাতে আমরা দুঃখিত হইয়াছি। এ বিষয় পূর্ব্ব প্রস্তাবে লিখিয়াছি এজন্য তাহার পুনর্ব্বিচার নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এইরূপ বর্ণাশুদ্ধির উল্লেখ করাতে রজনী বাবুর অমর্ষ প্রকাশ পাইতেছে। মুদ্রাকর, লিপিদর্শক ও লিপিকরের অনবধানতায় এরূপ বর্ণাশুদ্ধি সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে।

রজনী বাবু বারম্বার বলিয়াছেন "পাণিনি শতপথ ব্রাহ্মণকে চ্যুতসংস্কৃতি-দোষে দুষ্ট করিবেন কেন?" তিনি পুনঃ২ চ্যুতসংস্কৃত দোষের উল্লেখ করিয়াছিলেন অথচ তাহা তাহার বাস্তবিক স্থল নহে। 'শতপথ ব্রাহ্মণ" শব্দ দুষ্ট হইবে কেন তাহা বুঝিতে পারিলামনা। পাণিনির জ্ঞানে তিনি অতি পুরাতন নহেন এই জন্য তিনি শতপথাদি ব্রাহ্মণকে ণিনি প্রত্যয় দ্বারা যাজ্ঞবল্কী এই রূপ প্রয়োগ করিতে নিষেধ করিয়াছেন মাত্র। ইত্যলম্।

শ্রীরামদাস সেন

যুনানী* নাট্যপ্রণালী।

নাট্য রচনা সম্বন্ধে তিনটি পৃথক প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম, ঔপন্যাসিক বা স্বাভাবিক প্রণালী। কালীদাস, ভবভূতি প্রভৃতি আর্য্য কবিগণ; সেক্ষপিয়র, জনশন প্রভৃতি ইংরেজ কবিগণ; এবং কাল্ডেরণ লোপ্‌ডিভেগা প্রভৃতি ইস্পানীয় কবিগন এই প্রণালী মত অতীব উপাদেয় নাটক-পরম্পরা রচনা করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। পাঠক মাত্রেই এই প্রণালীর কোন না কোন নাটক অবশ্যই পাঠ করিয়া থাকিবেন, অতএব এ স্থানে ইহার বিশেষ পরিচয় অনাবশ্যক। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে প্রকৃতিই এই প্রণালীর প্রাণ ও পরমাত্মা। দ্বিতীয় প্রণালী যুনানী বা নিয়মাত্মক। ইহাই আমাদিগের উপস্থিত প্রস্তাবের বিষয়, ইহার বিবরণ আমরা বিস্তৃত রূপে পরে বলিব। তৃতীয় কাল্পনিক বা অস্বাভাবিক। এই প্রণালীর প্রবর্ত্তক গেটি প্রভৃতি আধুনিক জর্ম্মান্ কবিগণ, এই নিমিত্ত এই প্রণালী, জর-

* Greek.

মান্ প্রণালী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা যুনানী প্রণালীর ঠিক বিপরীতধর্ম্মাবলম্বী এবং ঔপন্যাসিক প্রণালী হইতেও অনেক বিভিন্ন। এই প্রণালীর নাটকের কেবল বাহ্যাকৃতির সহিত ঔপন্যাসিক নাটকের সৌসাদৃশ্য আছে; কিন্তু প্রকৃতিগত উভয় জাতীয় নাটকে অবান্তর ভেদ লক্ষিত হয়। কোন কোন জরমান নাটকে সংস্কৃতের ন্যায় সূত্রধার প্রসঙ্গ প্রভৃতি পূর্ব্ব রঙ্গও * দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় নাটক যথেচ্ছা-রচিত, কোন নিয়মেরই অধীন নহে এবং আদ্যোপান্ত অস্বাভাবিক ও অসম্ভব সংস্থানে পরিপূর্ণ। ইহার পাত্র সকল ঘোর পাপী ও নীচাশয়। প্রচলিত রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির বিপরীত শিক্ষাই ইহার বীজ মন্ত্র। পাপই ইহার কর্ম্ম এবং অধর্ম্মই ইহার ধর্ম্ম। যথেচ্ছাচারিতা, অবৈধ স্বাধীনতা ও সমাজ-বিপ্লব ইহার লক্ষ্য, এবং বিশ্বজনীন্ নবীনতাই ইহার সৌন্দর্য্য ও মহদাকর্ষণ। ফলতঃ রঙ্গাঙ্গণে এই জাতীয় নাটক অত্যন্ত আমোদজনক ও কুতূহলোদ্দীপক হইয়া থাকে। ইহার অভিনয়ে দর্শক-মণ্ডলীকে কখন উদ্দীপিত, কখন উল্লাসিত কখন বা চকিত ও চমৎকৃত হইতে হয়। বাঙ্গালা শরৎ-সরোজিনী নাটকে জারমান প্রণালীর অনেক আভাস পাওয়া যায়। বোধ হয় গ্রন্থকার শিলর-প্রণীত "রবর" নাটক আদর্শ করিয়া শরৎসরোজিনী লিখিয়া থাকিবেন।

* See Goethe's "Faust"

ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের মতে তাঁহাদের ভরত মুনি সর্ব্ব প্রথম পৃথিবীতে নাট্য রচনা প্রচার করেন। প্রত্নতত্ত্ব বিদ্যাভিমানী পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে হিন্দুদিগের সাহিত্যে আদৌ দৃশ্যকাব্য ছিল না, তাঁহারা যুনানী জাতির নিকট নাটকের রচনা ও অভিনয়-প্রণালী শিক্ষা করিয়াছিলেন। ভরত মুনি পৃথিবীর নাট্যগুরু কি না তাহা আমরা জানি না, পরন্তু ইংরাজাবিষ্কৃত পুরাবৃত্ত-তত্ত্বেও আমাদের বিশেষ আস্থা নাই। তাঁহারা জটিল তর্কশাস্ত্রের বলে, অনেক স্থলে সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ঋষি প্রণীত রামায়ণ যুনানী ইলিয়দের অনুবাদ, এবং শ্রীমদ্ভাগবত ও ভগবদ্গীতা বাইবেলের অনুকৃতি। এ প্রকার প্রলাপ বাক্য পরম্পরাও যদ্যপি বিশ্বাস করিতে হয় তত্রাচ আমাদের আর্য্য পিতামহগণ যে যুনানীজাতির নিকট নাট্যামোদ শিক্ষা করিয়াছিলেন এ কথা আমরা কোন মতেই প্রত্যয় করিতে প্রস্তুত নহি, যেহেতু পরে প্রদর্শিত হইবে, সংস্কৃত নাটকের সহিত যুনানী নাটকের কোনই সাদৃশ্য নাই। ইংরেজ পণ্ডিতেরা একদিন যদি বলিতেন যে সংস্কৃত নাটক ইংরেজী নাটকের অনুকরণ, তাহা হইলে বরং তাঁহাদের কথা কতকটা শোভা পাইত; কেন না উভয় জাতীয় নাটক একই প্রণালীতে রচিত। কিন্তু তাঁহাদের সে কথা বলিবার পথ নাই। সেক্ষপিয়র জন্মিবার বহুকাল

পূর্ব্বে কালীদাস মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইংরেজেরা যখন উলকি কলঙ্কিত গাত্র পশুচর্ম্মে আবৃত করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করেন, তখন বিক্রমাদিত্য প্রভৃতির রাজসভায় শকুন্তলার শত বার অভিনয় হইয়া গিয়াছে। বাস্তবিক যুনানী ও সংস্কৃত নাটকের আকৃতি ও প্রকৃতিগত বিস্তর বৈষম্য দৃষ্ট হয়। আমরা তুলনায় এই উভয়বিধ নাটকের স্বরূপালোচনা করিয়া, যুনানী প্রণালী কিরূপ তাহা পাঠককে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

সংস্কৃত নাটককারগণ স্বভাবের অনুকরণ করিয়া গিয়াছেন। যুনানী কবিগণ নাট্যসম্বন্ধে, কেবল কতিপয় নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছেন। সংস্কৃত নাটকাবলী ঔপন্যাসিক বা স্বাভাবিক প্রণালীতে রচিত, যুনানী নাটক সমূহ নিতান্ত নিয়মাধীন। নিয়মের অনুরোধে যুনানী নাটককার দিগকে অনেক সময়ে স্বভাবকে উপেক্ষা করিতে হইয়াছে। নাটকে দেশ, কাল ও ঘটনার একতা সংরক্ষণই তাঁহাদের প্রধান নিয়ম*। এক স্থলে, একদিনের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ ঘটনার পরিসমাপন তাঁহাদের মতে অবশ্য কর্ত্তব্য। এই নিমিত্ত যুনানী নাটকের অঙ্ক, গর্ভাঙ্ক প্রভৃতি কোনই পরিচ্ছেদ দেখিতে পাওয়া যায় না।

যুনানী নাটক অতীব ক্ষুদ্রায়তন এমন কি উক্ত প্রণালীর একখানি সম্পূর্ণ নাটক সংস্কৃত নাটকের একটি অঙ্কেরও অপেক্ষা বিস্তৃত নহে; এবং উহাতে কোনই প্রকার পূর্ব্ব রঙ্গ লক্ষিত হয় না। পরন্তু সংস্কৃত নাটকে দশম অঙ্ক পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে এবং উক্ত ভাষায় একখানিও এমন নাটক আছে কিনা সন্দেহ যাহাতে নট নটী বা সূত্রধার-প্রসঙ্গ নাই।

যুনানী নাটকে দেবতা ও মনুষ্য সাকল্যে প্রায়ই চারি পাঁচটির অধিক চরিত্র থাকে না, এবং একটি করিয়া গায়ক* সম্প্রদায় প্রত্যেক নাটকে ভিন্ন ভিন্ন বেশে কুশীলবদিগের সহিত নাট্য-ঘটনার সমান সহায়তা করিয়া থাকে। ফলতঃ গায়ক সম্প্রদায় যুনানী নাটকের একটি প্রধান অঙ্গ। সংস্কৃত নাটকে গায়ক সম্প্রদায়ের চিহ্নও নাই এবং ধীবর হইতে রাজাধিরাজ, দাসী হইতে রাজমহিষী পর্য্যন্ত বিবিধ-জাতীয় চরিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। যুনানী নাট্য

* Unity of time, place, and action.

* Chorus.

" With respect to the character which the Chorus should support in the play, Aristotle says it should be considered as one of the persons of the drama, should be a part of the whole, and a sharer in the action'.

" The chorus must support
an actor's part,'
Side with the virtuous
and advise with art,,
Art of Poetry.

ঘটনা সমস্তই প্রায় অতি-মানুষিক, দেব তারাই সকল ঘটনার নেতা, মনুষ্যগণ তাঁহাদের হস্তে যন্ত্র স্বরূপ। মনুষ্যের সকল কার্য্যই দৈবের বশবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছে। এই নিমিত্ত যুনানী নাটকে মনুষ্য চরিত্র অনেক স্থলে অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। অনেক স্থলে নাট্যোক্ত পাত্র ও পাত্রিগণ সহ পাঠকের সহানুভূতি জন্মে না। পরন্তু সংস্কৃত নাটকের নায়ক নায়িকার সুখ দুঃখ, জয় পরাজয়, এবং আহ্লাদ বিষাদ, পাঠক বা দর্শকের যেন নিজের বলিয়া অনুভূত হইতে থাকে। বস্তুতঃ মনুষ্যের স্বাধীন কার্য্যের ক্রমানুসরণে আমাদের যত কৌতূহল উদিক্ত হয় এবং সেই কার্য্যের ফলাফল জানিবার জন্য যত ঔৎসুক্য জন্মে, দৈবসম্পাদিত ঘটনায় তত কখনই হইতে পারে না।

নবরস-বিশিষ্ট না হইলে সংস্কৃত নাটক, নাটক বলিয়াই ধর্ত্তব্য নয়। অধিকাংশ সংস্কৃত নাটককে, শৃঙ্গার, করুণ, হাস্য, প্রভৃতি বিবিধ রসের পলান্ন বলিলেও অসঙ্গত হয় না, সংস্কৃত নাটকে শৃঙ্গার রসেরই অধিক প্রাদুর্ভাব। দুই একখানি ভিন্ন প্রায় সমস্ত নাটকই নায়ক নায়িকার প্রণয় প্রসঙ্গে পরিপূর্ণ। কিন্তু রস সম্বন্ধে যুনানী কবিগণ অনেক সতর্কতা ও নিপুণতা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা কোন নাটকেই এক বা দুইটি রসের অধিক অবতারণ করেন নাই। গম্ভীর নাট্যব্যাপার মধ্যে অনর্থক বিদূষকের বিরক্তি-জনক রসিকতা নিবিষ্ট করিয়া কুত্রাপি রসভঙ্গ করেন নাই। তাহাদের হাস্য রসের পৃথক নাটক আছে। প্রহসন তাঁহারাই প্রথম কল্পনা করেন। এবং তাঁহাদের রচনাবলীতে আদৌ আদিরসের নামগন্ধ রাখেন নাই। শৃঙ্গার রস ব্যতীত, তাঁহারা যখন যে রসের অবতারণ করিয়াছেন তখন সেই রস যেন মূর্ত্তিমান দেখাইয়া গিয়াছেন।

যুনানী নাটক কোন কোন বিষয়ে ঔপন্যাসিক নাটক অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইলেও আধুনিক জবমান নাটক হইতে অনেক গুণে উৎকৃষ্ট। যুনানী নাটকে, সৌন্দর্য্যে গাম্ভীর্য্য আছে; ঔপন্যাসিক নাটকে, সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্য আছে; একটি সূর্য্য, অপরটি চন্দ্র—উভয়ই সুন্দর। একটিতে আমাদের ভক্তির উদয় হয়, অপরটিকে আমরা হৃদয়ের সহিত ভালবাসি। আর্য্য শ্লেগেল যুনানী নাটকের সহিত ভাস্কর্য্যের এবং ঔপন্যাসিক নাটকের সহিত চিত্র কার্য্যের তুলনা করিয়া যাহার পর নাই সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ পুরু-বিক্রম নাটকে যুনানী প্রণালী কিয়দংশে অবলম্বিত হইয়াছে।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী।

মেহের আলি।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

এই সকল ঘটনার পর আসগরআলি ও ফজর আলি স্বদেশে গমন করিল। মেহেরকে পরাজয় করিতে না পারিয়া, তাহার আশা ভরসা, মেহেরন্নিসাকে সন্ধান করিতে আসিল, যে তাহার অবস্থা দেখে মেহের আলি মর্ম্ম ব্যথা পায় ও দেশ ছাড়ে। আসিবামাত্র বাকর আলির মুখে শুনিল মেহেরন্নিসা বনবাসে ছিল, একদল মগী এসে তাহাকে হরণ করে লয়ে গেছে। বাকরের নিজ কার্য্য সে গোপন করিল এবং যাহাতে বিশেষ গোপন থাকে, বাকর সেই অত্যাচারের পর আমীর জানের পদানত হইয়া ক্ষমা চায় ও ঐ কথা প্রকাশ না করেন এজন্য জিদ করে। আমীরজানও ভাবিলেন প্রকাশ করিলে তাঁহার অখ্যাতি ও হয়ত অনিষ্ট হইতে পারে, অতএব ঐ প্রস্তাবে সম্মতা হয়েন।

মোক্তার গঙ্গাম হইতে আসিবার কালে একটী তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কার্য্য করিয়াছিলেন এবং তাহাতে নিশ্চিন্ত ছিলেন। মেহের আর দেশে আসিবে না। মেহেরন্নিসা যেন প্রণয়-পাত্র ফজর আলিকে লিখিয়াছে ও মেহের আলির দুরাকাঙ্ক্ষা উপহাস করিতেছে, এইরূপ ভাবে কয়েক পত্রিকা সৃজন করিয়া একটি তাড়া বাঁধিয়া মেহের আলির পথে ফেলিয়া রাখেন। মেহের ও যে তাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন, মোক্তার সন্ধান পাইয়াছেন। মেহের ও যে তাহার পর জাহাজ চট্টগ্রামে যাইতে নিষেধ করিয়া একেবারে শ্রীহট্ট যাইতে আদেশ দেয়, আসগর আলি তাহাও শুনিয়া আসিয়াছেন।

একদা সন্ধ্যা কালে মোক্তার আপন বাটীর সম্মুখে বেড়াইতেছেন। এমত সময় এক জাহাজী ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে সেলাম করিল। মোক্তার সন্দিগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা হইতে আসিতেছ? কে তুমি? কাহারে চাহ?"

জাহাজী। আপনার নাম কি? আমীর আলি মোক্তার সাহেব? আপনি না রকিমুন্নিসা জাহাজের অধিপতি? আপনি আমায় চিনিতে পারিতেছেন না?

মোক্তার। কৈ ভাল চিনিতে পারিতেছি না, অন্ধকার! কোথায় দেখেছি বল দেখি?

জাহাজী। আর চিনিতে হইবে না, আমি নিজ পরিচয় দিতেছি। গঙ্গাম জানেন?—মেহের আলিকে জানেন?—আমি মেহের আলির জাহাজের একজন চাকর ছিলাম।

মোক্তার, সন্দিগ্ধ চিত্তে কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন ও কহিলেন "এখানে

কি অভিপ্রায়ে? জাহাঙ্গী মনোগত সন্দেহ বুঝিয়া কহিল, "মহাশয় ভয় কি সন্দেহের কারণ নাই। আমি আর মেহেরের চাকর নহি, পরম শত্রু। আপনার কাছে এসেছি তাঁহার প্রতি বৈরনির্য্যাতনের পরামর্শ করিতে।"

মোক্তার। শত্রু কিসে হইলে?

জাহাঙ্গী। দেখুন আমার হস্তের অঙ্গুলি নাই, দুষ্ট মেহের আলি আদেশ দিয়া তাহা কাটাইয়াছেন।

মোক্তার। কি জন্য এই দণ্ড দিলেন?

জাহাঙ্গী। আমি হাল ধরে ছিলাম, সম্মুখে চড়া বলে হাল ফেরাইতেছিলাম; মেহের কহেন সোজা চল। আমি তাহা শুনিলাম না, হাল ছাড়িলাম না, আমাদেরওত প্রাণভয় আছে। বদরাগী আমীর অঙ্গুলি কাটাইয়া দণ্ড দিলেন! দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি গেছে, খাই কি করে? আল্লা! এ অপরাধ আমি জন্মে ভুলিবনা।

মোক্তার। বুঝিলাম, তুমি তাহার শত্রু হইয়াছ, তোমার অঙ্গদৃষ্টে প্রমাণও পাইলাম, এক্ষণে আমার সহিত তোমার কি পরামর্শ আছে?

জাহাঙ্গী। মহাশয় মেহের বড় ভয়ানক লোক, পরমেশ্বর তাহাকে যেমনি আটকে ফেলেছেন, এখন আপনার কৌশল হইলে তাহাকে নাশ করা যায়। — কিন্তু সে কথা গোপনে বলা চাহি, আপনি অগ্রসর হইয়া ঐ নির্জ্জন অশ্বত্থ বৃক্ষ তলে চলুন, বলিতেছি।

মোক্তার। এখানেও কেহ নাই; নয় আমার ঘরে চল।

জাহাঙ্গী। আমার বড় ভয় হইতেছে, কে শুনিবে। আপনার কোন ভয় নাই আসুন না।

মোক্তার। তবে বিলম্ব কর কিছু অস্ত্র শস্ত্র লই ও বিশ্বাসী লোক একজন লই।

জাহাঙ্গী। মহাশয় আমি শপথ করিতেছি, আমার বিলম্ব সহেনা। আমি অঙ্গুলিহীন নিরস্ত্র ও বিদেশী, আমাকে আশঙ্কা! আপনার বিশ্বাস না হয়, ইচ্ছা না হয়, —আমি চলিলাম। বিলম্ব করিলে কার্য্য সিদ্ধি হইবেক না।

এই কথা বলে জাহাঙ্গী চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিল ও সেলাম করিল। সাত পাঁচ ভেবে মোক্তার তদনুবর্ত্তী হইলেন। ভাবিলেন দেশের মধ্যে আমার ভয় কি? কিন্তু যেই অশ্বত্থতলে আসিয়াছেন, সহসা অন্ধকার হইতে কে একজন মোক্তারকে ধাক্কা দিয়া ফেলিল, বক্ষঃস্থলে বসিল ও মুখ চাপিয়া ধরিল। সকলই মুহূর্ত্তের কার্য্য। মোক্তারের সাধ্য নাই যে লোক ডাকেন, অথবা বক্ষঃ হইতে অজ্ঞাত শত্রুকে ফেলিয়া দেন। বিশেষতঃ তাঁহার দক্ষিণ হস্ত বনবাড়ি হইতে পলায়নে অবর্ম্মণ্য হইয়াছে। আততায়ী কহিল "দুষ্ট আমায় চিনিস না আমি তোর যম।" সেই গম্ভীর স্বরে মোক্তার শিহরিল—এবার প্রাণ গেল বুঝিলেন। গোঁ গোঁ করে বলিলেন, মুখ ছাড়

চেঁচাইব না। আততায়ী তীক্ষ্ণ অস্ত্র মুখের কাছে ধরিয়া কহিলেন, চেঁচাও ত অমনি গলায় বসাব, নচেৎ প্রাণে মারিব না। মোক্তার স্বীকার হইল। আততায়ী মুখের ধারে একহাত বাখিয়া ও একহাতে ছুরিকা ধরিয়া রহিলেন। জাহাঙ্গী আসিয়া মোক্তারের পা চাপিয়া ধরিল। পরে আততায়ী কহিলেন "বল্ কি বলবি?"

মোক্তার। আমায় মার কেন?

আততায়ী। মূর্খ! মারিবার পাত্র তোমা অপেক্ষা আর কে পৃথিবীতে আছে?—জানিস না, নেমোক্ হারাম। আমার স্বর্গীয় পিতার সর্ব্বস্ব তুই লয়েছিস্!—পরে তাঁহার প্রাণবিনাশের হেতু হয়েছিস!———আমার মাতার আত্ম-হত্যা ও অপমানের কারণ তুই। আমার প্রণয়িনীর সতীত্ব নাশের কারণও তুই! এবং আর বাকী কি আছে, আমাকে একবার রাক্ষসের মুখে একবার অনাহারে ও একবার অগ্নিকুণ্ডে মারিতে উদ্যত হয়েছিলি।—আমি সেই মেহের আলি।

মোক্তার এবার প্রাণে হতাশ হইয়া একবার গা ঝাড়া দিল, পারিল না। চেঁচাইবার উদ্যোগ করিল, মুখ তখনি চাপা হইল, চেঁচাইতে পারিল না। অবশেষে নিতান্ত ব্যকুল হইয়া কহিল, আর পলাইবার চেষ্টা করিব না, প্রাণে মেরোনা তুমি এখন যাহা চাহ করিতে স্বীকার আছি। মোক্তার কাপুরুষ, প্রাণ-ভয়ে নিতান্ত পদানত হইল। মেহের কহিল "পাপিষ্ঠ! তোর কাছে কি চাহিব? যে কার্য্য করেছিস্ তাহার আর প্রতীকার নাই; পিতা মাতাকে আর পাব না। আমাকে মারিতে পারিস্ নাই, তা হাতে ভয় কি? ধন লয়েছিস্—ফিরে লইতে পারি, তাহাতে প্রয়োজন নাই। তুই যে আমার প্রণয়িনীর সতীত্ব নাশ করাইয়াছিস্—তাহার প্রতিশোধ তোর জীবন নাশ।"

মোক্তার। সকল অপরাধ স্বীকার করিতেছি; আমার ধন লও সব লও, প্রাণে মেরো না। যে প্রাণের জন্য এতটা করেছি—তাহা ছাড়িতে পারিব না।

মেহের। হতভাগ্য! এখনও তোর জীবনের আশা আছে?

মোক্তার। আছে, তুমিই আশা দিলে। যদি মেহেরন্নিসার সতীত্ব নাশ ব্যতীত তাবৎ অপরাধ ক্ষমা কর, আমার আশা আছে।

মেহের। হাঁ, ও সব ত যা হইবার হয়েছে। এখন এক মেহেরন্নিসার প্রতি অপরাধই আমার অন্তরের শেল রহিয়াছে—সে অপরাধেই তোর শত প্রাণদণ্ড বিধেয়।

মোক্তার। মেহেরন্নিসাকে ফজর আলি লয়ে গেছিল বটে কিন্তু তাহার সতীত্ব নষ্ট হয় নাই। সে সেখান হইতে পলায়ন করিয়া বনবাসে গেছিল।

মেহের। প্রমাণ কি?

মোক্তার। যে রূপে সন্তুষ্ট হও প্রমাণ দিব। পাড়া প্রতিবাসী ঝবঝব্যার দোকানী সকলকে জিজ্ঞাসা কর।

মেহের। মিথ্যাবাদী! আমি মেহেরের প্রেম-পত্রিকা পাইয়াছি, তাহাতে ফজরের প্রতি তাহার ভাব বুঝা গেছে।

মোক্তার। সে গুলি, আমার কৌশল-সৃষ্ট, ভাল করে দেখ মেহেরের হস্ত লিপি নহে।

মেহের। অচ্ছা আমি যে এক পত্র লিখিলাম, টাকা পাঠাইলাম, মেহেরুন্নিসা তাহার প্রত্যুত্তর দেয় নাই কেন?

মোক্তার। সে সবও আমি আটক করেছিলাম, সে পায় নাই।

মেহের। রোষ কষায়িত লোচনে দন্তে দন্তে কড় মড় করিয়া কহিলেন, "নরাধম তোর আরও অপরাধ ব্যক্ত হইল। নরপিশাচ! বল্ সেই কামিনীর শেষ দশা কি হইল?"

মোক্তার কম্পিত স্বরে কহিল "শুনেছি এক দল মগ এসে তাহাকে হরণ করে রামগড়াভিমুখে গিয়াছে।"

মেহের। কত দিন হইল?

মোক্তার। ছয় মাস হইবে।

মেহের মনঃকষ্ট আর সহ্য করিতে না পারিয়া ছুরিকা গলে দিবার উদ্যোগ পূর্ব্বক কহিলেন "সকল অনিষ্টের মূল তুই, তোর প্রাণ বিনা আমার তৃপ্তি হবে না। আর ত মেহেরকে পাব না, পেলেও লইব না। সংসারে আর সুখ নাই, কেবল তোকে মারাই এক সুখ।"

মোক্তার প্রাণ ভয়ে ভয়ানক নড়িয়া উঠিল ও চীৎকার করিল। তাহাতেও রক্ষা হইত না, তবে হঠাৎ কি ভাবিয়া ক্ষান্ত হইলেন এবং কহিলেন "নরাধম! একবার এই রকমে তোকে মারিতে চাই, বাবা রক্ষা করেন। এবার ও বাবার আদেশ জন্য তোকে প্রাণে মারিলাম না, কিন্তু যথোচিত দণ্ড দিব।" বলিয়া ছুরিকা দ্বারা মোক্তারের দুই চক্ষু নষ্ট করিয়া দিলেন। এই সব কথা ও কার্য্য এত শীঘ্র হইল, যে মোক্তারের চীৎকার-রব গ্রামবাসীরা বুঝিতে না বুঝিতে মেহের পলায়ন করিলেন। গ্রামবাসীরা এসে রক্তাক্ত অচেতন মোক্তারকে লইয়া তাহার বাটীতে আনিল। অনেক সন্ধানেও আততায়ী দল পাওয়া গেল না।

সম্বন্ধ-নির্ণয়.*।

সুবিখ্যাত অধ্যাপক ভট্ট মক্ষমূলর তাঁহার একটী বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে "যে জাতি আপনার অতীত ইতিহাসে জাতীয় গৌরব অনুভব করিতে শিক্ষা করে না, তাহার জাতীয় চরিত্রের মূলভিত্তি পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া যায়। যৎকালে জার্ম্মাণীতে রাজনৈতিক দুরবস্থার পরিসীমা ছিল না, তৎকালে ইহা আপনার প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায় নিমগ্ন হয়, এবং অতীতের আলোচনা হইতে

* বঙ্গদেশীয় আদিম জাতি সমূহের সামাজিক বৃত্তান্ত। কৃষ্ণনগর নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

ভবিষ্যতের আশা সংগ্রহ করে।" তিনি আরও বলিয়াছেন যে অধুনা ভারতেও ঠিক এইরূপ ক্রিয়া আরব্ধ হইয়াছে। কিন্তু আমাদিগের ভারত-বিষয়ক বহুদর্শন তাঁহা অপেক্ষা অনেক অধিক; এবং আমরা স্পষ্টাক্ষরে তাঁহার মতের প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছি যে ভারতে ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে আরব্ধ হয় নাই। দুই একজন পুরাবিদ্ পুরাবৃত্তের অনুশীলন আরম্ভ করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু অদ্যাপি জাতি সাধারণের কথা দূরে থাকুক—সুশিক্ষিত দলের মধ্যেও—ইহা সম্পূর্ণরূপে আরব্ধ হয় নাই। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক প্রশংসাপত্রধারী বিদ্যাভিমানী ছাত্রকে বলিতে শুনিয়াছি যে আর বৃদ্ধ প্রপিতামহের পুরাতন গল্প শুনিয়া লাভ কি? তাঁহারা ভারতের পুরাবৃত্তকে "বৃদ্ধ প্রপিতামহের পুরাতন গল্প" এই আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে ভারত কবে কি ছিল, সে পুরাতন কথার আলোচনায় আর লাভ কি? যাহা গিয়াছে, তাহা আর ফিরিবে না, তাহার জন্য কাঁদিয়া কি হইবে? শ্রুতি স্মৃতি, রামায়ণ মহাভারত, ইতিহাস পুরাণ, সাহিত্য দর্শন প্রভৃতি আর্য্য কীর্ত্তিকলাপের চর্ব্বিত চর্ব্বণে ফল কি? আর্য্য বীরগণ কবে কি করিয়াছিলেন তাহার আন্দোলনে আর লাভ কি? ইত্যাদি প্রলাপ বাক্য সুশিক্ষিত দলের মুখে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শুনিতে পাওয়া যায়। ভারতের বিংশতি কোটী অধিবাসীর প্রায় অধিকাংশই অনক্ষর। অতি অল্পসংখ্যকই সাক্ষর। এই সাক্ষর দলের অতি অল্প সংখ্যাই আবার উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন এই উচ্চ শিক্ষা-প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের যখন ঐরূপ মত তখন অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিতদিগের নিকট আমরা কি আশা করিতে পারি?

অতীত মহিমার অনুশীলন যে পতিত জাতির অভ্যুত্থানের একটী প্রধান উপায়, অধ্যাপক মক্ষমূলরের সহিত এবিষয়ে আমাদিগের সম্পূর্ণ ঐকমত্য। জার্ম্মাণী যেমন অতীত মহিমার অনুশীলন দ্বারা রাজনৈতিক অবনতির গভীরতা হইতে উঠিতে পারিয়াছিলেন, সেই রূপ ভারতও অতীত মহিমার অনুশীলন করিলে এক দিন রাজনৈতিক গিরির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিতে পারিবেন। পুরাবৃত্তের আলোচনা তাঁহাদিগের উন্নতির নিমিত্ত কারণ হইবে। পুরাবৃত্তের আলোচনা তাঁহাদিগকে বলিষ্ঠ করিবে না বটে, কিন্তু বলিষ্ঠ হইবার ইচ্ছা প্রদান করিবে। পুরাবৃত্তের আলোচনা তাঁহাদিগের হস্তে ধন মান ও জ্ঞান আনিয়া দিবে না বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের অন্তরে ধনী মানী ও জ্ঞানী হইবার ইচ্ছা বলবতী করিয়া দিবে। ইচ্ছা বলবতী হইলে, মন অভিলষিত বস্তুর দিকে আপনিই প্রবল বেগে ধাবিত হয়; এবং "ক ঈপ্সিতার্থস্থির-নিশ্চয়ং মনঃ পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ" নিম্নাভিমুখিনী স্রোতস্বিনীর গতির ন্যায় অভিলষিত বিষয়ে স্থির-প্রতিজ্ঞ মনের গতি কে নিবারণ করে? যে দিন

ভারতে পুরাবৃত্তের আলোচনা প্রচুর পরিমাণে আরব্ধ হইবে, সেই দিন আমরা জানিতে পারিব য ভারতের জাতীয় অভ্যুদয় অতি দূরবর্ত্তী নয়।

আমাদিগের প্রাচীন আর্য্যেরা অল্প-সংখ্যক মাত্র বিশাল ভারত ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া কেমন করিয়া অল্প দিন মধ্যে সমস্ত ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বি রাজত্ব সংস্থাপন করেন, কেমন করিয়া তাঁহারা প্রকাণ্ড অসুরদিগকে সমরে পরাস্ত করেন, অবশেষে কেমন করিয়া তাঁহারা সভ্যতা শৈলের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেন এবং কি কি কারণে সেই অত্যুচ্চ শিখর হইতে এই গভীরতম নরকে পতিত হয়েন—ইত্যাদি আলোচনা করিলে যে হৃদয় কি ভাব তরঙ্গে আপ্লুত হয় তাহা ব্যক্ত করা যায় না। পূর্ব্ব গৌরবে সুখ—বর্ত্তমান অবনতির কারণ অনুসন্ধানেও সুখ। রোগের কারণ জানিতে পারিলে, প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন করা যাইতে পারে। রোগের কারণ জানিতে না পারিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা উন্মত্ততা মাত্র। এইজন্য যাঁহারা ভারতের পুরাবৃত্ত আলোচনা না করিয়া ভারতে ভবিষ্য উন্নতির বীজ বপন করিতে যান, তাঁহাদিগকে আমরা উন্মত্ত বলিব। যখন তাঁহারা রোগের মূল কি নির্ণয় করিতে পারিলেন না তখন তাঁহারা কি ঔষধ প্রয়োগ করিবেন?

এইজন্য আমরা ভারতের হিতৈষী মাত্রকেই অনুরোধ করি তাঁহারা ভারতের পুরাবৃত্তের আলোচনা আরম্ভ করুন যাঁহারা এই আলোচনার পথ দর্শক হইয়াছেন, তাঁহারা আমাদিগের জাতীয় উৎসাহ ও জাতীয় ধন্যবাদের পাত্র। যাঁহারা এই গবেষণা ইংরাজী ভাষায় করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের নাম করিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে রাজেন্দ্র লাল মিত্র ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোর নাম করিতে হয়। আর যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় এই গবেষণা আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম করিতে গেলে, রামদাস সেন, রজনীকান্ত গুপ্ত লালমোহন বিদ্যানিধি এবং প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম করিতে হয়। আর্য্যদর্শন এই চারি জনেরই নিকট ঋণী আছে। সুতরাং আর্য্যদর্শনে এই চারি জনেরই পুস্তকের যে কিছু প্রশংসাসূচক সমালোচনা বহির্গত হইবে, তাহাই পক্ষপাত দূষিত বলি॥ সাধারণের প্রতীতি জন্মিতে পারে। আবার যদি নিন্দা করি, তাহা হইলে আর্য্যদর্শন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এত উভয় সঙ্কট জন্য আমরা আর্য্যদর্শনের লেখকদিগের পুস্তকের সমালোচনা করিতে অনিচ্ছুক; কিন্তু তাঁহারা যখন পীড়াপীড়ি করিয়া ধরেন তখন তাঁহাদিগের পুস্তক সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা না বলিয়া থাকা যায় না। আমরা সেই জন্য আজ সেই চারিজন গ্রন্থকারের অন্যতমের একখানি গ্রন্থের যৎকিঞ্চিৎ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

এই গ্রন্থখানিরই নাম যে সম্বন্ধ নির্ণয় তাহা বোধ হয় পাঠক মাত্রই বুঝিয়াছেন।

ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্গদেশের পুরাবৃত্ত। অধুনা বঙ্গদেশে রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, সাতশতী, মধ্যশ্রেণী ও পাশ্চাত্য প্রভৃতি নানা জাতীয় ব্রাহ্মণ; ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, দত্ত প্রভৃতি নানাজাতীয় শূদ্র; নানাজাতীয় বর্ণসঙ্কর; এবং অল্পসংখ্যক ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—বাস করিয়া থাকেন। উর্দ্ধতম পুরুষ ব্রহ্মা হইতে অধস্তন পুরুষ-পরম্পরার পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় করা এবং সেই উপলক্ষে প্রসঙ্গক্রমে তাঁহাদিগের রীতি নীতি, আচার ব্যবহার ও সামাজিক সংস্কার বা পরিবর্ত্তনের উল্লেখ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

লালমোহন বাবু তাঁহার প্রবন্ধে যে উপকরণ-সামগ্রীর সমাবেশ করিয়াছেন তাহা বহুমূল্য। এই উপকরণ-সামগ্রী বঙ্গের ভবিষ্য ইতিহাস লেখকের নিকট বিশেষ আদরণীয় হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তিনি ইহাতে প্রকৃত ইতিহাসকে রূপক হইতে বিশ্লেষিত করিতে পারেন নাই। ইহাতে ইতিহাস ও রূপক এরূপ ভাবে সংমিশ্রিত রহিয়াছে, যে ইতিহাসকে রূপক হইতে পৃথক্ করা পাঠকবর্গের পক্ষে অতি দুরূহ।

মগধাধিপতি অশোকের সময় হইতে আদিশূরের রাজত্বকালের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব এতদূর বাড়িয়াছিল যে বঙ্গে ব্রাহ্মণজাতির এবং বৈদিক ক্রিয়া কলাপের একবারে লোপ হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেবল সাতশত ঘরমাত্র অবশিষ্ট ছিলেন, অবশিষ্ট সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বর্ত্তমান সপ্তশতীদিগের আদি পুরুষ সাতশত ব্রাহ্মণের কেহই বেদপারগ ছিলেন না, এই জন্য ৯৯৯ শকে আদিশূর নরপতি পুত্রেষ্টি যাগের জন্য কান্যকুব্জাধিপতি মহারাজ বীরসিংহের নিকট পঞ্চগোত্রীয় পঞ্চজন সচ্চরিত্র, সাগ্নিক, বেদজ্ঞ যজ্ঞনিপুণ ও বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করেন। তদনুসারে বীরসিংহ শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ, কাশ্যপ-গোত্রীয় দক্ষ, বাৎস্যগোত্রীয় ছান্দড়, ভরদ্বাজ-গোত্রীয় শ্রীহর্ষ এবং সাবর্ণগোত্রীয় বেদগর্ভ নামক পঞ্চব্রাহ্মণকে প্রেরণ করেন। ইহাঁরা রাজদত্ত প্রসাদ স্বরূপ পঞ্চকোটি, কামকোটি, হরিকোটি, কঙ্কগ্রাম, বটগ্রাম, এই পাঁচখানি গ্রাম পাইয়া তাহাতে বসতি করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহাদিগের ছাপ্পান্নটী পুত্র সন্তান হইল—ভট্টনারায়ণের যোলটী, দক্ষেরও যোলটী, ছান্দড়ের আটটী, শ্রীহর্ষের চারিটী, বেদগর্ভের দ্বাদশটী। এই ছাপ্পান্ন জন পুত্রও বাসের নিমিত্ত রাজার নিকট ছাপ্পান্নখানি গ্রাম প্রাপ্ত হয়েন। এই গ্রামগুলি রাঢ়দেশে অবস্থিত ছিল বলিয়া ইহাঁরা এখন হইতে রাঢ়ী নামে আখ্যাত হইলেন। যে যে পুত্র যে যে গ্রামে বসতি করিতে লাগিলেন, সেই সেই গ্রামের নামে সেই সেই পুত্রের বংশ আখ্যাত হইতে লাগিল। এইরূপে রাঢ়ীদিগের মধ্যে পঞ্চগোত্র ও ছাপ্পান্ন গাঁইএর প্রাদুর্ভাব হইল। রাঢ়ীরা এই পঞ্চ গোত্র ও ছাপ্পান্ন গাঁইএর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহাকেও ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করেন না। এই জন্য তাঁহাদিগের মধ্যে "পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই তাছাড়া বামুন নাই" এই প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে।

এক্ষণে কথা হইতেছে বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা কোথা হইতে আসিলেন। তাঁহারাও আপনাদিগকে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণের সন্ততি বলিয়া পরিচয় দেন। কিন্তু তাঁহাদিগের গাঁই স্বতন্ত্র। এক্ষণে ইহার কি মীমাংসা হইতে পারে? পণ্ডিতবর লালমোহন বলেন যে পূর্ব্বোক্ত

ছাপ্পান্ন ভ্রাতার সন্ততিগণের মধ্যে পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ হওয়ায় তাঁহারা বরেন্দ্র ভূমিতে রাজার নিকট কয়েকটী গ্রাম ভিক্ষা করিয়া বসতি করেন। সেই অবধি তাঁহাদিগের সন্ততিগণের বিভিন্ন গাঁই হইয়া যায়। ইহা লাল-মোহন বাবুর অনুমান মাত্র। কারণ তিনি ইহার স্বাপক্ষ্যে কোন প্রমাণ প্রদান করিতে পারেন নাই। এবং তাঁহার এই অনুমান অপ্রতিদ্বন্দ্বিও নহে। কারণ কেহ কেহ এবিষয়ের অন্যপ্রকার মীমাংসা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা সস্ত্রীক বঙ্গে আসেন নাই। তাঁহারা যৎকালে বঙ্গে আগমন করেন তখন তাঁহাদিগের পূর্ব্বোঢ়া ভার্য্যারা বাটীতেই ছিলেন। ইহাঁরা বঙ্গে আসিয়া এখানকার ব্রাহ্মণগণের পঞ্চ কন্যাকে বিবাহ করেন; এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহাদিগের পাশ্চাত্য সহধর্ম্মিণীরা বঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হন; আদিশূর ইহাঁদিগের বাসের জন্য বরেন্দ্রভূমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন; এইরূপে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র উভয়বিধ ব্রাহ্মণের সৃষ্টি হয়। এটীও অনুমান। এই অনুমান-দ্বয়ের মধ্যে কোন্‌টী সত্য নির্ণয় করা দুরূহ।

এই রাঢ়ী ও বারেন্দ্র উভয়বিধ ব্রাহ্মণেরাই সপ্তশতী ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় ক্রমে বেদানভিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। সুতরাং বঙ্গে আবার বেদপারগ ব্রাহ্মণের আগমন প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। এই সময় দ্রাবিড় হইতে একদল দাক্ষিণাত্য বৈদিক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহাঁরা বঙ্গে আসার আগে উৎকলে আসিয়া কিছুদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এই দাক্ষিণাত্য বৈদিকেরাও ক্রমে বেদানভিজ্ঞ হইয়া উঠেন। সুতরাং আবার একদল বৈদিক পশ্চিম হইতে আসিয়া তাঁহাদিগের স্থলাভিষিক্ত হয়েন। এইরূপে বঙ্গে দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য দুই শ্রেণীর বৈদিকের আবির্ভাব হয়।

ইহার পর পশ্চিম হইতে বঙ্গে আর এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আসিয়া বাস করেন। ইহাঁদিগের লক্ষ্য বাণিজ্য। ইহাঁরা বাণিজ্য দ্বারা ক্রমে ধনবান্ হইয়া স্বদেশের মমতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক এখানেই অবস্থিতি করেন। ইহাঁরাই পাশ্চাত্য বা পশ্চিমা ব্রাহ্মণ নামে আখ্যাত হয়েন।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের রাজত্ব কালে বঙ্গে একটী প্রকাণ্ড সমাজসংস্কার আরব্ধ হয়। নানাজাতীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাহাতে আদান প্রদান প্রচলিত হয় মহারাষ্ট্রীয়েরা তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নশীল হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের যত্নে বিভিন্ন-জাতীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারা বিদ্যা বুদ্ধিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাঁহারা আপনাদিগের মধ্যে আদান প্রদান আরম্ভ করেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের সময়ে ইহাতে তাঁহাদিগের গৌরব লাঘব না হইয়া বরং গৌরব বৃদ্ধিই হইয়াছিল। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় প্রাদুর্ভাবের অন্তর্ধানের সহিত তাঁহাদিগেরও গৌরব-রবি ক্রমে অস্তমিত হইল। ক্রমে সেই সংস্কারকেরা "মধ্যশ্রেণী" এই অশ্রদ্ধেয় আখ্যা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। মেদিনীপুর বাকুড়া ও তৎপ্রদেশের নিকটবর্ত্তী পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলে অদ্যাপি এই শ্রেণীর কতকগুলি ব্রাহ্মণের বসতি দৃষ্টিতে পাওয়া যায়। মহারাষ্ট্রীয় প্রতাপ দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে বোধ হয় সমস্ত বঙ্গদেশ এই শ্রেণীর লোকে পরিব্যাপ্ত হইত এবং তাহা হইলে তাঁহারা "মধ্যশ্রেণী" নামে আখ্যাত না হইয়া 'উত্তম শ্রেণী'' নামে আখ্যাত হইতেন। আধুনিক সমাজ-সংস্কারকেরা মহারাষ্ট্রীয়দিগের এই উদার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তন করিলে বঙ্গের বৈবা-

তিক সীমা যে অতিশয় পরিবর্দ্ধিত হইয়েছে তাহার আর সন্দেহ নাই।

এইরূপে বঙ্গে ক্রমে—সপ্তশতী, রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, পাশ্চাত্য ও মধ্যশ্রেণী এই ছয় প্রকার ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইল।

এক্ষণে ভারতবর্ষে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বংশ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। এরূপ প্রবাদ আছে যে ভগবান্ ভৃগুনন্দন পৃথিবীকে একবিংশতি বার নিঃক্ষত্রিয়া করেন। পৃথিবী এইরূপে ক্ষত্রিয় শূন্য হইলে, ক্ষত্রিয়-পত্নীরা বংশরক্ষার্থ ব্রাহ্মণ দ্বারা সন্তান উৎপাদন করিয়া লয়েন। সুতরাং এক্ষণকার ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের ঔরসে ও ক্ষত্রিয় জাতির ক্ষেত্রে উৎপন্ন। আর একজাতীয় ক্ষত্রিয় আছেন যাঁহারা ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ও বৈশ্যজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাঁরা রাজপুত নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই দুই দল ক্ষত্রিয়ই বঙ্গদেশে বিরল প্রসর। সুতরাং এস্থলে ইহাঁদিগের সবিশেষ উল্লেখ করা গেল না।

বৈশ্যজাতি—ইহাঁরাও দ্বিজাতি মধ্যে গণ্য। ইহাঁদিগের আচার ব্যবহার প্রায় ক্ষত্রিয় সদৃশ। ইহাঁদিগের জাতীয় ব্যবসায় কৃষি বাণিজ্য ও কুসীদ ব্যবহার। ইহাঁদিগের সাধারণ নাম বণিক্। বঙ্গদেশে ইহাঁরা প্রায় সুবর্ণ-বণিক্ নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন। এই সুবর্ণবণিকেরা এক্ষণে কর্ম্মদোষে শূদ্রশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন।

বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণের নিম্নেই শূদ্র ও বর্ণসঙ্করের প্রাদুর্ভাব।

শূদ্রদিগের মধ্যে কায়স্থ প্রধান। কায়স্থেরা উত্তর রাঢ়ী, দক্ষিণ রাঢ়ী, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র প্রধানতঃ এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। লালমোহন বাবুর কায়স্থ প্রকরণ অতিশয় জটিল ও অপরিস্ফুট। ইহার আলোচনা ও মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে প্রস্তাব অতিশয় বাড়িয়া যায়; এই জন্য আমরা তাহা হইতে বিরত হইলাম।

পূর্ব্বোক্ত নানা জাতির পরস্পরসংমিশ্রণে যে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা এক্ষণে বঙ্গীয় সমাজের একটী বিস্তৃত অঙ্গ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে। লালমোহন বাবু বলিয়াছেন যে এই বর্ণসঙ্কর সকল স্থলেই বিশুদ্ধ শূদ্র অপেক্ষা নীচ। একথা আমাদিগের সমীচীন বোধ হয় না। কারণ আমরা দেখিতে পাই উচ্চ শ্রেণীর বীজে ও নিম্নশ্রেণীর ক্ষেত্রে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহা উচ্চ শ্রেণীর সমকক্ষ না হউক, নিম্নশ্রেণীর অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগৃহীত হয় তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এবিষয়ে বৈদ্য ও উগ্রক্ষত্রিয় প্রভৃতি আমাদিগের নিদর্শন।

গ্রন্থের উপসংহারকালে লালমোহন বাবু পঞ্চগোত্রীয় কুলীন ব্রাহ্মণগণের বর্ত্তমান সন্ততিগণের যে তালিকা প্রদান করিয়াছেন তাহা বিশেষ উপাদেয়। কুলীন ব্রাহ্মণমাত্রেই এই জন্য এক খণ্ড করিয়া লালমোহন বাবুর সম্বন্ধনির্ণয় রাখা উচিত। এমন অনেক কুলীন আছেন যাঁহারা আপনাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণের কোন বৃত্তান্তই অবগত নহেন। যে পূর্ব্বপুরুষদিগের গুণগরিমায় তাঁহারা অদ্যাপি সমাজে সবিশেষ আদরণীয় হইতেছেন তাঁহাদিগের বৃত্তান্ত অবগত না হওয়া তাঁহাদিগের পক্ষে অতিশয় লজ্জার কথা সন্দেহ নাই।

আধুনিক ভারত। *

ভ্রাতৃগণ! আমি অদ্য অনুরুদ্ধ হইয়া আপনাদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছি। বক্তৃতা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। কারণ আমার সাহস ও শক্তি বক্তৃতার অনুকূল নহে। তবে আমার কতিপয় বন্ধুর অনুরোধ এই যে—আমি তাঁহাদিগের নিকট যেমন হৃদয়ের কপাট খুলিয়া ভারতের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার বিষয়ে মধ্যে মধ্যে আলোচনা করিয়া থাকি, আপনাদিগের নিকটও আজ সেই রূপ নির্ম্মুক্ত ভাবে ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা বিষয়ে, দুই চারিটী কথা বলি। আমি এই গুরুতর বিষয় ভাবিতে এক দিন মাত্র সময় পাইয়াছি, সুতরাং এ প্রস্তাব যে অসম্পূর্ণ হইবে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

আজ কিঞ্চিদধিক এক শতাব্দী হইল এই সোণার ভারত ইংরাজ বণিক্‌দিগের হস্তগত হইয়াছে। পলাশী যুদ্ধের দিন হইতে ভারতের অদৃষ্ট-চক্রের গতি-পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। মুসলমান রাজাদিগের অত্যাচার দুর্ব্বিষহ হওয়ায় কতিপয় সম্ভ্রান্ত হিন্দু চক্রান্ত করিয়া বঙ্গের রাজমুকুট মুসলমানের মস্তক হইতে তুলিয়া ইংরাজবণিকের মস্তকে অর্পণ করেন। সকলেই জানেন কেমন করিয়া সেই বন্যার জল সমস্ত ভারত প্লাবিত করে। সকলেই জানেন কেমন করিয়া সেই ধূর্ত্ত বণিক্ সূচ্যগ্র পরিমাণে প্রবেশ লাভ করিয়া এক্ষণে বিশাল শাল রূপে পরিণত হইয়াছেন। হিমালয় হইতে কুমারিকা ও সিন্ধুর পশ্চিম উপকূল হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত ভারত এক্ষণে ইংরাজ বণিকের প্রচণ্ড প্রতাপে কম্পান্বিত। ইহাঁদিগের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপের ভয়ে আজ আমাদিগের হৃদয় এতদূর কলুষিত যে এক্ষণে প্রকাশ্যস্থলে আমরা হৃদয়ের দ্বার সম্পূর্ণ রূপে উদ্ঘাটিত করিয়া কাঁদিতেও অক্ষম।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যখন পূর্ব্বপ্রভু সিরাজদ্দৌলার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া এই দুর্দ্দান্ত বণিকদিগকে বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন, তখন তাঁহার মনে কত আশা কত অভিলাষ ছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে ইংরাজেরা যখন হিন্দুদিগের ষড়যন্ত্রে বিনাযুদ্ধে বা কাল্পনিক যুদ্ধে বঙ্গের সিংহাসন পাইলেন, তখন অবশ্যই তাঁহাদিগকে মন্ত্রিত্ব সেনাপতিত্ব প্রভৃতি উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠাপিত করিবেন। মনুষ্যমাত্রেরই হৃদয়ে যে কৃতজ্ঞতা বিরাজমান,

* এই প্রবন্ধটী হিন্দুমেলায় পঠিত হইবে বলিয়া লিখিত হয়। কিন্তু পুলিসের অদ্ভুত মহিমায় মেলা স্থলে যে দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়, তাহার জন্য ইহা তথায় পঠিত হয় নাই।

তিনি ইংরাজদিগেরও অন্তরে সেই কৃতজ্ঞতার অস্তিত্ব অনুমান করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুমান অস্বাভাবিক বা অমানুষ গুণের উপর ন্যস্ত হয় নাই বটে, কিন্তু তাঁহার একটী গুরুতর ভ্রম হইয়াছিল। তিনি জানিতেন না যে যাহারা বিশ্বাসঘাতকতা উত্তেজিত করিয়া তাহার ফলভোগ করিতে কুণ্ঠিত নহে, তাহাদিগের পক্ষে স্বকার্য্যসাধন হইলে উপকর্ত্তার প্রতিও বিমুখ হওয়া অতি সহজ।

তিনি ইংরাজদিগকে উপলক্ষ করিয়া মুসলমান ভ্রাতৃগণের চরণে যে শৃঙ্খল পরাইতে গেলেন, ধূর্ত্ত ইংরাজদিগের বুদ্ধিকৌশলে আপনারাও সেই শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেন। কান্যকুব্জাধিরাজ জয়চন্দ্রের বিশ্বাসঘাতকতায় ভারতের চরণে যে শৃঙ্খল অর্পিত হয়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বিশ্বাসঘাতকতায় সেই শৃঙ্খল উন্মুক্ত না হইয়া দৃঢ়সম্বদ্ধ হইয়াছে। আজ তাঁহাদিগের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমরা সকলেই ভোগ করিতেছি।

যৎকালে ভারত ইংরাজাধিকৃত হয়, তখন ভারতবাসী মাত্রেরই মনে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, ভারতে ইংলণ্ডের ন্যায় প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠাপিত হইবে। সকলেই বিশ্বাস করিতেন যে, যে জাতি স্বাধীনতার জন্য শ্বেতদ্বীপকে রাজরুধিরে অভিষিক্ত করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই সে জাতি দ্বারা জাত্যন্তরের স্বাধীনতাপহরণ অসম্ভব। সে জাতি দ্বারা জাত্যন্তরের উপকার ভিন্ন অপকার হওয়া অসম্ভব। দাসত্ব উন্মোচনের নিমিত্ত যে জাতির সহস্র সহস্র রণতরি সদা সপ্তসাগর আলোড়িত করিতেছে, সেই জাতি যে স্থানান্তরে দাসত্ব-বীজ বপনে এত পটু হইবেন, তাহা কে জানিতে পারিয়াছিল? কে জানিত যে একাধারে এরূপ পরস্পরপ্রতিদ্বন্দ্বী গুণদ্বয়ের সমাবেশ হইতে পারে?

ইংরাজেরা মনে করিতে পারেন তাঁহারা আমাদিগের উপর রাজত্ব করিতেছেন বলিয়া আমাদিগের মনে এরূপ ঈর্ষার ভাব উদিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা নহে। ভারত এক্ষণে যেরূপ বিচ্ছিন্নাঙ্গ ও হীনবল তাহাতে কোন প্রবলতর রাজ্যের আশ্রয়ে থাকা তাহার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে শ্রেয়স্কর। আমরা কেবল এই মাত্র চাই, যেন সেই বৈদেশিক সাহায্য আমাদিগের ভবিষ্য জাতীয় সঞ্জীবনের প্রতিকূল না হয়। ইংরাজদিগের বর্ত্তমান ভারত-শাসনপ্রণালী যে আমাদিগের ভবিষ্য জাতীয় সঞ্জীবনের প্রতিকূল তাহা আমরা সহজেই প্রদর্শন করাইতে পারি।

যখন ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্প্যানির অধীনে ভারতের শাসনভার অর্পিত ছিল, তখন উক্ত কোম্পানি এই গুরুতর ভারের সদ্ব্যবহারের নিমিত্ত ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্ট ও ব্রিটীশ সিংহাসনের নিকট দায়ী ছিলেন। তাঁহাদিগের ভারত-প্রতিনিধি ভারতের গর্হিত শাসনের জন্য পার্লিয়ামেণ্টর নিকট দণ্ডার্থ আনীত হইতেন। লর্ড হেষ্টিংসের বিচার তাহার নিদর্শন। তখন কোম্পানির

কর্ম্মচারীকে বিধির কঠোর শাসন হইতে পরিরক্ষিত করায় পার্লিয়ামেণ্ট বা মন্ত্রি-দলের কোনও স্বার্থসাধন হইত না, সুতরাং তাঁহাদিগের উপর পার্লিয়ামেণ্ট ও মন্ত্রিদলের সতত কঠোর দৃষ্টি থাকিত। এইজন্য তৎকালে কোম্পানির প্রতিনিধিকৃত কোন অত্যাচার তাঁহাদিগের নিকট ভাল করিয়া জানাইতে পারিলে তাহার প্রতিবিধান হইতে পারিত।

কিন্তু এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ বৈপরীত্য ঘটিয়াছে। এক্ষণে ভারত—মহারাণী ও পার্লিয়ামেণ্টের অব্যবহিত শাসনের অধীনে আসিয়াছে। এক্ষণে ভারত প্রতিনিধি অপরের কর্ম্মচারী নহেন, তাঁহাদিগেরই খাসের চাকর। তাঁহার গৌরব রক্ষা করা, দোষ করিলে তাঁহাকে দণ্ড হইতে উন্মুক্ত করা, এক্ষণে মহারাণী ও পার্লিয়ামেণ্টের স্বার্থ। সুতরাং এক্ষণকার ভারত-শাসন-প্রণালী যে সম্পূর্ণরূপে যথেচ্ছাচার প্রণালী (Despotism) হইয়া উঠিয়াছে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। অর্থাৎ গবর্ণরজেনেরেল ও ষ্টেট সেক্রেটারী যাহাই ভাল বুঝেন তাহাই ভারতের অখণ্ডনীয় বিধি হইয়া উঠে। ইহার উপর আর আপিল নাই। দুই জন ব্যক্তির ইচ্ছা ভারতের বিংশতি কোটী অধিবাসীর দুর্লঙ্ঘনীয় বিধি, ইহা ভাবিতে গেলেও হৃদয় ভয়ে আকুলিত হয়।

আমরা স্বীকার করি আক্‌বরের ন্যায় নরপতির হস্তে যথেচ্ছাচার-প্রণালী সমর্পিত হইলে রাজ্যের মঙ্গল বই অমঙ্গল নাই। কিন্তু ইতিহাসের আরম্ভ হইতে এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত আমরা কয়টী আক্‌বর প্রাপ্ত হইয়াছি? সহস্র বর্ষে একটী আক্‌বর জন্মে কি না সন্দেহ। এরূপ স্থলে আমরা দুই একটী ব্যক্তির ইচ্ছার উপর আমাদিগের ধন, প্রাণ ও মান অর্পণ করি কিরূপে? ভারতের বিংশতি কোটী অধিবাসীর মঙ্গলের নিমিত্ত আমরা দুই একটি ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করি কিরূপে? ইংরাজ রাজত্ব কাল মধ্যে যদি একটী আক্‌বরও আবির্ভূত হইত, তাহা হইলেও আমাদিগের মনে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইত। যদি ইংরাজ-রাজত্ব কালে একটী বীরবল, একটী মানসিংহ, একটি তোদরমল্ল—সেনাপতিত্ব, শাসন-কর্তৃত্ব বা মন্ত্রিত্ব পদে অভিষিক্ত হইত, তাহা হইলেও আমাদিগের মনে একদিন আশার সঞ্চার হইত। কিন্তু সমস্ত ইংরাজ ইতিহাসে এরূপ ঔদার্য্যের একটিও দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। তবে আমরা মনকে কি বলিয়া প্রবোধ দিই? আমাদিগকে কোন নূতন স্বত্ব প্রদান করা দূরে থাকুক, আমরা দেখিতেছি যে একটি একটি করিয়া আমাদিগের স্বভাব-দত্ত স্বত্ব অপহৃত হইতেছে। কাল বলিলেন তোমাদিগকে এই এই স্বত্ব প্রদান করা যাইবেক। আজ বলিলেন না—তোমরা অদ্যাপি উপযুক্ত হও নাই—সুতরাং এক্ষণে তোমাদিগকে সে সকল স্বত্ব প্রদান করা যাইতে পারে না—যদি কখন উপযুক্ত হও, তবে পরে বিবেচনা করা

যাইবেক। ১৮৫৮ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর শান্তি সংস্থাপনের জন্য রাজ্ঞী বলিলেন "অতঃপর জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ ভেদ না করিয়া শুদ্ধ গুণ বিচার পূর্ব্বক তোমাদিগকে রাজ্যের উচ্চতম পদে প্রতিষ্ঠাপিত করা যাইবেক। এখন হইতে ভারতবাসী ও ব্রিটনবাসী বলিয়া কোন বিষয়েই কোন প্রভেদ করা যাইবেক না।" প্রজারা কিছু দিন মুগ্ধ আশ্বাসে রহিল। ভাবিল তাহাদের রাণীর বাক্য কখন মিথ্যা হইতে পারে না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের সেই ভ্রম বিদূরিত হইল। বিংশতি বৎসর অতীত হইল, তথাপি তাহারা রাজ্ঞীর বাক্য কার্য্যে পরিণত হইতে দেখিল না। আজ হইবে কাল হইবে এরূপ লুব্ধ আশ্বাসে রহিয়াছে, এমন সময় দিল্লীর দরবার আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলেই ভাবিল যে এই শুভ লগ্নে রাজ্ঞী তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করিবেন। অসংখ্য প্রজা নব স্বত্ব লাভের আশায় দিল্লীর অভিমুখে বহ্নিমুখে পতঙ্গের ন্যায় ধাবিত হইলেন। কত ব্যক্তির অন্তরে কত আশা কত অভিলাষ ও কত উৎসাহ! রায় বাহাদুর, রাজা বাহাদুর, রাজা, মহারাজা, আমীর ওমরা সকলেই ঊর্দ্ধ শ্বাসে দৌড়িতেছেন, সকলেই ভাবিয়াছিলেন ভারতে কি এক নবীন সৌভাগ্য অভ্যুদিত হইবে। ব্যক্তিগত ও জাতীয় আশায় সকলেরই অন্তর আপ্লুত। নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে নৃত্য, গীত ও মহোৎসব। মুগ্ধ আশ্বাসে সমস্ত ভারত যেন ক্ষেপিয়া উঠিল। সামান্য প্রজা হইতে মহারাজা পর্য্যন্ত সকলেরই গৃহে মহা সমারোহ উপস্থিত হইল। আমাদিগের ভয় হইল বুঝি ভারতের মস্তিষ্কে কোন বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে। যাহা হউক এই বিশ্বব্যাপী আনন্দোৎসবের পরিণাম কি হইল, না দুই চারি জন শাদা ভারতবাসী রায়বাহাদুর প্রভৃতি বঙ্গে অভিরঞ্জিত হইলেন, দুই চারি জন রায়বাহাদুর রাজা হইলেন, দুই চারি জন রাজা রাজাবাহাদুর হইলেন, দুই চারিজন রাজাবাহাদুর মহারাজা হইলেন। যাঁহারা ১৯ তোপ পাইতেন তাঁহারা ২১ তোপ পাইলেন, যিনি ২১ তোপ পাইতেন তাঁহার ৩১ তোপ হইল, যিনি তোপ পাইতেন না তাঁহার ১৩ তোপ হইল, মহারাণীর এক শত এক তোপ হইল, স্বাধীন রাজাদিগের কণ্ঠে অধীনতাপদক লম্বমান হইল, তাঁহারা রাজা হইতে উচ্চতমপদ [সেনাপতিত্বে বৃত হইলেন; অবশেষে শ্রাদ্ধের চূড়ান্ত পরিণাম স্বরূপ লর্ডলীটন স্বাধীন রাজাদিগকে এই মর্ম্মে বলিলেন তোমরা আর এখন হইতে স্বাধীন রাজা বলিয়া পরিগণিত হইবে না, তোমরা এখন হইতে মহারাণীর মন্ত্রি-সভার সভামাত্র বলিয়া পরিগণিত হইবে। ইহাতেও তোমরা যদি আপন ইচ্ছায় রাজভক্ত না হও, তাহা হইলে তোমাদিগকে বলপূর্ব্বক রাজভক্ত করিব। আর প্রজা-সাধারণ! তোমরা অদ্যাপি কোন কাযেরই হও নাই, সুতরাং এক্ষণে তোমাদিগের

কোন উচ্চ পদের আকাঙ্ক্ষা বামন হইয়া চাঁদে হাত দেওয়ার ইচ্ছার ন্যায় হাস্যাস্পদ হইবে। তোমরা এরূপ দুরাকাঙ্ক্ষা করিও না। আমরা যে দুই চারি টাকা অনুগ্রহ করিয়া দিতেছি তাহাতেই তোমরাএক শাঁক করিয়া খাইয়া কথঞ্চিৎ সন্তুষ্ট থাক। মহারাণী তোমাদিগকে পূর্ব্বে যে আশ্বাস বাক্য প্রদান করিয়াছিলেন, সে আশ্বাস বাক্যে আপাতত মুগ্ধ হইও না। তোমরা যদি কখন উপযুক্ত হও, তাহা হইলে মহারাণীর সে কথা বিচার করা যাইবেক। আর তোমরা উপযুক্ত হইয়াছ কি না সে বিচারের ভার আমাদিগেরই হাতে এবং আমরাও বিশেষ বিবেচনা না করিয়া তোমাদিগকে উপযুক্ত বলিয়া স্বীকার করিব না। ইহাতেও তোমরা যদি রাজভক্ত না হও তাহা হইলে তোমাদিগকেও বলপূর্ব্বক রাজভক্ত করিতে চেষ্টা করিব।

মহারাণীর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের বক্তৃতায় আমাদিগের মনে যে কিছু আশা ভরসা হইয়াছিল. লর্ড লীটনের দিল্লীর বক্তৃতায় আমাদিগের সে সমস্ত আশা একবারে সমূলে উন্মূলিত হইয়াছে। প্রলয় ঝটিকার পর যে স্তব্ধভাব, আমাদিগের হৃদয়ের এক্ষণে ঠিক সেই স্তব্ধভাব। আমরা এক্ষণে কোন্ দিকে যাইব, কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। যে দুই চারিজন উপাধি পাইয়াছেন তাঁহারা ভিন্ন, ভারতের আর সমস্ত অধিবাসীই হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। সকলেই কোন না কোন প্রকারে মর্ম্মাহত হইয়াছেন। সকলেই যেন এতদিন মোহনিদ্রায় অভিভূত ছিলেন, এতদিন পরে যেন তাঁহাদিগের চৈতন্য হইল। চৈতন্য লাভের পর সকলেরই মনে এই প্রশ্ন সমুদিত হইল "ইংরাজ রাজত্বে আমাদিগের কি আশা?" ইংরাজদিগের সহিত স্বাধীন বাণিজ্য যুদ্ধে ভারতের বাণিজ্য প্রতিভা অঙ্কুরে বিদলিত হইল। শিল্পও ক্রমে ক্রমে অন্তর্ধান করিল। ভারতের যে বস্ত্র ও অলঙ্কার জগতের বিস্ময়োদ্দীপক ছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে অবমানিত ও অধঃকৃত হইল: সুতরাং কর্ম্মকার ও তন্তুবায় কুল একবারে উৎসন্ন হইয়া পড়িল। যে অর্থে অসংখ্য ভারতীয় শিল্পীরা প্রতিপালিত হইতে পারিত, সেই অর্থে এক্ষণে অসংখ্য বৈদেশিক শ্রমোপজীবী প্রতিপালিত হইতেছে। একদিকে ভারতের শিল্পীরা দিন দিন শুদ্ধ উদরান্নের জন্য লালায়িত হইতেছে, অন্যদিকে বৈদেশিক শিল্পীরা দিন দিন ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া পড়িতেছে। শিল্প ও বাণিজ্য ত এই রূপে এক প্রকার বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে, এক্ষণে কৃষিই সাধারণ লোকের জীবন ধারণের এক মাত্র উপায় রহিয়াছে। কিন্তু ইহাও অর্থসাধ্য, অর্থাভাবে কৃষকেরা ইহারও উন্নতি সাধন করিতে পারিতেছে না। মহাত্মা আকবর তাঁহার কলেক্টারদিগকে আদেশ করিয়াছিলেন যে তাঁহারা যেন কৃষকদিগকে প্রয়োজন হইলেই অর্থসাহায্য করেন,

তাঁহারা যেন সকল অবস্থাতেই তাহাদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন, তাঁহারা যেন সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদিগের অবস্থার উৎকর্ষ সাধন করিতে সচেষ্ট হন। কই ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ত কলেক্টরদিগের প্রতি এরূপ কোন আদেশ প্রদান করেন নাই, অথবা যদি করিয়া থাকেন, তাহাও কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পের ত এই দশা গেল, আমাদিগের একমাত্র আশা ছিল রাজকর্ম্ম। লর্ড-লীটনের বক্তৃতাও সেই চিরলালিত আশা লতাকেও সমূলে উন্মূলিত করিল। এক্ষণে আমরা করি কি, যাই বা কোথায়? আমরা প্রতি বৎসর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অসংখ্য ছাত্রকে প্রশংসাপত্র সহ বহির্গত হইতে দেখিতেছি, আমাদিগের প্রথমে ইহাতে বড়ই আনন্দ বোধ হইত। কিন্তু এক্ষণে এই শোচনীয় দৃশ্যে আমাদিগের হৃদয় কাঁদিয়া উঠে। আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম, এ পরীক্ষা দিয়া বহির্গত হইয়াছিলাম, তখন আমাদিগের মনে কতই আশা, কতই উৎসাহ ছিল। তখন দেশের "এ করিব" "ও করিব" বলিয়া আমাদিগের মনে কত প্রকার ইচ্ছা হইত, কিন্তু এক্ষণে "উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ" দরিদ্রের মনোরথের ন্যায় সেই সকল ইচ্ছা আমাদিগের হৃদয়ে উত্থিত হইয়াই অন্তর্লীন হইতেছে। আমাদিগের জ্ঞান, আমাদিগের শিক্ষা, আমাদিগের কেবল যাতনার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। আমরা জানিতে পারিয়াছি এই সকল কার্য্য করিলে আমাদিগের জাতীয় গৌরব ও মনুষ্য নামের মহত্ব পরিরক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু যে যে উপায়ে সে সকল করিতে সমর্থ আমরা সে সকল উপায়ে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। আমরা সকলের ঘৃণার কারণ হইয়াছি, যেহেতু আমরা চাকরী ও ওকালতি প্রভৃতি ভিন্ন অন্য কোন জীবিকা অবলম্বন করি না। কিন্তু আমরা জানি না যে চাকরী ও ওকালতী প্রভৃতি ভিন্ন আমরা অন্য কোন্ জীবিকা অবলম্বন করিতে পারি। আমাদিগের শিক্ষা আমাদিগকে যাহা করিয়া দিতেছে, তাহা ভিন্ন আমরা আর কি হইতে পারি? আমরা অন্য যে দিকেই যাইব সেই দিকেই মূল ধনের প্রয়োজন। মূল ধন আমাদিগের নাই। আমাদিগের ধনিকবৃন্দও নিতান্ত স্বার্থপর। তাঁহারা সঞ্চিত অর্থ কেবল আপনাদিগের বৃথা আমোদ প্রমোদে ব্যয়িত করিয়া থাকেন। তদবশিষ্ট যাহা থাকে তদ্দ্বারা অল্পসুদে গবর্ণমেণ্টের কাগজ ক্রয় করিবেন, তথাপি অধিক লাভ-কর বহির্বাণিজ্য, কৃষি বা শিল্পে প্রযুক্ত করিবেন না। তাহা হইলে তাঁহাদিগেরও অধিকতর লাভ হইতে পারে এবং দেশীয় মস্তিষ্ক পরিচালিত ও দেশীয় শোণিত পরিপোষিতও হইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা তাহা করিবেন কেন? উদরান্নের জন্য তাঁহাদিগকেত লালায়িত হইতে হয় না। তাঁহাদিগের স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণের দুরবস্থার সহিত তাঁহা-

দিগের কি সম্বন্ধ আছে, যে তাঁহাদিগের সঞ্চিত ধন তাঁহারা এরূপ সংশয়িত কার্য্যে প্রযুক্ত করিবেন? একদিকে যেমন অধিকতর লাভের সম্ভাবনা, সেইরূপ অন্য দিকে মূল ধনের সমূলে বিনষ্ট হওয়ারও সম্ভাবনা রহিয়াছে। এরূপ স্থলে তাঁহারা কি জন্য এরূপ অসমসাহসিকতায় প্রবৃত্ত হইবেন? সুতরাং অধিকতর লাভের আশা দেখাইয়া তাঁহাদিগকে ইহাতে প্রবর্ত্ত করা অসম্ভব। তাঁহাদিগের অন্তর যদি স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণের দুরবস্থা দেখিয়া আপনি না কাঁদে, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ইহাতে প্রবৃত্ত করে কাহার সাধ্য? কিন্তু কবে যে তাঁহাদিগের অন্তর স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণের জন্য কাঁদিবে আমরা জানি না; এবং তাহা না হইলেও আমাদিগের সুশিক্ষিত দলের আর কোন আশা নাই।

আর একটী দ্বার সুশিক্ষিতদিগের সম্মুখে উন্মুক্ত রহিয়াছে। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে সরস্বতীর বরপুত্র হইয়া মসীমর্দ্দন ও মস্তিষ্ক পরিচালন দ্বারা জীবন দগ্ধ করিতে পারেন। কিন্তু সরস্বতীর বরপুত্রদিগের সাধারণ অবস্থা দেখিয়া কেহ সহজে এ পথে অগ্রসর হইতে চাহেন না। এই ব্যবসায়ে দুই চারিজনকে সৌভাগ্যশালী হইতেও দেখা গিয়াছে সত্য, কিন্তু এই ব্যবসায়ের ব্যবসায়ীদিগের সাধারণ অবস্থা অতি শোচনীয়। বাঙ্গালাভাষা যেরূপ সর্ব্বতঃ অনাদৃত, তাহাতে নবন্যাস, নাটক ও স্কুল বই ব্যতীত ইহাতে অন্য কোন বই লিখিলে মুদ্রাঙ্কন ব্যয় পর্য্যন্ত নির্ব্বাহ হইয়া উঠা দুষ্কর। নবন্যাস, নাটক ও স্কুল বইয়ে কিঞ্চিৎ লাভ হয় বলিয়া অধিকাংশ গ্রন্থকারই সেই দিকে ঝুঁকিয়াছেন। এই কারণে এই শ্রেণীর গ্রন্থকারদিগের আয়ও ক্রমে সহস্রভাগে বিভক্ত হইয়া কমিয়া যাইতেছে। এ ব্যবসায়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা বাড়িতেছে, কিন্তু প্রতিযোগিতাক্ষেত্র পূর্ব্ববৎ একইরূপ সঙ্কীর্ণ রহিয়াছে। সুতরাং দুর্ভিক্ষ পীড়িতের ন্যায় এই শ্রেণীর গ্রন্থকারেরা পরস্পরের মাংস ভক্ষণ আরম্ভ করিয়াছেন। এই দুর্ভিক্ষের সময় আবার বৈদেশিক অর্থলোলুপ গ্রন্থকারেরা প্রতিদ্বন্দ্বীতাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া ইংরাজী হইতে বাঙ্গালা পুস্তকের অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা নানাপ্রকারে আমাদিগের শোণিত শোষণ করিতেছেন, তাঁহাদিগের উদর আমাদিগের মাংসে পরিপূরিত করিয়াছেন, আমাদিগকে কঙ্কালমাত্রে পরিশিষ্ট করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদিগের পরিতৃপ্তি ও নিবৃত্তি নাই। যখন এদেশীয় গ্রন্থকারেরা অন্নবিনা মারা যাইতেছেন, যখন দুর্ভিক্ষের জ্বালায় তাঁহারা পরস্পরের মুখের গ্রাস পরস্পরের মুখ হইতে কাড়িয়া লইতে বাধ্য হইতেছেন, সেই ভীষণ যাতনার সময় তাঁহারা কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাসমরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। পুস্তক নির্ব্বাচন বিষয়ে তাঁহাদিগেরই হাত, সুতরাং তাঁহারা অনায়াসে নিরুপায় বাঙ্গালীদিগকে পরাস্ত করিয়া আপনাদিগের অভীষ্ট সাধন করি-

তেছেন। গ্রন্থকারদিগের মধ্যে যাঁহাদিগের কিঞ্চিৎ লাভ ছিল, তাঁহাদিগের ত দশাপরিণাম এই হইল। আর এক শ্রেণীর গ্রন্থকার আছেন, তাঁহাদিগের অবস্থা আরও শোচনীয়। ইহাঁরা সাধারণতঃ সম্পাদক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইহাঁরা সাময়িক পত্রের প্রচার দ্বারা পৈতৃক ধনের বা স্বোপার্জ্জিত অর্থের ধ্বংশ করিয়া থাকেন। দেশের মঙ্গল সাধন করা তাহাদিগের উদ্দেশ্য। কিন্তু দেশের মঙ্গল সংসাধিত হউক বা না হউক, তাঁহাদিগের নিজের অমঙ্গল নিশ্চিত। ক্রমে তাঁহাদিগের মনের স্বাধীনবৃত্তি সকল এতদূর তেজস্বিনী হইয়া উঠে, যে তাঁহারা ক্রমে পরের উপাসনা ও পরের দাসত্ব করিতে অক্ষম হইয়া উঠেন। কিন্তু সাহেবের উপাসনা ও সাহেবের দাসত্ব ব্যতীত আজ কাল যে অর্থসম্বন্ধে আমাদিগের কোন উন্নতিরই আশা নাই তাহা বলা কেবল বাহুল্য মাত্র। সেই সাহেবদিগের সহিত সম্পাদক দিগেরত চিরশত্রুতা দাঁড়াইয়া যায়। তাঁহারা অনেক সময় সাহেবদের বিচারকর্ত্তা হইয়া দাঁড়ান, এই জন্য সাহেবদিগের অধীনে চাকরীকরাও তাঁহাদিগের পক্ষে অতিশয় ক্লেশকর হইয়া দাঁড়ায়। এইজন্য তাঁহাদিগের অর্থবিষয়ক উন্নতির দ্বার একপ্রকার রুদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু যে দেশের উন্নতি সাধন করিবেন বলিয়া তাঁহারা নিজের উন্নতির আশায় জলাঞ্জলি দেন, সে দেশের লোকের তাঁহাদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার? নিঃস্বার্থভাবে সম্পাদকদিগের উৎসাহবর্দ্ধন করা দূরে থাকুক, কাগজ লইয়া তাঁহারা অনেকেই দাম দিতে চাহেন না। সম্পাদকেরা যে কি খাইয়া তাঁহাদিগের জন্য লড়িবে তাহা তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখেন না। সম্পাদকদিগেরনিজের উদর পূরণ করা দূরে থাক্, কি দিয়া তাঁহারা মুদ্রাঙ্কনের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন তাহাও তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। স্বদেশীয় রাজা হইলে সম্পাদকদিগের সহিত রাজার সহযোগিতা হইতে পারিত; কিন্তু বৈদেশিক রাজার সহিত সম্পাদকদিগের স্বভাবসিদ্ধ প্রতিযোগিতা। সুতরাং তাঁহাদিগের রাজার নিকট কোন উৎসাহ পাইবার আশা নাই। তাঁহাদিগের একমাত্র আশাস্থল স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণ। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সম্পাদকদিগের কষ্টে স্বদেশবাসিগণের হৃদয় বিচলিত হয় না। সুতরাং সম্পাদকদিগের ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়ান ভিন্ন অন্য উপায় নাই। আর এক শ্রেণীর গ্রন্থকার আছেন, যাঁহাদিগের লিখিত গ্রন্থ নবন্যাস, নাটক বা স্কুলের বই এ কোন শ্রেণীর অন্তর্গত নহে। তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সাধনের নিমিত্ত উচ্চদরের পুস্তক লিখিয়া থাকেন। ইহাঁদিগেরও দশা সম্পাদকদিগের ন্যায়, সুতরাং ইহাদিগের বিষয় আর অধিক করিয়া বলা বাহুল্য। সুতরাং এ জীবিকা সাধারণের প্রলোভনীয় হইতে পারে না। সুশিক্ষিত দলের সম্মুখে

আর কোন্ স্বাধীন জীবিকার দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে আমরা জানি না।

পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সহানুভূতি না থাকায় আজ আমাদিগের এই দশা! এখনই আমাদিগের দুরবস্থার পরিসীমা নাই। এর পর আরও কি হইবে ভাবিতে গেলে ভয় হয়। আমাদিগের পুত্র পৌত্রদিগের যে কি দশা হইবে তাহা আমরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। ক্রমে শিক্ষার ব্যয় গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। একজন ভদ্র-বংশোদ্ভব কেরাণীর বেতন ২০ টাকা, কিন্তু পুত্রের সংখ্যা ৫টী। পাঁচটীকে ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখাইতে হইলে, তাহাদিগের বিদ্যালয়ের বেতন দিতে হইলেই তাঁহার নিজের বেতন পর্য্যবসিত হয়। মূর্খ করিয়া রাখিলেও তাহারা চির-জীবন গলগ্রহ স্বরূপ হইবে, এবং সমাজে তাহাদিগকে লইয়া তাঁহাকে সতত অবমানিত হইতে হইবে; সুতরাং তাহাদিগকে মূর্খ করিয়াও রাখিতে পারেন না। এস্থলে তিনি কি করেন? কেরাণীর উপরি লাভের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং অগত্যা তাঁহাকে পরের শরণাপন্ন হইতে হয়। একজন এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, তাঁহার ঊর্দ্ধ সংখ্যা ১০০ শত টাকা বেতন হইল। অসংখ্য নিরন্ন কুটুম্ব আসিয়া তাঁহার গল-লগ্ন হইল। স্নেহ-কোমল হিন্দু হৃদয় আত্মীয় স্বজনের দুঃখে উপেক্ষা করিতে না পারিয়া সোণামুখ করিয়া সেই গুরুভার বহন করিতে লাগিলেন। যত দিন তাঁহার পুত্রাদি না হইল, তত দিন তিনি দুঃখে কষ্টে সেই গুরুভার কথঞ্চিৎ বহন করিতে পারিলেন, কিন্তু সন্তানাদি হইবামাত্র নানা প্রকার খরচ বাড়িয়া গেল; যে আত্মীয় স্বজনের গুরুভার মস্তকে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদিগকেও কিছু বলিতে পারেন না, অথচ দেখিতেছেন তাঁহার আয়েও সঙ্কুলান হয় না। সাহেবের নিকট বলিলেন সাহেব! ১০০ শত টাকায় আর কুলায় না। সাহেব পূর্ব্ব সংস্কার মনে করিয়া আছেন। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি যখন জাহাজ হইতে নামিয়াছিলেন, তখন শুনিয়াছিলেন ১০০শত টাকায় একজন বাঙ্গালী ভদ্র লোকের বেশ চলিতে পারে। সেই সংস্কার তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়া আছে। এদিকে তাঁহারা আসিয়া আমাদিগের যে কি সর্ব্বনাশ করিয়াছেন তাহা তাঁহার মনে নাই। আগে আমাদিগের একখানি ধুতি ও এক খানি চাদর হইলেই যথেষ্ট হইত, কিন্তু এক্ষণে আমাদিগের বটজুতা চাই, ষ্টকিং চাই, পিরান চাই, চাদর চাই, আবার বাহিরে যাইতে হইলে ইহার উপর পেণ্টুলেন, চাপকান, টুপি বা পাকড়ী প্রভৃতি আসবাব চাই। এ সকল না হইলে আবার, সাহেব! তুমি আমাদিগকে তোমার নিকটে যাইতে দিবে না। বাটীর কর্ত্তা যখন এই সকল পরিচ্ছদ ধারণ করিলেন, তখন যে বাটীর অন্যান্য লোক কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহার অনুকরণ করিবে তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং প্রত্যেকের এক দফা করিয়া পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতে হইলে গড়ে

১০ টাকা করিয়া পড়িয়া যায়। ইহার উপর আবার প্রত্যেক দ্রব্যের মূল্য চতুর্গুণ করিয়া বাড়িয়াছে। এ সকল কারণ সত্ত্বেও সাহেব বলিলেন এক শত টাকায় বেশ চলিতে পারে। বেশী পীড়াপিড়ি করিলে বলেন যে ইহাতে সন্তুষ্ট না হও, উন্নতির অন্য চেষ্টা দেখ।

যাঁহারা উচ্চ শিক্ষার উচ্চতম শাখায় আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ত এই দশা। যাঁহাদিগের ইহার মধ্যে পদস্খলন হয়, তাঁহাদিগের অবস্থা আরও শোচনীয়। যিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না, তিনিত মনুষ্য-মধ্যেই পরিগণিত হইলেন না। ১০, টাকার চাকরীর জন্য তাঁহাকে দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে হয়। যিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, তাঁহার মাসিক ঊর্দ্ধসংখ্যা ১৫ টাকার সংস্থান হইল। যিনি এল. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, তাঁহার ঊর্দ্ধসংখ্যা মাসিক ২৫, টাকার সংস্থান হইল; এবং যিনি বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন তাঁহার ঊর্দ্ধসংখ্যা ৫০, টাকার সংস্থান হইল। বাজারের দর ক্রমেই কমিতেছে। ক্রমেই কর্ম্ম অপেক্ষা কর্ম্মচারীর সংখ্যা বাড়িতেছে। ২০ বৎসর পরে যে কি হইবে তাহা ভাবিতে গেলে হৃদয় বিকম্পিত হয়। যাঁহারা বিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা পাইতেছেন, তাহাদিগেরত এই দশা। আবার যে সকল ভদ্র সন্তান অবস্থার দোষে ইংরাজী শিক্ষা পাইতে পারেন নাই, অথচ হলচালন করিতেও অক্ষম, তাঁহাদিগের অবস্থা দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। যাঁহারা বলেন যে তাঁহারা হলচালন করেন না কেন তাঁহারা অতিশয় মূর্খ। অধিকতর বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমসহিষ্ণু কৃষকদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা দুর্ব্বলতর ও শারীরিক-পরিশ্রমকাতর ভদ্রসন্তানের পক্ষে একান্ত অসম্ভব। আর কৃষকদিগের অবস্থা এত কি লোভনীয় যে তাহাদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাসমরে ভদ্রসন্ততিগণের অবতরণ করা উচিত। আমরা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারি যে টাকার সুদ ও খরচা বাদে কৃষকের গড়ে মাসিক ৫৲ টাকার ঊর্দ্ধ লাভ হয় না। একজন মধ্যবিৎ লোকের ৫৲ টাকায় কখন সংসার চলে না। এরূপ স্থলে তাঁহারা কি করিবেন? হয় তাঁহাদিগকে পরের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হইবে, নয় ভিক্ষাব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু এরূপ জীবিকা যে কিরূপ ক্লেশকর তাহা যাঁহারা অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। এই ভীষণ অন্নযুদ্ধের সময় আবার লর্ড লীটন কর্ত্তৃক আশার মূলে কুঠারাঘাত। ভারতবাসির মনে আশা ছিল যে ক্রমে ক্রমে তাঁহারা রাজ্যের অধিকাংশ উচ্চ কর্ম্ম প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহাদিগের বিশ্বাস ছিল যে ক্রমে ক্রমে ভারতে শ্বেতাঙ্গের আমদানী কমিয়া যাইবে। কিন্তু এক্ষণে সে বিশ্বাস তিরোহিত হইয়াছে, সে আশা সমূলে উন্মূলিত হইয়াছে। আমরা জানিতে পারিয়াছি যে ইংরেজেরা সহজে

আমাদিগের মুখের গ্রাস আমাদিগকে প্রত্যর্পণ করিবেন না।

এই নিরাশ সময়ে আমাদিগের একটী মাত্র উপায় করতলস্থ রহিয়াছে। আমরা ইচ্ছা করিলে সেই উপায় দ্বারা বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে, ইংরাজদিগের উপর জয়লাভ করিতে পারি। এই উপায় একতা ও আত্মত্যাগ। ইংরাজ জাতি অতিশয় স্বাধীনতাপ্রিয়, এইজন্য সাধারণ মতকে (Public opinion) ইহাঁরা বিশেষ মান্য করিয়া থাকেন। সমস্ত ভারতবাসী যদি একস্বর হইয়া ইংলণ্ডের নিকট কোন বিষয় প্রার্থনা করিতে পারেন, ইংলণ্ড সে প্রার্থনা কখনই অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। ইংলণ্ডের এ ঔদার্য্য ও এ মহত্ত্ব আছে। সমস্ত ভারতবাসীর একস্বর হইতে হইলে তাঁহাদিগকে অগ্রে একত্র মিলিত হইতে হইবে। বিংশতি কোটী ভারতবাসী যদি বৎসরে অন্ততঃ একদিনও জাতি, ধর্ম্ম, সমাজের পার্থক্য ভুলিয়া ভ্রাতৃভাবে একত্র মিলিত হইতে পারেন, তাহা হইলে জানিতে পারিব যে ভারতের সৌভাগ্য-সূর্য্য উদিত হওয়ার আর বিলম্ব নাই। ভারতের সমস্ত অধিবাসী বৎসরে অন্ততঃ একদিনও একত্র মিলিত হইতে পারেন, এমন একটী উপলক্ষ চাই, এমন একটী স্থান চাই। আমরা মেলার অধ্যক্ষদিগের নিকট করযোড়ে এই ভিক্ষা চাই, তাঁহারা যেন এই মেলাকে কোন সঙ্কীর্ণ ভিত্তির উপর সংস্থাপন না করেন। আমাদিগের ভিক্ষা তাঁহারা যেন এই মেলাকে এখন হইতে হিন্দুমেলা নাম না দিয়া ভারত-মেলা নাম দেন। যেন ইহা এখন হইতে ভারতবাসী মাত্রেরই উৎসব-স্থল হয়। হিন্দু ভিন্ন অন্য কোন জাতি ইহাতে যোগ না দেন—আমরা কাঁদিব। কিন্তু আমরা ভারতবর্ষীয় কোন ভ্রাতার বিরুদ্ধে ইহার দ্বার অবরুদ্ধ রাখিব না। আমরা সকলকেই ইহার অভ্যন্তরে আহ্বান করিব। আমরা কোনক্রমেই দলাদলির ভিতর যাইব না। দলাদলি ও গৃহবিচ্ছেদ ভারতের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। যে দলাদলি ও গৃহবিচ্ছেদ আমাদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে, আমরা আর তাহার শরণাপন্ন হইব না।

ভারতবাসী! হৃদয়ের প্রিয়তম বস্তু!—আসুন আমরা এই প্রস্তাবিত প্রকাণ্ড ভারতবর্ষীয় মেলায় একত্র মিলিত হইয়া একতানে সমস্বরে একবার ইংলণ্ডের নিকট আমাদিগের অপহৃত স্বত্ব যাচ্ঞা করি। ইংলণ্ড সমস্ত ভারতবাসীর মিলিত ক্রন্দনে কখনই উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। কিন্তু ইংলণ্ডকে স্বার্থত্যাগ করিতে অনুরোধ করার পূর্ব্বে আমাদিগকে দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতে হইবে যে আমরা স্বদেশবাসীর জন্য—প্রিয়তম ভ্রাতার জন্য—আত্মত্যাগ করিতে সমর্থ। আমাদিগের নিজের নৈতিক উৎকর্ষ দেখাইয়া আমরা ইংরাজদিগের নিকট নৈতিক উৎকর্ষ ভিক্ষা করিব। ভারতবাসী ধনিক-বৃন্দ! আপনাদিগের নিকটে করযোড়ে আমরা এই ভিক্ষা করিতেছি যে সাধারণের উপকারার্থ আপনারা প্রত্যেকে

এই জাতীয় সভায় অপনাদিগের বিপুল আয়েরকিয়দংশ অর্পণ করুন। যদি ভারতকে আবার একটী জাতি করিতে চাহেন, তবে, কিয়ৎ পরিমাণে স্বার্থবিহীন হউন, কিয়ৎ পরিমাণে আপনাদিগের বিলাসিতা ভুলিয়া যাউন। স্বার্থপরতা ও বিলাসিতায় কখন জাতীয়-উদ্ধার সাধন হইতে পারে না। যখন অসংখ্য ভ্রাতা অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিতেছেন, তখন আপনারা কোন্ প্রাণে আত্মসুখে নিমগ্ন থাকিবেন? এ সুখের সময় নয়! জাতীয় মৃত্যু সন্নিকট! এসময়ে শেষ চেষ্টা করুন, নতুবা আর কিছু দিন পরে সমস্ত চেষ্টা বিফল হইবে। মৃতদেহে ঔষধ প্রয়োগের ন্যায় তখন ইহা নিতান্ত উপহাসাস্পদ হইবে। আপনাদিগের আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া, ইংরেজদিগকে স্বার্থত্যাগ করিতে শিক্ষা দিউন। দেখিবেন সেই দৃষ্টান্তের বলে ইংরাজদিগের পাষণহৃদয়ও বিচলিত হইবে!

মেহের আলি।

ষোড়শ অধ্যায়।

ফজর আলির গৃহে ফজর আলি শয্যায় শায়িত আছে এবং আমীর জান তাহার পার্শ্বে বসে আছেন। আমীর জানের বিমর্ষ বদন, কিন্তু তাহাতে অপ্রিয় ভাব প্রকাশ পায়। কোন বিরক্তি জন্য নহে, দৈব দুর্ঘটনা জন্য সেই বিমর্ষতা। রাত্রি প্রায় ভোর হইয়াছে, এখনও আমীর জান বসে ও ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে। আমীর জান প্রদীপ নিকটে আনিল এবং ফজর বদন বিবস্ত্র করিল। অমনি ফজরের নাসিকায় এক জঘন্য ক্ষত প্রকাশ পাইল। নাসিকাগ্রভাগ একেবারে নাই, এবং মুখটী ভয়ঙ্কর কদাকার হইয়াছে। পার্শ্বস্থ কাঁচের বাটী হইতে আমীর জান আস্তে আস্তে ঔষধ লেপন করিল এবং রোগী এক একবার লাগে লাগে করিতে লাগিল। আমীর সস্নেহ বচনে সান্ত্বনা করিয়া এবং বদনের অক্ষত অংশ কোমল অঙ্গুলি দ্বারা সেবা করিয়া রোগীকে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ করিল।

ফজর আমীরের স্কন্ধে হস্ত দিয়া গদগদ বচনে কহিল; "প্রিয়ে, তোমার জন্য এ যাত্রা বাঁচিলাম। তোমার সেবা শুশ্রূষা নাপাইলে এ রোগ আরাম হইত না। আর তোমায় ভুলিব না। যাহা বলিবে করিব। তোমার কথা অবহেলা ক'রে আমার এত দুঃখ"। আমীর জান দুই এক বার স্মিত বদনে প্রশ্রোন্মুখী হইয়া নীরব হইলেন।

পরে কহিলেন "একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব ঠিক্ বলিবে ?"

ফজর। বলিবনা ? কি বল না।

আমীর। নাকটী ঘুচুলে কেমন করে?

ফজর। "কেন ? পড়ে গিয়া নাক থেঁতো হয়েছে জান না" বলে একটু মৃদু হাসিল। আমীর কহিলেন: "প্রবঞ্চনা আবার কেন ? পড়ে গেলে ত নাকের আগাটা গেল কোথায় ? আর কোথায় বা পড়ে গেলে, আর পড়িলেই বা কেন ? রাত্রিতে কুস্থানে গেলেই পড়িতে হয় !"

ফজর। আমায় অবিশ্বাস কর ?

আমীর। বিশ্বাস করিতে পারি—সত্য কহিলে। ঢাক কার কাছে ? নটেরদের মেজবৌ তোমার নাক কাটিবার গুরু নয় ?

ফজর। তাই, তাই।

আমীর। তাই আবার কি ? এখন-ও মানিবে না।

ফজর। তোমার কাছে আর গোপন করিব না। ওদের মেজবৌ ছুঁড়ি বড় দুষ্ট। আমাকে ইঙ্গীতে ডাকিল, তাহাদের ঢেঁকিশালে রাত্রি দুপুরে থাকিতে বলিল,—আমি গেলাম,—আর তাহার স্বামীরা সাত ভাইয়ে আমার নাক কাটিয়া দিল !

আমীর মনে মনে কহিল "পাপের উচিত ফল হয়েছে।" প্রকাশ্যে কহিল, গৃহস্থ কুলবধূর প্রতি টাঁক করাও দোষ, এবং সেও পর পুরুষকে ডেকে লয়ে মার খাওয়াইয়া ভাল করে নাই।—আচ্ছা কি লোভেতে মেজবৌ পানে নজর পড়িল; মেহেরন্নিসা—রূপের চাঁদে লোভ করে, শেষে এক কাল শূকরীর ঘাড়ে দোচোট খেলে ! এবুদ্ধি কেন হয় বুঝিতে পারিনা।

কেন হয় ? ফজরও জানে না। রূপের লোভে প্রথম মেহেরন্নিসার প্রতি লোভ হয়। কল্পনায়, পরে কার্য্যে সে প্রবৃত্তি পরিচালিত হয়। প্রার্থনীয় রমণীতে নূতনতা, যৌবন ও সৌন্দর্য্য ছিল। তদভাবে ফজর, যুবতী এক নব রমণীর প্রতি আসক্ত হয়। অবশেষে সে সৌন্দর্য্য ও যৌবনের মান গেল; কেবল নূতনতারই আদর। নয়ত কাল ভুতিনী পাঁচছেলের মা, মেজবৌ আর ফজরকে ফাঁদে ফেলিতে পারিতনা। যাহা হউক ফজর বিলক্ষণ শাস্তি পেয়েছেন। আজ একমাস শয্যাগত। আমীর জান নিতান্ত শ্রদ্ধার সহিত স্বামী সেবা করিতেন; ক্ষতস্থলের দুর্গন্ধে কেহ ঘরে যাইতে পারে না, আমীর জান দিবা নিশি তাহার শুশ্রূষায় আছেন। পতি মন্দ হইলে সতী মন্দ হয় না। আমীর জানের ঐ প্রশ্নের উত্তর ফজর দিতে পারিত না এবং তৎকালে আবজানি আসায় সে দায় হইতে-ও ফজর মুক্ত হইল।

আমীর। কিরে আবজানি ? মুখটা যে তলোমত ? কাঁদ্‌ছিস না কি ?

আবজানি। কাঁদিবনা ? আহাঃ-কর্ত্তার দশাদেখে——আবজানি অবিশ্রান্ত ভেউ ভেউ করে কাঁদিল।

আমীর। বল্ বল্ কি হয়েছে, বাবার কোন ব্যারাম হয়েছে ?

আবজানি। ব্যারাম হলেত আরাম হয়; তারও বাড়া।

আমীর। বাবাত প্রাণে বেঁচে আছেন? ওরে আমার বুক ধড়ফড় করছে! বল্ কি হয়েছে।

আবজানি। এমন পরাণ থাকার চেয়ে যাওয়া ভাল ছিল!

আমীর। কি হয়েছে বল্‌বিনা, চল্ দেখে আসি।

আবজানি। আর দেখে কেবল কাঁদবে বৈত নয়, তার চেয়ে না দেখা ভাল।

আমীর। মর পোড়ার মুখী, দগ্ধে মারিস কেন? বল না কি হয়েছে?

আবজানি। হ্যাঁগা আমার উপর রাগ কর্‌লে কি হবে? আমি কি সে কাণ্ড বেধিয়েছি?

আমীর। তুই ছুঁড়ী বলেই ফেল্ না, কি হয়েছে।

আবজানি। তুমি দিদি ঠাকরুণ, যদি দেখ্‌তে, অমন বল্‌তে না, সে কথা কি বলা যায়।

আমীর। দূরহ হতভাগী! তবে বল্‌তে এলি কেন?

আবজানি। হ্যাঁগা, আমাকে পেট্-য়েছে তাই এসেছি, আমায় গাল্ দাও কেন গা?

আমীর। ওরে, তুই এসেছিস বলে কি বলছি; তুই ভালই করেছিস্। কথাটা কি বলে প্রাণটা রাখ্—আমার প্রাণ যে গেল।

আবজানি। ও বাবা, না শুনেই প্রাণ গেল, তা শুন্‌লে কি হবে! তুমি নেয়ে খেয়ে ঠাণ্ডা হও তার পর বল্‌ব এখন। এখন যাই?

আমীরজান আর সহ্য করিতে না পারিয়া উঠিয়া আবজানিকে ধাক্কা দিয়া বলিলেন, "যা মাগি যা আমি নিজে গিয়া সংবাদ জান্‌ছি।"

আবজানি কাঁদ কাঁদ হইয়া কহিল, "আমাকে অমন করে তাড়াও কেন? ভাল মন্দ খবর টা বল্‌তে আসব না!"

আমীর। হাজার বার আসবি লক্ষ্মী ধন আমার বল্ না বাবার কি হয়েছে! তোকে একটা টাকা দিব।

আবজানি একটু ফিক্ করে হেসে বলিল, তোমাদেরইত খাচ্চি; এই মন্দ খবর দিতে কি বকশিস্ লইব?

আমীর। তবে বল।

আবজানি। এই দাদা ঠাকুরের যেমন হয়েছে কর্ত্তারও ঐ রকম একটা হলো।

আমীর। বাবার নাক গেছে কি? পড়ে গেছেন কি?

আবজানি। নাকই কি সকলের যায়, আর কি কিছু যেতে নাই?

আমীর। কি হয়েছে?

আবজানি রাগ করে বলিল। 'কি হয়েছে? কি হয়েছে, একশবারই ঐ কথা; কি আবার হবে? তোমার বাবার চক্ষু দুটি জন্মের মত গেলে দেছে।

আমীর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "ওমা বলিস কিরে কে এ কর্ম্ম করলে?"

আবজানি। কাল্ সন্ধ্যাকালে এক জন কর্ত্তাকে ডেকে লয়ে গেল, আর খানিক পরে ও পাড়ার লোকে তাঁকে ধরাধরি করে আন্‌লে। আহা দুই চোখ দে রক্ত ঝুজ্‌রেঁ পড়্‌ছিল। আমীরজান কাঁদিতে লাগিল ও আবজানি ঐ অবসরে চলে গেল।

কয়েক দিবস পরে ফজর আলি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে ঐ গৃহে তাকিয়া ঠেস্ দিয়া বসিয়া আছে। আমীরজান তাহাকে বাতাস দিতেছে ও গল্প করিতেছে। পতিব্রতার গুণ এক। অমন যে দুশ্চরিত্র স্বামী তাহাকেও দেবতার ন্যায় আমীরজান সেবা করিতেছে। ফজর আলিও বুঝিয়াছে পতিব্রতা স্ত্রী কি সুখের বস্তু। ফজর আলির ক্ষত অংশে কীট পর্য্যন্ত হয়েছিল, ক্রমে আরাম হয়ে এসেছে। এখন ঘা টা শুকনো শুকনো হয়েছে।

ফজর সহাস্য বদনে আমীরজানকে কহিলেন, "আমীর তোমায় আমি সব বলেছি কোন কথা গোপন করি নাই। তুমি একটি কথা আমায় বলবে?"

আমীর। বলবনা কেন?

ফজর। মেহেরন্নিসা হরণ কালে কে পালকী করে আমার বাটিতে এসেছিল শুনেছি, কে এসেছিল?

আমীর। বিশ্বাস কর ত সব বলি।

ফজর। বল, সত্য হইলে বিশ্বাস করিবনা কেন?

আমীর। সত্যই বলিব।

ফজর। বল।

আমীর জান আদ্যোপান্ত সব বিবরণ বলিলেন। ফজর কিঞ্চিৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন "এ কথা আগে বল নাই কেন? বাকুরের এত বড় আস্পর্দ্ধা।" আমীর কহিলেন, বাকুরে অপরাধ মার্জ্জনা জন্য ধরে ছিল। আর পাছে ফজর আলি ও মোল্লার উলটা ভাবেন এজন্য বলেন নাই।

ফজর আলি রহস্যভাবে কহিলেন, "আমার যেন দশজনে কুহক করে নাক কেটেছে। তোমায় যে একা বাকর আলি উলঙ্গ করিল ও ধর্ম্মনষ্ট করিত তাতে কি দোষ হয় না।"

আমীর কহিল, "আমার কি দোষ ভাগ্যে সতীত্ব রক্ষা হয়েছে; ধর্ম্ম সতীত্ব রক্ষা করেন। তবে কিনা বাকুরের ভয়ানক অপরাধ! ক্রমে তোমার মন বুঝে সে কথা বলিতাম।"

ফজর। আগে বলা উচিত ছিল। কার এত বড় বিশ্বাস তোমার কথা সত্য মনে করবে? তোমার উপর যদি বাকুরে বল করিত; অবশ্য তুমি বলিতে। এরূপ অপরাধীকে ক্ষমা করায় কি বুঝায়? লোকের এরূপ ঔদার্য্য কি সতীত্বের লক্ষণ? ছি! ছি! ধিক্! কুলবধূ বনমধ্যেও অসচ্চরিত্র পুরুষের কাছে! আমার কপাল, এ অপমানও সহিতে হইল!

ফজর আলি আরক্তলোচনে, আপন মস্তকে করাঘাত করিলেন। পরে রুক্ষস্বরে কহিলেন, "পাপীয়সি! তুই পরের

সতীত্ব রক্ষাকরে বেড়াস্—স্বামীর চরিত্রে ছিদ্র অন্বেষণ করিস্, আর নিজের এই সব কাণ্ড!”

আমীরজান কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন পরমেশ্বর জানেন পরোপকার ভিন্ন আর কোন অভিপ্রায় ছিল কিনা। আর এই জন্যই তিনি ও কথা উত্থাপন করেন নাই। যাহার চরিত্র মন্দ সে সকলকে মন্দ ভাবে। ফজর কহিলেন “যা দুষ্টা, আর ছলনা করতে হবে না তোকে চিনেছি; অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ। থাক্ হারাম্জাদি, তোর শাস্তি পরে দিব; আগে বাকুরের মাথা থাই।” ফজর তৎক্ষণাৎ চলে গেলেন।

তখন বৈকাল বেলা। সেই রজনী প্রহরেক গতে বাকর আলিও ফজর আলি পূর্ব্বকথিত গোলাম নবীর কবরস্থানে উপনীত হইল। সন্ধ্যাকালে আবজানির কাছে সকল কথা ফজর আলি শুনে, আমীরজানের উপপতি বনে আছে এবং বাকর আলিও তাহাকে তথায় পেয়ে অহিতাচার করিতে উদ্যত হয়েছিল বুঝিলেন। ইহাতেই বাকরকে সঙ্গে করে কবর স্থানে ফজর আলি আসিলেন। কবরের মৃত্তিকা হস্তে বাকরকে কহিলেন, “নরাধম! তোর সঙ্গে যে মিত্রতা ছিল তাহা ভঙ্গ করিবার জন্য এখানে এসেছি। এই মৃত্তিকা ফেলে ফের শপথ করিতেছি আমি তোর পরম শত্রু হইলাম।” বাকর অবাক হইয়া কহিল “বলেন কি? আমার অপরাধ?”

ফজর। অপরাধ! যার পর নাই। তুই আমার স্ত্রীর ধর্ম্ম নাশে উদ্যত হয়েছিলি।

এই কথায় বাকর ভয় পেয়ে পলাইত, কিন্তু ফজর দৃঢ় মুষ্টিতে তাহার হস্ত ধারণ করে রেখেছিলেন। নিরুপায় হয়ে বাকর কহিল “এমন কথা কে বলিল? একি বিশ্বাসের কথা?”

ফজর। কে বলিল? ঝব্ঝব্যার দোকানী, আবজানি ও আমীর জান নিজে। বিশ্বাস?—অবিশ্বাস কিসে?

বাকর। কুলবধূ কি বনে যায়? তাহা অবিশ্বাস্য কথা।

ফজর। কুলবধূ কি কুলটা তোর থবরে কাজকি, তুই কি সাহসে এ কাজ করিলি?

বাকর। কেন আমার দোষ দেন, আমি কিছুই জানি না।

ফজর। আচ্ছা মেহেরন্নিসাকে তুই বলাৎকার করিতে গিয়াছিলি?

বাকর। হাঁ বনের একটা মেয়ে জানিতাম, পরে শুনিলাম মেহেরন্নিসা।

ফজর। সেই সময় আর একটী স্ত্রীলোক উপস্থিত হয়েছিল?

বাকর। হাঁ, সে কে একটা কুলটা।

ফজর। সে কি বলে পরিচয় দেয়?

বাকর। তোমার স্ত্রী বলে, কিন্তু তাহা বিশ্বাস করি নাই এখনও করিনা।

ফজর। আচ্ছা আবজানি সঙ্গে ছিল?

বাকর। কৈ না! তা হলে কি চিনিতাম না?

ফজর। আবজানি কেঁদে ঝবঝব্যায় আসে এ কথার প্রমাণ আছে; আবার মগেবদেব মেয়ে যে তথায় যায় তুই অবশ্য জানিস। (বাকর নীরব।)

ফজর। আচ্ছা সেই স্ত্রীলোককেও তুই বিবস্ত্র করেছিলি কি না?

বাকর। সে কোন মতে যায় না, তার নাগ বুঝে কবেছি।

ফজর। সে কিজন্য এসেছিল? কি বলেছিল?

বাকর। প্রথম স্ত্রীলোককে মুক্ত করিতে এসেছিল ও আমায় গালি দিয়াছিল।

ফজর। তবে যে বলিলি তার মন্দ অভিপ্রায় ছিল।

বাকর। নীরব।

ফজর। আচ্ছা সেই স্ত্রীলোককে উদ্ধার করে কিনা?

বাকর। হাঁ।

ফজর। একটিকে লয়ে যায়, একটিকে পালকী করে গাঁএর ভিতর পাঠায় কিনা।

বাকর। শুনেছি একটা পালকী আসে।

ফজর। পাল্কী আমার বাটিতে আসে কি না?

বাকর। জানি না।

ফজর। জানিস না? আমীরজানের কাছে তুই ক্ষমা চেয়ে ছিলি ও একথা গোপন করিতে বলেছিলি, জানিস না?

বাকর। নীরব।

ফজর কহিল, "হয়েছে তোর দোষ সপ্রমাণ, মেহেরন্নিসাও আমার স্ত্রী বলিয়া পরিচিতা, তাহাকেও তুই ছাড়িস নাই। আমীরজানকে—আমার স্ত্রী, কর্ত্তার কন্যা—দেখেও তোর মর্য্যাদা বোধ হলো না। পাজী, আপন কর্ম্মের ফল ভোগ কর্।"

গ্রীক এবং হিন্দু।

ফলদ্বয় একই বৃক্ষে উৎপন্ন হইয়া বিভিন্ন গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাতে দোষ কাহার?—ফলের দোষ কি? কার্য্য কারণ সংযোগে যাহা ঘটিবার, তাহাদের ভাগ্যে তাহাই ঘটিল। অতএব নিয়তি প্রবলা। কৃত আয়োজনের উপার্জ্জিত ফলের নাম নিয়তি। ইহার অন্যতর আখ্যা ভাগ্য। নিয়তি আয়ত্তাতীত দোষগুণ-বিহীন, পরিচ্ছিন্ন নিত্য স্ব-স্বভাবে প্রভাবশী। যৎ কর্ত্তৃক যে ভাবে অর্চ্চিত হয়েন, তাহার নিকট সেইরূপ ভাবে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। অতএব উপস্থিত শুভাশুভের কারণ অর্চ্চনা-প্রণালী, নিয়তি নহেন। বৃক্ষস্থ ফল—জড়

বস্তু, সে অর্চ্চনার উপর স্বেচ্ছাবিহীন, সুতরাং অপরের ইচ্ছায় চালিত। কিন্তু মনুষ্য অজড় জ্ঞানময়, তাহারা স্বয়ং না অন্যের ইচ্ছা দ্বারা চালিত হইয়া থাকে?

—বাইবেল শাস্ত্রানুসারে মনুষ্য স্বেচ্ছাময়, শুভাশুভ যাহা কিছু, তাহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া থাকে, আমাদিগের সত্ত্ব-প্রধান ধর্ম্ম শাস্ত্র শ্রুতি অনুসারে কর্ম্মসূত্র মানবীয় ইচ্ছার পরিচালক, কিন্তু এ কর্ম্ম-সূত্রের মূল ভাগে স্বাধীন ইচ্ছা প্রবলা, অতএব উভয় মতেই বলিতে হইবে যে মনুষ্য যথেচ্ছ নিয়তির অর্চ্চনা করিয়া যথা সম্ভব ফল লাভ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু জগৎ সৃষ্টির দিন হইতে দিনেকের তরেও ত ইচ্ছাবশে অদৃষ্ট-পূর্ব্ব ফল লাভে সে সামর্থ্য দেখিলাম না, তবে কি এ স্বেচ্ছা আকাশ-কুসুম, কল্পনা মাত্র? শ্রুতির মতে যে কর্ম্ম সূত্রের মূল স্বাধীন ইচ্ছা, সাংখ্যকারের মতে তাহার "মূলে মূলা ভাবাৎ অমূলং মূলম।" এ কথা নিতান্ত মন্দ নহে, ফলতঃ এজগতে স্বেচ্ছার অস্তিত্ব থাকিলেও তাহা অন্ধ, স্বয়ং কর্ম্ম-ক্ষম নহে; কর্ম্ম-সূত্র প্রবলা, এবং আপাত দৃষ্ট স্বেচ্ছা কর্ম্মসূত্র রূপ কারণের কার্য্য মাত্র। যে কর্ম্ম সূত্র বশে জড়বস্তু ফল চালিত হইয়া থাকে, অজড়বস্তু জ্ঞানময় মনুষ্যও তাহার দ্বারা পরিচালিত হয়—জড় অজড় সকলেই কর্ম্ম-সূত্র বশে দৃষ্ট বা অদৃষ্টপূর্ব্ব নিয়তির অর্চ্চনা করিয়া দৃষ্ট বা অদৃষ্টপূর্ব্ব যথা সম্ভব ফল লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু এ কর্ম্মসূত্র কি?

—আপাততঃ এই পর্য্যন্ত বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে নিয়ন্তা হইতে প্রাপ্ত শক্তি প্রকৃতি হইতে যদৃচ্ছা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন এবং প্রাকৃতিক ক্রিয়া। স্বর্গে নক্ষত্র-মণ্ডল, মর্ত্ত্যে পার্থিব-বস্তু-নিকর, এক কথায় এই বিশ্বস্থিত পরমাণুটি পর্য্যন্ত সেই মোহ মন্ত্রে পরিচালিত।

হিন্দু এবং গ্রীক জাতির অবস্থাগত বৈষম্যও এই কর্ম্মসূত্র বশে উদ্ভূত। আদিতে আমি এবং একজন গ্রীক্ পৃথক্ ছিলাম না। আমার এবং একজন গ্রীকের জন্মভূমি স্বতন্ত্র নহে, বাইবেল-ভূমিও নহে। পিতা মাতা স্বতন্ত্র বা আদম্ ও ইবও নহে। কুলপতি স্বতন্ত্র বা মূসা নহে। রাজা স্বতন্ত্র বা দাউদ নহে। আমাদিগের উভয়েরই জন্ম স্থান সেই

"সপ্তর্ষীণাং স্থিতি র্যত্র যত্র মন্দাকিনী নদী।
দেবর্ষিচরিতং রম্যং যত্র চৈত্ররথং বনং ॥"

এবম্ভূত সর্ব্বসুখপ্রদ স্বর্গসম উত্তর কুরুবর্ষ। মূর্ত্তিমান সৌম্য রূপে যথায় সপ্তঋষি বাস করিতেছেন, যথায় সুধাস্রাবী কলনাদিনী মন্দাকিনী নদী প্রবাহিত হইতেছেন, যে স্থান দেবর্ষিচরিতে পরিকীর্ত্তিত, এবং যথায় চৈত্ররথ কানন দেবগন্ধর্ব্ব-বিলাস যোগ্য প্রাকৃতিক মাধুর্য্য পূর্ণ ভাবে বিস্তার করিতেছে, সেই স্বর্গসম উত্তর কুরুবর্ষ আমাদের জন্মস্থান। আমাদের পিতা বিধাতার মানসপুত্র স্বায়ম্ভুব এবং মাতা বিধাতৃ-দুহিতা শতরূপা। কুলপতি সপ্তঋষি, অদ্যাপি যাঁহারা জ্যোতির্ম্ময় গগণে জ্যোতিঃ বিস্তার

করিতেছেন। রাজ্যেশ্বর প্রিয়ব্রত, সকাননা সাগরাম্বরা সসপ্তদ্বীপা পৃথিবীর উপর তাঁহার আধিপত্য। মধুস্রাবী একই ভাষা, যুগ যুগান্ত গত হইয়াছে, কত সহস্র সহস্র পরিবর্তন গত হইয়াছে, তথাপি আজি পর্য্যন্ত ভাবান্বয়ে শাব্দিক একতা তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। এইরূপে এক স্থানে, এক পিতৃ-দেবতার বশবর্ত্তিতায়, এক দেবতা-পূজক হইয়া, গ্রীক এবং হিন্দুগণ এক জাতি থাকিয়া, একই ভাবে ও একই বৃত্তিশালী হইয়া, আহার বিহার বিলাস বিস্তার করিয়া কাল যাপন করিতেন। ভিন্নতার নাম মাত্রও পরিজ্ঞাত ছিল না। কোন সংযোগই চিরদিনের নহে, পিতা পুত্রে পৃথক্ হইয়া থাকে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় পৃথক্ হইয়া থাকে, সুতরাং এ সংযোগও চিরদিনের হইবার নয়। কালবশে ইহাদেরও সম্মিলন ভাঙ্গিল, অভাব বৃদ্ধি হইল, স্বস্থান প্রচুর বোধ হইল না, অথবা যে কোন কারণের উপস্থিতিতেই হউক, আবশ্যক বোধে, পার্থক্য অবলম্বন পূর্ব্বক ইহারা সুখ লালসায় স্বস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক যদৃচ্ছা অভিগমনে প্রবৃত্ত হইল। হিন্দুগণ অপেক্ষাকৃত অল্প ভ্রমণেই হলস্কন্ধে, হস্তে ধনুর্ব্বাণ, বিশাল হিমাদ্রি-চূড়া লঙ্ঘন করিয়া, পঞ্চনদের তটে অবতীর্ণ হইলেন। অন্যদিকে গ্রীকগণ বহুতর নদ নদী পর্ব্বত বনদেশ অতিক্রম করিয়া, বহুরক্তপাতে, বহুকষ্টে ও বহু শ্রমে, বহুদূর ভ্রমণান্তে, সমুদ্র তীরবর্ত্তী হেলাস ভূমে পদার্পণ করিলেন। স্ব স্ব উপনিবেশ স্থলে পদার্পণ মাত্রেই শান্তিলাভ উভয়ের মধ্যে কাহারই ভাগ্যে বিধাতা লিখেন নাই। উভয়েই উভয়দেশে পদার্পণ মাত্র দেখিলেন যে তত্তৎ স্থানের আদিম অধিবাসীগণ উভয়েরই নিকট প্রতিদ্বন্দ্বিভাবে দণ্ডায়মান।—ভারতে প্রতিদ্বন্দ্বি দৈত্যকুল, হেলাসে পিলাসগি। উভয়েই উভয়কে দমন করিয়া এবং দাসত্ব পদে আনিয়া আপনাপন প্রভুত্ব স্থাপনের সূত্রপাত করিলেন। বিভিন্ন ঘটনা ও অবস্থাসঙ্কুল পথাতিক্রমের বিভিন্নতা পরিত্যাগ করিলে, উভয়জাতির মধ্যে ছাড়াছাড়ি হইয়া দূরান্তরে পতিত হইলেও, বৃত্তির এখনও একতা রক্ষিত হইল দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু এ একতা আর বেশি ক্ষণ থাকে না।

হিন্দু এবং গ্রীক এতদুভয় জাতি যৎকালে স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ব স্ব অধিকৃত দেশদ্বয়ে পদার্পণ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে, সেই স্মৃতি-বহির্ভূত সময়ে, সমস্ত জগৎ ঘোর মূর্খতা অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। মানব সমস্ত পাশবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বনে বনে, গিরিগহ্বরে, সমুদ্রবেলায় ক্ষুব্ধচিত্তে আহার লালসায় যদৃচ্ছা বিচরণ করিয়া বেড়াইত। মিসর এবং ফিনিসীয় সভ্যতার স্তিমিতালোক তখনও প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না। যদি হইয়া থাকে, তবে তাহা বোধহয় তৎ তৎ দেশমধ্যে আবদ্ধ এবং দেশবহির্ভাগের যে কোন

বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কবিরহিত ছিল। সুতরাং হিন্দু এবং গ্রীক্ উভয় জাতিই স্বীয় স্বীয় গন্তব্য পথের পরিচালক বন্ধু বা শত্রু স্বরূপ দ্বিতীয় কাহাকেও প্রাপ্ত হয়েন নাই।

মানবচিত্ত শৈশবে বিচার-বিহীন, বিকার বিহীন, দুগ্ধ-মথিত সদ্য নবনীতবৎ নির্ম্মল, কোমল, টল টল করিতেছে, পিপিলিকাটি পর্য্যন্ত তাহার উপর দিয়া চলিয়া গেলে, তাহাতে পায়ের দাগ বসিয়া থাকে। চক্ষু নবীন নবীন, পূর্ব্বদর্শন শূন্য, অকপট। যে যে ভাবে নয়ন-সমক্ষে উপস্থিত হইতেছে, চিত্ত তাহাকে বিনা বাক্যব্যয়ে অবিকল সেই ভাবে গ্রহণ করিতেছে। এ সময়ে যে কোন বস্তু, ইচ্ছা করিলেই সেই নেত্র এবং চিত্ত-সমক্ষে রোষ তোষ ভয় বিস্ময় মোহ প্রভৃতি যাহা ইচ্ছা তাহাই অনায়াসে উৎপাদনে সমর্থ হয়। এসময়ে প্রবলতা সহকারে যে যে ভাবে এই চিত্তকে আকর্ষণ করিবে, উহা যথাদিষ্ট রূপে সেই ভাব আকর্ষিত হইয়া অনুরূপ ভাবে শিক্ষিত হইবে। গ্রীকজাতি এবং হিন্দুরা উভয়েই সেই প্রাচীনকালে যদি ও ব্যক্তিগত বলবীর্য্য সাহস ও বীর-দর্প প্রভৃতি মনুষ্যোচিত গুণে পরিপূরিত ছিল, কিন্তু তাহা মানবীয় গুণ গণনায় অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীতে অবস্থান করে। যে গুণের উৎকর্ষে মনুষত্ব বোধ হয়, যে জ্ঞানের প্রাচুর্য্যে মনুষ্যত্ব প্রকাশ ও দীপ্তিমান হইয়া থাকে, এমন রূপ গুণ ও জ্ঞানের আধার স্বরূপ মানবীয় জ্ঞান-জীবনের তাহাদের এই শৈশবকাল। চিত্ত অনুরূপ শৈশবোচিত। এসময়ের দর্শনস্থলীয়—একমাত্র জড় জগতের ভৌতিক ব্যাপার। ফলতঃ বাহ্য জগৎ এ সময়ে যে ভাবে যে মূর্ত্তিতে চিত্ত আকর্ষণ করিবেক, উহা সেইভাবে আকর্ষিত এবং তাহাতে পূর্ণ ও শিক্ষিত হইবে। এই শিক্ষা বর্ত্তমান এবং প্রায় ভাবী জীবন প্রবাহেরও পরিচালক হইয়া থাকে, বহু যত্নেও তাহার মোহ পরিত্যাগ করিতে কদাচিৎ সমর্থ হয়।

কিন্তু এস্থলে এক কথা বলা কর্ত্তব্য। উপরে যে মত প্রকাশিত হইল তদ্দ্বারা যেন এরূপ বিবেচিত না হয় যে এক মাত্র বাহ্য-জগতই মানবজীবনের গতিচাতুর্য্য সুস-ম্পাদন পক্ষে বলবতী, অথবা মানব প্র-কৃতি আত্ম স্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাহ্য-জগতেই লীন হইযাছে। এস্থলে একটি বিষয় পরিষ্কার করিয়া বলা কর্ত্তব্য। আমরা এপ্রবন্ধারম্ভ হইতে কোথাও প্রকৃতি, কোথাও বাহ্যজগৎ কোথাও বা মনুষ্যপ্রকৃতি এবম্ভূত শব্দ ব্যবহার করিয়াছি, কিন্তু এই প্রত্যেক শব্দ কি কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে? প্রকৃতি অর্থে যাহার নির্ব্বাচন ও ক্রিয়াকলে কর্ম্মসূত্রের উৎপত্তি, এবং যে কর্ম্মসূত্রে এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যাহা কেবল নিয়ন্তার পরবর্ত্তী কিন্তু আর সকলের আদি, যাহা নিয়ন্তার আজ্ঞাবশে যথাবিহিত কর্ম্মসূত্র নির্ম্মাণে নিরত রহিয়াছে,

যাহা সর্ব্বব্যাপিনী এবং যাহার আদি অন্ত কেবল নিয়ন্তার সন্নিহিত তাহাই প্রকৃতি পদে বাচ্য। আর মনুষ্যে সন্নিহিত যে স্বভাব, তাহা মনুষ্য প্রকৃতি। তদ্ব্যতীত প্রকৃতিস্থ আর সমস্ত—বাহ্য জগৎ পদে বাচ্য। অতএব বাহ্যজগত এবং মানব প্রকৃতি উভয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ, কিন্তু প্রভেদ এই মানব-প্রকৃতি স্বাধীন নহে, বাহ্য জগতের সম্পূর্ণ অধীন, তাহার সহিত সংযোগ ব্যতীত কার্য্যকরণে সম্পূর্ণ অসমর্থ। অন্তর, মন, অহঙ্কার, প্রজ্ঞা, মেধা, মতি, মনীষা, জূতি, সমৃতি, ক্রতু, ইচ্ছা, ইত্যাদি বৃত্তি নিচয় মনুষ্য প্রকৃতির পৈতৃক সম্পত্তি, বাহ্যজগৎ হইতে প্রাপ্ত হয় নাই। চার্ব্বাক্ বা ডারবিনশিষ্যগণ বলিতে পারেন যে আদিমকাল হইতে চেতনাচেতন উভয়ের ক্রমান্বয় সংঘাতে উক্ত সমস্ত বৃত্তি উদ্ভাবিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। তাহা হইতে পারে কিন্তু সে মতে আমার আবশ্যক নাই, যাহা দেখিতে পাইতেছি এবং স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে তাহাই এস্থলে গ্রহীতব্য। যাহাহউক ঐ সকল বৃত্তি মনুষ্য প্রকৃতির আছে বটে, কিন্তু বাহ্যজগতের সংস্রব বিরহে ঐ সকল বৃত্তি অকার্য্যকর। উহারা শাণিত অস্ত্রস্বরূপ, কর্ত্তনযোগ্য দ্রব্য পাইলেই কার্য্যে লাগিল, এবং তাহাতে যত্ন পূর্ব্বক প্রয়োজিত হইলে হয়ত ধারেরও বৃদ্ধিহইল, কিন্তু যদি তাহা না পাইল, তবে অকার্য্যকর হইয়া অবয়বটি মাত্র লইয়া পড়িয়া থাকে, এবং হয়ত মরিচা পড়িয়া ধারের ধ্বংস হয়। বাহ্যজগতের সহ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে পর বৃত্তি লইয়া কি করিব? আমার স্মৃতি আছে, কিন্তু কি স্মরণ করিব, স্মরণীয় বস্তু কোথায়? আমার মনীষা আছে, কিন্তু কি লইয়া তাহা খাটাইব, বস্তুর অভাব। আমার অহঙ্কার জ্ঞান আছে, কিন্তু কাহার সহ পার্থক্য দর্শাইয়া এই বোধের ভাব সম্যক্ উপলব্ধি করিব, তুলনায় বস্তুর অভাব। এই সকল বৃত্তি নিয়োগ অনিয়োগ, উৎকর্ষ বা অপকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমরা সাধারণ মানবীয় কার্য্যেও ইহা নিত্য প্রত্যক্ষবৎ দেখিতেছি। ফলতঃ বৃত্তি সমস্ত যদি বাহ্যজগতের সহ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া এবম্ভূত অকার্য্যকর হইয়া উঠে, তাহা হইলে মানব প্রকৃতি অস্তিত্ব সত্বেও অস্তিত্ব বিহীনতাপেক্ষা অধম ভাব প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় অবাঞ্ছনীয় এবং হেয়তম হইয়া উঠে। কিন্তু সর্ব্বদর্শী নিয়ন্তার তাহা ইচ্ছা নহে।

অতএব মানব প্রকৃতি বাহ্যজগতের সংযোগ ভিন্ন কার্য্যকরণে সম্পূর্ণ রূপে অসমর্থ। আমরা যাহা করি, আমরা যাহা বলি বা আমরা যাহা ভাবি, সে সকলেরই ভাব আমরা অগ্রে বাহ্যজগত হইতে সংগ্রহ করিয়াছি, তদ্ব্যতীত সে সকল নিষ্পন্ন হইবার নহে। মানবচিত্তের সহ বাহ্যজগতের সংযোগ, প্রথমটি দ্বিতীয়টির বিভাসে বিভাসিত হওয়া মাত্র, যদ্রূপ কোন বর্ণ

বিশিষ্ট পুষ্প বা বস্তু বিশেষের সান্নিধ্যস্থিত স্ফটিক পাত্র তদ্রূপ বিভাসিত হইয়া থাকে। বাসন্ত প্রদোষে তমসাচ্ছন্ন নভোমণ্ডল দেখিয়া আমার মন সহসা তমসাচ্ছন্ন হইয়া ম্লানভাবে অভাবনীয় চিন্তামগ্ন হইল কেন? কোথায় আকাশের দূরপ্রান্তে মেঘমালা ঝুলিতেছে, আর কোথায় আমি এই দূর সংসার কান্তারে পড়িয়া রহিয়াছি, তথাপি কেন উহার দ্বারা আমার চিত্ত আকর্ষিত হইয়া তাহাতে ভাবান্তর উপস্থিত হইল, ঐ মেঘের সহ আমার মনের কি সম্বন্ধ বলিতে পার? কোকিলের কুহু রবে বিরহিণীর উত্তেজনা, পূর্ণচন্দ্র দর্শনে চিত্তের প্রফুল্লতা, নক্ষত্র খচিত নীল-চন্দ্রাতপ নভোস্থল দর্শনে মনোমধ্যে স্বীয় অসারত্ব জ্ঞান এবং স্রষ্টার গরিমা এবং দূরস্থ গীত বাদ্যধ্বনি শ্রবণে চিত্তের অস্থির প্রসন্নতা, নির্ঝরিণী-পরিশোভিত গিরিগুহামধ্যস্থ বাস্তাব ভাগ হইতে বহুবিধ বিহঙ্গরব মিশ্রিত প্রতিধ্বনিতে মনোমধ্যে জন্মান্তরীণ ভাবের উদয়, এ সকল কি কারণে হইয়া থাকে? ঊর্দ্ধে বিদ্যুৎ বজ্রাদি যুক্ত নিবিড় ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশ মণ্ডল, নিম্নে স্বচ্ছন্দ অন্ধকারময়ী রজনী, টিপ টিপ খদ্যোতমালা ঝলিতেছে, বিদ্যুৎ-ঝলসে অন্ধকার আরও বর্দ্ধিত হইতেছে, পতঙ্গের ঝিঁঝিঁ রব, জলের তর তর ধ্বনি, ভেকের কলরব, বায়ুর শন্ শন্ শব্দ, এবম্ভূত সময়ে চিত্ত কেন চমকিত, সঙ্কুচিত এবং ভীত হইয়া আত্মস্বভাব পরিত্যাগ করিয়া সেই সেই ভাবে লীন হইয়া থাকে? মানবচিত্ত, কোথায় সেই সেই পদার্থ, তথাপি কেন তাহাতে আকর্ষিত ও উত্তেজিত এবং ভাবান্তর-প্রাপ্ত হইয়া থাকে? এ চৌম্বকীয় গুণ ইহাদের মধ্যে কে সংযোজিত করিল? যাহার আজ্ঞায় ফুল ফুটিতেছে, ফল পাকিতেছে, নক্ষত্রমণ্ডল ঘুরিতেছে, পরমাণু উড়িতেছে, আমরা বুঝিতে পারি না পারি উহা সেই বিশ্বকর্ম্মার কার্য্য। অথবা যাহারই হউক, এবং আমরা তাহা বুঝিতে পারি না পারি কিন্তু ইহা নিশ্চয়, যে বাহ্য জগত ও মানব চিত্তের মধ্যে একটি চৌম্বকীয় আকর্ষণ অবস্থান করিতেছে, ইহা লুকাইবার নহে, হারাইবার নহে, ধ্বংস হইবার নহে। ক্ষুদ্র হইতে মহৎ সমস্ত বিষয়েই বাহ্যজগৎ মানবচিত্তকে আকর্ষিত করিয়া তাহার ভাবান্তর সাধন এবং আপন ভাবে ভাবযুক্ত করিতেছে। লৌহ চুম্বকের ন্যায় পরস্পর গাত্র সংলগ্ন হইতেছে না বটে, অথচ লৌহ চুম্বকের কার্য্যাপেক্ষাও গূঢ় ভাবে গুরুতর কার্য্য সমূহ, বাহ্যজগৎ দূরে এবং মানবচিত্ত অন্তরে থাকিলেও, এতদুভয়ের মধ্যে সুসম্পন্ন হইতেছে। এই জন্য বলিতেছি যে এতদুভয়ের সংযোগ একের বিভাসে অপরে বিভাসিত হওয়া মাত্র। এ সংযোগ তোমার আমার বারণ বা রূপান্তর করিবার ক্ষমতা নাই, কর্ম্মসূত্র বশে যদৃচ্ছা সংঘটিত হয়।

বাহ্যজগতের ভাব একরূপ নহে, বহুতর, অসংখ্য। ইহার মূর্ত্তি ভেদে ভাব ভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। মানবচিত্তের

সঙ্কীর্ণতা বশতঃ এককালে সেই সমস্ত ভাবে সংযোজিত হইতে গেলে তিল তিল হইয়া বিলীন হইয়া থাকে, পরন্তু একের বিস্তার, অপরের সঙ্কীর্ণতা বশতঃ তদ্রূপ সুসম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। এই নিমিত্ত একে একে তিল তিল করিয়া বাহ্যজগৎ মানব প্রকৃতিকে স্বস্বভাবের শ্রেণী বিশেষে আকর্ষণ করিয়া উহার অনুরূপ ভাবান্তর উপস্থিত করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত উহার যখন যে ভাব বিশেষে মানবচিত্ত সংযোজিত হয়, তখন তদ্বৎ কার্য্য প্রসব করিয়া থাকে। এই সংযোগ ও তাহার উত্তেজনা যে কত গূঢ়তম ও কত গূঢ়-ভাবে কার্য্য করিয়া থাকে, এবং এই সংযোগ ও উত্তেজনা যে কেবল চিত্তেই সমাবেশ বা তদতিরিক্ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধের ক্রিয়া গুলি মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হয় না তাহা কোন বিষয় হইতে-উৎপন্ন-আপন মনের ভাব হইতে যে সমস্ত ক্রিয়া গুলির প্রসন্নতা স্বতঃউৎপন্ন হয়, তাহাদের সম্বন্ধ মিলাইয়া দেখিলে জানিতে পারিবে। কোন বস্তু দৃষ্টে তোমার মন চকিতবৎ ভাবান্তর প্রাপ্ত হইল, সেই ভাবান্তর-প্রাপ্ত মনে তোমার যত গুলি কার্য্য করিতে ইচ্ছা জন্মিবে, জানিও যে সেই সমস্ত কার্য্য কলাপ, ও তাহাদের প্রসূতি স্বরূপ মানসিক ভাবান্তর বিশেষ উভয়েই এক জাতীয় পদার্থ। আবার যে বস্তু হইতে ভাবান্তরের উৎপত্তি, তাহাতে তাহাদের মূল নিহিত এবং এক গ্রন্থিতে এই ত্রিবিধ পদার্থই গ্রথিত প্রভেদ মাত্র এই যে কেহ উৎপন্ন, কেহ উৎপাদক। সেইরূপ আবার সময়ান্তরে অন্যরূপ ভাব বিশেষে সংযোজিত হইলে অন্যতর ফল প্রসবিত হয়। সান্নিধ্যস্থিত বস্তু বিশেষ হইতে স্ফটিক-পাত্র যে বর্ণ প্রাপ্ত হয়, আবার প্রতিকূল-বর্ণবিশিষ্ট পদার্থ সংযোগে যেমন সেই পূর্ব্ব প্রাপ্ত বর্ণের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে, তেমনি বাহ্য জগতের কোন এক ভাবের সহ সংযুক্ত মানব প্রকৃতি যদি অদৃষ্টপূর্ব্ব বা যে কোন প্রকারে আবার ভাব বিশেষ দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তৎ পরিমাণ অনুরূপ পূর্ব্বভাবের এবং তদুৎপন্ন কার্য্যের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। দৃষ্ট বা অদৃষ্টপূর্ব্ব এই প্রতিকূল সংযোগ বশে, আমরা জাতি বিশেষে যে স্বভাবের কার্য্য নিয়ত প্রত্যাশা করিয়া থাকি, মধ্যে মধ্যে তাহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। এখানে জাতীয় জীবন আলোচ্য বিষয় বলিয়াই, জাতি বিশেষের কার্য্যগত ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত স্থলে গৃহীত হইল। যিনি এই তত্ত্ব সম্যক্ অবগত এবং বাহ্যজগৎ ও মানব প্রকৃতির সহ সম্বন্ধ অবধারণ পূর্ব্বক প্রত্যেক কার্য্যে উভয়ের স্বাতন্ত্র্যতা এবং সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া এতৎ জাতীয় জীবনদ্বয় সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন, তিনিই তদ্বিষয়ে পটুতা লাভে কৃতকার্য্য, এবং মানব জীবন প্রবাহের অদ্ভুত কৌশল জ্ঞাত হইয়া অপার আনন্দ লাভে সমর্থ হইবেন।

বলিয়াছি যে জাতিদ্বয়ের জ্ঞান-জীব-

নের এই শৈশবকাল। চিত্ত তরল, কোন একটি বস্তু-সজ্ঘাতে সহসা বিপুল তরঙ্গাভিঘাত হয়। সুতরাং এসময়ে বাহ্যজগতের যে যে ভাবের সহিত সংযোগে আসিয়াছে, তাহাতেই তরঙ্গিত হইয়া অনুরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এই উভয় জাতি স্ব স্ব উপনিবেশিত দেশে পদার্পণ করিলে পর, বাহ্যজগৎ কাহার নিকট কিরূপ ভাবে প্রতীয়মান হইয়া প্রত্যেকের ভাবী জীবন প্রবাহ এবং তজ্জনিত শুভাশুভের কিরূপ ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা আপাততঃ প্রবোধার্থে অতি স্থূল স্থূল বিষয় লইয়া দেখা যাউক।

ভারতীয়েরা স্বপ্নপ্রাণ উত্তরকুরুবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া, সুখলালসায়, মনের সাহসে, অল্পশ্রমে, অনুরূপ স্বপ্নপ্রাণ নদী পর্ব্বত কানন প্রভৃতি লঙ্ঘন করিয়া, ভারতে উপনীত হইলেন। হয়ত এখানে উপনীত হওয়ার পূর্ব্বে তাঁহারা মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে যেখানে যাইতেছি, সেখানকার বাহ্যজগতও, আহার প্রচুর অথচ উত্তর কুরুর ন্যায় চিত্তের সামঞ্জস্য-সাধক হইবে। কিন্তু আশার কি বিপরীত ফল! তাঁহারা ভারতে পাদার্পণ মাত্র দেখিলেন যে ভারতীয় বাহ্যজগৎ অদ্ভুত-পূর্ব্বভাববিশিষ্ট। ভয় বাৎসল্যের এককালে যুগপৎ উৎপাদক। উত্তরে বিশাল হিমাদ্রি গিরি শতশৃঙ্গে ধবল মূর্ত্তি ধরিয়া, বিরাট দেহে গগণ ভেদ পূর্ব্বক নক্ষত্র মণ্ডল স্পর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। পার্শ্বে সপ্তসিন্ধু বায়ু-বিক্ষোভিত সাগর তরঙ্গ অনুকরণ করিয়া বেগভরে প্রবাহিত হইতেছে। দক্ষিণে সমুদ্র গ্রীষ্ম-মণ্ডল-স্বভাবজাত ভীমমূর্ত্তিধর। স্থলে নয়ন পথ অতিক্রম করিয়া নিবিড় বনভূমি, উন্নতশির বৃক্ষাবলি গগণ স্পর্শ করিতে উদ্যত হইয়াছে। ভীষণ-স্বভাব শ্বাপদ-কুল রব তুলিয়া বনভূমি আলোড়িত ও দিগ্বলয় কম্পিত করিতেছে। ঊর্দ্ধে গগণ সাগরে ঘোরদর্শন শকুন্তবর্গ সন্তরণ দিতেছে। নিম্নে বীভৎস মূর্ত্তি-বিশিষ্ট খলস্বভাব বিষধর সরীসৃপকুল ধীরে ধীরে মন্থরগমনে অতর্কিতভাবে তৃণ-শষ্প-সমাচ্ছন্ন হইয়া পদে পদে পদক্ষেপ আশঙ্কা জন্মাইতেছে। ব্যোমমার্গে মেঘদল বিদ্যুৎ বজ্রপাণি হইয়া যদৃচ্ছা বিচরণ পূর্ব্বক বিভীষিকা উৎপাদন করিয়া ফিরিতেছে। পবন দেব রোষভরে আমূল জগৎ কম্পনে রত। উত্তর কুরুস্থ হিমানীমুক্ত হইয়া, নিশানাথ এখানে যথার্থই সুধাংশু অংশু হইয়া এবং দিনদেব সহস্র রশ্মিতে বিভূষিত হইয়া অচিন্তনীয় পুরুষ নিয়ন্তার প্রত্যক্ষ প্রভাব জ্ঞাত করিতে করিতে উদয় গিরি হইতে অস্ত-শিখরে গমনাগমন করিতেছেন। নিশা নিবিড়, কখনবা নিবিড়তম হইয়া কেবল খদ্যোত মালায়, কভুবা নীল উজ্জ্বলমণি খচিত চন্দ্রাতপতলে প্রদীপ্ত মণিসহস্রের স্তিমিতালোকে, প্রতিভাসিত হইতেছেন। এদিকে বসুন্ধরা মাতৃস্নেহ পরবশ হইয়া অযাচিত ফলমূল প্রভৃতি আহারীয় এবং আশ্রয় দানে যেন সান্ত্বনা দিয়ে

অভয়দানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ফলতঃ বাহ্য-জগৎ যেন এখানে আর্য্যগণকে রোষ ও ক্ষমা-বিমিশ্রিত বিকট ভঙ্গীতে সদর্পে কহিতেছেন "দেখ এ তোমার কবকানী-হার-পীড়িত সামান্য-প্রাণ উত্তর কুরুবর্ষ নহে যে, যে কোন বিষয় সহজে সাধ্যায়ত্ত করিবে; বড় তেজে আসিয়াছিলে, দস্যু দল নিপাত করিয়া বড় দর্পিত হইয়াছ, কিন্তু আমার মূর্ত্তি দেখিলেত! আমার বিকট হাস্য একবার দেখিবে? না, তাহা হইলে তুমি বাঁচিবে না। এখন দেখ তুমি কত ক্ষুদ্র, দর্প দূর কর, আমার পায়ে নত হও, ভয় বিস্ময়ে আমাকে নিয়ত দর্শন কর। খাইতে দিতেছি, খাও, তাহার জন্য ভাবিতে হইবে না; কিন্তু মাথা তুলিওনা।

আর গ্রীকভূমি দেখ! হিমানী-পীড়িত উত্তরকুরুবর্ষ হইতেও স্বল্পপ্রাণ। যাহারা স্বস্থান পরিত্যাগান্তে বহুদূর অতিক্রম করিতে গিয়া গ্রীস অপেক্ষা ভীষণতর জাগতিক মূর্ত্তিকে উপহাস করিতে করিতে সমাগত হইয়াছে, তাহাদিগের নিকট ইনি কি ভয় প্রদর্শন করিয়া কৃতকার্য্য হইবেন? ইহাঁর প্রাণ স্বল্প, শক্তিও স্বল্প। দর্শন সম্পন্ন দৃঢ়তা-যুক্ত মানব চিত্তকে মোহাভিভূত করিয়া নিয়ত ভয় বিস্ময়ের অধীন রাখা ইহাঁর কার্য্য নহে। ভারতে যেমন জাগতিক মূর্ত্তিদর্শনে মানবচিত্ত বাহ্যজগতের নিকট আত্মপ-রাধীনতা সম্পূর্ণ রূপে স্বীকার করিয়া রামবৎ রহিলেন, গ্রীকেরা তেমনি জাগ-তিক ভীষণতার অভাবে সাহসী হইয়া,—যদিও তাঁহাদের চিত্ত বাহ্য জগতের অধী-নতা হইতে পৃথক নহে, তথাপি অধী নহে থাকিয়াও,—তাহার উপর প্রভুর ন্যায় কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাহারই নিকট বস্তু সংগ্রহ করিয়া তাহারই উপর প্রভুত্ব করিতে লাগিলেন। গ্রীসে জাগ-তিক মূর্ত্তি উর্দ্ধ অধে সমসামান্য-প্রাণ। সুতরাং এখানে তাহার অসা-মান্য ভাব কখনই নহে, যদিও বা অপরিচিততায় তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া ক্ষণমাত্র ভীত হইয়াছিল, কিন্তু ফিড্রসের উপন্যাসস্থ ভেককুল কর্ত্তৃক যাচিত জুপি-তর কর্ত্তৃক একখণ্ড কাষ্ঠ তাহাদিগকে রাজাস্বরূপ প্রদত্ত হইলে, ভেকেরা তদা-গমনে কিয়ৎক্ষণ ভীত, কিন্তু পরক্ষণেই যেমন সেই ভয়ের অপনয়নে, রাজার উপর আরোহণ পূর্ব্বক টিটিকার নৃত্য এবং তাহাতে মল মূত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক, দেব-তার নিকট আর একটি রাজার প্রার্থনা করিয়াছিল, গ্রীকেরাও তদ্রূপ পরক্ষণেই সেই ভয়ের কারণ সকলের মস্তকে পদা-ঘাত করিয়া সদর্পে বাহ্য জগৎকে জি-জ্ঞাসা করিয়াছিল, "আর তোমার কি কি বিভীষিকা আছে উপস্থিত কর, ইহাতে কিছুই হইল না। পূর্ব্বে যে কিছু একটু ভয় ছিল, তোমার নিকট পর্য্যন্ত আসিতে বহু ঘটনায় তাহা তিরো-হিত হইয়াছে, এক্ষণে তোমার একটু ভয় প্রদর্শনে সুখ বোধ হইল, নির্ভয়তা আরও বাড়িল। তুমি ভাবিয়াছ, আমাদের জীব-

গোপায় পদার্থ সমস্ত লুকাইয়া রাখিবে, তাহা পারিবে না, তোমাকে চিনিয়াছি, আমরা তাহা বলপূর্ব্বক আহরণ করিব।"

এই খান হইতে সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে যে গ্রীক এবং হিন্দু এতদুভয় জাতির চিত্তবেগ পূর্ব্বে যাহা একই দিকে প্রবাহিত হইত, এখানে তাহা যথা প্রকৃতি বিচালিত হইয়া দ্বিধা ভাবে বিপরীতগামী হইল। হিন্দুরা বিনা যত্নে অনুকূলা বসুমতী হইতে স্বচ্ছলতা প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্য-পদবীতে পদার্পণ করিয়া মানবীয় ইতরবৃত্তি সমুদয় হইতে অবসর পাইলেন বটে, কিন্তু জাগতিক মূর্ত্তিতে ভীত, বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হইয়া, এবং তন্নিকটে পদে পদে দারুণতর আত্মন্যূনতা দর্শন করিয়া, আত্ম নির্ভরতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সে অবসর কাল পারলৌকিক তত্ত্বে ব্যয়িত করিয়া, সেই তত্ত্বেই চিত্ত সমাহিত করিয়া স্থৈর্য্য লাভ করিলেন। আর গ্রীকেরা প্রতিকূলা বসুমতীর কোপে পতিত হইয়া, ইতরবৃত্তি নিচয়ের বশবর্ত্তিতায় বাহ্য জগতের সহ মল্লযুদ্ধ এবং কালে তাহাকে পরাস্ত করিয়া, পূর্ব্বসঞ্চিত আত্ম-নির্ভরতা গুণ আরও দৃঢ়তর করিয়া, সেই পরিমাণে পারলৌকিক তত্ত্বে আস্থাশূন্য হইলেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে ভারতীয়েরা এক পক্ষে আত্মন্যূনতার আধার, আর গ্রীকেরা অন্য পক্ষে আত্ম-সর্ব্বতার আদর্শস্থল হইলেন। এরূপ আত্ম ন্যূনতা এবং পারলৌকিকে নির্ভরতার গুণ—ধর্ম্ম বিষয়ে এবং চিন্তা বিষয়ে প্রাধান্য লাভ; আর আত্ম নির্ভরতার গুণ—পার্থিব বিষয়ে প্রাধান্য লাভ এবং পারলৌকিক বিষয়ে পরিমাণ-অনুরূপ আস্থা-শূন্যতা। এই উভয়বিধ প্রাধান্য জাতি-বিশেষে কি সাংসারিক কার্য্যে, কি ধর্ম্ম-বিষয়ে, জীবনের সমস্ত কার্য্যেই তত্তৎ বিষয়ের বহুলতা লক্ষিত হইবে।

পুরাবৃত্তবিৎ পণ্ডিতগণের দ্বারা ইহা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে উত্তর কুরু হইতে যে যে জাতি বহির্গত হইয়া বিভিন্নদেশে আগমন পূর্ব্বক উপনিবেশ স্থাপন করিয়া কালে ঐতিহাসিক গণনায় পরিগণিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে হিন্দু গ্রীক এবং রোমক এই তিন জাতির মধ্যে রোমকেরা সর্ব্ব প্রথমে আদি স্থান পরিত্যাগ করিয়া ইতালি ভূমে উপনিবেশ স্থাপন করে। তৎপরে গ্রীকেরা বহির্গত হয়, এবং সর্ব্ব শেষে গ্রীক ও রোমকদিগের স্থানান্তর হওনের বহুকাল পরে হিন্দু জাতিরা আদি স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভারতে আগত হইয়া পঞ্চনদের ধারে এবং সরস্বতী-তটে বাসস্থান নিরূপণ করিয়া জাতীয় গৌরব-বিস্তারে রত হয়েন। পুরাবৃত্তবিদ্‌দিগের এই সিদ্ধান্ত অনুসারে গ্রীকেরা গন্তব্য স্থানে অগ্রে উপস্থিত হইলেও, বহুপরে আগত এবং আদিতে গ্রীকদিগের সহ একদেশবাসী ও একপিতৃসন্তান হিন্দুদের আঢ্যতা এবং সভ্যতা কি কারণে গ্রীকদিগের অপেক্ষা বহু পূর্ব্বে উদয় হইয়াছিল এবং কেনই বা পরে উদিত গ্রীক সভ্যতা বহু বিষয়ে হিন্দু সভ্যতাকে

অতিক্রম করিয়াছিল, তাহা অগ্রে আলোচ্য।

উপরেই আভাসিত হইয়াছে যে মানবের সামান্যতর বৃত্তি সমুদয় যত দিন স্বচ্ছন্দতার সহিত পরিতৃপ্ত না হয়, তত দিন তন্নিমিত্ত ব্যস্ততা বশতঃ অন্য বিষয়ে মনঃ সংযোগ করিতে অপারগ হয়। হিন্দুরা এই অপারগতা হইতে, ভারতে আগমন দিন হইতেই বোধ হয় নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন। ভারতের যে স্থানে যাও, তথায়ই স্বচ্ছসলিলা নদী সকল প্রবাহিত, বর্ষাগমে পল্বল দ্বারা সন্নিকটস্থ ভূমি সমস্তকে উর্ব্বরা করিতে পটু। স্বভাবতঃ ভূমি সর্ব্বত্র এরূপ অনুকূলা, যে অতি অযত্ন পূর্ব্বক এক মুষ্টি বীজ ছড়াইলেও অল্প দিনে তাহার ফল লাভ করিতে সমর্থ হওয়া যায়, এবং হয়ত আবার সে প্রাচীন কালে ভূমি অক্ষুণ্ণ থাকাতে অনেক স্থানে শস্য যদৃচ্ছা উৎপন্ন এবং বিকীর্ণ হইয়া থাকিত। যেথানে যাও, কানন সকল যতই ভীষণ দর্শন হউক, বৃক্ষাবলি পরিপক্ক সুস্বাদু ফলভরে সর্ব্বত্রই অবনত হইয়া রহিয়াছে। পর্ব্বত সকলও সর্ব্বত্র ফল রস জল প্রদান করিয়া পথিকের ক্ষুৎ পিপাসা নিবারণ করিয়া থাকে। অথবা সংক্ষেপে আকবরের রাজস্ব-সচিবের কথায় এদেশ এতই সৌভাগ্যশালী যে বিধাতা ইহার অধিবাসীদিগের নিমিত্ত বৃক্ষের উপরেও দুই দুই রুটি এবং এক এক পেয়ালা জল রাখিয়াছেন। হিমাদ্রি এবং সন্নিকটস্থ পর্ব্বত সমূহ রত্নাধার, ইচ্ছা করিলেই তাহা হইতে নানা রত্ন উত্তোলিত ও বাক্ত হইতে পারে। যে দেশের এমন অবস্থা, সেখানকার অধিবাসীর আর সামান্য-বৃত্তি-পরিতৃপ্তি-বিষয়িণী চিন্তা কোথায়? ইহার ফল হিত অহিত উভয়ই আছে। মনুষ্যের স্বভাব এই যে সমবেত কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, আজ্ঞাদাতা এবং আজ্ঞা-প্রতিপালক এতদুভয় পর্য্যায় সংস্থাপন না করিলে, সে কার্য্য আয়ত্ত এবং সংসাধন করিতে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া থাকে, হয়ত অন্তে একেবারেই অসমর্থ হইয়া পড়ে। কোন নূতন সমাজ সংস্থাপন করিতে হইলেও এই নিয়ম অভিনীত হইয়া থাকে। যাঁহারা, অপেক্ষাকৃত গুণসম্পন্ন তাঁহারা পর্য্যায় ভেদে নেতার পদ প্রাপ্ত হইয়াথাকেন, এবং যাহারা অল্পগুণসম্পন্ন তাহারা নীত হইয়া থাকে, নেতৃগণ বুদ্ধি কৌশল, বল বা যথাসম্ভব পরিচালন দ্বারা নীত ব্যক্তিগণকে আপদ বিপদ্ হইতে রক্ষণ এবং সংস্থাপন করিয়া থাকেন। নীতগণ কৃতজ্ঞতা বশে, প্রাপ্ত উপকারের এবং বিনিময় স্বরূপে সৌভাগ্যের অংশ নেতা দিগের উচ্চ-নীচ-পর্য্যায় অনুসারে আত্ম হইতে অধিক পরিমাণে নিয়োজিত করে। এই নিয়ম হইতে রাজা রাজ পরিষদ্ বা ভূম্যধিকারী প্রভৃতি আঢ্য শ্রেণীতে স্থাপিত হয়। এই শ্রেণীস্থের সংখ্যা স্বভাবতঃ এবং কার্য্যগতিকে অল্প। অপরাপর ব্যক্তিগণ উহাদের আঢ্যতা বশে কিয়দংশে উহাদের আজ্ঞাকারী হয়। সুতরাং তাহাদের আজ্ঞাধীনতা বশতঃ

তাহাদিগকে খাটাইয়া আড্যেরা আপনাদের পূর্ব্ব হইতেই পুষ্ট সৌভাগ্য আরও পুষ্ট করিতে ক্ষমবান্ হয়। কিন্তু এঅবস্থাতে লোক দাসবৎ আজ্ঞাকারী বা উচ্চ এবং অধমের মধ্যে অপরিমিত ধন-বৈষম্য জন্মায় নাই। অধম শ্রেণী এখনও অপরের জন্য না খাটিলেও, আপন ভাগ্যে স্বচ্ছন্দে স্বচ্ছলতার সহিত সময় অতিবাহিত করিতে সমর্থ হয়। এবং উচ্চ শ্রেণী ইহাদিগকে কার্য্যে নিয়োজিত করিতে হইলে, অনাদর প্রকাশে কার্য্যসিদ্ধি করিতে পারেন না।

কিন্তু এই ধন-বৈষম্য যথাভাবে স্থিতি বা তাহার বৃদ্ধি, দেশের শীতাতপ, উর্ব্বরতা বা অনুর্ব্বরতা গুণের উপর বহুলাংশে নির্ভর করিয়া থাকে। যথা প্রকৃতি শরীর সঞ্চালন ও শারীরিক কার্য্য সাধনোপযুক্ত শরীরজ তাপ রাশি, পার্শ্বস্থ বায়ুরাশির সংস্পর্শে, তাহার শৈত্য বা উষ্ণতা অনুসারে, হ্রাস বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শৈত্যের যথায় হ্রাস হয়, তথায় তাপের সমতা রক্ষার্থে, ক্ষতি পূরণজন্য মাংস, মাদক বা তৈলাক্ত দ্রব্য আহারার্থে প্রয়োজন হয় এবং পরিশ্রম দ্বারা শরীর সঞ্চালন ও বস্ত্রাদি দ্বারা বায়ুমণ্ডলস্থ শৈত্য হইতে সর্ব্বদা শরীর রক্ষার আবশ্যক হয়। আর যথায় উষ্ণতা হেতু তাপের বৃদ্ধি হয়, তথায় তদ্রূপ আহারের অপ্রয়োজন, সাধারণ ফল মূল শস্য প্রভৃতি অল্পায়াসলভ্য দ্রব্যই প্রচুর বলিয়া গণ্য হয়, শ্রম দ্বারা তাপ বৃদ্ধির অনাবশ্যক; ফলতঃ তাপবৃদ্ধি-জনিত অলসতা উপস্থিত হইয়া পরিশ্রম করিতে মানব প্রবৃত্তি-শূন্য হয়; পরন্তু শরীরে কোন প্রকার আবরণেরও অনাবশ্যক। গ্রীষ্মপ্রধান দেশ প্রায়ই সজল এবং উর্ব্বরা। কিন্তু যদি জলশূন্য ও অনুর্ব্বরা হয়, তাহা হইলে আবার সজল ও উর্ব্বরা উষ্ণ দেশ এবং নির্জল ও অনুর্ব্বরা দেশ মধ্যে প্রভেদ আছে। প্রথমোক্ত দেশের বায়ু সজল ও উত্তপ্ত এবং উর্ব্বরা, শেষোক্ত দেশের বায়ুও উষ্ণ বটে কিন্তু শুষ্ক এবং দেশের জল-শূন্যতা হেতু ভূমি অনুর্ব্বরা। এই নিমিত্ত শেষোক্ত দেশীয়েরা দুষ্প্রাপ্য আহারের নিমিত্ত বাধ্য হইয়া শ্রম করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহাতে সক্ষমও হইয়া থাকে, কারণ জলীয় বাষ্পযুক্ত উষ্ণ বায়ুমধ্যে দেহ হইতে তাপ নির্গমন পক্ষে যে প্রতিবন্ধক জন্মে, শুষ্ক উত্তপ্ত বায়ুমধ্যে সে প্রতিবন্ধক থাকে না বলিয়া, তাহাদের শ্রম জনিত তাপ সহ্য করিতে ক্লেশ বোধ হয় না, এবং অবস্থা গুণে প্রথমোক্ত দেশের অধিবাসী অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম প্রিয় ও কষ্টসহ হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত—অপেক্ষাকৃত সজল ও উর্ব্বরা এবং উত্তপ্ত বঙ্গ দেশস্থ এবং অপেক্ষাকৃত নির্জল অনুর্ব্বরা ও সম পরিমাণে উত্তপ্ত উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ অধিবাসীদিগের মধ্যে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এখানে দেখিতে পাইবে যে একজন বাঙ্গালী কতদূর অলস, পরিশ্রম-কাতর, ভীরু এবং দুর্ব্বল, আর এক জন হিন্দুস্থানী

কতদূর উদ্যোগী, পরিশ্রমপ্রিয়, সাহসী এবং সবল। গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের ন্যায় আবার শীত-প্রধান দেশেরও দুইরূপ অবস্থা আছে। যথায় শৈত্যের ভাগ অত্যন্ত অধিক এবং বায়ু সজল, তথায় ভূমি একেবারে অনুর্ব্বরা, এবং আহারীয় অতিশয় দুষ্প্রাপ্য, অথচ তাপবৃদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন, সেখানকার লোকের চিরকাল অতিরিক্ত পরিশ্রম ও দুঃখ ভোগ করিতে জীবন অতিবাহিত হয়, সুখের দিন ভাগ্যে একদিনও ঘটেনা। আর যেখানে শৈত্যভাগ অপেক্ষাকৃত অল্প এবং বায়ু শুষ্ক এবং ভূমি অপেক্ষাকৃত উর্ব্বরা, সেখানে লোকে নিয়মিত শ্রম দ্বারা অভাব পরিপূরণ করিয়া চিত্তের তৃপ্তি সাধন করিতে পারে। এতদুভয়ের মধ্যে প্রথমটির আদর্শস্থল— লাপলাণ্ড প্রভৃতি পৃথিবীর উত্তর-কেন্দ্রস্থ দেশ সমুদয়। আর দ্বিতীয়টির আদর্শস্থল— পৃথিবীর সমমণ্ডলস্থ দেশ সমূহ।

যথায় দেশ সজল এবং উত্তপ্ত এবং ভূমি উর্ব্বরা, তথায় কষ্টসাধ্য মাংস মাদক বা তৈলাংশ দ্রব্য প্রভৃতি আহারীয় দ্রব্যের অপ্রয়োজন হেতু, মানবেরা অনায়াস-লভ্য ফল মূল শস্যাদি সংগ্রহ দ্বারা ক্ষুৎপিপাসা প্রভৃতি পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ হয়; এবং শৈত্য-প্রধান দেশে তাপ বৃদ্ধি করণ জন্য ব্যয়-বাহুল্য এবং কষ্ট-সাধ্য গাত্রাবরণের অনাবশ্যকতা হেতু তাঁহাদের তাহার ভাবনা ভাবিতে হয় না। এক কথায় অন্ন বস্ত্র অনায়াসে লাভ হইয়া থাকে। ম্যাল্থস্ সাহেবকৃত লোকতত্ত্ব-নিরূপণবিষয়িণী পুস্তকে প্রদর্শিত হইয়াছে যে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই অন্নবস্ত্রের স্বচ্ছলতা হইলেই লোক দ্বারা পরিগৃহীত হইয়া সন্তানোৎপাদন দ্বারা বংশ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। সুতরাং উক্তরূপ প্রকৃতি-বিশিষ্ট দেশে অচিরাৎ লোক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই লোকবৃদ্ধি সহকারে আহারের অপেক্ষাকৃত দুষ্প্রাপ্যতাজনিত লোককে শ্রমে প্রবৃত্ত হইতে হয় এবং কাযে কাযেই শ্রমজীবির সংখ্যা অধিক হইয়া পড়ে, কাযেই পরিশ্রমের মূল্য কমিয়া যায়, এ নিমিত্ত পূর্ব্বার্জ্জিত সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিগণ অল্পব্যয়ে অধিক শ্রম বিনিময় করিয়া বহু ধন সঞ্চয়ে বা যথা-অভীপ্সিত কার্য্য করণে সমর্থ হয়; এবং অন্যদিকে সেই পরিমাণে শ্রম-জীবিরা ক্রমে নির্ধন এবং সৌভাগ্যশালীদের পদানত হইতে থাকে। এই নিমিত্ত এবম্ভূত দেশ মধ্যে অতি অল্প দিনেই উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণী স্পষ্ট রূপে স্থাপিত এবং তাহাদের মধ্যে অপরিমিত বিষয়-বৈষম্য ঘটিয়া উঠে, সুতরাং সামাজিক উৎকর্ষ অপকর্ষের ভার সর্ব্বজনীন না হইয়া, একচেটিয়া ভাবে উচ্চ শ্রেণীস্থের উপর অর্পিত হয়। আঢ্য বা উচ্চ শ্রেণীরা সম্পত্তি লাভে আলস্য-প্রিয়তা গুণ-বিশিষ্ট মনুষ্যদিগের স্বভাব-সুলভ বহুবিধ বিলাস বিস্তারে রত হয়, এবং যে বুদ্ধি অন্যাবস্থায় অপরাপর বহুবিধ গুরুতর কার্য্যে ব্যয়িত হইত, এক্ষণে তৎপক্ষে অল্পই ব্যয় করিয়া, অধিকাংশ অভিনব বিলাস দ্রব্যের উদ্ভাবন, সৃষ্টি ও

তাহার ব্যবহার এবং রক্ষণ কার্য্যে নিয়োজিত হয়। তাহার সিদ্ধি পক্ষে লোক সকলও আজ্ঞাকারী থাকায়, দেশ মধ্যে অচিরে শিল্প, কারু, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি কার্য্যের প্রাদুর্ভাব ও প্রাচুর্য্য হওয়ায় অনুগামিনী সভ্যতাও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু এই সভ্যতা সমাজের মধ্যে উচ্চতর ভেদ বিহীন হওত সর্ব্বজনীন না হওয়ায় উহা আভ্যন্তরিক না হইয়া প্রায় বাহ্যিক ভাবে অবস্থিতি করে, এবং ধ্বংস কালে হয়ত সমাজকে একেবারে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইতে হয়, নয়ত এমন মুমূর্ষু অবস্থায় তাহাকে নিক্ষেপ করিয়া যায় যে তাহাকে পুনর্ব্বার সজীব করিতে বহু যত্ন ও বহুকাল ব্যয়িত হইয়া থাকে। সভ্যতাবিষয়কী ইতিহাস-লেখক বকল সাহেবের মত এই যে এইরূপ ধনবৈষম্য হইতে মিসর দেশের আদিম সভ্যতার উদ্ভব হয়। ঐ সভ্যতা বাহ্যিক দৃশ্যে অত্যুৎকৃষ্ট নহে, এবং তাহা সর্ব্ব শ্রেণীতে সমভাবে বিকীর্ণ হয় নাই। উচ্চ শ্রেণীরা যেমন অপরিমিত ধনশালী হইয়া বিলাস রত হইয়াছিল, নিম্নশ্রেণীরা তেমনি নিঃস্বল ও দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া কোন রূপে জীবন অতিবাহিত করিতে কালক্ষেপ করিত, এবং সর্ব্বদা আঢ্যদিগের পদানত থাকিত। এতদূর পদানত থাকিত যে আঢ্যেরা যাহা মনে করিতেন, তাহাদের দ্বারা তাহাই সমাপন করিয়া লইতেন। মিসরদেশীয় পীরামিড্ সকল তৎপক্ষে সাক্ষ্য-স্থানীয়। এই পীরামিড সকল পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য্য পদার্থ মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু সপ্তাশ্চর্য্যের আর ছয়টি বহুকাল হইল ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এই পীরামিডগণ অদ্যাপি অচল ও অটল ভাবে বিরাট্ বেশে মেঘমুকুটে শির ভূষিত করিয়া দর্শকের মনে যুগপৎ ভয় বিস্ময় ও চমৎকারিত্ব উৎপাদন করিয়া মিসরের বিগত গৌরব ঘোষণা করিতেছে। কত কালস্রোত ইহার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি ইহারা সেই একই ভাবে অবস্থান করিতেছে, আবার কত কালস্রোত সেই রূপ অতিক্রম করিয়া কত যুগ যুগান্ত অবস্থান করিবে তাহা কে বলিতে পারে? এই স্থানে যত পীরামিড্ আছে, তন্মধ্যে গিজা নগরের পীরামিড্, যাহা খুপ নামক মিসরের প্রবলপ্রতাপান্বিত রাজার সমাধিমন্দির রূপে নির্ম্মিত হয়, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ এবং বিস্ময়কর। হিরোডোটস লিখিত ইতিহাস অনুসারে এই পীরামিড্ নির্ম্মাণ করিতে প্রতিনিয়ত লক্ষাধিক লোক নিয়োজিত ছিল, এবং কুড়ি বৎসরে এই নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা হয়, এই সকল শ্রমজীবি-রক্ষার্থে ৩৮৪০০০০ টাকা ব্যয় হয়। এবম্ভূত কীর্ত্তি এত স্বল্প ব্যয়ে নির্ম্মাণ, শ্রমজীবির সংখ্যা অতি সুলভ ও আজ্ঞাকারী না হইলে সমাপন হইতে পারে না। সাহজাঁহার তাজমহল নির্ম্মাণ করিতে এরূপ কথিত যে ৭৫০০০০০ টাকা ব্যয় হয়। মিসরদেশীয় কার্ণাকনগরস্থ প্রাচীন দেব-

মন্দিরের ন্যায় আশ্চর্য্যকাণ্ডও শ্রমের বহুসুলভতা ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে না। উহা কিরূপ আশ্চর্য্যকাণ্ড তাহা বর্ণনাতীত। ইহার আয়তন এবং আকৃতি বিস্ময়কর। ইহার একটি মাত্র হলের অর্থাৎ দালানের স্তম্ভাবলী দেখিয়া বিখ্যাত ভ্রমণকারী সাম্পলিওন বিস্ময় সহকারে এরূপ উক্তি করিয়াছিলেন যে, "The imagination which in Europe rises far above our porticoes, sinks abashed at the foot of the 140 Columns of the hypostyle hall of Karnak". মিসরের শ্রমজীবিরা কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্থ ছিল, যদি এ দূরতর সময়ে ও বহুবিপ্লবে রূপান্তর-প্রাপ্ত তাহাদের বংশধরদের দ্বারা কিছু মাত্র প্রতীত হয়, তবে মিসরীয় ফেলাদের অবস্থা বারেক পর্য্যালোচনা করিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে। মিসরের সভ্যতা, ধনবত্তা, কীর্ত্তি এবং সামান্য শ্রেণীদিগের দুরবস্থা যেরূপ যেরূপ কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, ব্যাবিলন সাম্রাজ্যে তদ্রূপ তদ্রূপ কারণের অস্তিত্ব থাকায় অবিকল তদ্রূপ তদ্রূপ ফল ফলিয়াছিল। বাইবেল গ্রন্থোক্ত বাবিলানের ধনবত্তা, এবং সামান্য শ্রেণীর উপর অত্যাচার, নবখদনজর সম্রাটের ঐশ্বর্য্য, এবং মীডদেশীয় রাজকন্যা অমিতীনাম্নী তাঁহার প্রিয় মহিষীর সন্তোষার্থে মনোহর অট্টালিকা ও গগনোদ্যান প্রভৃতি ইহার পরিচয় স্থল।

ভারতবর্ষের প্রকৃতি বহুবিধ বিভিন্নাকারের ও বিভিন্ন স্বভাবের বটে, কিন্তু সমগ্র ধরিতে গেলে, মিসর যে শ্রেণীতে ইহাকেও সেই শ্রেণীতে গণনা করা যায়। ইহাও উত্তপ্ত ও সজল, এবং বাড়ার ভাগ অন্যান্য দেশাপেক্ষা অধিকতর উর্ব্বরতাগুণসম্পন্ন। আহারীয় দ্রব্যের অভাব নাই, এজন্য অতি অল্প দিনেই ধনসঞ্চয় এবং নিম্নশ্রেণীর অবস্থাও পূর্ব্ব-কথিত নিয়মানুসারে আরও নিম্নতর এবং উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ধন-বৈষম্যও জন্মিয়াছিল। আর্য্যেরা আপন অভীষ্ট পরিপূরণার্থে আপনাদের স্বদলস্থ নিম্নশ্রেণী ব্যতীত আর একদল দাসবৎ পদানত লোক পাইয়াছিলেন। ইহারা ভারতের আদিম অধিবাসী, এবং আর্য্য-অস্ত্রের বশ্যতায় আনীত হইয়া দাসপদে নিয়োজিত হইয়াছিল। এই সময়ে সমস্ত জগৎ পশুবৎ লোক দ্বারা অধিবেশিত থাকায় বহিঃশত্রু হইতে নির্ভাবনায়, এবং এরূপ প্রকৃতি বিশিষ্ট দেশের রীতি অনুসারে, আর্য্য সন্তানেরা শীতপ্রধান দেশবাসীদিগের অলস ভাব প্রাপ্ত এবং অবসরপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এমন অবস্থায় মানবের যে পরিমাণে বিলাসরত, এবং তজ্জনিত ব্যাবিলনের গগনোদ্যানের ন্যায় অদ্ভুত বিলাস বস্তুর উদ্ভাবন হওয়া উচিত—এ সকল হইতে পায় নাই। তাহার কারণ আছে। আর্য্যদিগের পারলৌকিক বিষয়ে চিত্ত অধিক পরিমাণে সমাহিত থাকায় অবসর কাল এবং চিন্তাশক্তি কেবল বিলাস ভোগে ও বিলাসিতা

উদ্ভাবনে ব্যয়িত না হইয়া, মনস্তত্ত্ব এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে সম বা তদধিক পরিমাণে ব্যয়িত হইয়াছিল। এই নিমিত্ত প্রথম হইতেই ভারতের সভ্যতায় বিলাস জনিত শিল্প কার্য্য প্রভৃতি মনস্তত্ত্ব ও বিজ্ঞানাদি সহ পাশাপাশি হইয়া, একত্রে উদ্ভাবিত ও অল্প দিনেই পরিপুষ্টতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সহসা উদিত সভ্যতার দোষ গুণ দেখা যাউক।

মনুষ্য চিত্ত ভারতের অদ্ভুত প্রকৃতি দর্শনে ক্রমে ক্রমে পারলৌকিক তত্ত্বে এরূপ সমাহিত হইল যে মানবচিত্ত পর পর অদৃশ্য ভেদ করিতে ক্রমাগত উৎসাহবান্ হইয়া, মানব জীবনের ক্ষণ-ভঙ্গুরতা এবং পরলোকেই সমস্ত নির্ভরতা সিদ্ধান্ত করিয়া, পার্থিব বিষয় সমস্তেই আস্থা-শূন্য এবং তাহা ক্ষণ মাত্রের বস্তু বলিয়া, তাহার প্রতি অপেক্ষাকৃত শিথিল যত্ন হইলেন। সংসার অনিত্য, সংসারস্থ সমস্ত পদার্থ অনিত্য, পরলোকই মূল বাসস্থান, সংসার কেবল বাসাবাড়ি স্বরূপ। এই নিমিত্ত ইহাদের সাহিত্য, বিজ্ঞান মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি সকল প্রকার বিদ্যাতেই এই বোধের আধিক্য লক্ষিত হয়। মনস্তত্ত্ব সেই বোধের পরিপোষক বলিয়া তৎসম্বন্ধে যতদূর উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায় তত দূর আর কোন বিষয়ে লক্ষিত হয় না। ইহা যথা স্থানে সমালোচিত হইবে। ব্যবহার শাস্ত্র যদিও একরূপ স্বতন্ত্র বস্তু, তথাপি তাহা সেই বোধের সহ এতদূর ঘনিষ্ঠতায় আসিয়াছিল, যে অন্য কুত্রাপি সেরূপ দৃষ্ট হয় না, এবং এই নিমিত্ত তাহাতেও যত্ন অশিথিল না থাকায় তৎপক্ষে উন্নতি-কল্পে ত্রুটি হয় নাই। এই বিষয়ের সত্যতা ভারতীয় প্রাচীন ব্যবস্থা শাস্ত্র এবং সমপ্রাচীন 'স্পার্টা' দেশীয় লাইকর্গস-প্রণীত ব্যবস্থা শাস্ত্র, এতদুভয়ের তুলনা করিলেই প্রতীয়মান হইবে, লাইকরগসের ব্যবস্থাশাস্ত্র, কিরূপে সমাজের লৌকিক সচ্ছন্দতা সাধিত হইবে তাহা নিরূপণ করিতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। সমাজের মঙ্গল সাধন জন্য যদি কোন নৈতিক বিষয় বা মনুষ্যত্বকে তাহার নিকট বলি দিতে হয়, তাহাও স্বীকার, তথাপি সামাজিক মঙ্গল সাধনে যত্নপর হও। সকল বিধিরই উদ্দেশ্য বাহ্য সম্পদ সাধন, তদ্ব্যতীত আর কিছুই নহে। এইরূপ সোলনের বিধি দেখ, রোমকদিগের ব্যবস্থাগ্রন্থ দেখ, একই উদ্দেশ্য; সেই ব্যতীত আর কিছুই নহে। আর হিন্দুদিগের ব্যবস্থা গ্রন্থ দেখ, ঠিক ইহার বিপরীত। কর্ম্ম বোধে যে যে বিষয় পবিত্র বলিয়া বিবেচিত, এবং সেই পবিত্রতা ও ধর্ম্ম সঞ্চয় যাহাতে যাহাতে হইতে পারে তাহারই সংসাধন পক্ষে সমস্ত বিধি প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার নিকট যদি লৌকিক নীতি ও বাহ্য সম্পদ বলি দেওয়া আবশ্যক বোধ হয়, তাহাতে ত্রুটি হয় নাই। বাহ্য সম্পদ সমস্তই পর্য্যবসিত হউক, তাহাতেও ক্ষতি নাই, তথাপি যাহাতে পরলোকে স্বচ্ছন্দতা লাভ হয়, এরূপ পবিত্রতা সাধনে ত্রুটি না হয়।

ল্যাইকর্গস বাহা সম্পদের অনুরোধে অনম্পন্ন-অবয়ব বা ক্ষীণদেহ শিশু হত্যায় কিছু মাত্র ক্ষুণ্ণ হয়েন নাই বা তাঁহার মনে কিছু মাত্র বিষাদ উপস্থিত হয় নাই কিন্তু হিন্দুরা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কোন একটি ইতরজাতীয় প্রাণীবধজনিত নিমিত্তের ভাগী হইলেও, কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পরলোকের পথ-পরিষ্কারক অঙ্গ পবিত্রতা সাধন করিতেন। ইহাপেক্ষা এতদুভয়ের বিভিন্নতা এবং হিন্দু ও গ্রীক চিত্তের গতিবিষয়ক সুন্দর দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে।

আয়ুর্ব্বেদ ও জ্যোতিষ এবং তদানুষঙ্গিক উচ্চশ্রেণীস্থ গণিতশাস্ত্র সম্বন্ধেও আর্য্যদিগের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। তাহাও উক্তরূপ কারণ হইতে প্রধানতঃ উৎপন্ন ও উৎকর্ষ-প্রাপ্ত হয়। শারীরিক স্বচ্ছন্দতা ব্যতীত হিন্দুদিগের ধর্ম্ম কর্ম্ম সাধন হইতে পারিতনা, বিশেষ যে দেশ যত গ্রীষ্ম প্রধান সে দেশ তত রোগময়, এবং যেরূপ বুদ্ধি-বিশিষ্ট চিত্তই হউক শারীরিক স্বচ্ছন্দতা কে না ভাল বাসে। এই সকল কারণে হিন্দুরা প্রথম হইতেই আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি করে অতি অল্পদিনেই সুফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এবং এই সূত্রে বহুবিধ রাসায়নিক, পাশব ও উদ্ভিদ-তত্ত্ব ও সেই সময়ে খণ্ড খণ্ড ভাবে উদ্ভাবিত হয়। উহা এত প্রাচীন সময়ে সংসাধিত হইয়াছিল, যে হয়ত গ্রীকেরা তখন মিসরীয়দিগের নিকট ভৈষজ্যবিদ্যা অর্জ্জন করিবেন বলিয়া অলখৎ লিখিতেছেন। এই ভৈষজ্য বিদ্যা কালক্রমে আরও উৎকর্ষ-প্রাপ্ত এবং অন্যান্য জাতি দ্বারা গৃহীত হয়। ব্যবহার শাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ ও জ্যোতিষ প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়েও ঐরূপ মন্তব্য বর্ত্তে। কিন্তু যেখানে উক্তরূপ বোধের অভাব, সেই সেই স্থানেই অপকর্ষ লক্ষিত হয়। এই অভাব এবং তজ্জনিত অপকর্ষ প্রায় সর্ব্বত্রই পার্থিব। ঐরূপ জ্যোতিষ ও গণিত সম্বন্ধেও ভারতীয়েরা বহু বিষয়ে শ্রেষ্ঠ এবং অপরাপর অনেক জাতিকে শিক্ষা দিয়াছে। এ মত যদি সত্য হয় যে—চন্দ্র সূর্য্য গ্রহমণ্ডলীর অদৃষ্টপূর্ব্ব গতি বিধি এবং বিস্ময়কর প্রাকৃতিক কার্য্যকলাপ দর্শনে আদি মানবের মনে যে বিস্ময় উৎপাদন ও নৈসর্গিক শক্তিবোধ হয়, তাহা হইতেই কালক্রমে দেবতত্ত্ব উদ্ভাবিত হইয়া থাকে—এবং সেই সকল চিত্তমোহকর পদার্থ দেব-পদে বরিত হয়, তাহা হইলে স্বচ্ছন্দতাযুক্ত মানব যে আপন অবসর কালের কিয়দংশ সেই সেই দেবতত্ত্ব ভেদ ও দেবতার স্বভাব ও গতি বিধি নিরূপণে ব্যয়িত করিবে তাহাতে সন্দেহ কি আছে। এই নিমিত্ত আমরা দেখিতে পাই যে প্রাচীনকালে যে যে দেশ স্বচ্ছন্দতা প্রযুক্ত ধনসঞ্চয় করিয়া অল্পদিনেই সভ্যতার উদ্ভাবক অবসর লাভ করিয়াছে, সেই স্থানেই জ্যোতিষ্কমণ্ডলের কোন না কোন রূপ চর্চ্চা এবং তাহাতে প্রতিপন্নতা লাভ হইয়াছে। এই নিমিত্ত প্রাচীন জ্যোতিষতত্ত্ব সমালোচনায় মিসর, ব্যাবিলন, চীন বা ভারতবর্ষের নাম

যেরূপ অগ্রে গণনায় আসিবে, গ্রীস কি রোম কিম্বা তদ্রূপ অন্যান্য দেশের নাম গণনায় আসিবেনা। মিশর দেশে এত প্রাচীনকালে জ্যোতিষিক তত্ত্ব উদ্ভাসিত হয় যে কথিত আছে খৃষ্টীয় শকের ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে মিসরীয়েরা রাশিচক্র ও দ্বাদশরাশি নিরূপণ এবং তাহাদের অবস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিল। এবং ইহাও কথিত আছে যে ইহারা পাশ্চাত্যক্রমে সর্ব্বপ্রথমে সপ্তাহ বিভাগ এবং গ্রহগণের নামানুসারে তদন্তর্গত দিবস সকলের নাম করণ করিয়াছিল। তদ্ভিন্ন অন্যান্য বহুবিধ তত্ত্বও আবিষ্কার তাহাদিগ হইতে উদ্ভূত হয়। ঐরূপ চীনদিগের জ্যোতিষিক তত্ত্ব নিরূপণের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কথিত হয় খ্রী-ষ্টীয় শকের ২৬১৭ বৎসর পূর্ব্বে হোয়াংসির রাজত্ব সময়ে নক্ষত্র-মণ্ডল পর্য্যবেক্ষিত ও তাহাদের অনেকের গতি নিরূপিত হয়। ইহার দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে ঐ তারিখ যদিও সন্দেহস্থল হয়, এবং ঐ নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণ যদিও নামে মাত্র এবং সামান্য হয়, তথাপি ইহা নিশ্চয় যে চীনেরা অতি প্রাচীনতম কালেই জ্যোতিষ বিদ্যায় মন-সংযোগ করিয়াছিল। ব্যাবিলন বাসী ও কাল্ডিয়া বাসীরাও জ্যোতির্ব্বিদ্যার আলোচনার প্রাচীনত্বে ন্যূন নহে, তাহারা বহুবিধ নূতন তত্ত্বাদি আবিষ্কার করে। কোন কোন পুরাবৃত্তবিৎ পণ্ডিতগণ বিবেচনা করিয়া থাকেন যে, যে যে জাতি অধিক পরিমাণে ভ্রমণ-শীল, তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্বদা স্থান পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা বশতঃ দিক্ ও সময় নিরূপণার্থে, অন্যান্য জাতি অপেক্ষা তাহাদের মধ্যে অধিক পরিমাণে জ্যোতিষ্কমণ্ডল পর্য্যবেক্ষিত হইয়া থাকে এবং সেই সূত্রে অনেক গ্রহ নক্ষত্র আবিষ্কৃত ও স্থিরীকৃত হয়; একথা কিয়ৎ পরিমাণে সত্য হইলে হইতে পারে, কিন্তু ইহাদের একরূপ অবস্থায় আবিষ্কৃত ও স্থিরীকৃত বিষয় সমস্ত যে জ্যোতি-র্ব্বিদ্যা সম্বন্ধে কোন স্থায়ী ফল প্রসব করে একরূপ বোধ হয় না। পূর্ব্বস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক গ্রীকেরা অনাশ্রমী ভাবে বহুকাল ধরিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে যদ্রূপ গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়াছে, ভারতীয়েরা তাহা-দের শতাংশের একাংশ ও নহে। পুনশ্চ দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্কান্দিনেবীয়েরা গ্রীকদিগের অপেক্ষা আরও অধিক পরি-মাণে নিরাশ্রমী ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। তথাপি দেখিতে পাওয়া যায় যে এই শেষোক্ত দিগের মধ্যে জ্যোতিষ বিষয়ক গণনীয় জ্ঞান কিছুই ছিলনা। গ্রীক দিগের মধ্যে খৃঃ পূ সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে জ্যোতিষ-বিষয়ক জ্ঞান অতি সামান্য ও অগণনীয় ছিল। ঐ সময়ের পরে ইহারা মিসরীয় এবং কাল্ডীয় দিগের নিকট হইতে উক্তবিষয়িণী জ্ঞান শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে। এবং খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতা-ব্দীতেই গণনীয় জ্ঞান যথা কথঞ্চিৎ লাভ করিয়াছিল। ঐ সময়ে জ্যোতিষ বিষয়ে প্রথম গ্রন্থ-প্রণেতা অতোলিক্স সচল গোলক ও গ্রহগণের উদয়াস্ত-সম্বন্ধীয় দুই খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তৎপরে খৃঃ

পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে অরিস্তর্কিস এবং ইরতস্থিনিস ও আর্কিমিডিস জ্যোতিষের সমধিক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতীয়দের দেখ, তাঁহাদের ঋগ্বেদিক গাথা সমূহ কোন্ দূরতর কালে প্রস্তুত এবং গীত হইয়াছে তাহার স্থিরতা নাই, তথাপি তাহাতে জ্যোতির্ব্বিদ্যা-বিষয়িণী বহুতর সারতত্ত্ব সম্বন্ধে বহুল উল্লেখ পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত সামবেদীয় গোভিলীয় নবগ্রহ শান্তি পরিশিষ্ট এবং অথর্ব্ববেদী নক্ষত্রকল্প, গ্রহযুদ্ধ, নক্ষত্র গ্রহোৎপাত লক্ষণ, কেতুচার, রাহুচার এবং ঋতুকেতু লক্ষণ ইত্যাদি প্রাচীনতম গ্রন্থে সাক্ষ্য দিতেছে যে, অতি প্রাচীন কালেই জ্যোতিষ-বিষয়ক জ্ঞান ভারতে অপরিমিত ভাবে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। তৎপরে অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে আর্য্যভট্ট, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণ ইহার কতদূর উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন এখানে তাহার পরিচয় দিবার আবশ্যকতা নাই। ভারতীয়দের জ্যোতিষ তত্ত্ব সর্ব্বপ্রকারে ধর্ম্মশাস্ত্রের সহ সম্বন্ধ-যুক্ত। কি প্রাচীনকালে কি বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্মবিষয়িণী ক্রিয়া কলাপ এতৎ সাহায্যে নিরূপিত দিন ক্ষণের উপর এতদূর নির্ভর করে যে, একের অভাবে অপরটি হইতে পারেনা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ফলতঃ ধর্ম্মশাস্ত্রের সহ জ্যোতিষ এতদূর ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযোজিত যে, যখনই জ্যোতিষ বিষয়ক কোন নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবিত হইয়াছে, তখনই আর্য্য ঠাকুরেরা ইহাকে বিজ্ঞান-বিষয়িণী জ্ঞানের উন্নতি না ধরিয়া, দেব-প্রসাদে যেন ধর্ম্মবিষয়ক নূতন জ্ঞান লাভ হইল বলিয়া ধরিয়াছেন, এবং কেবল এই বোধের বশবর্ত্তী হইয়াই, ভারতে যত দিন উন্নতির কাল ছিল, পর পর আরও নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবনে যুক্ত হইয়াছেন। ইহাদের উদ্ভাবিত জ্যোতির্ব্বিদ্যা প্রথমে আরব দিগের দ্বারা দেশান্তরিত হইয়া কাল সহকারে ইউরোপ প্রভৃতি দেশে নীত হইয়াছে।

পরবর্ত্তী সময়ে যদিও ভারতীয়েরা সাহিত্য বিষয়ে অপরিমিত উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন এবং এ বিষয়ে তাহাদের সৃষ্ট বহু বিষয় যদিও অনেকের আদর্শস্বরূপ হইয়াছিল, তথাপি অতি প্রাচীন কালীয় বৃত্তান্ত অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে আর্য্যঠাকুরদিগের সাহিত্য, প্রায় ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থেই সমাহিত হইয়াছে। কেবল এক মাত্র এবং জগতের অদ্বিতীয় মহাকাব্য মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত রামায়ণ, ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে স্বতন্ত্র ভাবে, ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। কিন্তু তথাপি ঐ রামায়ণে ধর্ম্ম ও দেব বিষয়ক প্রসঙ্গের আধিক্য এত অধিক পরিমাণে আছে, যে কেবল আমরাই উহার ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে স্বাতন্ত্র্য নির্ব্বাচন করিলাম, কিন্তু পৌত্তলিক হিন্দু ধর্ম্মাশ্রয়ী কোন ব্যক্তি তাহা করিবে না। উহা তাহাদের মনে ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া এতদূর প্রতীত যে, কাব্য বলিয়া নহে, কেবল পবিত্র ইতিহাস ও ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়াই

উহাকে পাঠ করিয়া থাকে। এবং বিশ্বাস এই যে উহা পাঠ করিলে পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ হইয়া পুণ্যলোকে অবস্থান লাভ হয়। যাহা হউক রামায়ণ অতি অতুলনীয় কাব্য মহৎ এবং সর্ব্বত্র রস-মাধুর্য্য ও রমণীয়তায় পরিপূর্ণ। এই গ্রন্থ কাব্য বিষয়ে চরমোন্নতি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পার্শস্থ পদার্থ মাত্রের মাধুর্য্য-সন্দর্শনে চিত্ত বিমোহিত হইয়া, সেই মাধুর্য্য যখন বাক্য দ্বারা ব্যক্ত হয়, তাহা কাব্য। মাধুর্য্য অর্থে যে কেবল বাসন্ত দক্ষিণানিলকুলের মধুরিমা বা তথাবিধ বস্তু, তাহা নহে; তমসাচ্ছন্ন নিশি, নিবিড় ঘনঘটা, বিদ্যুৎ, বজ্রাগ্নি বা বীভৎস বস্তু, সর্ব্বত্রই ইহা বিদ্যমান আছে। এই মাধুর্য্য-চিন্তা এবং কল্পনা সাহায্যে সেই সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম দর্শিত, এবং চিত্ত যে ভাবে আপ্লুত হইয়া তাহা দর্শন করে, কাব্য সেই পরিমাণে মাধুর্য্য প্রচুর বা তাহার স্বল্পতাযুক্ত এবং সেই সেই ভাবে পরিপূরিত হইয়া অনুরূপ আকার ধারণ করিয়া থাকে। চিন্তা এবং কল্পনাদক্ষ ও ধর্ম্মবোধ পরিপূরিত ভারত ভূমিতে যে অত্যুৎকৃষ্ট এবং রামায়ণের ন্যায় স্বভাব বিশিষ্ট মহাকাব্যের উৎপত্তি হইবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ। রামায়ণের সহ পার্শ্বাপার্শি ভাবে আর এক বিরাটভাব-বিশিষ্ট কাব্য গণনায় গণিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা রামায়ণ অপেক্ষা অনেক আধুনিক, এবং পরবর্ত্তী সাহিত্যের সহ শ্রেণী-নিবদ্ধ হইতে পারে। এই কাব্যেরও স্বভাব কিরূপ তাহা হিন্দু সন্তান মাত্রে জ্ঞাত আছেন।

এতদ্ব্যতীত কৃষি শিল্প প্রভৃতির আবশ্যক অনুরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সাধারণতঃ যে যে শাস্ত্রে ও বিজ্ঞানে ধর্ম্ম বোধের অভাব, তথায় তথায়ই উন্নতি বিষয়ে ভারতীয়দিগের মধ্যে অপকর্ষ লক্ষিত হয়। সুতরাং এই অভাব এবং তজ্জনিত অপকর্ষ, বাহ্যিক চাকচিক্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক দর্শন করিলে, যে যে বিষয়ে যাহা সম্পদ মাত্র সংসাধিত হয়, এতদ্রূপ পার্থিব বিষয়ে ও তৎসম্পর্কীয় শাস্ত্রাদিতে প্রায় সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ ইতিহাস বা পুরাণাদি বিলোড়ন দ্বারা দেখা যাইবে যে ভারতবর্ষীয়েরা আত্মদেশ-বহির্ভাগে কখন অনধিকার প্রবেশে উদ্যত হয়েন নাই এবং এতদ্বিষয়িণী দুরাকাঙ্ক্ষা বোধ হয় তাঁহাদের মনোমধ্যেও কখন স্থান পায় নাই। ইহঁারা স্বদেশ আপনা আপনার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকে আপনাপন অধিকার মধ্যে সন্তুষ্ট থাকিতেন। ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে, সময়ে সময়ে ভারতের মধ্যে কোন কোন রাজা কখন কখন প্রবল ও দুরাকাঙ্ক্ষান্বিত হইয়া পার্শ্বস্থ বিভিন্নাধিকার সকল আত্মবশে আনিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু এতদ্রূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। কেবল এইরূপ ঘটনা ঘটিলেই এবং দাসদিগকে কখন কখন দমন করিতে হইলেই সেই সময়ে যে কিছু অস্ত্র চালনা হইত।

নতুবা অধীশ্বর সকলে এক ধর্ম্ম ও এক-জাতিত্ব নিবন্ধন, স্বভাবের মাধুর্য্য বশে পরস্পর সুখসম্মিলনে বসতিবাস করিতেন। বিশেষতঃ দেশ যেরূপ প্রাকৃতিক দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত—উত্তরে অভেদ্য হিমাদ্রি, পশ্চিমে পরিখারূপে শতশাখা-ময়ী সিন্ধু, পূর্ব্বে অগম্য বনভূমি এবং দক্ষিণে ঘোর তরঙ্গসঙ্কুল দুর্দ্দমনীয় সমুদ্র;—তাহাতে আবার সেই দূরতম কালে তৎকালীন অসভ্যতা এবং বর্ব্বরতা জনিত পশুবৎ পার্শ্বস্থ জাতি সকল হই-তেও স্বদেশের স্বাধীনতা লোপ বা কোন বিপৎ-উৎপাদনের সম্ভাবনা না থাকায় বহিঃশত্রুর প্রভাব এবং তন্নিমিত্ত অস্ত্র-ধারণের পাট একেবারে, ছিল না। এই সকল কারণ-বশতঃ ভারতবর্ষীয়েরা কখন যুদ্ধপ্রিয় জাতি ছিলেন না এবং বোধ হয় এই কারণেই তাহাদের বীরকীর্ত্তি অন্যান্য পুরাতন প্রাচীন জাতির সমকক্ষ-তায় আসিতে পারে নাই। দ্বিতীয়তঃ দেখা যাইতেছে যে দেশ মধ্যে জীবনের অত্যাবশ্যকীয় কোন দ্রব্যের জন্য বিদেশে যাইতে হইত না, দেশ মধ্যেই সে সমস্ত মিলিত। তদতিরিক্ত দ্রব্যের প্রয়োজন বিলাসবৃদ্ধি বা তথাবিধ কারণের দ্বারা অভাব বোধ ব্যতীত হইতে পারে না। কিন্তু এখানকার লোক সকল মিসর ব্যা-বিলন প্রভৃতি গ্রীষ্মপ্রধান দেশবাসীদিগের অপেক্ষা অল্প পরিমাণে বিলাসপ্রিয় এবং খেয়ালময়, সুতরাং কোন বৈদেশিক দ্রব্যের লালসায় বিদেশ গমনের তত আবশ্যকতা ছিল না। এই নিমিত্ত আমরা কদাচ শুনিতে পাই যে ভারতীয়েরা বি-দেশ গমন পূর্ব্বক কোন স্থানে বিদেশ-বাণিজ্যে রত হইয়াছে। তবে যে প্রাচীন কালে বিদেশজাত কোন দ্রব্যের ভারত বর্ষে ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা তৎ তৎ দেশের অধিবাসীদের ভা-রতে বাণিজ্যহেতু আগমন সুযোগে আনীত হইত, এবং অপেক্ষাকৃত সৌভা-গ্যশালী এবং শৌখিনদিগের দ্বারা ক্রীত ও ব্যবহৃত হইত। এই রূপ ইহাদের দর্শন স্বদেশ মধ্যে এতদূর আবদ্ধ হইয়াছিল যে স্বদেশই পুণ্যভূমি, আর সমস্ত অপবিত্র প্রেত বা রাক্ষস নিবাস, তথায় পদক্ষেপ করিলেও পাপ অর্শে। বিদেশ গমনের দ্বারা প্রকৃতির নূতন নূতন মূর্ত্তি এবং বিভিন্ন-জাতীয় মানব চরিত্র ও মানবীয় কীর্ত্তিকলাপ দর্শনে, তত্তৎ বিষয়ে যে দূরদর্শন, চিত্তের প্রশস্ততা ও উদারতা, এবং আত্মোন্নতি কারক ও লোক হিতকর যে জ্ঞান জন্মায়, ভারতীয়েরা বিদেশ পরাঙ্মুখতায় তাহাতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে যদিও সমুদ্র যাত্রার বহুতর উল্লেখ পাওয়া যায়, সে সকল উল্লেখ যে বৈদেশিক বাণিজ্যের অনুশীলন বশতঃ অনুরূপ কার্য্যে নিয়ত পরিণত হওয়ার ফল তাহা বোধ হয় না। এক সময়ে ভারতে সমুদ্র যাত্রার বহুলতা হইয়াছিল বটে কিন্তু তাহা বৌদ্ধদিগের অধিকার সময়ে। এই সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম দ্বারা লোকের মনে নূতন প্রকারের তেজ নি-

ক্ষিপ্ত হয়, এবং প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম প্রভাবে লোকের মন পারলৌকিক তত্ত্বে যে মোহাভিভূত হয় ইহার প্রভাবে তাহার বহুলাংশে অপনীত হইয়া পার্থিব বিষয়ে সেই পরিমাণে চিত্ত আকৃষ্ট হয়। এই সময়ের রাজা অশোক, সমগ্র পরিজ্ঞাত ভারতের অধীশ্বর ছিলেন। লোক সকল আত্মোৎকর্ষ অবধারণ ও তাহা রক্ষণে সমর্থ হইয়াছিল, এবং বিদেশ বাণিজ্যের অভ্যুদয় হওয়ায় ও ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যের বহুলতা বশতঃ স্থলপথ ও জল পথে বহু স্থানে যাতায়াত আরম্ভ হইয়াছিল। এই সময়ে তৎকারণ বশতঃ শুধু সমুদ্র যাত্রা ও বিদেশ ভ্রমণ মাত্রই পর্য্যাপ্ত হয় নাই, ইহার ফল স্বরূপ ভূগোল এবং রসায়ন প্রভৃতি বিজ্ঞানেরও সমালোচনা হইয়াছিল। এই সময়ে কৃষি বাণিজ্য উভয়বিধ উপায় দ্বারা বহু ধন সঞ্চয় হয় এবং শিল্প বিদ্যারও বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। প্রাচীন রাজনৈতিক সমাজে ভারতের যে কিছু গণনা তাহা প্রধানতঃ এই সময়েরই প্রভাবে হইয়াছিল। লৌকিক সুখ স্বচ্ছন্দতা ধরিলে, ভারতের এই সময়ের মূর্ত্তি অতি মনোহর, কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই, এ মূর্ত্তি বহুক্ষণস্থায়ী নহে, ভারতের পূর্ব্বাপর ধরিতে গেলে, এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বৌদ্ধদিগের প্রাদুর্ভাবকাল পলকবৎ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

যে সকল শাস্ত্র এবং বিজ্ঞানের আশু ফল পার্থিব সুখ ও স্বচ্ছন্দতা লাভ, এরূপ কোন শাস্ত্রের ও বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত সত্য খণ্ড ভাবে ভারতে কখন কখন উদ্ভাবিত ও অপরাপর বিষয়ে নিয়োজিত দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাদের পৃথক্ ভাবে শ্রেণী নির্ব্বাচন, ধারাবাহিক রূপে সংযোজন ও তাহার উৎকর্ষ সাধন কোথাও দৃষ্ট হয় না। এরূপ শ্রেণীনিবদ্ধ ভাবে ভূবিদ্যা, ভূতত্ত্ব-বিদ্যা, উদ্ভিদ্ বিদ্যা, পশুতত্ত্ব, ভূমণ্ডলের জল বায়ু ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিষয়ের তত্ত্ব, এবং তথাবিধ অপরাপর বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান প্রাচীন হিন্দুদিগের একরূপ ছিলই না বলিতে হইবে। তাঁহাদের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত এ সকল কিছুরই আবশ্যক হয় নাই। যে জাতির পার্থিব জীবনের অনিত্যতা ও তৎপতি তুচ্ছতা শিক্ষা দিবার জন্য লোমশ মুনির উপাখ্যান কল্পিত হইয়াছে, সে জাতির মধ্যে যে এ সকল শাস্ত্র ও বিজ্ঞানের উদ্ভাবন ও উৎকর্ষ সাধন হয় নাই কেন, তাহা বলিবার আবশ্যক রাখে না। এই মুনির সর্ব্বাঙ্গ মেষবৎ লোমে আচ্ছন্ন ছিল, এবং ঐ লোম প্রতি ইন্দ্রপাতে এক একটি খসিত, এরূপে সমস্ত লোমচ্যুত হইলে তবে তাঁহার মৃত্যু হইবে। তথাপি ঋষি এই অল্প কয়েক দিনের জন্য আপনার আশ্রম কুটীরের উপরিভাগস্থ আচ্ছাদন প্রদানের আবশ্যকতা নিরূপণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ইহাঁদিগের ভূবিদ্যায়-লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি প্রভৃতি সপ্ত সমুদ্র এবং ত্রিকোণময়ী ভারতে সমগ্র পৃথিবীর সমাবেশ। ভূতত্ত্ব বিদ্যায় জ্ঞান—বাল্মীকীর

মস্তকে পৃথিবীর অবস্থিতি, এবং তাহার মাথা ঝাড়াতেই ভূকম্পন উপস্থিত হইয়া থাকে। উদ্ভিদ্ তত্ত্ব বিদ্যা—কোন্ গাছ ব্রাহ্মণ, কোন্ গাছ চণ্ডাল এবম্ভূত বিভাগ বোধ। পাশবতত্ত্ব বিদ্যা—আত্মার কর্ম্ম সূত্র বশে ইতর হইতে ইতরতর অবস্থা প্রাপ্ত্যর্থে চৌরাশি লক্ষ যোনির সৃষ্টি—ইত্যাদি ইত্যাদি। আর মানব জীবন প্রবাহের উপর এতদূরই আস্থা যে তাহার পুরাবৃত্ত রক্ষণের আবশ্যকতা ইঁহারা বিবেচনা করেন নাই। অন্যান্য অসভ্য ও বর্ব্বর জাতিরাও কেবল স্মৃতির সাহায্যে মাত্র যে কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব পুরুষের কীর্ত্তিকলাপ জীবিত রাখিত, হিন্দুদিগের নিকট প্রাচীন পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে তাহাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হইবে যে লৌকিক ব্যাপারে হিন্দুরা গণনার উপযুক্ত কোন প্রকার উন্নতি সাধন করিতে পারেন নাই। জীবনযাত্রা যাহাতে আপাততঃ সুখে অতিবাহিত হয় তৎপক্ষে কিয়ৎ পরিমাণে উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, এবং সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীতে তাহা অতুলনীয় হইয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ জাতির স্বভাব হইতে যাহা প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, সেই নৈতিক উন্নতির পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্তি হইয়াছিল। আজি পর্য্যন্ত তাহার মোহিনী শক্তি বহু বিপ্লবগতেও একেবারে অস্তিত্বশূন্য না হইয়া দর্শকের চমৎকারিত্ব উৎপাদন করিতেছে। সুনীতি বিষয়ে এরূপ শ্রেষ্ঠ জাতি আর হইতে নাই। কাল-আবর্ত্তনে সে সকল সুনীতি যদিও বহুতর বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি তাহার জীবনী ও মাধুর্য্য শক্তি এখনও অপরিসীম। যে বল অন্যত্র দুরাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তি করণার্থে ব্যয়িত হইত, সে বল এখানে অন্যের বিপদোদ্ধারে ব্যয়িত হইত। যে অর্থ অন্যের খেয়াল পরিপূরণার্থে ও বিলাস বিস্তারার্থে নিয়োজিত হইত, এখানে তাহা দরিদ্রের দুঃখ নিবারণ ও বিধবার চক্ষুজল মার্জ্জনের জন্য পর্য্যবসিত হইত। যে বুদ্ধি অন্যত্র দুরাকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করণের এবং বিলাস বিস্তারণের উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত হইত, এখানে তাহা ধর্ম্মতত্ত্বানুসন্ধানে নিয়োজিত হইত। ইহাদের জাতীয় জীবন নৈতিক, ইহা কেবল পৃথিবীর প্রথম অবস্থাতেই শোভা পাইয়াছিল। আবার যখন এই পৃথিবী দুরাকাঙ্ক্ষা, দ্বেষ হিংসা প্রভৃতি পাপরাশি-বিনিবারিত হইয়া নৈতিক ও আর্য্য আকৃতি ধারণ করিবে, তখনই আবার ইহা শোভা পাইবে, তদ্ভিন্ন অন্য সময়ে নহে। লৌকিক বিষয় চিত্ত-নিয়োগকারী ও তদ্বিষয়ে উন্নতিশীল জাতির যখনই এমন জাতির পার্শ্বে উদ্ভব হইবে, তখনই ইহাদের লৌকিক গরিমা ও প্রভুত্ব নগণ্যের মধ্যে পড়িয়া যাইবে, হয়ত একেবারে লোপ পাইবে। ভারতের ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছে। এই জন্যই গ্রীকদিগের সভ্যতা পরে উদিত হইলেও, লৌকিক দর্শনে বলিতে হইবে যে তাহা ভারতীয় সভ্যতার অপে-

ক্ষা অনেক বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। এক্ষণে তদ্বিষয় প্রদর্শনার্থ, হিন্দু দিগের অভ্যুদয়-কালীন সভ্যতা অপেক্ষা, গ্রীক সভ্যতা কিরূপ প্রকৃতির বশে কি ভাবে উদিত হইয়া, লৌকিক দর্শনে কোন্ কোন্ বিষয়ে এই উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, তাহার যথাযথ সমালোচন করা কর্ত্তব্য।

ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাণিনি।

আমি মনোযোগ সহকারে পৌষ মাসের আর্য্যদর্শনে বাবু রামদাস সেনের পাণিনি সমালোচন পাঠ করিয়াছি। রামদাস বাবু স্বমতের সমর্থন জন্য যে যুক্তির অনুসরণ করিয়া স্বীয় প্রবন্ধ পরিসমাপ্ত করিয়াছেন, বর্ত্তমান প্রস্তাবে অতি সংক্ষেপে তদ্বিষয় সমালোচিত হইতেছে।

আমি পুনঃ পুনঃ বলিতেছি আশ্চর্য্যাদি শব্দের উদাহরণ দেখাইয়া পাণিনিকে বুদ্ধের পূর্ব্বসাময়িক বলা আচার্য্য গোল্‌ডষ্টুকরের অভিপ্রেত নয়। গোল্‌ডষ্টুকর আশ্চর্য্যাদি শব্দের অর্থতে বৈসাদৃশ্য দেখাইয়া পাণিনি ও কাত্যায়নের আবির্ভাব সময়ের পার্থক্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন মাত্র। গোল্‌ডষ্টুকর কেবল "নির্ব্বাণোঽবাতে" সূত্র অবলম্বন করিয়াই পাণিনিকে বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াছেন। এবিষয় মৎপ্রণীত পাণিনি পুস্তকে ও অগ্রহায়ণ মাসের আর্য্যদর্শনের পাণিনি বিষয়ক প্রবন্ধে বিশেষরূপে লিখিত আছে। উক্ত প্রবন্ধের যে স্থলে এবিষয়ের নির্দ্দেশ আছে, তাহা যথাবৎ উদ্ধৃত হইলঃ—

"কোন বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া প্রতিকূলবাদীর মত খণ্ডন করিতে হইলে সর্ব্বাদৌ তাঁহার প্রধান যুক্তির মূলোচ্ছেদ করিতে হয়। বিচারের এই চিরন্তন পদ্ধতির বহিশ্চর হইয়া বিষয়ান্তরের তর্ক উপস্থিত করা উচিত নহে। গোল্‌ডষ্টুকর ৮।২।৫০ সংখ্যক 'নির্ব্বাণোঽবাতে' সূত্র অবলম্বন করিয়া যে ভাবে পাণিনিকে বুদ্ধের পূর্ব্বসাময়িক স্থির করিয়াছেন রামদাস বাবু তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই, অথচ 'আরণ্যক' প্রভৃতি কয়েকটী শব্দের উল্লেখ করিয়া গোল্‌ডষ্টুকরের মত ভ্রান্তিপূর্ণ বলিয়াছেন।"

স্থলান্তরেঃ——

"'গোল্‌ডষ্টুকরের মত' খণ্ডন করিয়া পাণিনির সময় নিরূপণ করিতে হইলে প্রথমতঃ "নির্ব্বাণোঽবাতে" সূত্রে যে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার মূলোচ্ছেদ করা উচিত।"

গোল্‌ডষ্টুকরের মতানুসারে পাণিনির আবির্ভাব সময়ের সহিত "নির্ব্বাণোঽবাতে" সূত্রের এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কিন্তু

এদিকে রামদাস বাবু গোল্ডষ্টুকরের মত খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়া লিখিয়াছেন "নির্ব্বাণোৎবাতে এই সূত্রের সিদ্ধান্ত (পাণিনি বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী) আমার বিচার্য্য নহে।" নির্ব্বাণোৎবাতে সূত্রের সিদ্ধান্ত যদি বিচার্য্য না হইল, তাহা হইলে গোল্ডষ্টুকরের মত খণ্ডিত হইল কিরূপে? রামদাস বাবুর বিচার এইরূপ সঙ্গতিবিরুদ্ধ প্রলাপে পরিপূর্ণ। একজনের যুক্তির বলাবল পরীক্ষা করিব না, অথচ অসঙ্কুচিতহৃদয়ে অবলীলাক্রমে তাঁহার সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিপূর্ণ বলিব, এরূপ চাপল্য প্রদর্শন কতদূর সঙ্গত বলিতে পারি না।

রামদাস বাবু "চিত্রঙ আশ্চর্য্য" ভাষ্যকারের এই ব্যাখ্যাস্থলে বিলক্ষণ কৌশলজাল বিস্তার করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থনে চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার এই সমর্থন চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে বিফল হইয়াছে। তিনি কার্ত্তিক মাসের আর্য্যদর্শনে এসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, পৌষ মাসের আর্য্যদর্শনে তাহার অপহ্নবে ক্রটী করেন নাই। কার্ত্তিক মাসের আর্য্যদর্শনে লিখিত আছেঃ—

"পণ্ডিতবর গোল্ডষ্টুকরের তর্কের অনুসরণ করিয়া রজনী বাবু পাণিনি পুস্তকের ৪৫ পৃষ্ঠার টীকায় "আশ্চর্য্যমনিত্যে" পাণিনি সূত্র ও "আশ্চর্য্য অদ্ভুত ইতি বক্তব্যম্" এই বার্ত্তিক উদ্ধৃত করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে পাণিনির সময় ও তাঁহার পূর্ব্বে অনিত্য শব্দ বিনশ্বরবোধক ছিল; কিন্তু "আশ্চর্য্য" শব্দ তদ্বোধক ছিল না, বস্তুতঃ তাহা নহে— অনিত্য শব্দ বিনশ্বর অর্থ বুঝেন এই আশঙ্কায় বার্ত্তিককার স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন, নচেৎ কাত্যায়নের সময়ে যে নূতন কোন অর্থ ছিল তাহা নহে। পাণিনির সময় যদি আশ্চর্য্য, অদ্ভুত, চিত্র আদি শব্দ এক পর্য্যায়াক্রান্ত না থাকিত, তবে পাণিনি "আশ্চর্য্য" অর্থে চিত্র শব্দের প্রয়োগ করিতে পারিতেন না। তিনি "চিত্রঙ্ আশ্চর্য্য" এই একটী সূত্র করাতে আচার্য্য গোল্ডষ্টুকরের সিদ্ধান্তের মূলোচ্ছেদ হইতেছে।"

ইহার উত্তর স্থলে আমি পাণিনির সূত্র ও পতঞ্জলির ভাষ্য উদ্ধৃত করিয়া স্পষ্ট দেখাইয়াছি, "চিত্রঙ আশ্চর্য্যে" পাণিনির সূত্র নয়, উহা ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা মাত্র (১)। পৌষ মাসের আর্য্যদর্শনে রামদাস বাবু তাহার এই উত্তর দিয়াছেনঃ—

"৩৬৭ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভে তিনি লিখিয়াছেন, আমি "চিত্রঙ আশ্চর্য্যে" এই সমুদয় বাক্যকে সূত্র বলিয়াছি। এবং ইহা আমার লিখন-ভঙ্গীতে প্রতীত (হয়?) বটে, কিন্তু তাহা আমার মনোগত নহে, এবং তাহা আমি রজনী বাবুকে বিস্মিত বা দুঃখিত করিবার জন্য লিখি নাই। পাণিনি মুনি যখন চিত্র শব্দের অর্থ বিশেষ অবধারণ করেন নাই তখন লোকপ্রসিদ্ধ অর্থই যে তাহার অর্থ, তাহাতে

(১) ১২৮৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসের আর্য্যদর্শন, ৩৬৬—৩৬৯ পৃষ্ঠা দেখ।

আর সন্দেহ নাই, ইহা ভাষ্যকারের প্রতীক দিয়া বুঝাইয়াছি মাত্র * * ।”

এক্ষণে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, রামদাস বাবু কার্ত্তিক মাসের আর্য্যদর্শনে “চিত্রঙ্‌ আশ্চর্য্যে” এই সমস্ত পদ্যটীকে পাণিনির সূত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। পরিশেষে অগ্রহায়ণ মাসের সংখ্যায় পাণিনি শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া পৌষ মাসের আর্য্যদর্শনে উহা ভাষ্যের অন্তর্গত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কার্ত্তিকের সংখ্যায় স্পষ্ট লিখিত আছে, “তিনি চিত্রঙ আশ্চর্য্যে এই একটী সূত্র করাতে আচার্য্য গোল্‌ডষ্টুকরের সিদ্ধান্তের মূলোচ্ছেদ হইতেছে।” এ স্থলে “তিনি” পদ নিঃসন্দেহ পাণিনির বোধক। পাণিনিই বৈয়াকরণ সূত্রের প্রণেতা, পতঞ্জলি এই সূত্র সমূহের ভাষ্যকার মাত্র। বিশেষতঃ পাণিনির অব্যবহিত পরেই “তিনি” পদের উল্লেখ থাকাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, উক্ত পদ পাণিনি ব্যতিরিক্ত অন্য কাহারও দ্যোতক নহে।

রামদাস বাবু এইরূপে এক স্থলে “চিত্রঙ আশ্চর্য্যে” পাণিনির সূত্র বলিয়া স্বীকার করিয়া পুনর্ব্বার স্থলান্তরে (পৌষ মাসের আর্য্যদর্শনে) লিখিয়াছেন, “পাণিনি মুনি যখন চিত্র শব্দের অর্থ বিশেষ অবধারণ করেন নাই, তখন লোক-প্রসিদ্ধ অর্থই যে তাহার অর্থ তাহাতে আর সন্দেহ নাই, ইহা ভাষ্যকারের প্রতীক দিয়া বুঝাইয়াছি মাত্র” এস্থলে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে রামদাস বাবুর মতানুসারে “চিত্রঙ আশ্চর্য্যে” পাণিনীয় সূত্রের ভাষ্য। অন্যথা, তিনি চিত্র শব্দের লোক-প্রসিদ্ধ অর্থ “ভাষ্যকারের প্রতীক দিয়া বুঝাইয়া দিতেন না। এইরূপ একটী বাক্যকেই ক্রমান্বয়ে সূত্র ও ভাষ্যের অন্তর্গত করা হইল। এরূপ অস্থিরতা কেন? রামদাস বাবু বৈয়াকরণিক নিয়ম সমূহের উল্লেখ করিয়া যতই পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করুন না কেন, অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তির লক্ষণাদি দ্বারা তাঁহার প্রস্তাব যতই পুষ্টাবয়ব হউক না কেন, স্থিরতা প্রদর্শিত না হইলে কখনও তাঁহার মত সামাজিক বর্গের আদরণীয় হইবে না। বলিতে হৃদয় ব্যথিত হয়, সত্যের ঈদৃশ অপলাপে রামদাস বাবুর প্রবন্ধ কলঙ্কিত হইয়াছে। পরন্তু রামদাস বাবু পৌষের আর্য্যদর্শনে লিখিয়াছেন, “তিনি লিখিয়াছেন, আমি “চিত্রঙ আশ্চর্য্যে” এই সমুদয় বাক্যকে সূত্র বলিয়াছি, এবং ইহা আমার লিখনভঙ্গীতেও প্রতীত বটে, কিন্তু তাহা আমার মনোগত নহে।” এস্থলে “লিখনভঙ্গীতেও প্রতীত হয় বটে কিন্তু তাহা আমার মনোগত নহে” এ বাক্যের অর্থ কি? নিজের মনোগত ভাব বিশদ রূপে পাঠকের হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া দেওয়াই প্রকৃত সুলেখকের রীতি। যিনি এই রীতির অনুসরণ করিতে না পারেন, তাঁহার লেখনী ধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। যেস্থলে বিচার করিয়া সত্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, সে স্থলে অস্পষ্টাদি দোষের আশ্রয়গ্রাহী হওয়া নিতান্ত অসঙ্গত। রামদাস

বাবু একজন সুলেখক হইয়াও যে বিশদ রূপে স্বীয় মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতে পারেন না, এরূপ বিশ্বাস হয় না। বস্তুতঃ রামদাস বাবু এস্থলে নিরবচ্ছিন্ন প্রগল্‌ভতা প্রদর্শন ও কৌশলজাল বিস্তার করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা পাইয়াছেন। এরূপ চেষ্টা কত দূর প্রশংসনীয়, সহৃদয়গণ বিবেচনা করিবেন।

যাহা হউক, ইহা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য, পাণিনি চিত্র শব্দের কোন অর্থ নির্দ্দেশ করেন নাই; সুত্রান্তরে তিনি আশ্চর্য্য শব্দ অনিত্যার্থবোধক বলিয়াছেন মাত্র। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে, পাণিনীয় সময়ে অথবা তৎপূর্ব্বে চিত্র, আশ্চর্য্যাদি এক পর্য্যায়াক্রান্ত শব্দ সমূহ অনিত্যের দ্যোতক ছিল। গত অগ্রহায়ণ মাসের আর্য্যদর্শনের পাণিনি শীর্ষক প্রবন্ধে ইহা বিশদ রূপে লিখিত হইয়াছে।

রামদাস বাবুর মতানুসারে বৃহৎ-কথা গল্পাংশে আরব্যোপন্যাসের সমশ্রেণীক। কিন্তু "উহার দেশ কাল পাত্র মিথ্যা না হইলেও হইতে পারে।" এ মত নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। বৃহৎ কথার দেশ, কাল, পাত্র যদি প্রকৃত ইতিহাসের সম্মান-স্পর্দ্ধী হয়, তাহা হইলে তিনি স্বপ্রণীত ঐতিহাসিক রহস্যের প্রথম ভাগে বৃহৎ কথার প্রমাণানুসারে কাত্যায়নকে পাণিনির সমকালবর্ত্তী বলিলেন না কেন? কাত্যায়ন যেমন বৃহৎ-কথানুসারে পাণিনির সমসাময়িক, পাণিনি ও সেই রূপ বৃহৎ কথানুসারে নন্দের সমসাময়িক। বৃহৎ কথায় এই তিন জনই এক সূত্রে গ্রথিত রহিয়াছেন। কিন্তু প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ীর কি অপূর্ব্ব গবেষণা! তিনি কাত্যায়নের বেলায় বৃহৎ কথাকে আরব্যোপন্যাসের সমশ্রেণীক বলিয়া তৎপ্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন, অথচ পাণিনির বেলায় দেশ, কাল, পাত্র, সত্য বলিয়া তাহার প্রতি আস্থা দেখাইতে ত্রুটী করিলেন না; কোন্ প্রমাণ অনুসারে এই অসার মতের সমর্থন হইতে পারে? পাণিনির ন্যায় কাত্যায়নও দেশ, কাল, পাত্রানুসারে বৃহৎ কথার সহিত সম্বদ্ধ, সুতরাং বৃহৎ-কথার দেশ, কাল, পাত্র সত্য বলিয়া ধরিলে পাণিনি ও কাত্যায়ন উভয়কেই এক সময়ে নিবেশিত করিতে হয়। কিন্তু রামদাস বাবু স্পষ্টাক্ষরে পাণিনি ও কাত্যায়নকে ভিন্ন সময়ের লোক বলিয়াছেন। এরূপ বিভিন্ন মত উপন্যস্ত করা ধীরতা ও শাস্ত্রদর্শিতার লক্ষণ নহে। অলীক উপন্যাসের দেশ কালাদিও অনেক স্থলে অলীকতায় পূর্ণ হইয়া থাকে; সুতরাং তৎসমুদয় অবলম্বন করিয়া সত্য নির্ণয় করা কোনও মতে যুক্তি-সিদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না।

যাজ্ঞবল্ক্য ও অথর্ব্ব বেদাদির সম্বন্ধে রামদাস বাবু যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা সদ্যুক্তির অনুমোদিত নহে। মৎপ্রণীত পাণিনি পুস্তকে এবিষয় বিশেষ রূপে লিখিত আছে। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া প্রস্তাবটী পল্লবিত করা বিধেয় নহে। যাজ্ঞবল্কানি ব্রাহ্মণানি" স্থলে "যাজ্ঞবল্কানি"-পদ যে

রূপে সিদ্ধ হইয়াছে তাহা আমি পাণিনি পুস্তকের ৫৭—৬৫ পৃষ্ঠায় বিশদ রূপে লিখিয়াছি। সহৃদয় পাঠক বর্গ উক্ত অংশ পাঠ করিয়া রামদাসবাবুর মতের সমালোচন করিলেই দেখিতে পাইবেন, রামদাস বাবু কিরূপ বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া অমর্ষ ও প্রগল্‌ভতার পরিচয় দিয়াছেন।

রামদাস বাবুর মতানুসারে যাজ্ঞবল্ক্য পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী। অগ্রহায়ণের আর্য্যদর্শনের পাণিনি-শীর্ষক প্রবন্ধে মুদ্রা-প্রমাদ বশতঃ "পরসাময়িক" স্থলে "পূর্ব্বসাময়িক" হইয়াছে (১)। উক্ত আর্য্যদর্শনের ৩৭৩ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভের পঞ্চম পঙ্‌ক্তি পাঠ করিলে এই ভ্রম নিরাকৃত হইবে।

ভাষাগত দোষ গুণ লইয়া অধিক বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন লক্ষিত হইতেছে না। বহুক্ষণ ব্যাকরণের আরাধনা করিলে "মান্য" পদটী সিদ্ধ হইতে পারে বটে, কিন্তু ভাববাচ্য-নিষ্পন্ন "মান্য" পদের প্রয়োগ কোথাও লক্ষিত হয়না। "মান্য" পদ সাধারণতঃ কর্ম্ম বাচ্যেই প্রয়োজিত হইয়া থাকে। রামদাস বাবু কূট তর্কের অনুসরণ পূর্ব্বক "পুস্তকের মান্য করিতে হইলে" বাক্য বিশুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি একবার লিখিয়াছেন "পুস্তকের মান্য করা" এইরূপ প্রয়োগ সাধু না হইবে কেন?" ইহার পরক্ষণেই আবার লিখিয়াছেন "পুস্তকের মান্য করা" এইরূপ লেখা বিশুদ্ধ না হইলেও "পুস্তকের মান্য করিতে হইলে" যখন আছে তখন তাহা বিশুদ্ধই হইয়াছে"। এটী রামদাসবাবুর অস্থিরতার অন্যতম দৃষ্টান্ত তিনি যে বাক্য ("পুস্তকের মান্য করা") একবার সাধু ও রীতি-বিশুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিলেন. পরক্ষণেই তাহা আবার অবিশুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সঙ্কুচিত হইলেন না। প্রত্নতত্ত্ব-বিচারকের এরূপ চপলতা কখনও মার্জ্জনীয় নহে। সত্যের অনুরোধে আমাদিগকে দুঃখ সহকারে বলিতে হইতেছে যে, রামদাস বাবুর বিচারের অনেক স্থলেই এইরূপ অধীরতা ও হঠকারিতা জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে।

রামদাসবাবু আমার লিখিত "এইরূপ যুক্তি ও বিচারের সংঘাতে সর্ব্ব প্রকার সংশয় জাল বিচ্ছিন্ন হইয়া পরিণামে সিদ্ধান্ত-ক্ষেত্র পরিষ্কৃত ও অনায়াস-গম্য হইতে পারে" এই বাক্যে যেরূপ বৈয়াকরণ জ্ঞান প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে আমি নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছি। তিনি লিখিয়াছেন, "সংশয়-জাল বিচ্ছিন্ন হইয়া" এস্থলে "হইয়া" এই আনন্তর্য্য-বোধক ক্রিয়ার কর্তৃত্ব সম্বন্ধ "সংশয় জাল বিচ্ছিন্ন" এই পদের সহিত হইতেছে, সুতরাং আনন্তর্য্য-বোধক অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্ত্তার সহিত "হইতে পারে। ইত্যাদি সমাপিকা ক্রিয়ার কর্ত্তার সহিত ঐক্য না থাকাতে নিয়ম ভঙ্গ ও সদোষ হইয়াছে।" রামদাস বাবু এস্থলেও স্বীয় হঠকারিতার পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত

আর্য্যদর্শন। অগ্রহায়ণ ১২৮৩। ৩৭৩ পৃষ্ঠা। প্রথম স্তম্ভ — ২য় পঙ্‌ক্তি।

হয়েন নাই। "সংশয় জাল-বিচ্ছিন্ন" কথনও কর্তৃপদ হইতে পারে না। এস্থলে "বিচ্ছিন্ন হইয়া" একবারে অসমাপিকা ক্রিয়া; "সংশয়জাল" উহার কর্ম্ম। "বিচ্ছিন্ন হইয়া" পদের ন্যায় "গম্য হইতে পারে" একবারে সমাপিকা ক্রিয়া। "সিদ্ধান্ত ক্ষেত্র" এই পদের সহিত উহার কর্ম্মত্ব সম্বন্ধ হইতেছে। এই অসমাপিকা (বিচ্ছিন্ন হইয়া) ও সমাপিকা (গম্য হইতে পারে) উভয় ক্রিয়ারই এক উহ্য কর্ত্তার সহিত অন্বয় হইয়াছে। অর্থাৎ অন্বয় স্থলে, পণ্ডিতগণকর্তৃক (উহ্য কর্ত্তা) বিচ্ছিন্ন হইয়া, পণ্ডিতগণকর্তৃক গম্য হইতে পারে এই এ কর্তৃত্ব স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, সুতরাং এ স্থলে উক্ত নিয়ম অন্যথাভূত হইল কি রূপে? "বিচ্ছিন্ন হওয়া" "গম্য হওয়া" উভয়ই কর্ম্মবাচ্যের পদ। বাঙ্গালা ভাষায় ছেদন করিয়া, গমন করিয়া, একবারে ক্রিয়ার ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক্ষণে সহৃদয় পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন, রামদাস বাবু এস্থলে কিরূপ অসাধারণ ব্যাকরণ বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন।

আমি মুদ্রাকরের দোষ প্রদর্শনার্থই রামদাস বাবুর প্রবন্ধোক্ত "চিত্রঙঃ" পদের অশুদ্ধির উল্লেখ করিয়াছি। রামদাস বাবু যে এরূপ একটী সামান্য বিষয় অবগত নহেন, এ বিশ্বাস কখনও আমার মনে স্থান পায় নাই। যখন বৈয়াকরণ সূত্র ও ব্যাখ্যা লইয়া বিচার হইতেছে, তখন তৎসমুদয়ের যথাযথ উল্লেখ না থাকিলে পাঠকগণ সন্দিহান হইতে পারেন এই আশঙ্কায় আমাকে বাধ্য হইয়া "চিত্রঙঃ" পদের বিভক্তিগত বিষয় উল্লেখ করিতে হইয়াছে। এজন্য আমি অমর্ষ প্রকাশ করিয়া রামদাস বাবুকে আক্রমণ করি নাই। রামদাস বাবু এবিষয়ে আমাকে আক্রমণকারী বলিয়া মনে করাতে আমি দুঃখিত হইয়াছি।

উপসংহার সময়ে পুনর্ব্বার আমার বক্তব্য এই, গোল্ডষ্টুকর আশ্চর্য্য, অনিত্য ও সাক্ষবন্ধাদির দৃষ্টান্ত দেখাইয়া পাণিনি ও কাত্যায়ন যে সমকালবর্ত্তী নহেন, ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। রামদাস বাবুও গোল্ডষ্টুকরের মতানুসারী হইয়া পাণিনি ও কাত্যায়নকে বিভিন্ন সাময়িক বলিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই। সুতরাং এবিষয়ে যখন মতবৈষম্য লক্ষিত হইতেছে না, তখন আশ্চর্য্যাদি শব্দ লইয়া বিচার করা বিড়ম্বনা মাত্র। যখন চরম সিদ্ধান্ত এক হইতেছে, তখন তাহার কারণ লইয়া বাগাড়ম্বর করিবার সার্থকতা কি? গোল্ডষ্টুকর "নির্ব্বাণেঽবাতে" এই সূত্র অবলম্বন করিয়াই পাণিনিকে বুদ্ধের পূর্ব্বসাময়িক বলিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, রামদাস বাবু বিচার্য্য বিষয় নয় বলিয়া এই সূত্রের সিদ্ধান্তের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন। যাবৎ "নির্ব্বাণোঽবাতে" সূত্রের সিদ্ধান্ত নিরাকৃত না হইতেছে, তাবৎ পাণিনি যে বুদ্ধের পরবর্ত্তী তাহার সমর্থন হইতেছে না। শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় দ্বারা হিন্দু হষ্টেলে প্রকাশিত। বিক্টোরিয়া যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ।।০ আট আনা।

আমরা সম্বন্ধ নির্ণয়ের প্রথমভাগ সমালোচন উপলক্ষে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে যে দুই চারি জন ভারতের পুরাবৃত্ত ও ইতিহাসের গবেষণায় নিমগ্ন আছেন রজনী বাবু তাঁহাদিগের অন্যতম। রজনী বাবু তদীয় জয়দেব-চরিত ও পাণিনি দ্বারা পূর্ব্বেই সাহিত্য জগতে সবিশেষ পরিচিত হইয়াছেন; সুতরাং এস্থলে আমাদিগকে তাঁহার বিষয়ে অধিক পরিচয় দিতে হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাসের প্রথম ভাগের প্রথম অধ্যায় আর্য্যদর্শনে প্রথমে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকার শীঘ্র গ্রন্থ-সমাপ্তির মানসে ইহাকে স্বতন্ত্র গ্রন্থের আকারে প্রতিমাসে এক খণ্ড করিয়া বাহির করিবেন সংকল্প করিয়াছেন। ইহাতে আর্য্যদর্শনের কিঞ্চিৎ ক্ষতি হইয়াছে বটে, কিন্তু সাধারণের অধিকতর উপকার হইবে আশায়, আমরা সে ক্ষতিতেও বিশেষ দুঃখিত হইলাম না।

সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস যদি সম্পূর্ণ হয়, তাহা হইলে ইহা বঙ্গসাহিত্য-মুকুটের একখানি অত্যুজ্জ্বল মণি বলিয়া পরিগৃহীত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু আজ আমরা শুদ্ধ প্রথমভাগের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। ইহার ভাষা অতি গম্ভীর ও হৃদয়-উত্তেজক ইহার ভাব আদ্যন্ত স্বদেশ-হিতৈষণাপূর্ণ। ইহার বিষয় অধিকতর গম্ভীর ও হৃদয়-উত্তেজক। ইহা পাঠ করিলে স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয় গভীর ভাবস্রোতে আপ্লুত হয়—না হইয়া থাকিতে পারে না। অতীত গৌরব ও ভবিষ্যতে আশা ভারতবাসীমাত্রেরই নির্ব্বাণোন্মুখ বীর্য্যবহ্নিকে সন্ধুক্ষিত করে।

এই খণ্ডে ভাবী প্রকাণ্ড অন্তর্বিপ্লবের ব্যবহিত কারণ-পরম্পরা সমালোচিত হইয়াছে। ভারত বর্ষের তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরেল লর্ড ডালহাউসীর সর্ব্ব-সংহারিণী রাজনীতিই যে সেই বিপ্লবের ব্যবহিত কারণ তাহা ইহাতে একপ্রকার প্রমাণীকৃত হইয়াছে। মুলতানেশ্বর মুলরাজের অকারণ নির্য্যাতন, রণজিৎ-মহিষী লোকললামভূতা মহারাণী ঝিন্দনের নিষ্ঠুর নির্ব্বাসন, নিরীহ ছত্রসিংহের নিষ্কারণ অবমাননা, অভিভাবকতাবস্থায় বিনা দোষে রণজিৎ-তনয় দলিপের রাজ্যাপহরণ, প্রভুশক্তিচ্ছলে সেতারা ঝান্সী প্রভৃতি স্বাধীন রাজ্য সকলের আত্মসাৎকরণ—প্রভৃতি অসংখ্য পাপ যে সেই প্রকাণ্ড বিপ্লবের দূরবর্ত্তী কারণ তাহা ইহাতে বিশদ-রূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

এ বিষয়টি অতি গুরুতর ও প্রকাণ্ড এবং গ্রন্থও আরব্ধ মাত্র। সুতরাং এবার আমরা এতৎ সম্বন্ধে সংক্ষেপে যৎকিঞ্চিৎ মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইলাম। গ্রন্থ সমাপ্ত হইলে ইহার স্বতন্ত্র ও বিস্তৃত সমালোচনা করিবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা রহিল।

ভৈষজ্য রত্নাবলী। আয়ুর্ব্বেদীয় সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসাগ্রন্থ। শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজ কর্তৃক পরিবর্দ্ধিত বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত ও প্রকাশিত। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। আমরা মনে করিয়াছিলাম, এই পুস্তক দুই খণ্ডের সবিস্তর সমালোচন করিব; নানা কারণে এত দিন তাহা

ঘটিয়া উঠে নাই। এজন্য প্রকাশক মহাশয়ের নিকট লজ্জিত আছি। এরূপ ভরসা করি, সুবিধা অনুসারে ভৈষজ্য রত্নাবলী লক্ষ্য করিয়া একটী স্বতন্ত্র প্রস্তাব আর্য্যদর্শনে প্রকাশ করিতে যত্নপর হইব। যাহা হউক, স্বতন্ত্র প্রস্তাবের অপেক্ষায় না থাকিয়া আপাততঃ আমরা ইহাই বলিতেছি যে, বিনোদলাল বাবুর উদ্যম প্রশংসনীয়। তিনি ভৈষজ্য রত্নাবলী প্রচার করিয়া নষ্ট-প্রায় আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ উদ্ধার করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা পাইয়াছেন। অনুবাদটী বিশদ হইয়াছে।

গুপ্তপ্রেস-পঞ্জিকা— শকাব্দা ১৭৯৯, ইং ১৮৭৭। ৭৮ সাল, ১২৮৪ সাল। বালি নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীচন্দ্র বিদ্যানিধি কর্ত্তৃক গণিত। শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা মাত্র। আমরা এই পঞ্জিকা খানি দেখিয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম। আমাদিগের দেশে এত স্বল্প মূল্যে এত উৎকৃষ্ট পঞ্জিকা প্রকাশিত হইতে পারে বলিয়া আমাদিগের পূর্ব্বে বিশ্বাস ছিল না। ছবি গুলি এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে, যে ইহাতে আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেরই চিত্ত আকৃষ্ট হয়। মুদ্রাঙ্কন কার্য্যও সুপরিপাটী হইয়াছে। আশা করি দুর্গাচরণ বাবু অচিরাৎ তাঁহার পরিশ্রম ও ব্যয়ের সমুচিত পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

কুসুম—সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচন। শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মিত্র দ্বারা সম্পাদিত। বহরমপুর ধন সিন্ধু যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য বার্ষিক ১।৵০। যখন উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সাময়িক পত্র সকল অন্নাভাবে মৃতপ্রায় হইয়া উঠিতেছে, তখন কুসুমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার আবশ্যকতা কি আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমাদিগের ভয় পাছে কুসুম মুকুলেই বিনষ্ট হয়।

My Leisure Hours কবিতা-গ্রন্থ। শম্ভুচন্দ্র দে বি, এল্ প্রণীত। জি পি রায় প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ॥৵০ আনা মাত্র। কবিতাগুলি মন্দ নহে। কিন্তু শম্ভু বাবুর এ পণ্ডশ্রম কেন? কবিতা লিখিবার যদি নিতান্তই ইচ্ছা ছিল, মাতৃভাষায় লিখিলেই পারিতেন। তাঁহার কবিতাগ্রন্থ অনন্ত ইংরাজী সাহিত্যসাগরে নগণ্য জলবুদ্বুদ মাত্র। কিন্তু বঙ্গভাষায় এখানি একখানি উপাদেয় গ্রন্থ হইতে পারিত।

বন-কুসুম—পদ্যগ্রন্থ। কলিকাতা ৯৩ ন কালেজ ষ্ট্রীট, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীভুবনমোহন ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য ৮০ আনা মাত্র। ইহাতে লক্ষ্মী পূজা, পাপিয়া, প্রণয় পরীক্ষা প্রভৃতি ৬টী কবিতা লিখিত আছে। আমরা প্রায় সকল গুলিই একবার করিয়া পাঠ করিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে কোনটীতেই আমাদিগের হৃদয় দ্রবীভূত বা উত্তোলিত হইল না। স্থানে স্থানে কবিত্বশক্তির অনতি-পরিস্ফুট উল্লাস দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সমগ্র ধরিতে গেলে বলিতে হইবে যে গ্রন্থকারের উদ্যম বিফল হইয়াছে। চাটরটন্, ক্যাম্বেল্ প্রভৃতি কবিগণ বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে অতি উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিয়াছিলেন বলিয়া সকলেরই আপনাদিগকে ক্যাম্বেল্ বা চাটরটন্ মনে করা উচিত নহে। একথা গ্রন্থকার বুঝেন; বুঝিয়াও যখন উদ্যম নিবারণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই, তখন আমাদিগের অধিক বলা বৃথা। তথাপি আমরা গ্রন্থকারকে একটী উপদেশ দিই। ভারত কবিত্ব-রত্নাকর। এখানে প্রকৃতির মোহিনী মূর্ত্তি অধিবাসী মাত্রেরই হৃদয়কে আশৈশব কবিত্বপ্রবণ করিয়া তুলে। এইজন্য ভারতে প্রায়

সকলেই কবি। ভাবিতে শিখিলেই কবি, লিখিতে শিখিলেই কবি। যে দেশে যে দ্রব্যের প্রাচুর্য্য, সে দেশে সে দ্রব্যের কিঞ্চিৎ অনাদর। যাহা দুর্লভ নয়, তাহাতে লোকের চিত্ত সহজে আকৃষ্ট হয় না। সুতরাং ভারতে কবিতা দ্বারা চিত্ত আকৃষ্ট করিতে হইলে, কবিত্ব শক্তির চরম উৎকর্ষ প্রদর্শন করা চাই। যে ভারতে কালিদাস, ভবভূতির জন্ম, যে ভারত হইতে শকুন্তলা, উত্তররামচরিত প্রভৃতির উদ্ভব; সে ভারতে যে, যে সে কবি যেমন তেমন কবিতা লিখিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিবেন, তাহার কোন আশা নাই। কত শত সহস্র কবি সংস্কৃত সাহিত্যে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন; কিন্তু কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষ ও ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি কয়জন ব্যতীত, আর সকলেই প্রায় কালের অনন্ত প্রবাহে বিলীন হইয়াছেন। সেই শত-সহস্র কবি নৃত্যের পুত্তলিকার ন্যায় এক বার জন-সমক্ষে আসিয়া নাচিয়া কুঁদিয়া কৃত্রিম হাসি হাসিয়া কালের করাল যবনিকার অভ্যন্তরে অন্তর্ধান করিয়াছেন। কে আর এক্ষণে তাঁহাদিগের সংবাদ লয়? কে আর এক্ষণে সেই ভীষণ যবনিকা উত্তোলন করিয়া তাঁহাদিগের সহিত আলাপ করে? ক্রমে তাঁহাদিগের নাম পর্য্যন্তও অগাধ বিস্মৃতিসাগরে ডুবিতে চলিল। আমাদিগের নবীন কবিগণ যদি এদশার প্রয়াসী হন, তাহা হইলে তাঁহারা সহস্র কবিতাগ্রন্থ প্রসব করুন আমাদিগের কোন আপত্তি নাই। আর যদি নিজের ভবিষ্যৎ মঙ্গল চান্, আর স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে কালিদাসের ন্যায় ঘোরতর তপস্যায় নিমগ্ন হউন। বহুদিনের তপস্যায় যখন সরস্বতী প্রীত হইয়া বর প্রদান করিবেন, তখনই যেন পবিত্র লেখনী ধারণ করেন। তাঁহাদিগের যেন মনে থাকে যে সামান্য আরাধনায়, সরস্বতী প্রীত হইবার নহেন। ' এই উক্তি যে শুদ্ধ এই গ্রন্থ ও ইহারই প্রণেতার প্রতি প্রযুক্ত হইল এরূপ নহে, নিম্নলিখিত সমস্ত কাব্যও কবিই ইহার বিষয়ীভূত।

কুসুম-কাননে কণ্টক-তরু। কলিকাতা ১১ নং পটুয়াটোলা লেন, নূতন ভারতযন্ত্র। শ্রীবামনৃসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত। মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

ভারত-ঈশ্বরী—উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা কর-প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ৶০ আনা মাত্র।

বঙ্গাঙ্গনা কাব্য, প্রথম খণ্ড। শ্রীরজনীনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। বরিশাল সত্য প্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

কবিতা-কুসুম— শ্রীরামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ঢাকা সুলভযন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

কুসুমকলিকা—শ্রী প্রসন্নকুমার ঘোষ প্রণীত। কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্রে শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।৵০ আনা।

মণিহারাফণী ভারত-জননী—পদ্য। শ্রীপার্ব্বতী নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মুর্শিদাবাদ। বহরমপুর সত্য রত্ন যন্ত্রে শ্রীনবীন চন্দ্র চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত। মূল্য /০ এক আনা মাত্র।

দুখসঙ্গিনী।*

প্রণয়ের গীত চিরকালই মধুর লাগে। যৌবনে মধুর লাগে এই জন্য, যে তখন হৃদয় প্রণয়ে পরিপূর্ণ থাকে। যৌবন অতীত হইলে প্রৌঢ়াবস্থায় যদিও মন সমস্ত যৌবন-লীলায় বিসর্জ্জন দেয়, যদিও মনে মনে আমরা প্রণয়ের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করি, কিন্তু হৃদয় তাহাতে সায় দেয় না। প্রণয়ের কথা উঠিলেই হৃদয় সেই দিকে অনিবার্য্য আকৃষ্ট হয়। জীবন যখন বার্দ্ধক্যের মরুভূমিতে উপনীত হয়, তখন প্রণয়কথা দ্বিগুণতর মধুর লাগে। তখন স্মৃতি তরুণকালের হরিৎ দৃশ্যে আপন কনকমন্দির যে রূপে শোভিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা বৃদ্ধের কল্পনাচক্ষে উদিত করিয়া দেন। বৃদ্ধ আবার যৌবন-রাগে উৎসাহিত হইয়া উঠেন। তাঁহার শিরায় বলসঞ্চার হয়, তাঁহার বদন হর্ষ-বিস্ফারিত হয়, তিনি আনন্দে পরিপূর্ণ হন। বাস্তবিক প্রণয়ে যে আনন্দ, যে উৎসাহ, যে উল্লাস, যে উন্মত্ততা আছে, জীবনে আর কিছুতেই তাহা পাওয়া যায় না। জীবন যখন প্রণয়-পূর্ণ হয় তখন জীবনের বসন্তকাল উদয় হয়। তখন মানব যেন এক নবজীবন প্রাপ্ত হন। এই বসন্তকালের মধুরতা তাঁহার চির-জীবনে ব্যাপ্ত হইতে থাকে। তাঁহার জীবনের মধ্যে এই কয়েকদিনই সুখের কাল। যে কয়েক দিন প্রণয়ের উন্মত্ততা থাকে সেই কয়েক দিনই সুখে অতি-বাহিত হয়। আর কিছুতে জীবনে তত-দূর উন্মত্ততা ও উল্লাস উৎপাদিত করিতে পারে না। সুতরাং আর কিছুতেই হৃদয় ও মন ততদূর একাগ্র হয় না; তখন জীবনে কেবল প্রণয়-স্বপন প্রণয়-চিন্তা এবং প্রণয় ভাবনা। পৃথিবীর দুঃখময়ী ভাবনা চিন্তা সমুদয় তিরোহিত হয়। এক প্রণয়-রাগে সকল শরীর পুলকিত হইয়া উঠে। পৃথিবীতে স্বর্গসুখ উপলব্ধি হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, এ সুখ অধিক কাল স্থায়ী হয় না। এ উন্মত্ততা ক্ষণকাল পরেই তিরোহিত হয়। এই দেখুন কবিবর সেক্সপিয়ার কি বলেন:—

"———And fancy (love) dies
In the cradle where it lies."

প্রণয়ের উন্মত্ততা ক্ষণকাল-স্থায়ী বটে, কিন্তু ইহা জীবন ময় পরিব্যাপ্ত হয়। সমস্ত ভবিষ্য জীবনে মধুরতা সঞ্চারিত করে। যখনই প্রণয়ের কথা মনে পড়ে, আবার জীবনের বসন্ত-সুখ সকলই মনে হয়। আবার জীবনকে মধুময় জ্ঞান হইতে থাকে। এই জন্যই প্রণয়-গীত চির কালই মধুর লাগে।

* গীতিকাব্য। কলিকাতা নূতন ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত। ১২৮২ সাল।

আমাদিগের সমালোচ্য গ্রন্থ খানির অধিকাংশই এই প্রণয় গীতে পরিপূর্ণ। সুতরাং ইহার অধিকাংশই আমাদিগের মধুর লাগিয়াছে। আমরা বিচার করিয়া দেখিয়াছি প্রণয় গীতে আমাদিগের দেশ উৎসন্ন গিয়াছে; এজন্য আমরা শতবার বলি আর প্রণয়-গীতে আমাদিগেব প্রয়োজন নাই। কিন্তু যখনই প্রণয় গীত পড়ি অমনি আবার হৃদয় নাচিয়া উঠে। আমাদিগের কবিগণও এই গীত যেমন হৃদয়ের সহিত গাহিতে জানেন, আজিও অন্যবিধ গীত সেরূপ গাহিতে পারেন না। এই গীত তাঁহাদিগের হৃদয়ের বীণা হইতে উত্থিত হয়, সুতরাং ইহা সুধারবে বাজিয়া উঠে।

প্রেস্‌কট্ যদি বাঙ্গালা জানিতেন তাহা হইলে কখনই বলিতেননা, যে ইতালীয় ভিন্ন আর কোন জাতিব কবিতায় প্রণয় এত বিচিত্র রূপে চিত্রিত হয় নাই এবং আর কোন জাতিব প্রেমগর্ভ গীতাবলি তত প্রচুর নহে †। বাস্তবিক বাঙ্গালা ভাষায় প্রেমেব এত সুন্দর সুন্দব সহস্রবিধ ভাব সুবর্ণিত হইয়াছে যে আমার অনুমান হয়, ইতালীয় ভাষাতেও ততদুর হয় নাই।

প্রণয়ীর এমন ভাব নাই, এমন অবস্থা নাই, যাহা বাঙ্গালা ভাষায় চিত্রিত হয় নাই। আমাদিগেব বিদ্যাপতি হইতে, কবিওয়ালার গীতাবলি পর্য্যন্ত বিলোড়ন করিয়া দেখ, প্রণয়ের সমস্ত ভাব ও অবস্থার চিত্র তাহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। তবু ও এই প্রণয় গীত আজিও সমুদায় সমাপ্ত হয় নাই। ইহার অন্যবিধ নব নব ভাব ভবিষ্য বাঙ্গালা কবির গাহনীয় হইবে। ইতালি যখন অধঃপাতে গিয়াছিল, যখন প্রণয়ে নিমগ্ন হইয়াছিল, তখন ও তাহা বাঙ্গালার ন্যায় হয় নাই। বঙ্গদেশ অধঃপাতে গিয়া কেবল প্রণয়ে উন্মত্ত হইয়া আছে। আজিও এ উন্মত্ততার পরিশেষ হয় নাই। সুতরাং বাঙ্গালি কবি আজিও প্রণয়ের নূতন নূতন ভাব বিকশিত করিবেন। আমাদিগের দুখসঙ্গিনী প্রণেতা এই প্রণয়ের এক নূতন ভাব নূতন স্বরে গাহিয়াছেন।

পেট্রার্ক, সুন্দরী লরাব প্রেমে হতাশ হইয়া যে খেদ গান গাহিয়াছিলেন, একদা সমস্ত ইতালী তাহাতে বিমুগ্ধ হইয়াছিল। পেট্রার্কেব খ্যাতি এবং সুমধুর কবিতা দেখিয়া লোরেন্‌সো ডি মেডিসি, ট্যাসো প্রভৃতি অনেকেই তাঁহার অনুকরণে প্রবৃত্ত হন কিন্তু কেহই পেট্রার্কের মত কবিতা লিখিতে পারেন নাই। পেট্রার্ক বহুযত্নে অনেক আশা করিয়া যে ল্যাটীন কবিতা কলাপ রচনা করিয়াছিলেন, আজি চারি শত বৎসব হইল, তাহা বোধ হয় চারি জন লোক পড়িয়াছে কি না সন্দেহ; কিন্তু যে প্রণয় গীত লোকে প্রার্থনা করিলেই একদণ্ড বসিয়া রচিয়া দিতেন; সেই অনায়াস-প্রসূত দাতব্য গীত গুলি

† See Pescott's Essay on the Poetry and Romance of the Italians.

সকলের কর্ণে মধুবর্ষণ করিয়াছে। পেট্রার্ক একদিনও ভাবেন নাই, তাঁহার লরার প্রণয়গীত, তাঁহার লরার জন্য খেদোক্তি শুনিয়া পৃথিবী মোহিত হইবে। কিন্তু সেই হৃদয়ের বেদনা, সেই আন্তরিক খেদগান শুনিয়া লোক বিমোহিত হইল। লোকে পেট্রার্কের সহিত লরার জন্য কাঁদিল। লোকে পেট্রার্কের চক্ষে লরার সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিমোহিত হইল। ইতালী পেট্রার্কের খেদগানে পরিপূর্ণ হইল। কারণ, সেই গীত হৃদয়ের বীণা হইতে উত্থিত হইয়াছিল; সুতরাং লোকের হৃদয়ে তাহা প্রতিধ্বনিত হইল। যাঁহারা পেট্রার্কের অনুকরণ করিতে গিয়াছেন, তাঁহাদিগের গীত হৃদয়তন্ত্র হইতে উত্থিত হয় নাই; তজ্জন্য হৃদয়ের লয়ের সহিত তাহা প্রতিধ্বনিত হয় নাই।

পেট্রার্ক লরার প্রেমে হতাশ হইয়া সেই প্রণয়িনীর উদ্দেশে দেশে দেশে ক্রন্দন করিয়াছেন। তাঁহার মন লরার জন্য একান্ত লালায়িত হইয়াছিল। লরা কখনই তাঁহার হন নাই বটে, তথাপি তিনি কখন লরাকে ভুলেন নাই। তাঁহার সেই যৌবন-কালের প্রণয়পাত্রী চিরকাল কল্পনায় এক স্বর্ণ-প্রতিমা রচিত করিয়া রাখিয়াছিল। পেট্রার্ক চিরদিন সেই প্রতিমার নিকট আপন হৃদয় উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই হৃদয় যে অনুরাগপূর্ণ শোচনীয় সুরে গান গাহিয়াছিল তাহাই পেট্রার্কের প্রণয়গীত, এবং সেই গীতেরই সুরে আমাদিগের দুখসঙ্গিনী গান গাহিয়াছেন।

দুখসঙ্গিনী গ্রন্থকারের নিশ্চয় এক জন লরা আছে, এবং সে লরা নিশ্চয় পরকীয়া ভদ্র-কুলবধূ। সে সুন্দরী আমাদিগের কবির জন্য নহে; কিন্তু কবি তাঁহার প্রতি অনুরাগে পরিপূর্ণ। সুন্দরী পতিদুঃখে কাতরা, সেই দুঃখে কবি আবার দ্বিগুণতর দুঃখিত। এ প্রকৃত ভালবাসারই চিহ্ন।

পেট্রার্ক লরাকে লাভ করিতে পারেন নাই বলিয়া যে গান গাহিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাহাতে ইতালীয়গণ তৎসঙ্গে সমদুঃখী হইয়াছিল। আমাদিগেরও কবি যে দুঃখসুরে গান ধরিয়াছেন, আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি দুখসঙ্গিনীর পাঠক মাত্রেই তাহাতে দুঃখিত হইবেন। তাহার কারণ এই, কবি আত্ম-কথা বর্ণনা করিলে লোকে অধিকতর অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করে এবং তাহাদিগের হৃদয় অধিকতর আকৃষ্ট হয়। আমরা ও মেকলের সহিত আশ্চর্য্য হইয়াছি * লোকে কবির আত্মকথা পড়িতে এত অনুরাগী কেন? কথাবার্ত্তায় যে আত্মকথা (Egotism) এত বিরক্তিকর হয়, লেখাতে তাহার মোহিনী শক্তি কোথা হইতে আইসে? প্রেমিক দম্পতিরা কেবল পরস্পরের প্রণয়-জ্ঞাপক কথায় সন্তুষ্ট হয়; নহিলে আত্মকথা আত্ম-প্রশংসা ও আত্মশ্লাঘা

* See Macaulay's essays on Petrarch contributed to the Quarterly Magazine April 1824.

কাহারই মুখে মিষ্ট লাগে না। যিনি যেরূপ গুরুজন হউন না কেন, আমার সহস্র উপকার করুন না কেন, আমার পরম আত্মীয় হউন না কেন, রূপে কন্দর্প ও গুণে বৃহস্পতি হউন না কেন, তথাপি আমি কাহারও মুখে আত্মকথা ও দম্ভ শুনিলে অমনি মুখ ফিরাইব। পূর্ব্বকৃতউপকার, ভয়, সম্মান, কিছুতেই আত্মকথার দোষ ও রূঢ়তা অপনয়ন করিতে পারে না। যিনিই আপনার কথা পাঁচ কাহন কহেন, তাঁহারই কথায় লোকে চটিয়া উঠে। কিন্তু কথাবার্ত্তায় এত বিরক্তিকর হইলেও লেখাতে ইহার চমৎকার মোহিনী শক্তি আছে। রুসো (Rousseau) ইহার আশ্চর্য্য শক্তি বিলক্ষণ প্রকাশ করেন। লর্ড বাইরণ তদ্রূপ আত্মকথায় তাঁহার কাব্য সমুদায় পরিপূর্ণ করিয়া জগতের মনোহরণ করিয়াছেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রচ্ছন্ন আত্মকথায় সহস্র জন তাঁহাকে সাধুবাদ দিতেছে এবং তাঁহার স্তুতিবাদে ও উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। মিলটন যেখানে আত্ম বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, লোকে তাঁহার কাব্যের সেই স্থল কত অনুরাগের সহিত পাঠ করিয়া থাকেন। কৃত্তিবাস ও কাশীদাস যেখানে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন, সে স্থল লোকের মন কতদূর আকৃষ্ট করিয়াছে। লোকে হোমরের কাব্য পড়িতে ডিমোডোকস্‌কে (Demodocus) হোমর বলিয়া অনুমান করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। কেহ কেহ বলেন, ইউলিসিস যে ফিমিয়সের (Phemius) জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনিই হোমরের নামান্তরে কাব্য মধ্যে বর্ণিত হইয়াছেন। আমরা আর দৃষ্টান্তের বাহুল্য করিতে চাহি না, যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে কবির আত্মকথা পড়িতে লোকে সাতিশয় প্রীতি লাভ করিয়া থাকে। দুখসঙ্গিনী গ্রন্থকারের প্রণয়-কথা এই জন্য আমাদিগের নিতান্ত চিত্ত হরণ করিয়াছে।

প্রভাতে যখন সরোবরে কমলিনী হাসিতে ও দুলিতে থাকে তখন তাহার শোভা ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া কে না বিমোহিত হয়েন? কিন্তু যখন গগণ-দেশ মেঘাচ্ছন্ন হয়, যখন সেই সরোবরে ঘনাবলীর ঘোর মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইয়া বারিরাশি গম্ভীরাকার ধারণ করে, যখন সেই সরোবরের চারিদিক্‌ অন্ধকারময় হইয়া আইসে, তখন কি কেহ সেই কাল-জলে কমলিনীর স্থির সৌন্দর্য্য দেখিয়াছেন? অন্য যদি কেহ না দেখিয়া থাকেন, কবি তখন সেই সরোবর-কূলে কমলিনীর যে সৌন্দর্য্য দেখিবেন, সাধারণ সকল লোক তাহা দেখিতে পাইবে না। প্রকৃতির মলিন দৃশ্য-মধ্যে কমলিনী তখন আর হাসিতে থাকিবেন না। তিনি সেই গম্ভীর দেশে স্থির ও বিশদবদনে দাঁড়াইয়া থাকিবেন; যেন অপেক্ষা করিতেছেন কখন বাতাঘাতে আহত ও মেঘের বারিধারায় সৌরভলুণ্ঠিত হইবেন। তখন সেই সরোবরে কমলিনীর যে সৌন্দর্য্য, সেই সৌ-

ন্দর্য্য দর্শনের সুখ কেবল কবিরাই সম্ভোগ করিতে পারেন। কামিনীর প্রফুল্ল মুখকমলে যে সৌন্দর্য্য, তাহাতে সকলেই মোহিত হয়েন। কিন্তু কামিনীর বিষণ্ণ মূর্ত্তিতে যে সৌন্দর্য্য, তাহা কেবল কবিরই সম্ভোগনীয়। সুন্দরীর হাস্যবিস্ফারিত বদন কমলে যে সৌন্দর্য্য, তাহা কি তাঁহার অশ্রুবিধৌত বিষণ্ণ বদনের স্থির সৌন্দর্য্যের সমতুল্য হইতে পারে? সুন্দরীর নয়ন হইতে যখন অশ্রুবিন্দু মুক্তিকার ন্যায় বিগলিত হইতে থাকে তখন তাহার বদনদেশ যে ভাবে ঢল ঢল করিতে থাকে তাঁহার শোভা কেবল সহৃদয় কবিগণই বুঝিতে পারেন। এই সৌন্দর্য্য বুঝিবার বিষয়, বর্ণনার বিষয় নহে। কবি ক্যাম্বেল্ (Campbell) কহিয়াছেন :—

"For Beauty's tears are lovelier than her Smile." এই কথার প্রমাণার্থেই যেন আমাদিগের দুখসঙ্গিনীর কবি এই ছবিটি ধরিয়াছেন :—

"সেই দিন প্রণয়িনি! ভুলিব কি হায়!
ভুলিব কি সে প্রতিমা বিষাদ মণ্ডিত—
সেই বেশ বিষাদিনী—
মনোদুঃখে পাগলিনী,
হৃদয়ের পটে মম থাকিবে অঙ্কিত।
সেই যে আমার পানে রহিলে চাহিয়া।
নীরবে সতৃষ্ণ আঁখি আনত আননে,
যথা বননিবাসিনী
পতিহারা কুরঙ্গিনী,
করুণ নয়নে চায় সুদূর কাননে।"

এই সুন্দরীর ভাবপূর্ণ মুখে যে সৌন্দর্য্য আছে, আমাদিগের কবি তাহা অনেক স্থলেই প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, বিষণ্ণতায় যদি কিছু সুখ থাকে, আমাদিগের কবি সে সুখ সম্ভোগ করিয়াছেন। তিনি যে কেবল নিজে সেই সুখ সম্ভোগ করিয়াছেন এমত নহে, তাঁহার পাঠকগণকেও সেই সুখে সুখী করিবেন। তিনি "Will teach impassion'd Souls the Joy of Grief" সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয়ে সমদুঃখের সুখোৎপাদন করিবেন, এবং যখন সেই সমদুঃখ সুন্দরীর পক্ষপাতী হয়, তখন সেই সমদুঃখীজনকে দেখাইবেন,—বিষাদমণ্ডিত সুন্দরীর মুখপ্রতিমা কত বিমোহনীয় রূপে প্রভাসিত হয়।

আমরা দুখসঙ্গিনী গ্রন্থকারের প্রণয়গীতের যে দুইটী বিশেষ ধর্ম্ম ও গুণ তাহা বিবৃত করিলাম। এই প্রণয়কবিতা গুলির প্রধান দোষ এই, ইহাদিগের অধিকাংশই ইন্দ্রিয়সুখপর আদিরসে পরিপূর্ণ। সমগ্র বঙ্গ সাহিত্যের আদিরসগর্ভ কবিতার বরাবর যে দোষ ঘটিয়া আসিয়াছে, সমালোচ্য কবিতাগুলি সে দোষ হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই।

যৌবনের নবীন হৃদয়ে যে প্রেমানুরাগ সঞ্চিত হয়, বিদ্যাসুন্দর ও রোমীয় জুলিয়েটে যে প্রেমের পরিচয় হইয়াছে, সেই প্রেম বঙ্গসাহিত্যের আদিরস। যে প্রেম ওথেলো ও ডেস্‌ডিমোনার প্রাণ, সে প্রেম বঙ্গসাহিত্যের কোন স্থানেও দেখা যায় না। ওথেলো ও ডেস্‌ডিমোনার প্রেমের

মূল কোথায়?

"She loved me for the dangers I had passed,
And I loved her that She did pity them'

এই খানে এই দম্পতির প্রেমের মূল। তাহাদিগের প্রেম হৃদয়গত, বাহ্য সৌন্দর্য্য-সম্ভূত নহে। এইটি বিশেষ রূপে দেখাইবার জন্যই সেক্সপিয়ার ওথেলোকে কৃষ্ণকায় মূর সাজাইয়াছেন। ডেস্‌ডিমোনার এই হৃদয়গত প্রণয়ের প্রসারণ কিরূপ হইয়াছিল, তাঁহার সেই প্রেমের গভীরতা ও দৃঢ়তার পরিচয় দিবার জন্যই যেন সেক্সপিয়ার ওথেলো নামক নাটকখানি বিরচন করিয়াছেন। এরূপ প্রণয়চিহ্ন পাইবার জন্য বঙ্গসাহিত্য বিলোড়ন কর, সকল কষ্ট বৃথায় হইবে। এই দেখুন বঙ্গসাহিত্যের বিরহীর স্বপ্নে কি উদয় হইতেছে।

জীবন সরসে তুই কেন আজি নলিনী
ফুটিলে, ছুটালে প্রাণে দুঃখের লহরী;
মলিন বদন খানি,
সেই সুকোমল পাণি,
আবার পড়িল মনে নয়ন-সফরী।
সেই সুমধুর স্বর প্রণয়-পূরিত,
কোকিল কাকলী যেন নিকুঞ্জ সদনে;
অধরে সরল হাসি,
বিনোদ সৌন্দর্য্য রাশি,
কুসুমললামময় নবীন যৌবনে।" ইত্যাদি

* * * * *

"অযত্নে বসন খানি পড়িছে খসিয়া,
বিবসনা, পয়োধর চারু বক্ষঃস্থলে,
মন্থর গমন ভরে
কাঁপিতেছে থরে থরে
খেলাইছে সমীরণ সলিল অঞ্চলে।

* * * * *

চলিতে যখন তুমি বরাঙ্গ নাচিত,
নবচূতলতা যথা মুকুলের ভরে,
পরসিয়া সমীরণ
নাচে সুখে অনুক্ষণ,
ধীরে ধীরে মধুমালা বিতরণ করে।" ইত্যাদি

স্থলান্তরে:—

সখিরে!—

কত সুখে ছিনু দোঁহে প্রণয়ের মিলনে,
যেন রে কুসুম দুটী, একবৃন্তে আছে ফুটী,
সরস মধুর মাসে নিরজন কাননে।
উন্মত্ত যুগল মন, এক মনে সম্মিলন,
মধুর প্রণয়-সুখে বিমোহিত দুজনে।
পরশি প্রণয় সুখ, আনন্দে নাচিত বুক
প্রেম প্রবাহিনী নীর ছুটিত এ মরমে,
কত সুখ হোত হায়, তব প্রেম-প্রতিমায়
স্নেহ-সিংহাসনে রাখি, দেখিতাম নয়নে।
সেই মুখ শশধর, নিখর নিতম্ব ধর,
অধর-জড়িত হাসি নিরুপম ভুবনে।

প্রেয়সি!—

যখন তোমারে ধরে, প্রণয়ে চুম্বন করে,
রাখিতাম প্রেমভরে এই বক্ষঃস্থলেরে;
যবে করে কর ধরি, কহিতাম প্রাণেশ্বরি!
আমার মতন সুখী নাহি ধরাতলেরে,
তখন জানিনি হায়, প্রণয় যে বিষময়,
প্রণয় অমৃত সাথে আছে হলাহল রে!"

এই উদ্ধৃত কবিতাবলির মধ্যে

কত সুখে ছিনু দোঁহে প্রণয়ের মিলনে.
যেনরে কুসুম দুটী, একবৃন্তে আছে ফুটি,

সরস মধুর মাসে, নিরজন কাননে।" এই কতিপয় পঁক্তিতে যে সুন্দর ভাবটি বিকশিত হইয়াছে তাহা বাঙ্গালা ভাষায় অতুলনীয়। ইহাতে দম্পতির প্রণয়-সুখ কি চমৎকারভাবে প্রদর্শিত হইতেছে। কিন্তু কবি তৎপরে যে সমস্ত ভাব তাহাতে যোজিত করিয়াছেন তাহাতে সেই ইন্দ্রিয়সুখপরতা বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং ঐ প্রথম ভাবটিকে যেন কলঙ্কিত করিতেছে। আমরা নিম্নে ইং-রাজী হইতে একজন সামান্য কবির কয় ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি, পাঠকগণ তুলনা করিয়া দেখুন ইহার পবিত্র প্রণয় চিত্র কেমন বিসদৃশ এবং সুন্দর ভাবে পরিপূর্ণঃ—

"For ever would the fond enthusiast rove,
With Julia's spirit, thro' the shadowy grove,
Gaze with delight on every scene she planned,
Kiss every floweret planted by her hand.
Ah! still he traced her steps along the glade,
When hazy hues *and glimmering lights* betrayea
Half viewless forms;

* * * * * *

Dear was the grot that shunned the blaze of day;
She gave its spars to shoot a trembling ray.
The spring, that bubbled from its inmost cell.
Murmurred of Julia's virtues as it fell;
And O'er the dripping moss, the fretted stone,
In Florio's ear breathed language not its own."

Rogers.

দুখসঙ্গিনীর কবিতাবলির দ্বিতীয় দোষ—কল্পনার অসঙ্গতি। কবি এক এক সময়ে প্রকৃতির চমৎকার ও গভীর দৃশ্যসমূহ বর্ণনায় কল্পনাকে এরূপ গম্ভীর ভাবে পূর্ণ করেন, যে তৎপরে তৎসদৃশ ভাব আর রক্ষিত হয় না; তৎপরে যে ভাব যোজিত ও অঙ্কিত হয় তাহার সহিত পূর্ব্ব কল্পনার সঙ্গতি থাকে না। কল্পনা একবার বিসারিত হয়, কিন্তু অচিরাৎ সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। এই দেখুন এ কি?

* * * * *

"বসি প্রেম সিংহাসনে
দেখিনু তোমার সাথে প্রেমের আরতি—
দেখিলাম প্রেমময় অনন্ত গগণ,,,
সুবিমল প্রেমময় সকল সংসার।

এই স্থলে কল্পনা কতদূর প্রসারিত হইল দেখুন, কিন্তু তৎপরেই কবি এই কল্পনাকে কেমন সঙ্কুচিত করিয়া দিলেন দেখুনঃ—

"প্রেম-পূর্ণ চন্দ্রানন,
প্রেমফুল্ল দুনয়ন,
প্রেমময় কথা গুলি, পীযূষ-আধার।

আবার দেখুন একি? কবি একবার কল্পনায় দেখিতেছেন।

"রক্ত তরঙ্গিণীময় অনন্ত আকাশ,
অস্তাচল সুশোভিত রবির কিরণে,
জ্বলিছে নীরদমালা,
যেন কাঞ্চনের থালা,
থুয়েছে প্রকৃতি সতী অম্বরে যতনে।

দূরে শূন্য নীরময়ী গিরিজা জাহ্নবী
গাইছে প্রণয় গীত বিরহ উচ্ছ্বাসে,
রজত লহরীগণ
শ্যাম অঙ্গে অনুক্ষণ,
নাচিতেছে মৃদু মন্দ সায়াহ্ন বাতাসে।

চুম্বিয়া প্রসূনবনে কুসুম আনন,
বহিতেছে সুকোমল নৈশ সমীরণ,
শ্যাম চুত দলে বসি,
মিলায়ে রাগিণী-রাশি,
জাগিছে কোকিল-বালা অদূর কাননে।

সকলি আনন্দময় অস্ফুট সন্ধ্যায়—
অস্ফুট তিমিরজালে ভূষিত ভুবন;
পূর্ব্বদিকে নীলাম্বরে,
বসাইতে শশধরে,
সাজায় যামিনী শুধু রজত আসন।"

কল্পনা এই বিশাল প্রকৃতি-সৌন্দর্য্যে যেরূপ বিসারিত ও মোহিত হইয়াছে, তৎপরে কি নিম্নলিখিত ভাবটি শোভা পায়?

"এ হেন সন্ধ্যায় সেই অদূরে আবার
দেখিনু দাঁড়ায়ে মম প্রেমের পুতলী
যেন মরি বনফণী,
খুলিয়াছে শিরোমণি,
খসেছে ভূতলে কিম্বা কনক-বিজলী।

কবি হয়ত ভাবিয়াছিলেন প্রকৃতির এই বিশাল সুন্দর দৃশ্য মধ্যে তাঁহার প্রেম-প্রতিমার গৌরব বৃদ্ধি হইবে। আমরা বলি ইহার ঠিক বিপরীত ঘটিয়াছে। তাঁহার প্রেম-প্রতিমাকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও সামান্য দেখাইয়াছে। কবি আবার যখন বলিলেনঃ—

"যেন মরি বনফণী
খুলিয়াছে শিরোমণি,

তখন পাঠকের কল্পনায় মণিকের ভাব যত না উদয় হয়, বনফণীর দৃশ্য তদপেক্ষা অধিকতর প্রতীয়মান হয়। তখন তিনি কবির প্রেমপ্রতিমাকে বনফণী রূপে কল্পনা করিতে যান ও সহসা চমকিয়া উঠেন। বনফণী শিরোমণি খুলিয়াছে—এ কথা বলিতে গেলে মাণিকের ভাব কিছুই উদয় হয় না, কল্পনার সমক্ষে একটি বনফণী যেন শির অবনত করিয়া রহিয়াছে, ইহাই জাজ্বল্যরূপে প্রতীত হইতে থাকে। আবার যখন পড়িঃ—

"খসেছে ভূতলে কিম্বা কনকবিজলী"

তখন ভূতলস্থ কনক-বিজলীর সহিত 'শূন্য-নীরময়ী' জাহ্নবী এবং উদ্ধৃত গগণস্থ দৃশ্যাবলির সঙ্গতি বুঝিতে পারিনা।

সমালোচ্য কবিতাবলির আর একটি ভাবগত দোষ এই—ভাব সকল নিতান্ত বিশৃঙ্খল ও অসম্বদ্ধ তজ্জন্য অনেক স্থল দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

দুখসঙ্গিনীর ভাবগত দোষ যাহাই থাকুক, ইহার পদবিন্যাস ও রচনায় যে সাতিশয় লালিত্য ও মধুরতা আছে তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কবি, পদ্য রচনা বিষয়ে অত্যন্ত নিপুণতা প্রদর্শন করিয়াছেন। পদগুলি সমান ওজনে বহিয়া যায়, কোথাও বাধে না। কেবল ইংরাজী কবিতার অনুকরণে কবি যেখানে দূরান্বয়ের সমাবেশ করিয়াছেন সেই খানে বাক্যস্রোত বাধিয়া যায়। অমিত্রচ্ছন্দে এ প্রকার দূরান্বয় তত দোষার্হ হয় না, কিন্তু মিত্রাক্ষরচ্ছন্দে পদভঙ্গদোষ বড় ভাল লাগে না, তাহা ঠিক যেন অমিত্র চ্ছন্দের ন্যায় শুনাইতে থাকে। এই পদ গুলি দেখুন কেমন শুনায়ঃ—

"চিরানন্দ প্রাণিকুল ভ্রমিছে, বদনে
নাহিক বিষাদ ধ্বনি বঞ্চিত যাতনা"
"জীবন সরসে তুই কেন আজি নলিনী
ফুটিলে, ছুটালে প্রাণে দুঃখের লহরী,"
"পরিয়া নবমী শশী
ললাটে, উজলি দিশি
অমৃতমালিনী সন্ধ্যা, ধরাতলে আসিছে।"

দুখসঙ্গিনীর গ্রন্থকার একজন নবীন লেখক, কারণ তাঁহার ভাবের এখনও শৃঙ্খলা ও প্রগাঢ়তা জন্মে নাই। নবীন লেখক প্রথমে যেমন পদ বিন্যাস ও রচনার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া থাকে দুখসঙ্গিনী-লেখকও তদ্রূপ করিয়াছেন। এ কথা বলাতে আমরা কিছু এমত বলিতেছি না যে, রচনার পরিপাটী সাধন করা অনাবশ্যক। প্রত্যুত আমরা বলি, যে রচনার পারিপাট্যসাধন করা আদৌ নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু কবির পক্ষে ইহাই শেষ নহে। ভাব লইয়াই কবি, এবং ভাবেই কবিত্ব প্রকাশ হয়। গ্রন্থকার অতঃপর তদ্বিষয়ে অধিকতর মনোনিবেশ করিলে তিনি যে একজন প্রসিদ্ধ সুলেখক হইবেন তাহার আর সন্দেহ নাই। আপাততঃ তাঁহার গ্রন্থ দেখিলে বোধ হয়, তিনি পদ রচনার প্রতি অধিকতর মনোযোগ দিয়াছেন; এবং তদ্বিষয়ে তিনি যে অনেক দূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহার আর সংশয় নাই। দুখসঙ্গিনীর যেখানেই পড়, ইহার রচনার এরূপ লালিত্য আছে যে ইহার সেইস্থলই পড়িতে অতি মধুর লাগে। রচনার প্রাঞ্জলতা থাকিলে ইহার পদাবলি অধিকতর প্রশংসনীয় হইত। আমাদিগের আশা আছে সময় ক্রমে এই গ্রন্থকারের রচনা সরল হইয়া আসিবে এবং তিনি একজন কবি বলিয়া সাধারণে গণনীয় হইতে পারিবেন।

শ্রীপুঃ——

আৰ্য্যজাতির ব্যবহার-বিজ্ঞান।

৬ষ্ঠ সংখ্যার অনুবৃত্তি।

অন্যান্য দেশের আচার ব্যবহার ও কার্য্য প্রণালী একরূপ অব্যবস্থিত যে, আজ যে প্রকার আচার, যে প্রকার ব্যবহার ও যেরূপ কার্য্য প্রণালী প্রচলিত আছে—দশ বৎসর পূর্ব্বের বা দশ বৎসর পরের আচার, ব্যবহার ও কার্য্য প্রণালী অনুসন্ধান করিলে তাহার কোনটির সহিত কোনটীর মিল হইবে না, একবারে সমস্তই পরিবর্ত্তিত দৃষ্ট হইবে; কিন্তু এদেশের সেরূপ অব্যবস্থিত ভাব নহে। পাঁচ হাজার বৎসরের প্রাচীন প্রথাও এদেশে অদ্যাপি অবিকৃত ভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে। এদেশের আচার, ব্যবহার, পরিচ্ছদ প্রভৃতি সমস্তই ধর্ম্ম সংস্রবে নিবদ্ধ, এজন্য তাহা এত দিন এদেশে অটল ভাবে চলিয়া আসিয়াছে, কিন্তু আর চলিবে না। এখন মনুষ্যের কল্পিত রীতি নীতির উন্নতির সময় বা প্রলয় দশা, এখন দশ সহস্র বৎসরের প্রতিষ্ঠিত প্রথা এক নিমেষের মধ্যে পরিবর্ত্তিত হইবে।

এখনকার বিচারপতিদিগকে যেমন ১০টার সময় ভাত মুখে দিয়া বিচারালয়ে দৌড়িতে হয়, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। পূর্ব্বে এইরূপ ছিল—

"দিবসস্যাষ্টমং ভাগং মুক্ত্বা ভাগত্রয়ন্তু যৎ।
স কালো ব্যবহারাণাং শাস্ত্রদৃষ্টঃ পরঃস্মৃতঃ॥
(কাত্যায়ন)

"ধর্ম্মাসন মধিষ্ঠায় সম্বীতাঙ্গঃ সমাহিতঃ।
প্রণম্য লোকপালেভ্যঃ কার্য্যদর্শনমারভেৎ॥"
(মনু)

বিচারকেরা ব্রহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া আপনার স্নান আহ্নিক ও দেবার্চ্চনা প্রভৃতি প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া কিঞ্চিৎ প্রাতরাশ গ্রহণ করিয়া ৪ দণ্ড বেলার পর বিচার স্থানে গমন করিতেন। ৮ দণ্ড কাল বিচার করিতে। তাঁহাদিগকেও এখনকার ন্যায় সম্বীতাঙ্গ হইতে হইত অর্থাৎ জামা যোড়া পরিতে হইত। বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রথমে ধর্ম্ম ও লোকপাল দেবতাদিগের উদ্দেশে নমস্কার করিতেন। অনন্তর কার্য্যদর্শনে প্রবৃত্ত হইতেন। বেলা দুই প্রহর হইলেই সভাভঙ্গ করিয়া গৃহে আগমন করিতেন।

কি বৈদ্যক শাস্ত্রকার ঋষি কি ধর্ম্মশাস্ত্রকার ঋষি সকলকারই মতে এদেশে আহারের পর বিশেষ চিন্তার কার্য্যকরা নিষিদ্ধ। তাঁহাদের মতে গ্রীষ্ম প্রধান দেশে "ভুক্ত্বা রাজবদাচরেৎ" আহারের

পর নিদ্রা ভিন্ন অন্যবিধ বিশ্রাম করাই বিহিত। দীর্ঘ-অহ নিদাঘ কালে দিবা-নিদ্রাও দূষণীয় নহে, শীত ঋতুতে দিবা নিদ্রাই দূষণীয়। ইহার ভাব এই যে, স্নান আহার করিলে শরীর স্বভাবতঃ শীতল হয় অর্থাৎ শারীরিক উষ্মতার ক্ষতি হয়। শীত ঋতুতে আপনা হইতেই শীতল হইতে থাকে, আহার করিলে ততোধিক শীতল হয়, নিদ্রা গেলে ততোধিক শীতল হইবার সম্ভাবনা। এজন্য বৈদ্যক শাস্ত্রে শীত ঋতুর দিবা-নিদ্রা শ্লেষ্মকর বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই শ্লেষ্মার অপর একটি নাম 'বলাশ' অর্থাৎ বলের নাশক। সুতরাং শীতকালে আহারের পর নিদ্রা না যাইয়া উষ্মতা উত্তেজনের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ শ্রম করা আবশ্যক বটে কিন্তু গ্রীষ্ম কালে তাহার আবশ্যক হয় না। কারণ, গ্রীষ্ম কালের ভোজন উষ্মতার বিনাশক নহে, কালগুণে প্রবৃদ্ধ উষ্মতার শাম্যকারী মাত্র। এই সকল কারণে ঋষিদিগের মতে এদেশে আহারের পর কোন গুরুতর কার্য্য করা অযুক্ত এবং শীত-প্রধান দেশের (দশটা পাঁচটা) প্রথা এদেশীয়দিগের শরীরের ক্ষতিকর।

"তিষ্ঠতু"—এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করা যাউক। বিচার নিষ্পত্তির রীতি পদ্ধতি—পূর্ব্ব কালের বিচার পদ্ধতি প্রকাশ করিতে হইলে প্রথমতঃ বাদী প্রতিবাদীকে গ্রহণ করা আবশ্যক। অর্থী, প্রত্যর্থী, আর বাদী প্রতিবাদী বা পূর্ব্ব-বাদী ও উত্তরবাদী তুল্য কথা। প্রথম আবেদনকারীর নাম বাদী আর তাহার উত্তর প্রদান কর্ত্তার নাম প্রতিবাদী। বাদী প্রতিবাদীর এইরূপ নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ থাকিলেও পূর্ব্বকালে ঠিক এরূপ নিয়মের দৃঢ় ব্যবস্থা ছিল না। অভিযোগের অবস্থা অনুসারেই বাদী প্রতিবাদী নিদ্ধারিত করা হইত। যথা,—

"যস্য চাভ্যধিকা পীড়া কার্য্যং বাপ্যধিকো ভবেৎ।
তস্যার্থিভাবো দাতব্যো ন যঃ পূর্ব্বং নিবে-দয়েৎ।"
(ব্যাস ও নারদ)

অর্থ এই যে বিবাদকারীদিগের মধ্যে যাহার পীড়াধিক্য অনুমান হইবে অথবা কার্য্যাধিক্য অনুমান হইবে, বিচারপতি তাহাকেই অর্থী করিয়া লইবেন। প্রথমে আবেদন করিয়াছে বলিয়া তাহাকে বাদী ভাব প্রদান করিবেন না। যদি যুগপৎ অর্থাৎ এক সময়েই যদি দুই বা তিন ব্যক্তি অভিযোগ উপস্থিত করে, তবে সে স্থলেও বাদী প্রতিবাদী ঐ নিয়মে স্থিরীকৃত হইবে।

পূর্ব্বকালে যে ব্রাহ্মণজাতির গৌরব অত্যন্ত প্রবল ছিল, তাহা এই রাজ-ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিলেও প্রতীত হয়। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোকেরা বিবাদ করিয়া বিচারালয়ে উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণের আবেদন অগ্রে গ্রহণ করা হইত। এই রূপ ব্রাহ্মণের অনন্তর ক্ষত্রিয়ের, ক্ষত্রিয়ের অনন্তর শূদ্রের অভিযোগ গ্রাহ্য হইত, যথা,—

"অহং পূর্ব্বিকয়া যাতাবর্থি প্রত্যর্থিনৌ যদা।
বাদো বর্ণানুপূর্ব্ব্যেণ গ্রাহ্যঃ পীডামবেক্ষ্য বা॥" (বৃহস্পতি)

বিবাদ কার্য্যে স্বয়ং উপস্থিত থাকাই তৎকালের নিয়ম ছিল বটে কিন্তু বিবাদ বিশেষে স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া প্রতিনিধি দ্বারা সমাধা করিবার রীতিও ছিল।

"মনুষ্য মারণে স্তেয়ে পরদারাভিমর্ষণে।
অভক্ষ্যভক্ষণে চৈব কন্যা-হরণ-দূষণে॥
পারুষ্যে কূট করণেহনুপদ্রোহে তথৈবচ।
প্রতিবাদী ন দাতব্যঃ কর্ত্তা তু বিবদেৎ স্বয়ম্।"

(কাত্যায়ন)

অর্থ——

হত্যাকারী (১), চৌর (২), পরস্ত্রী-অপহারী (৩), যে অভক্ষ্যভক্ষণ করিয়াছে (৪), যে কন্যকা-হর্ত্তা (৫), পরুষব্যবহারকারী (৬) কূটকারী অর্থাৎ যে জালিয়াৎ (৭),—ইহাদিগকে স্বয়ং উপস্থিত হইতে হইবে। প্রতিনিধি বা মোক্তার দ্বারা ইহাদের সম্বন্ধে অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না।

এক্ষণে (rape) নামক কেস্ যাহা বর্ত্তমান আছে, তাহার সহিত (৫) চিহ্নিত কন্যা হরণ অপরাধের ভিন্নতা আছে। রেফ শব্দের লক্ষ্য সাধারণতঃ বলাৎকার। কিন্তু কন্যাভিমর্ষণ শব্দের লক্ষ্য অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা অনুপযুক্ত ব্যবহার অবস্থায় অভিগমন করা। কন্যকা অন্যকা বলিয়া কথা নাই, বলাৎকার করিলেই রেফ কেস্ হয়, কিন্তু অকন্যকাবস্থায় বলপূর্ব্বক অভিগত হইলে তাহা কন্যকাভিমর্ষণ না হইয়া ঋষিদিগের সময়ে তাহা পরদারাভিমর্ষণের মধ্যে গণ্য হইত। পরদারাভিমর্ষণ-শ্রেণী ভুক্ত হইলেও তাহা প্রকৃত পরাদারাপহরণের সহিত তুল্য ছিল না। পরদার হরণ অপেক্ষা অবিবাহিতা প্রাপ্ত বয়স্কা স্ত্রীহরণের দণ্ড কিছু অল্প হইত। ইহাতে যুক্তি এই যে, অকামা পরস্ত্রী হরণ করিলে তাহার এবং তদীয় ভর্ত্তা এই উভয়কেই পীড়িত করা হয় এবং তাহার পাতিব্রত্য নষ্ট করা হয়, কিন্তু তাদৃশ কন্যকাভিমর্ষণে একতরকে পীড়িত করা হয় মাত্র এবং কন্যকা ধর্ম্মের ক্ষতি করাও হয়। কন্যকা ধর্ম্ম অপেক্ষা পাতিব্রত্য ধর্ম্মের গুরুত্ব আছে এবং বহুতরের পীড়ন রূপ অন্য একটি গুরুধর্ম্মও তৎকার্য্যে আপতিত হয়। সুতরাং অকামা প্রৌঢ় কন্যকাভিমর্ষণ পরদারাভিমর্ষণ-শ্রেণী ভুক্ত হইলেও তাহাতে দণ্ডের তারতম্য করা হইত।

৪ চিহ্নিত "অভক্ষ্যভক্ষণ" অপরাধের জন্য নালিশ হইত এবং তাহার যথাযথ বিচারও হইত, এতদনুসারে পাঠকগণ বিবেচনা করুন যে, পূর্ব্বকালে আর্য্য জাতির মধ্যে সামাজিক শৃঙ্খলা কিরূপ দৃঢ় নিয়মে আবদ্ধ ছিল এবং হিন্দু আচার ব্যবহার চিরস্থায়ী এবং অন্যের সহিত সাঙ্কর্য্য নিবারণ করার জন্য কিরূপ যত্ন ছিল। এই সকল কারণে এদেশ এত দিন পর্য্যন্ত এক ভাবে চলিয়া গিয়াছে। তাহাতে

দেশের ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে সে কথা এস্থানে অপ্রকাশ্য। যাক্,—এই রূপে অপরাধ বিশেষে অপরাধীদিগকে রাজদ্বারে স্বয়ং উপস্থিত হইতে হইত-- আবার কোন কোন অর্থাৎ সামান্য অপরাধী হইলে তাহার নিমিত্ত মোক্তার নিযুক্ত করিলেই হইত। গুরুতর অপরাধ করিলেও কুলস্ত্রীগণ সহসা বিচারস্থলে নীত হইতেন না। কুলস্ত্রী, অতি বালক, জড়, উন্মত্ত, এবং উৎকট রোগগ্রস্ত ইহাদিগের বিচার-স্থানে উপনীত করিবার নিষেধ থাকা দৃষ্ট হয়। যথা,——

কুলস্ত্রী বালকোন্মত্ত জড়ার্ত্তানাঞ্চ বান্ধবাঃ।
পূর্ব্বপক্ষোত্তরে ব্রুযু নির্যুক্তো ভৃতকস্তথা।"
(কাত্যায়ন)

যে স্থলে প্রতিনিধি দ্বারা অভিযোগ বা উত্তর প্রদান, সে স্থলে সেই ব্যক্তি যে তৎকার্য্যের প্রতিনিধি তাহা রাজার বিজ্ঞাত থাকা আবশ্যক অর্থাৎ এক্ষণকার ন্যায় পূর্ব্ব কালেও রেজেষ্টরী করিয়া মোক্তার নিযুক্ত করিতে হইত। অনি-যুক্ত ব্যক্তির কোন পক্ষীয় কথা বার্ত্তা বলিবার অধিকার ছিল না। কেবল পিতা ভ্রাতা, ও পুত্র, এই তিন ব্যক্তি অনিযুক্ত হইলেও উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে পারি-তেন যথা,—

"যো ন ভ্রাতা পিতা বাপি ন পুত্রো ন
নিয়োজিতঃ।
পরার্থবাদী দণ্ড্যঃ স্যাৎ ব্যবহারেষু বি-
ব্রুবন্॥"

অর্থ— (নারদ)

পিতা, মাতা ও পুত্র ব্যতীত অনিযুক্ত ব্যক্তি যদি বাদী বা প্রতিবাদীর হইয়া কথা বলিবে বা কিছু করিবে, তবে সে দণ্ডনীয় হইবে এবং বিরুদ্ধ ব্যবহার বা মিথ্যা বলিলে বা করিলেও দণ্ডনীয় হইবে।

এক্ষণে যেমন অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি প্রথমে শাসন পত্র (শমন) দেওয়া হয় অনন্তর ওয়ারেণ্ট দ্বারা হাজীর করা হয়—পূর্ব্বে একপ প্রথা ছিল না। পূর্ব্বে এইরূপ ছিল যে, কোন ব্যক্তি বাদীর নামে অভিযোগ উপস্থিত করিলে রাজা বা রাজপ্রতিনিধি তৎকার্য্যের নিমিত্ত যে সকল দূত নিযুক্ত থাকিত—একেবারে তাহাদিগকেই প্রেরণ করা হইত—তাহারা ডাকিয়া আনিত। তাহাদের কথায় না আসিলে বলপূর্ব্বক অর্থাৎ ধরিয়া আনা হইত। বিজ্ঞাপন লিপি অবগত করান প্রথা না থাকিবার কারণ কেবল তাঁহারা ঐরূপ প্রথাকে সদোষ বিবেচনা করি-তেন। সে দোষ পরে ব্যক্ত হইবে।

অপিচ, কোন ব্যক্তি বিবাহে প্রবৃত্ত আছে,—কোন ব্যক্তি রোগের যাতনায় কাতর আছে,—কোন ব্যক্তি যজ্ঞ কার্য্যে ব্যাপৃত আছে, কোন ব্যক্তি ব্যসন গ্রস্ত হইয়াছে,—কোন ব্যক্তি কোন প্রকার রাজকীয় কার্য্যে নিযুক্ত আছে,—কোন ব্যক্তি গোরক্ষক, সে যখন গোচারণে প্রবৃত্ত আছে,—কোন কৃষক কৃষি কার্য্যে বা শস্য বন্ধনে নিযুক্ত আছে,—কোন

শিল্পী কোন এক শিল্প কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া আছে,—কোন যোদ্ধা যুদ্ধ কার্য্যে উপস্থিত হইয়াছে,—কোন শিশুর ব্যবহার যোগ্য বয়স উপস্থিত হয় নাই,—কোন দূত দৌত্য কার্য্যে প্রবৃত্ত আছে,—কোন দাতা দান করিবার আয়োজন করিয়াছে,—কোন ধার্ম্মিক কোন এক ব্রতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত আছে,—কোন ব্যক্তি হঠাৎ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছে,—এমন সকল ব্যক্তিদিগকে পূর্ব্বকালের রাজারা তাহাদের কার্য্যের শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ধরিয়া লইয়া যাইতেন না। উত্তমর্ণ ব্যক্তিরাও এতাদৃশ অবস্থায় তাঁহাদের নামে অভিযোগ করিতেন না। অভিযোগের পর ঐরূপ ঘটনা অথবা তাদৃশ অবস্থা না জানিয়া যদ্যপি অভিযোগ করা হইত, তাহা হইলে রাজা, বা রাজ প্রতিনিধি তাহাদের সেই সেই কার্য্যের শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেন, শেষ হইলে পর ধরিয়া লইয়া যাইতেন। যথা,—

"নির্ব্বেষ্টুকামো রোগার্ত্তো যিযক্ষুর্ব্যসনে স্থিতঃ।
অভিযুক্তস্তথান্যেন রাজকর্ম্মোদ্যতস্তথা॥
গবাং প্রচারে গোপালাঃ শস্যবন্ধে কৃষীবলাঃ।
শিল্পিনশ্চাপি তৎকালে আয়ুধীয়াশ্চ বিগ্রহে॥
অপ্রাপ্তব্যবহারশ্চ দূতো দানোন্মুখো ব্রতী।
বিষমস্থাশ্চ নাসেধ্যা নচৈতান্নাহ্বয়েন্নৃপঃ॥"
(নারদ)

বিবাদ বিশেষে বাদী বা প্রতিবাদী, উভয়েরই প্রতিভূ অর্থাৎ জামিন লওয়া হইত। জামিন দিতে না পারিলে বিচার নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত আবদ্ধ থাকিতে হইত। এই রূপ আবদ্ধ থাকা আর এক্ষণকার 'হাজত' তুল্য বলিয়া বোধ হইতেছে। মহর্ষি কাত্যায়ন সভাপতির কর্ত্তব্য বর্ণন স্থলে ইহা বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিদংশ এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা,—

"অথচেৎ প্রতিভূ র্নাস্তি বাদযোগ্যস্ত বাদিনোঃ।
স রক্ষিতো দিনস্যান্তে দদ্যাৎ ভৃত্যায় বেতনম্।

এই বচনের "বাদযোগ্য" শব্দের অর্থ এই যে বিবাদের ফল পাক কালে শারীরদণ্ড বা ধনদণ্ড যে রূপ হইবে তাহাই গ্রহণ বা দান করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি। "প্রতি ভবতি তৎকার্য্যে ত্বৎ ভবতীতি প্রতি ভূর্গ্রাহ্যঃ." স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য প্রতিভূশব্দের এই রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আর "দিনস্যান্তে" এই অংশের তাৎপর্য্য এই যে বিচার নিষ্পত্তি যাবৎ না হয় তাবৎ পর্য্যন্ত। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের মতও এই রূপ যথা —

"উভয়োঃ প্রতিভূর্গ্রাহ্যঃ সমর্থঃ কার্য্য নির্ণয়ে,।
প্রতিভূবস্তু ভাবেচ বাক্সা সংগোপনং তয়োঃ।"

ইহার মর্ম্ম আর কাত্যায়নের মর্ম্ম প্রায় তুল্য। ফল, বাদি প্রতিবাদির জামিন লওয়া প্রথা পূর্ব্বকালেও ছিল কিন্তু তাহা সর্ব্বপ্রকার বিবাদে নহে। বিশেষ

বিশেষ বিবাদ পক্ষেই ঐরূপ করা হইত। পূর্ব্বোক্ত "দদ্যাৎ ভৃত্যায় বেতনম্" এতদনুসারে বোধ হইতেছে খরচাব টাকাও আমানৎ করিতে হইত।

এক্ষণে মোকদ্দামা পোষ্টপোন (Postpone) বা আর্জ্জী লওয়া এবং দেওয়ার প্রথা থাকা যাহা দৃষ্ট হয় তন্মধ্যে তৎকালে প্রতিবাদীরই আর্জ্জী লওয়ার অধিকার ছিল এবং প্রতিবাদীকেই তাহা দেওয়া হইত। বাদী অভিযোগ উপস্থিত করিয়া কোন বিষয়ের জন্য আর্জ্জী প্রার্থনা করিতে পারিবে না। যদি করে, তবে তাহার অর্থিত্ব বিনাশ অর্থাৎ ডিস্‌মিস্ করা হইত। যথা,—

"প্রত্যর্থী যদি কাঙ্ক্ষিৎ কালং প্রার্থয়তে স লভতে, অর্থীতু কালং প্রার্থয়ন্ অর্থীত্বমেব ব্যাহন্যাৎ"

অতস্তেন কালো ন প্রার্থনীয়ঃ।"

অর্থ বলা হইয়াছে। অপিচ, আর্জ্জীর জন্য নিয়মিত কাল ঊর্দ্ধ সংখ্যায় সপ্তাহ ছিল। যথা,—

"প্রত্যর্থী লভতে কালং ত্র্যহং সপ্তাহমেব বা।

অর্থীতু প্রার্থয়ন্ কালং তৎক্ষণাদেব হীয়তে॥"

(ব্যবহার তত্ত্ব)

ইহার অর্থ সুগম।

ক্রমশঃ

শ্রীকা——

গ্রীক ও হিন্দু

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বাহ্যপ্রকৃতি সম্বন্ধে ভারত যদ্রূপ বহুমূর্ত্তি-বিশিষ্ট, গ্রীকদিগের অধিবাসিত ভূখণ্ড তদপেক্ষা যদিও ন্যূন, কিন্তু সঙ্কীর্ণ স্থান মধ্যে তাহাদের সন্নিবেশ বশতঃ গাঢ়তাপূর্ণ এবং বৈচিত্রের আধিক্য রূপে প্রতীয়মান হয়। ইহার উৎপন্ন ফলও তদ্রূপ হইবে। যাহা হউক এই সামান্য আয়তনের মধ্যে ইহার ভাব-বৈচিত্র এত অধিক যে তাহার তুলনায়, দূর-বিক্ষিপ্ততা হেতুও ভারতীয় বৈচিত্র সমূহ অগণনীয়ের মধ্যে পড়িয়া যায়। গ্রীসের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, দেখিতে পাইবে ইহার তিনধারে সমুদ্রতরঙ্গে উপকূলভাগ ধৌত হইতেছে, উত্তরে পর্ব্বতমালা পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রধাবিত হইয়া বহির্জ্জগত হইতে ইহার বিভিন্নতা সাধন করিতেছে। এই সীমান্তর্বর্ত্তী ভূভাগ ক্রমান্বয়ে পর্ব্বত, নদী, সমতল ক্ষেত্র, উপত্যকা, অধিত্যকা প্রভৃ

ত্তিতে বিভাজিত হইয়া বহুতর ভিন্ন ভিন্ন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশমালায় বিভক্ত হইয়াছে। ঐ সকল প্রদেশের প্রত্যেকে এত ক্ষুদ্র যে ইহাদের পরিমাণফল কয়েক বর্গ ক্রোশের অধিক হইবে না, বোধ হয় আমাদিগের এক একটি পরগণাও তাহাদের অপেক্ষা স্থানবিশেষে বৃহৎ হইবে। এই সকল প্রদেশের মধ্যে উত্তরে থেসালী ও এপিরুস, উভয়ে পিন্দুস নামক পর্ব্বত শ্রেণী দ্বারা বিভক্ত। থেসালি চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত মধ্যে আবদ্ধ সমতল ক্ষেত্র, মধ্যস্থলে একটি নদী প্রবাহিত, ভূমি উর্ব্বরা। এপিরুস উত্তর দক্ষিণে প্রধাবিত পর্ব্বত শ্রেণী দ্বারা আকৃষ্ট, ভূমিতল বন্ধুর এবং অনুর্ব্বরা। এতদুভয় দেশের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণী ক্রমাগত দক্ষিণপূর্ব্বমুখে প্রবাহিত হইয়া মধ্য গ্রীসকে দ্বিভাগে বিভক্ত করিয়াছে, উহার পশ্চিম ভাগে ইতোলিয়া ও আকাশনিয় নামক প্রদেশ দ্বয়। ইহাদের মধ্য দিয়া গ্রীসদেশীয় সর্ব্বপ্রধান স্রোতস্বতী আকিলোস প্রবাহিত হইয়া করিন্থ উপসাগরাভিমুখে গমন করিতেছে। এ উভয় দেশ পর্ব্বতময় ও বনময় এবং সভ্যতা বিস্তারের পক্ষে সম অনুকূল না থাকায়, বহু কাল পর্য্যন্ত ইহা দস্যুগণের দ্বারা অধিকৃত ছিল।

এই মধ্যদেশের পূর্ব্বভাগ গ্রীক বিদ্যা বুদ্ধি ও বীরত্বের আকর স্থল। যে পর্ব্বত মালা ইহাকে দ্বিভাগে বিভক্ত করিয়াছে, তাহা পূর্ব্ব দিকে সমুদ্র হইতে অদূরবর্ত্তী ভাবে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং থেসালি হইতে পূর্ব্বমধ্যদেশে আসিতে হইলে, ঐ পথের এক পার্শ্বে অত্যুচ্চ পর্ব্বত ও অপর পার্শ্বে সমুদ্র। এই পথ দিয়া আসিতে হইলেই বিখ্যাত গিরিসঙ্কট থার্ম্মপলি অতিক্রম করিতে হয়। এই পূর্ব্ব ভাগের পূর্ব্ব উপকূল চাপিয়া লোক্রিয়ার নামক প্রদেশ। লোক্রিয়ার পশ্চিমে ডোরিস এবং কোকিস নামক প্রদেশদ্বয়। কোকিস প্রদেশের মধ্য দিয়া পার্নাসুস নামক পর্ব্বত শ্রেণী। ইহার উপরে গীতি-বিষয়িণী দেবীগণের অবস্থান এবং নিম্ন দেশে বিখ্যাত ভবিষ্যৎজ্ঞাপক আপলো দেবের মন্দির। কোকিসের দক্ষিণে বিওশিয়া নামক প্রদেশ। ইহা চতুর্দ্দিক পর্ব্বতমালায় আবদ্ধ এবং জল-নির্গমনের স্থল। এ নিমিত্ত ভূমি সর্ব্বদা সলিল সিক্ত থাকায় তাহা উর্ব্বরতা গুণ বিশিষ্ট, এবং তাহা হইতে নানাবিধ শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু বায়ু সর্ব্বদা সজল এবং কুজ্ঝটিকাময়। বিওশিয়ার দক্ষিণে আটিকা প্রদেশ, এতদুভয়ের মধ্যে পর্ব্বত শ্রেণী। আটিকার পূর্ব্ব দক্ষিণ ও পশ্চিমে সমুদ্র। এখানকার বায়ু শুষ্ক এবং ভূমি নিষ্ফল, কোন প্রকার শস্য উৎপন্ন হয় না, কিন্তু বিবিধ ফলের উৎপাদন-পক্ষে উপযোগী। আটিকার পশ্চিমে মিগারিস। এখান হইতে দক্ষিণ দেশে যাইতে হইলে, করিন্থ যোজক দিয়া যাইতে হয়, কিন্তু এই পথে পর্ব্বতের বাধা এত অধিক যে

স্থলপথ অপেক্ষা দক্ষিণ দেশে জলপথে যাওয়াই সুগম।

উত্তরদেশাপেক্ষা দক্ষিণ দেশ নদী-বিরল ও পর্ব্বতময়। ইহার উত্তরে আর্গোলিস। এই আর্গোলিস প্রদেশ আবার বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই সামান্য স্থানের মধ্যেই আবার প্রকৃতিবৈচিত্র্য, এত যে কোথাও কমলা কমলা প্রভৃতি লেবু পর্য্যন্ত উৎপন্ন হয়, কোথাও আবার কোন দ্রব্যই উৎপন্ন হয়না। ইহার পশ্চিমে আকৈয়া। মধ্যভাগে আর্কেডিয়া, চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত-মালা প্রাকারের ন্যায় বেষ্টন করিয়া, অন্যান্য প্রদেশ হইতে ইহাকে ছেদসম্বন্ধ করিতেছে। দক্ষিণে মেসিনা ও লাকোনিয়া নামক প্রদেশদ্বয়। এতদুভয় দেশ যদিও পর্ব্বতময় কিন্তু অনুর্ব্বরা নহে। মেসিনা প্রদেশে খর্জ্জুর প্রভৃতি ফল এবং বিবিধ শস্যাদি জন্মিয়া থাকে। এই প্রদেশেই সুবিখ্যাত স্পার্টা নগরী ইউরোতাস নামক নদীর তটে অবস্থিত ছিল। আর্কেডিয়ার পশ্চিমে ইলিস নামক প্রদেশ। এই প্রদেশের মধ্যে বিখ্যাত অলিম্পিয়া ক্ষেত্রের অবস্থান।

গ্রীসের এই প্রকৃতি বৈচিত্র্যে লক্ষিত হইবে যে এই ক্ষুদ্রায়তন দেশের মধ্যে প্রদেশভেদে কত স্বভাব-বিভিন্নতা। কোন প্রদেশ হয় ত একেবারে প্রায় চতুর্দ্দিক্ সমুদ্রবেষ্টিত, আবার তদ্বিপরীতে কোন স্থান নিরবচ্ছিন্ন পর্ব্বতমালায় আবৃত, বহির্ভাগের আর সমস্ত স্থান হইতে সম্বন্ধ-বিচ্ছিন্ন, বহুদূর অতিক্রম না করিলে সমুদ্রের মুখ দেখিবার যো নাই। গ্রীসের প্রত্যেক প্রদেশ যেন স্বভাব কর্ত্তৃক বিভাজিত হইয়া প্রত্যেকে আত্মস্বাতন্ত্র্য সহ নির্জ্জনে অবস্থান করিতেছে। ইহাদের মধ্যে পরস্পরের যেরূপ আকৃতি ভেদ, গুণ ভেদও তদনুরূপ। কোন প্রদেশ একেবারে উর্ব্বরতা গুণ বিশিষ্ট, শস্য প্রচুর, ফল রস জালে পরিপূর্ণ। আবার কোন প্রদেশ একেবারে সে সকল বিষয়ে বঞ্চিত, জীবন ধারণের সমস্ত পদার্থের জন্যই অপরের মুখাপেক্ষা করিয়া না থাকিলে চলে না। কোথাও নিবিড় বনভূমি, কোথাও কর্কর-পূর্ণ সমতল ক্ষেত্র, কোথাও বা অবিরল শস্য চূত সকল বায়ু-হিল্লোলে ক্রীড়া করিতেছে, এবং সর্ব্বত্রই উপলখণ্ড-বর্দ্ধিত গিরি শ্রেণীতে এই সকল বিভক্ত করিতেছে। এই পর্ব্বত-শ্রেণী এবং বহু মৃত্তি-বিশিষ্ট ক্ষেত্র সমূহ, গতায়াতের পক্ষে স্থলপথ দারুণতর কষ্টকর, এজন্য এক স্থান হইতে আর এক স্থানে যাইতে স্থলপথ অপেক্ষা জল-পথই সুগম।

স্থল ভাগ ছাড়িয়া জলভাগের প্রতি নেত্রপাত কর। পশ্চিম ও দক্ষিণস্থ সমুদ্র-দেখ, ধীর, মৃদু, মন্থরগতি। গ্রীসের অভ্যন্তরে প্রায় সর্ব্বত্রই ইহা এতদূর প্রবেশ করিয়াছে যে গ্রীস বহু প্রদেশে বিভক্ত হইলেও, কেবল আর্কেডিয়া ভিন্ন সকলেরই সমুদ্রতটে একটি না একটি বন্দর স্থাপিত ও তদ্দ্বারা সমুদ্রে গমনপক্ষে সুবিধার অভাব ছিল না। এই সমুদ্রের সর্ব্বত্র

দ্বীপ শ্রেণিতে এরূপ আকৃষ্ট যে তাহার জন্য সমুদ্রের অস্থি চর্ম্ম অবশেষ। ঐ সকল দ্বীপ অধিকাংশ পর্ব্বতময়, আবার কোনটি অতি উর্ব্বরা, কোনটি বা মধ্যম-প্রকৃতি, কিন্তু সকলেই রমণীয়-প্রকৃতি এবং বাসযোগ্য। ঐ সকল আয়তনে বৃহৎ নহে, আকৃতিতে ক্ষুদ্র এবং পরস্পর এত সন্নিকটে অবস্থান করে যে একটিতে উত্তীর্ণ হইয়া তাহা দেখিতে দেখিতে আর একটিতে উপস্থিত হইতে পারা যায়। এই-রূপে ইউরোপ খণ্ড গ্রীস হইতে নির্গত হইয়া অবলীলা ক্রমে অপর খণ্ড আশিয়ায় উপনীত হইতে পারা যায়। এবং এই গতায়াতের সুবিধা করে অতি অনুকূল বাণিজ্য-বায়ু হেলাসপণ্ট হইতে ক্রীট দ্বীপ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া থাকে। গ্রীসের পূর্ব্ব উপকূলের অনুকূলতা বশতঃ জাহাজ ও নানা বিধ পোত রক্ষার্থে সুন্দর সুন্দর বন্দর সকল সংযুক্ত। পশ্চিম সমুদ্রও দ্বীপাবলী-সংযুক্ত, কিন্তু পূর্ব্ব সমুদ্রের ন্যায় নহে। পূর্ব্ব সমুদ্র অপেক্ষা ইহা আয়তনে বৃহৎ, স্বভাবও অপেক্ষাকৃত উগ্র। উপ-কূল ভাগ পূর্ব্ব উপকূলের ন্যায় অনুকূল নহে। ইহা উচ্চ এবং দুরারোহ পাহাড়ে আবৃত, সমস্ত উপকূল ভাগ ভ্রমণ করিলে কদাচিৎ একটি সুন্দর বন্দর পাওয়া যায়।

এক্ষণে গ্রীসের পার্শ্বস্থ দেশ সমূহের প্রতি নিরীক্ষণ কর। এই মৃদু সমুদ্র অতিক্রম করিলে, একদিকে সুসভ্য ও বিজ্ঞানশালী মিসর, এবং আফ্রিকার উত্তর উপকূলস্থ বল-সম্পন্ন অন্যান্য স্থান—অন্য-দিকে সমুদ্র-প্রিয় ফিনিসীয় এবং আশি-য়াস্থ অন্যান্য বলশালী প্রদেশনিচয়। অপর পার্শ্বে প্রবল পরাক্রান্ত ইতালী। গ্রীসের যে রূপ সমুদ্র-গতায়াতের সুবিধা, এসকল দেশের পক্ষেও তদ্রূপ। এবং গ্রীসে যে যে কারণে মনুষ্যকে মনুষ্য-পদ-বীতে স্থাপন করিতে পারে, এসকল দেশেও বিষয়-বিশেষের বৈচিত্র্য-সাধক কারণ-বিশেষের ক্ষীণতা বা পুষ্টতার প্রতি লক্ষ্য না করিলে, সেই সেই কারণের নিতান্ত ন্যূনতা ছিল না।

একজন ফরাশিস বিজ্ঞপ্রবর কহিয়া-ছিলেন যে তাঁহাকে যে কোন দেশের মানচিত্র প্রদান করিলে এবং তদ্দেশীয় উৎপন্ন দ্রব্যজাত ও পদার্থ-নিচয় কীর্ত্তন করিলে, তিনি বলিয়া দিতে পারেন যে এই দেশ-বাসীরা কিরূপ প্রকৃতির লোক হইয়া কিরূপ কার্য্যফল প্রসব করিবে এবং মানবীয় ইতিহাসের কোন পর্য্যায়ে অবস্থান এবং তাহাতে কিরূপ গণনায় আসিবে। একথা মিথ্যা নহে। পাঠক বলিতে পার গ্রীসের ন্যায় প্রকৃতিবিশিষ্ট দেশের অধিবাসীবর্গ কিরূপ অবস্থা-সম্পন্ন হইবে?

প্রথমতঃ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে এরূপ স্বভাব-বিশিষ্ট দেশের প্রদেশ সমূহ পরস্পর পরস্পর-সম্বন্ধে এরূপ বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থান করে যে, যেন কাহার সহিত কাহারও সংস্রব নাই, সকলেই স্ব স্ব প্রধান এবং স্বতন্ত্র। প্রদেশ-দ্বয়ের মধ্যে দুর্গম ব্যবধানের অভাবে, উভয় প্রাদেশিক

অধিবাসীদিগের মধ্যে গতায়াত সুগম, এবং তাহা হইতে স্বতঃ উৎপন্ন ঘনিষ্ঠতা-সূত্রে উভয়কে যেমন একসূত্রে বদ্ধ এবং এক-প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট ও এক-প্রকৃতি-যুক্ত হইয়া একজাতিত্বে পরিগণিত হয়; এখানে প্রদেশ-পরম্পরায় ব্যবধান দুর্গমতা হেতু এক প্রদেশের অধিবাসীদিগের সহ অপর প্রদেশের অধিবাসীদিগের তদ্রূপ গতায়াতের সুগমতা এবং তাহা হইতে উৎপন্ন ঘনিষ্ঠতা এতদুভয়ের অভাব নিবন্ধন, প্রত্যেক প্রদেশ প্রথম কালে স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন পূর্ব্বক স্থাপিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়, এবং পার্শ্ববর্ত্তী অপরাপর প্রদেশ সমূহ যেন সীমাবিশিষ্ট বিভিন্ন দেশস্বরূপ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। প্রাদেশিক এইরূপ স্বাতন্ত্র্য হইতে অধিবাসী ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত এবং প্রকৃষ্টরূপে অহঙ্কার বোধ হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে এতদ্রূপ অহঙ্কার-বোধ ভাবী গৌরবের ভিত্তি স্বরূপ। দ্বিতীয়তঃ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে গ্রীসের ন্যায় প্রকৃতিবিশিষ্ট দেশের মধ্যে ভূমির উর্ব্বরতাগুণ সর্ব্বত্র সমান নহে। কোন স্থানে আবশ্যকাধিক জীবনোপায় বস্তু সমূহ উৎপাদিত হইয়া থাকে, আবার কোথায় বহুশ্রমেও যৎকিঞ্চিৎ পাওয়া দুষ্কর। অতএব কালে লোকবৃদ্ধি সহ লক্ষিত হইবে যে কোন কোন প্রদেশ বহু পরিবার-বৃদ্ধি সত্বেও আহার-প্রাচুর্য্যে অত্যন্ত-স্বচ্ছলতা-যুক্ত। আবার কোন কোন দেশকে হয়ত তদভাবে এককালে উপবাসে প্রাণত্যাগ করিতে হয়। এমন অবস্থায় স্ব স্ব দেশজাত যে কোন বস্তু যাহা অপরের নিকট লোভনীয়, তদ্দ্বারা বিনিময় ও ব্যবসায়ের প্রবর্ত্তন ব্যতীত সকলের সমভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। এ নিমিত্ত অন্যান্য দেশের সহ তুলনায়, প্রত্যেক প্রদেশ অধিবেশনের অপেক্ষাকৃত অল্পকাল পরেই, পরস্পরের মধ্যে বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়। প্রদেশ-সমূহ পরস্পরের মধ্যে যেরূপ স্বতন্ত্র, তাহাতে এই বাণিজ্য-সূত্রে, দূরদর্শিতা, বিজ্ঞতা এবং লোক চরিত্র নির্ম্মাণ সম্বন্ধে বিদেশ বাণিজ্যের যে সকল আনুসঙ্গিক ফল, সেই সকল ফল লাভ হইয়া থাকে। ক্রমে লোক-বহুলতায় যখন বাণিজ্যের আধিক্য হয়, তখন এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে যাইতে দুর্গম স্থলপথের ক্লেশ অনুভূত হইতে থাকে, এবং সেই অনুভব-শক্তি হইতে প্রতিকার স্বরূপ জলপথে গমনাগমন প্রবর্ত্তিত হয়, এবং এই প্রবর্ত্তন হইতে ক্রমে তদ্রূপ গমনাগমনের উৎকর্ষ সাধিত হয়। এরূপ ক্রমাগত গতায়াত ও সংস্রবে পরস্পরের মধ্যে ক্রমে ঘনিষ্ঠতা উপস্থিত হইয়া, সকল প্রদেশের অধিবাসীরা অন্তরে অন্তরে স্বতন্ত্রতা-যুক্ত থাকিলেও, বাহ্যিকে একজাতিত্বের আকার ধারণ করে। একের রীতি নীতি অপর দ্বারা বিচালিত, একের ধর্ম্মতত্ব প্রভৃতি অপর দ্বারা গৃহীত হয় বটে, কিন্তু তাহাতেও বহুকাল ধরিয়া অবলম্বিত

সুতরাং অন্তর্নিহিত স্বাতন্ত্র্য ভাবের অপলোপ করিতে পারে না। এ নিমিত্ত বাহিরে একজাতি হইলেও ভিতরে ভিতরে সম্পূর্ণ বিভিন্নজাতীয় বোধ-শক্তি বিরাজ করিতে থাকে।

বাণিজ্য দ্বারা এবম্ভূত আহার-স্বচ্ছন্দতা সাধিত হইলে, পরিমাণ অনুসারে ক্রমে লোকবৃদ্ধি হইয়া দেশের মধ্যে যখন স্থান-সঙ্কীর্ণতা উপস্থিত হয়, তখন, উপনিবেশ স্থাপন ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এরূপ উপনিবেশ স্থাপন পক্ষে ঘন সন্নিকটস্থ ঘন সন্নিবিষ্ট দ্বীপাবলী এবং অপরাপর ভূখণ্ড যেরূপ অগ্রে মনোনীত হওয়ার সম্ভব সেরূপ অন্য স্থান নহে। এজন্য ক্রমে সেই সকল উপনিবেশিত এবং কালে তদ্রূপ উপনিবেশ সমূহের বিস্তার সাধন, এবং তজ্জন্য নূতন নূতন স্থান সকল মনোনীত হইয়া থাকে। এবং ইহা হইতে ক্রমে সামুদ্রিক বাণিজ্যের বিস্তার এবং তজ্জনিত ধন-সঞ্চয় ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইয়া থাকে। যে সমুদ্র-যাত্রার সুযোগে এই দেশ শ্রীবৃদ্ধিযুক্ত হইবার কথা, ইহার প্রতিবেশীবর্গেরও তদ্রূপ সুবিধা, সুতরাং তাহাদেরও ইহাদের সঙ্গে একই সময়ে ধনসঞ্চয় ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবার কথা। অথবা যদি তৎপক্ষে কাহার ন্যূনতা হয় অথচ সে তাহার স্বাদ জ্ঞাত হইয়াছে, তাহাহইলে অপরের ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই। যেহেতু আপনার হীনতা দর্শনে অপরের অপরিমিত ধন দ্বারা আত্ম পরিপোষণ করার প্রবৃত্তি, পার্থিবসুখে বিমোহিত মানবের মনে স্বতঃই উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরন্তু একপক্ষে হীনতা না থাকিলেও তদ্রূপ মানবের মনে ঐ প্রবৃত্তির ক্রীড়া লক্ষিত হওয়ার অসম্ভাব নাই, অতএব প্রতিবেশীবর্গের নিকট হইতে সর্ব্বদা আক্রমণের সম্ভব। এমন অবস্থায় প্রত্যেক প্রদেশ স্বাতন্ত্র্যাবলম্বী হইলেও, এবং আপনাদের পরস্পরের মধ্যে যে কোন সূত্রে বিবাদ বিসম্বাদের সম্ভাবনা থাকিলেও, বাহ্য শত্রুর বিপক্ষে প্রতিযোগিতায় এক এক প্রদেশ স্বতন্ত্রভাবে অসমর্থ হেতু, সকলে সংমিলিত হইয়া একযোগ হওয়া কর্ত্তব্য। এই একতা ক্ষণিক নহে, সর্ব্বদা আবশ্যক, সুতরাং তৎসাধন একমাত্র কথায় সুসম্পন্ন হয় না। অতএব একতা বন্ধনোপযোগী বস্তুর আবশ্যক, এ নিমিত্ত সর্ব্বজনীন কোনরূপ পর্ব্বোপলক্ষে জাতীয় সংমিলন আবশ্যক হয়। তথাপি প্রতিবেশীগণের বহ্বায়তন হেতু, ইহারা প্রতিযোগিতার উদ্দেশে, একতা সত্ত্বেও সংখ্যায় সামান্য গণনায় আইসে। কিন্তু প্রতিবেশীরা যেরূপ পার্থিব সুখ-সর্ব্বস্বতা হেতু দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী, ইহারাও তদ্রূপ পার্থিব-সুখ-সর্ব্বস্বতা হেতু আত্ম-ধন রক্ষণে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। এমন স্থলে সংখ্যায় যেমন সামান্য, তাহার পরিপূরণার্থে এক মাত্র বীর কার্য্যে পারদর্শিতা এবং বীরত্বে খ্যাতি লাভ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। বাহিরের শৈত্য গুণে অন্তরস্থ তাপ যেমন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তেমনি বহ

বৈদেশিক প্রতিবেশিরা ইহাদের উপর অত্যাচরণ করিবে, এবং তন্নিমিত্ত ইহারা ঐ বিদেশীয়দিগের উপর বিতৃষ্ণাযুক্ত হইবে, তত ইহাদের স্বদেশ-প্রিয়তা বৃদ্ধি, স্বদেশের উপর মমতা এবং স্বদেশ রক্ষণে বীরত্ব প্রতিভাসিত হইতে থাকিবে। মানবচিত্ত অনেক সময়ে বিস্মৃতি-যুক্ত হয়, আপন ভাব, স্বভাব ও প্রবৃত্তি সম্যক্ উপলব্ধি করিতে না' পারিয়া জড়বৎ থাকে, কিন্তু বিষয় বিশেষ অনুসারে কবিগণ দ্বারা সেই সেই ভাব, স্বভাব ও' প্রবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া দিলে সে জড়তা তিরোহিত হইয়া মানব সতেজ ও উৎসাহিত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। এবম্ভূত দেশ মধ্যে বীরকীর্ত্তি ও স্বদেশ-হিতৈষিতা মনোমধ্যে উদয় করার যত আবশ্যক, তত অন্য বিষয়ে নহে। এজন্য এরূপ দেশের সাহিত্য কাব্যাদি বীরত্ব ও স্বদেশ হিতৈষিতার জীবিত ভাবে পরিপূর্ণ হইবে। এবং এবম্ভূত দেশেই কেবল ইতিহাসের মূল্য অবধারিত ও তাহার উৎপত্তি সাধিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বগত বীরপুরুষের কীর্ত্তি কলাপে বিমোহিত হইয়া, চিরনেত্রপথে আদর্শ রূপে তাঁহাকে স্থাপিত করণের আকাঙ্ক্ষায় ভাস্কর্য্যের উৎপত্তি ও তাহার উৎকর্ষ সুসাধিত হয়।

বাহ্যজগৎ ইহাদিগের নিকট সামান্য বোধে প্রতীয়মান হওয়ায় এবং প্রাকৃতিক অদ্ভুত কার্য্য কলাপের সঙ্কীর্ণতা হেতু, ইহাদের চিত্ত পারলৌকিক তত্ত্বে তাদৃশ আকর্ষিত হওয়ার সম্ভব নাই। এনিমিত্ত ইহাদের পরলোক বিভীষিকা-পূর্ণ এবং দেবতত্ত্ব অমানুষিক হইবার বিষয় নহে। এতদুভয়েরই ইহাদের নিকট মানবোচিত আকৃতি ধারণ করা সম্ভব। পরলোক ভীষণ হইতে ভীষণতর নহে, এবং দেবতারাও অভাবনীয়, অচিন্তনীয়, বিকট-সাজ, বিকট কাজ, বা বিকট মূর্ত্তি বিশিষ্ট নহে। সকলেই মানবের ন্যায় মানবীয় ক্রীড়াযুক্ত, তাহার সহিত মানবের সহানুভূতি জন্মিতে পারে এতদ্রূপ। পরলোক সামান্য বিভীষিকাযুক্ত বলিয়া, মানব চিত্তকে, তাহা হইতে কিসে উদ্ধার হইবে, এরূপ আকুলতা-যুক্ত হইয়া ধর্ম্ম বিষয়ে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম এরূপ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া হাবুডুবু খাইতে হয় না। সুতরাং সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর তত্ত্বের উদ্ভাবনের অভাবে সাধারণ দেবতত্ত্বেই মানবচিত্ত সতত সন্তোষযুক্ত এবং তাহাতে ভয় বিরহিত। এ ভয়ের অভাব এত যে মানব দেবতা হইতেও আত্ম স্বতন্ত্রতা রক্ষণে অপরিমিত যত্ন-শীল।

মানবচিত্ত পার্থিব বিষয়ে এরূপ সংলগ্ন হওয়াতে, তদ্বিষয়ক যে কোন বিষয়ে সম্যক্ হস্তক্ষেপে শিথিল-যত্ন হয় নাই। সুতরাং সকল বিষয়ের পরিরক্ষক রাজনীতিতে যে ইহারা সম্যক্ হস্তক্ষেপ করিবে তাহাতে বিচিত্রতা কি? স্বতন্ত্রতা-প্রিয়তায় প্রত্যেক প্রদেশ এক এক রাজ্য, আবার কোন স্থানে এক প্রদেশের মধ্যেই চারি পাঁচটি বিভিন্ন রাজ্য। এতদ্রূপ

ক্ষুদ্র রাজত্বের মধ্যে রাজা স্বল্পকাল মধ্যে সর্ব্ব সমক্ষে পরিচিত এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শিত হওয়াতে আত্ম দেবত্ব রক্ষণে সমর্থ হয়েন না। এবং রাজনীতির বিচার-স্থান অল্পায়তন হওয়ায় প্রজামাত্রেই তাহা আয়ত্ত করিয়া, তাহার দোষ গুণের বিচারে প্রবৃত্ত এবং আবশ্যক হইলে তাহার প্রতিকার করণে উদ্যত হয়। এ নিমিত্ত এখানে সর্ব্বদা রাজবিপ্লব এবং প্রজা-বিদ্রোহ হওয়ায় সম্ভব। শাসনপ্রণালী এই কারণে কখন রাজতন্ত্র কখন বা তাহা ঘুচিয়া সাধারণতন্ত্র, আবার কখন বা সম্ভ্রান্ততন্ত্র ইত্যাদি রূপ যখন যাহা বলবতী, তখন সেই ভাবে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কখন বা আত্মকলহে দেশ রক্ত-ধারায় স্নাত হয়। কখন বা আবার রাজাপ্রজা-সংমিলনে দেশ মধ্যে সুখের তরঙ্গ প্রবাহিত হইতে থাকে। এরূপ স্থানে প্রজা মাত্রেই অল্প বিস্তর রাজনীতি-বিশারদ, তন্মর্ম্মজ্ঞ, এবং তাহাতে সম্পূর্ণ রূপে আস্থা যুক্ত হইয়া আপন আপন কার্য্যকলাপ পরিশোধিত করিয়া থাকে।

গ্রীকদিগের অবস্থা অবিকল এইরূপ। ইহার প্রত্যেক প্রদেশ এক এক বিভিন্ন দেশ স্বরূপ, এবং প্রত্যেক প্রদেশের অধিবাসী এক এক বিভিন্ন জাতি স্বরূপ। কেহ কাহার সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত নহে। ভারতীয়দের অবস্থা তদ্রূপ নহে। প্রদেশ পরম্পরা সর্ব্বত্র গতায়ত-সুলভ, এবং ঘনিষ্ঠতা-যুক্ত। এই ঘনিষ্ঠতা দস্যুবর্গের ভয়ে আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভারতে যেরূপ আদিম অধিবাসী দৈত্যবর্গের দ্বারা আর্য্যগণ উত্যক্ত হইয়াছিলেন, গ্রীসেও তদ্রূপ প্রতিদ্বন্দ্বী দৈত্যবর্গ না ছিল এমন নহে। কিন্তু গ্রীস যেমন সঙ্কীর্ণায়তন তাহারাও তেমনি সঙ্কীর্ণসংখ্যক, সুতরাং গ্রীকেরা অতি অল্প শ্রমেই তাহাদের বল চূর্ণ করিয়া পদানত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু ভারতীয় দৈত্যেরা সংখ্যায় সমুদ্র-তীরবর্ত্তী বালুকারাশির ন্যায়, আর্য্যেরা কিয়দংশের বল চূর্ণ করিয়া পদানত করিয়াছিলেন বটে, তথাপি অবশিষ্ট এত ছিল যে তাহাদের ভয়ে সশঙ্কিত থাকিতে হইত। এই আত্মরক্ষার প্রয়োজন হেতু যিনি যেখানে অবস্থিতি করুন না কেন, সকলেই একতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। এই সূত্রে আমূলত পরিচালিত বলিয়া, হিন্দু সন্তান মাত্রেই কি ভিতরে কি বাহিরে সর্ব্বত্রই সর্ব্বপ্রকারে প্রথম কালে একজাতি ছিলেন। গ্রীকেরা তদ্বিপরীতে প্রথম কালে প্রদেশ ভেদে সম্পূর্ণই বিভিন্ন জাতি স্বরূপ ছিল। আবার গ্রীকেরা যখন একজাতিত্ব রূপ আকার ধারণ করিল, তখনও চির-প্রবুদ্ধ স্বাতন্ত্র্য ভাব অন্তরে অন্তরে বিরাজ করিতে লাগিল। তখন ভারতীয়েরা বংশ-বাহুল্যতায় যদিও বিভিন্ন প্রদেশে অধিবেশন ও বিভিন্ন রাজ্য স্থাপন পূর্ব্বক যেন স্বতন্ত্রতা অবলম্বন পূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন, তথাপি চির-প্রবুদ্ধ একতা ভাব তাঁহাদের হৃদয় হইতে অপ...

লোপ হইল না। এ নিমিত্ত গ্রীকদিগের যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ভাব ভাবী গৌরবের সোপান স্বরূপ, ভারতীয়েরা সে স্বাতন্ত্র্য ভাব প্রাপ্ত হইলেন না, এবং অহঙ্কার বোধেও অতি হীনতা প্রাপ্ত হইলেন, যেহেতু এতদ্বোধের প্রথম বাধকতা বাহ্য জগতের নিকট আত্ম খর্ব্বতা জ্ঞান, দ্বিতীয়তঃ ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ভাবের অভাব। একতার আবশ্যক প্রধানতঃ বাহ্য শত্রুর বিপক্ষে এবং স্বাধীনতা রক্ষণে; একতার আবশ্যক উপযোগী কার্য্য-কাল সর্ব্ব সময়ে নহে, সুতরাং যদি আর সমস্ত কার্য্যকরী গুণের অসম্পূর্ণতা না থাকে, তবে প্রদেশ-পরম্পরায় মিত্ররাজ্য রূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হইলেই একতার উদ্দেশ্য স্থাপিত হইতে পারে। অতএব এতদুভয় ভাবের স্ব স্ব সম্বন্ধীয় ইষ্টানিষ্টের বিষয় দেখিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে অন্তরস্থ একতার অভাব গ্রীকদিগের মধ্যে তত অনিষ্ট উৎপাদন করিতে পারে নাই, যত ভারতীয়দের মধ্যে লৌকিক মহত্বের ভিত্তি স্বরূপ ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ভাব ও অহঙ্কার বোধের অভাবে অনিষ্ট উৎপাদন করিয়াছে।

গ্রীসের ভূমি উর্ব্বরতা গুণে সর্ব্বত্র সমান নহে। কোন স্থানে আবশ্যকীয় জীবনোপায় বস্তু সমূহ অপরিমিত ভাবে উৎপন্ন হয়, কোথাও বা তাহা একেবারে নগণ্য। যে সকল ভূমি খণ্ড উর্ব্বরতা-গুণ-বিশিষ্ট, তাহা যদি ভারতবর্ষীয় ভূ-খণ্ডের সহিত তুলনায় আনা যায়, তাহা হইলে গ্রীসের উর্ব্বরতা গুণকে অনুর্ব্বরতার মধ্যে গণ্য করিতে হয়। এজন্য ভূমির উর্ব্বরতা গুণ উপলব্ধ করিতে গ্রীকদিগকে বহু বুদ্ধি ও বহু পরিশ্রম ব্যয় ও বহুকাল অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। এই বহু বুদ্ধি ও বহু পরিশ্রম ব্যয় হেতু, তদুভয়ের অভাব বিশিষ্ট ভারতীয়দের অপেক্ষা গ্রীকদিগের উদ্ভাবনী শক্তি ও শ্রমসহিষ্ণুতা দৃঢ়তা-প্রাপ্ত হইয়াছিল। এবং বহুকাল অতিবাহিত করিবার ফলে ভারতীয়দিগের অপেক্ষা গ্রীকদিগের সভ্যতা বহুকাল পরে উদিত ও বর্দ্ধিত হয়। সে যাহা হউক, ভূমির এই নিকৃষ্ট উর্ব্বরতা হইতে ফল লাভের উপযুক্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায় এবং তজ্জনিত যে দর্শন ও দৃঢ়তা লাভ, এ সকল পূর্ব্ব বিষয় পরিত্যাগ করিয়া, যদি একেবারে সমগ্র দেশাধিবেশন ও দেশ মধ্যস্থ সমগ্র উর্ব্বর ভূমি খণ্ডের সমসাময়িক ফল-প্রসবিতা গণনায় আনিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে লক্ষিত হইবে যে কোন প্রাদেশিক লোক আহার-প্রাচুর্য্যে সচ্ছলতা যুক্ত, আবার কোন প্রাদেশিক লোককে আহার অভাবে প্রাণত্যাগ করিতে হয়। আবার দেখিতে হইবে যে শীতপ্রধান দেশের আহার গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের ন্যায় সামান্য নহে, উহা গুরুতর ও শ্রম সাধ্য। এমন অবস্থায় স্ব স্ব দেশজাত লোভনীয় যে কোন বস্তুর সহ বিনিময় ও বাণিজ্য ব্যতীত একের আহারবিষয়ক অভাব, অপরের তদতিরিক্ত অপরাপর আবশ্যকীয় বস্তুর

অভাব, এতদুভয় অভাব নিবারণ না হওয়ায়, সকলের সমভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। এই নিমিত্ত মানবীয় স্বভাবে ক্ষুৎ-পিপাসা নিবারণের বাঞ্ছার প্রথম উদ্রেকেই, এবং সভ্যতা-সূর্য্যের উদয় কালেই বলিতে হইবে, যে গ্রীকেরা প্রদেশ-পরম্পরায় বিনিময় ও বাণিজ্য করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এবং এই সকল প্রদেশ পরস্পরের মধ্যে আদিম কালে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন থাকায়, এই বাণিজ্য তৎকালে বিদেশ-বাণিজ্যের আকার ধারণ করিয়াছিল, পরন্তু ইহাতে বলিতে হইবে যে বিদেশ-বাণিজ্য হইতে আত্মোন্নতি কল্পে যে যে ফল লাভ হইয়া থাকে, এই সূত্রে গ্রীকেরা তাহাতেও কথঞ্চিৎ পারগতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এ স্থলে যদি ভারতীয়দের সহিত তুলনা করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে এরূপ কারণ হেতু তাহাদের প্রথম অবস্থায় বাণিজ্য বিনিময়ে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য হইতে হয় নাই। যখন কাল সহকারে বিলাসের বৃদ্ধি হইয়াছিল তখনই প্রদেশ পরম্পরায় বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়। আবার এখানে প্রদেশ সমূহ পরস্পরের মধ্যে যেরূপ ঘনিষ্ঠতা-যুক্ত, তাহাতে এবম্ভূত বাণিজ্য কখনই বৈদেশিক বাণিজ্যের আকার ধারণ করে নাই। ভারতীয়েরা কখন স্বদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া বাণিজ্য করিতেন কি না, এতদুত্তরে বলিতে পারা যায় যে নানা কারণ হেতু প্রথম কালে কখনই নহে। পরবর্ত্তী সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে বিদেশের দ্রব্য ভারতে আনীত এবং ভারতের দ্রব্য বিদেশে নীত হইতেছে। কিন্তু ইহার মূল অনুসন্ধান করিলে প্রতীয়মান হইবে, যে এরূপ বিনিময় ভারতীয়েরা বিদেশে গমন পূর্ব্বক সমাধা করিতেন না, বিদেশীয়েরাই তাঁহাদের দেশে আগমন পূর্ব্বক সমাধা করিতেন।

যে সূত্রে গ্রীকদিগের প্রথম বাণিজ্যের উদ্ভব, তাহাতে মূল হইতেই তাহার বিস্তৃত আকার ধারণ করা সম্ভব, এবং লোক বৃদ্ধি সহ যে তাহা আরও বিস্তার-যুক্ত হইবে তাহাতে কথা কি আছে। এই বাণিজ্য নৈমিত্তিক ব্যাপার স্বরূপ, সুতরাং গ্রীসের ন্যায় দুর্গম স্থলপথে ইহা সমাধা করা ক্রমে অতিশয় কষ্টকর হইয়া উঠে; আবার অন্যদিকে সুগম সমুদ্র সর্ব্বদা প্রলোভিত করিয়া থাকে।' এক দিকে ক্লেশ, অন্যদিকে সুবিধা যেখানে বর্ত্তমান, সেখানে মানবচিত্তের উদ্ভাবনী শক্তি সুবিধাকে আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত উপায় উদ্ভাবনে তেজস্বিনী হইয়া থাকে। কাযেই বাণিজ্য প্রবর্ত্তনার অল্পকাল পরেই গ্রীকদিগের মধ্যে সমুদ্র গমনাগমনের আরম্ভ হয়, এই নিমিত্ত প্রাচীনকালের অতি দূরতর সময়েই আমরা দেখিতে পাই যে গ্রীকেরা সমুদ্র গমনাগমন প্রক্ষে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে। হিন্দুদিগের প্রাচীনতম গ্রন্থাবলীতে যদিও সমুদ্র যাত্রার দুই একটি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি তাহা যে গ্রীক দিগের ন্যায়

পুষ্টতা-সম্পন্ন তাহা কখনই নহে। গ্রীকেরাই যে অতি প্রাচীন কালে সমুদ্র-যাত্রা পক্ষে অতিশয় দূরদর্শিতা লাভ করিয়াছিল তাহা নহে। হোমারের সময়ে দেখা যায় যে জাহাজের আকৃতি অতি সামান্য ছিল, এবং সন্নিকট দ্বীপ ও উপ-কূল ভাগ মাত্রে যাতায়াত ছিল, কৃষ্ণসাগরের পার্শ্বস্থ স্থান সমূহ পরিজ্ঞাত ছিল না, এবং মিসরের জনশ্রুতির ন্যায় পরি-জ্ঞাত ছিল। কিন্তু যে কোন বিষয়ের নিরন্ত ব্যবহারে তাহার উৎকর্ষ সাধিত হয়। গ্রীসে তন্নিমিত্ত অচির কালমধ্যে সমুদ্র যাত্রার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল আর ভারতে তদভাবে, তাহাদের যে কিছু সমুদ্র যাত্রার প্রবর্ত্তনা ছিল, তাহা হীন ভাবেই বর্ত্তমান ছিল, কালে অতি অল্পই উৎকর্ষ সাধিত হয়। আবার লক্ষিত হইবে যে সামুদ্রিক বাণিজ্যে কেবল গ্রীকেরাই যে আত্মদেশমধ্যে আপনাপনি লিপ্ত থাকিত এরূপ নহে, ইহাদের প্রতিবেশী ফিনিশীয় প্রভৃতি জাতিরাও অতি প্রাচীন কালে সমুদ্র যাত্রায় প্রবৃত্ত হওয়ায়, গ্রীসে আসিয়া সদা সর্ব্বদা বাণিজ্য করিত; ইহাদের নিকট হইতেও গ্রীকেরা পোত চালনার উৎকৃষ্ট কৌশল সকল অধিক প্রকারে শিক্ষা করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছিল। অস্ত্র চালন ও পার্থিব চতুরতা শিক্ষাও এ সূত্রে নিতান্ত অল্প হয় নাই। কারণ ইয়ো, মিডিয়া প্রভৃতির হরণ ও তদানুস-ঙ্গিক ঘটনাবলী তৎপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ভারতের আদিম কালে দেশ মধ্যে এরূপ বৈদেশিক আগমন একে-বারে ছিল না বলিতে হইবে।

ক্রমে লোক বৃদ্ধি সহকারে দেশ মধ্যে স্থান সঙ্কীর্ণ হইলে, ভারতীয়েরা যেমন ব্রহ্মর্ষি হইতে ব্রহ্মাবর্ত্ত, ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে মধ্যদেশ, ক্রমে সমগ্র উত্তর দেশ, পরে দক্ষিণাবর্ত্তে জনস্থান স্থাপন পূর্ব্বক উপ-নিবেশ করিয়াছিলেন; গ্রীকেরাও তদ্রূপ দেশ মধ্যে স্থান সঙ্কীর্ণ হইলে ক্রমে ক্রমে সন্নিকটস্থ দ্বীপাবলী—তাহাতেও সঙ্কুলান না হইলে আসিয়া মাইনর প্রভৃতি দূরতর স্থানে উপনিবেশ স্থাপনে বাধ্য হয়েন। গ্রীকেরা যখন এইরূপ ছড়াইয়া বিভিন্ন দেশগত হইলেন এবং প্রতিবেশীবর্গ যখন প্রবল হইয়া পরধন লাভে আত্মো-ন্নতি করিবার অভিপ্রায়ে ইহাদের উপর শত্রুতা-সাধন করিতে লাগিলেন, তখন সাধারণ শত্রুর প্রতিযোগিতায় সকলকে একতা-সূত্রে আবদ্ধ হইতে হইল। এই রূপ একতা বন্ধনের নিমিত্তই অলিম্পিক, ইস্থমিয়ান প্রভৃতি পর্ব্বের সৃষ্টি। এবং শত্রুর অপেক্ষা অল্প সংখ্যক হওয়ায়, সামর্থ্যে তাহাদের প্রতিযোগিতার নিমিত্ত ঐ ঐ পর্ব্বে শরীর-পরিচালক ও বলবিধা-য়ক ক্রীড়া কৌতুকের প্রাধান্য। এই নিমিত্তই সর্ব্বত্র বলের অর্চ্চনা, সর্ব্বত্রই সামাজিক নিয়মাবলীর মধ্যে তৎপ্রতি-পোষক নিয়মাবলীর প্রাধান্য। এই নিমিত্ত স্পার্টা নগরে লাইকর্গাসের ভয়ঙ্কর নিয়মাবলী- যাহা বল-বৃদ্ধির অনুরোধে

মানবীয় প্রাকৃতিক বৃত্তি নিচয়কেও ধ্বংস করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই এবং যাহার প্রভাব এতদূর, যে সমাজে বল বৃদ্ধি হইবে বলিয়া স্বামী আপন স্ত্রীকে আত্মাপেক্ষা বলিষ্ঠ পুরুষের সহবাস করিতেও অক্লিষ্ট মনে উপদেশ প্রদান করিয়াছে। এই বলের উত্তেজনা হেতু হোমারের চিরন্তন-স্মমযী মহাকাব্য—এবং ইহারই পরিপোষক রূপে টিটিয়স প্রভৃতি কবিগণের গীতি-কাব্যের উৎপত্তি। আবার এই বলের প্রভাবে, এবং বহিঃ শত্রুর উত্তেজনায় বর্দ্ধিত স্বদেশ-প্রিয়তার মোহিনী শক্তির মোহে সালামিস, থার্ম্মপিলি প্রভৃতি তীর্থ-নিচয় গ্রীকদিগের বীরকীর্ত্তি ও স্বদেশ-প্রিয়তার চির সাক্ষ্য স্বরূপ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে গ্রীকেরা এই সুন্দর বল ও সাহস অনেক সময়ে স্বজাতীয় রক্তপাতে অপ-ব্যয়িত করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু প্রদেশ-পরম্পরায় অন্তরে অন্তরে স্বাতন্ত্র্য ভাব, এবং আপনাপনির মধ্যে কোন বিষয়ের নিষ্পত্তি-সম্বন্ধে কেহ কাহার নিকট ন্যূনতা এবং বাধ্য বাধকতা স্বীকার না করা—এ অপব্যয়ের মূলীভূত কারণ।

যাহা হউক এক্ষণে ভারতীয়দের স-হিত তুলনে সাধারণ গ্রীক চরিত্র যথাযথ পর্য্যবেক্ষণ ও উভয়ের মধ্যে বৈলক্ষণ্যের পর্য্যালোচনা করা যাউক।

ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

তড়িতের ইতিবৃত্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তড়িৎ ও বিদ্যুতের একতা প্রতিপাদন। ফ্রাঙ্কলিন কর্ত্তৃক তড়িদাক্রান্ত পদার্থের সহিত বিন্দুনিচয়—Points—বা সূক্ষ্মাগ্রের সম্বন্ধ নির্ণয়। তড়িদাক্রান্ত মেঘ-বিষয়ক পরীক্ষার প্রস্তাবনা। ফ্রান্সে মেঘ হইতে প্রথম তড়িতাকর্ষণ। ফ্রাঙ্কলিনের তড়িদাক্রান্ত ঘুড়ী। বিদ্যুদ্দণ্ডের (Lightning Conductor) আবিষ্ক্রিয়া। বিদ্যুৎ সম্বন্ধে ভয়ানক পরীক্ষা। অধ্যাপক রিচমানের (Professor Richman) মৃত্যু। বায়বীয় তড়িতের (Atmospheric electricity) উপর ব্যাকেরিয়ার (Baccaria) পরীক্ষা। তড়িৎ-সংক্রামণের (Eletrical Induction) আবিষ্ক্রিয়া। কাচজ ও লাক্ষাজ তড়িৎ-মতের (Vitreous ahd Resinous theory of electricity) পুনরুদ্দী-পনা। তড়িৎ-বলের পরিমাণ ফল। টরসন তুলামান যন্ত্র (Torsion Balance) এবং ইলেকট্রোফোরসের (Electrophorus)—আবিষ্ক্রিয়া। অষ্টাদশ শতাব্দির শেষ পর্য্যন্ত তড়িৎ-বিজ্ঞানের উন্নতি।

ইতি পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে তাড়িত তরলের অগ্ন্যুদ্গম ও আস্ফোটনের সহিত বিদ্যুৎ ও বজ্রের সাদৃশ্য দর্শনে কতিপয় পূর্ব্বতন বৈজ্ঞানিক তড়িৎ ও বিদ্যুৎকে একই বলিয়া অনুমান করেন। এবিষয় সম্বন্ধে ডাক্তার ওয়ালের মত যে সময়ে প্রচারিত হয়, তখন তড়িৎ-তত্ত্বের অতি অল্প মাত্র সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এবং তৎ সমস্তের গূঢ় নিয়মাদিও স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। তৎপরে উত্তরোত্তর পরীক্ষা দ্বারা, বিশেষতঃ লিডেন বোতলের আবিষ্কারের পর, তড়িৎ দৃশ্য সকলের আরও উন্নতি হওয়ায় অনেকানেক পরীক্ষক (Experimenters) উক্ত বোতলের সাহায্যে সামান্য পরিমাণে বিদ্যুৎ ও বজ্রের অনুকরণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

আবে নলে (Abbe Nollet) তাঁহার লিকন ডি ফিজিক (Lecons de Physique) নামক গ্রন্থে এই রূপ মত ব্যক্ত করেন; "তাড়িত তরলের সর্ব্বব্যাপিত্ব, তাহার ক্ষণস্থায়িত্ব, দাহিকা-শক্তি ও আস্ফোটন প্রভৃতি যে সমস্ত গুণ লিডেন বোতলের পরীক্ষায় উত্তম রূপে প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইতেছে, তদ্দর্শনে আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে প্রকৃতি দেবীর হস্তে যেমন বজ্র, তদ্রূপ আমাদিগের হস্তে তড়িৎ। তড়িৎ-পরীক্ষা দ্বারা আমরা যে সমস্ত বিস্ময়কর প্রত্যক্ষ প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছি তৎসমুদয় কেবল ভীষণ-বজ্রের সামান্যতঃ অনুকরণ মাত্র। উভয়েরই গূঢ় কারণ এবং প্রকৃতি একই রূপ। বায়ু, তেজ, এবং বিবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়া সহযোগে বোধ হয় মেঘ তড়িদাক্রান্ত হইয়া পার্থিব কোন তড়িদাক্রান্ত পদার্থের নিকটবর্ত্তী হইলে বিদ্যুৎ ও বজ্রের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।" কিন্তু তড়িৎ ও বিদ্যুতের একতা প্রতিপাদন জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট উপায় উদ্ভাবনে ফ্রাঙ্কলিনের পূর্ব্বে কেহই কৃত কার্য্য হয়েন নাই। ফ্রাঙ্কলিন প্রকৃত প্রস্তাবে মেঘ হইতে তড়িদাকর্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই পরীক্ষার কল্পনা তিনি তাঁহার বন্ধু হপ্‌কিন্‌সনের একটী নিষ্ফল পরীক্ষা হইতে প্রাপ্ত হন। তাঁহার উক্ত বন্ধু কোন সময়ে একটি লৌহ বর্ত্তুলকে তড়িদাক্রান্ত করেন, ও বর্ত্তুলস্থ তড়িৎ সমগ্র এককালীন বৃহত্তর অগ্নিশিখা রূপে নিষ্ক্রামণ করণাভিপ্রায়ে উক্ত বর্ত্তুল-গাত্রে একটি সূক্ষ্মাগ্র সূচি বিদ্ধ করিয়া রাখেন। কিন্তু তাঁহার আশার বিপরীত ফল প্রাপ্তে তিনি বিস্ময়াপন্ন হয়েন, অর্থাৎ তদুপায় দ্বারা অধিকতর স্ফুলিঙ্গ প্রকাশমান না হইয়া বরং সূচ্যগ্র দ্বারা বর্ত্তুলস্থ তড়িৎ রাশি ত্বরায় বিকীর্ণ হইয়া যায়। তিনি এই পরীক্ষার সবিশেষ বিবরণ ফ্রাঙ্কলিনের নিকট ব্যক্ত করেন। ফ্রাঙ্কলিন তৎসংবাদ প্রাপ্তে তৎকারণানুসন্ধানে এবং সূচ্যগ্রের তড়িদাকর্ষণ করিবার ক্ষমতা নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হয়েন। এবং স্বয়ং উক্ত পরীক্ষা পুনঃসংসাধন দ্বারা প্রত্যক্ষ করিলেন, কেবল

যে তড়িদাক্রান্ত বর্ত্তুল-গাত্র-বিদ্ধ সূচি তড়িৎকে ত্বরায় বিসৃত করে এমত নহে, অধিকন্তু ঐ বর্ত্তুল গাত্র হইতে সূচি স্থানান্তরিত করিয়া বর্ত্তুলকে তড়িৎ-পূর্ণ করত তাহার নিকটে ভূ সংস্পৃষ্ট কোন ধাতব দণ্ডের সূক্ষ্মাগ্র ধারণ করিলে তদ্দ্বারা বর্ত্তুলস্থ তড়িৎ অতি শীঘ্র এবং অলক্ষিত ভাবে পৃথিবীতে সঞ্চালিত হইয়া যায়।

তড়িৎ-সম্বন্ধে বিন্দু বা সূক্ষ্মাগ্রের উক্ত ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ করিয়া ফ্রাঙ্কলিন্ অনেক আন্দোলনের পর অনুমান দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন, যে মেঘ হইতে ঐ রূপ সূক্ষ্মাগ্র কোন ধাতব দণ্ড দ্বারা তড়িৎ রাশি নিঃশব্দে ও নিরাপদে আকর্ষণ করা যাইতে পারে। দণ্ডের সূক্ষ্মাগ্র মেঘের নিকটবর্ত্তী রাখা উচিত। কিন্তু সুদীর্ঘ ধাতব দণ্ড ব্যয়সাধ্য বিধায় তিনি কল্পনা করিলেন যে কোন অত্যুচ্চ প্রাসাদ বা স্তম্ভোপরি উক্ত দণ্ড স্থাপন দ্বারা ও কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে। সেই সময়ে ফিলাডেল্-ফিয়াতে একটি অত্যুচ্চ মন্দির গঠিত হইতেছিল। তিনি তাহার সমাধা অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। ইত্যবসরে তাঁহার পরীক্ষার ফল সমূহ তিনি প্রচার করিলেন, এবং তৎসঙ্গে এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে, যাঁহার সুবিধা হইবে তিনি যেন উক্ত পরীক্ষার অনুষ্ঠান করেন।

চার্‌ল্‌ষ্টন নিবাসী ডাক্তার লাইনিং এর (Dr Lining) এক পত্রের প্রত্যুত্তরে ফ্রাঙ্ক্‌লিন নিম্নলিখিত মর্ম্মে তাঁহার এই মহতী আবিষ্ক্রিয়া সম্বন্ধে এক পত্র লিখেনঃ-"তড়িৎ ও বিদ্যুতের সমতা সপ্রমাণ জন্য মেঘ হইতে তড়িৎ আকর্ষণের পরীক্ষা অবলম্বনের কল্পনা প্রথমতঃ আমার মনে কি রূপে উদয় হয়, আপনার এই প্রশ্নের উত্তরে আমার তড়িৎ-তত্ত্বের স্মৃতিকা (Memorandums) হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া পাঠাই। তদ্দর্শনে মহাশয়ের উপলব্ধি হইবে যে উক্ত কল্পনা দূর-পরাহত নহে। যে কোন তড়িৎ-বৈজ্ঞানিকের মনে উহা স্বতই উদয় হইতে পারে; নবেম্বর ৭. ১৭৪৯—নিম্ন-লিখিত কয়েক বিষয়ে তড়িৎ ও বিদ্যুৎকে সমতুল্য বলিয়া বোধ হয়: (১) উভয়েরই দীপিকা শক্তি, (২) বক্র গতি, (৩) দ্রুত বেগ, (৪) আস্ফোটন (৫) জল ও বরফ মধ্যে স্থায়িত্ব, (৬) উভয়ই জীব-নাশক, (৭). ধাতু-দ্রব কারী, (৮). দাহ্য পদার্থ-প্রজ্বলনকারী, (৯). গন্ধকীয় ঘ্রাণ-যুক্ত, এবং ধাতু দ্বারা পরিচালিত হয় (১০) উভয়ের আলোকের বর্ণ একই, (১১). এবং উভয়ই তাহাদের বিসরণে বাধা-সম্পাদক পদার্থ মাত্রকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে। তড়িৎ সূক্ষ্মাগ্র দ্বারা আকর্ষিত হয়। এই গুণটি বিদ্যুতে অবস্থিত কি না, তাহা আমরা অদ্যাপি অবগত হই নাই। কিন্তু আমরা যত প্রকারে পরীক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছি তৎ সমস্ত স্থলে যখন উভয়েই এক পদার্থ বলিয়া বোধ হইতেছে, তখন শেষোক্ত বিষয়ে সম্ভবতঃ তাহারা সমতুল্য হইবে।

পরীক্ষা দ্বারা ইহাই এক্ষণে সপ্রমাণ করিতে হইবে।”

ফ্রাঙ্কলিনের পূর্ব্বোক্ত মতের উপর নির্ভর করিয়া এম ডালিবার্ড (M. Dalibard) ও এম ডেলর (Delor)—নামক ফরাসীদ্বয়, মেঘ হইতে তড়িদাকর্ষণ করণাভিপ্রায়ে দুইটি স্বতন্ত্র স্থানে দুই পৃথক যন্ত্র স্থাপন করেন। ডালিবার্ড ফ্রান্স হইতে নয় ক্রোশ অন্তরে মার্লি লাভিল নামক এক গ্রাম মধ্যে ৭০ ফীট দীর্ঘ এক সূচাগ্র লৌহ দণ্ড স্থাপন করেন। এই দণ্ডই সর্ব্ব প্রথম মেঘ হইতে তড়িদাকর্ষণ করে। সেই সময়ে ডালিবার্ড মার্লি হইতে কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করেন। এবং ঐ দণ্ডের তত্ত্বাবধারণের ভার কইফর (Coiffer) নামক তত্রস্থ জনৈক সূত্রধরের উপর অর্পণ করিয়া যান। ১০, মে ১৭৫২ খৃঃ অঃ দিবা ২।৩. টার মধ্যে এক বজ্রধ্বনি শুনিয়া কইফর দ্রুত বেগে দণ্ডের নিকট উপস্থিত হন। এবং ডালিবার্ডের উপদেশানুসারে একটি লিডেন বোতল দণ্ডের সন্নিকট ধারণ করিবা মাত্র এক উজ্জ্বল অগ্নি স্ফুলিঙ্গ তীব্র শব্দের সহিত দণ্ড হইতে বোতল মধ্যে প্রবিষ্ট হইল দেখিলেন। তিনি দ্বিতীয় বার উক্ত রূপে পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবলতর স্ফুলিঙ্গ গ্রহণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তাঁহার প্রতিবেশিগণকে তথায় আহ্বান করিলেন। এবং সেই গ্রামের যাজককে তৎসংবাদ প্রেরণ করিলেন। সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র যাজক তথায় যাত্রা করিলেন। গ্রামস্থ অনেকেই কইফরকে বজ্রাহত দেখিবে প্রত্যাশা করিয়া প্রবল বাত্যা ও বৃষ্টি সত্ত্বে ও যাজকের পশ্চাৎগমন করিল। যাজক তথায় উপস্থিত হইয়া কইফরের ন্যায় কয়েক বার স্ফুলিঙ্গ গ্রহণে কৃতকার্য্য হয়েন। এবং তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার এক সবিশেষ বিবরণ লিপি বদ্ধ করিয়া ডালিবর্ডকে প্রেরণ করেন। তাহাতে তিনি লিখেন যে, “স্ফুলিঙ্গ সমূহ নীলবর্ণ, দেড় ইঞ্চ দীর্ঘ, এবং গন্ধকীয় গন্ধ বিশিষ্ট, ৪ মিনিটের মধ্যে ৬ বার তিনি স্ফুলিঙ্গ গ্রহণ করেন। এবং তৎপরীক্ষাকালীন তিনি বাহুতে একটি তীব্র আঘাত প্রাপ্ত হন, ও তথায় এক স্থানে প্রবলতর মুষ্টাঘাতের কালীমা চিহ্ন রহিয়া যায়।”

এবম্বিধ প্রকারে মার্লিতে প্রথমতঃ তড়িৎ ও বিদ্যুতের প্রকৃতি-গত একতা সপ্রমাণ হইলে তাহার ৮ দিবস পরে ডেলার পারিস মধ্যে ৯০ ফীট উচ্চ যে দণ্ড স্থাপন করেন, তাহাতে তিনিও পূর্ব্বোক্ত রূপ স্ফুলিঙ্গ গ্রহণে কৃতকার্য্য হয়েন। উক্ত পরীক্ষা ফরাসী রাজ এবং অনেকানেক সম্ভ্রান্ত সদস্য সমক্ষে প্রদর্শিত হয়। এদিকে ফ্রাঙ্কলিন্ এই সময়ে ফিলাডেলফিয়াতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার প্রস্তাবিত পরীক্ষা যে ইতিমধ্যে ফ্রান্সে এই রূপে প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইল, তদ্বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। বিদ্যুৎ ও তড়িৎ উভয়ই যে এক প্রকৃতি এবং এক পদার্থ ইহা ক্রমে

তাঁহার মনে এরূপ বদ্ধমূল হইল যে তিনি ফিলাডেলফিয়ার পূর্ব্বোল্লিখিত মন্দির সমাধা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে না পারিয়া উপায়ান্তর দ্বারা তদ্বিষয় পরীক্ষা-সিদ্ধ করিতে অধীর হইয়া পড়িলেন। এবং অনেক আন্দোলনের পর স্থির করিলেন যে বালকের সামান্য ঘুড়ী দ্বারা বৈদ্যুতীয় মেঘের ও ভূপৃষ্ঠের মধ্যে এক প্রকার তাড়িত-সংযোগ স্থাপন করা যাইতে পারে। মার্লিতে পরীক্ষার এক মাস পরে ১৭৫২ খৃঃ অঃ জুন মাসে এক দিবস তিনি উক্ত পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয়েন। পরীক্ষা নিষ্ফল হইলে অপদস্থ ও হাস্যাস্পদ হইবার আশঙ্কায় তিনি তাঁহার পুত্রকে এক খানি ঘুড়ির সহিত সঙ্গে লইয়া, যেন তাহারই সাহায্যার্থে, গ্রাম-প্রান্তস্থ একটী নির্জ্জন মাঠে গমন করেন। ঐ ঘুড়ী খানি সামান্য ঘুড়ী হইতে এই প্রভেদ ছিল যে, বৃষ্টি দ্বারা কোন হানির সম্ভাবনা নিরাকরণ জন্য কাগজের পরিবর্ত্তে রেশমি রুমাল দ্বারা উহা নির্ম্মিত হয়। এবং তাহার শিরোদেশে একটী সূক্ষ্মাগ্র ক্ষুদ্র ধাতব তার সংলগ্ন থাকে তাহাতে সামান্য সূতা বিনা কোন পরিচালক পদার্থ ছিল না। সূতার অপর প্রান্তে একটী চাবি বাঁধিয়া দেন ও ভূপৃষ্ঠ হইতে বিচ্ছিন্নাবস্থায় রাখিবার জন্য উহাকে এক গাছি রেসমের সূতা দ্বারা এক বৃক্ষ-শাখায় বাঁধিয়া রাখেন। এই রূপে ঘুড়ী খানি উড়াইয়া তিনি অনেক ক্ষণ আগ্রহাতিশয়ের সহিত তৎফল প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। এক খানি গাঢ় মেঘ ঘুড়ীর উপর দিয়া প্রধাবিত হইতে দেখিলেন। কিন্তু তড়িতের কোন লক্ষণ না দেখিয়া তাঁহার আশা ভঙ্গ হইতে লাগিল। ইতি মধ্যে সামান্য বৃষ্টি পড়িয়া সূতা সিক্ত হইয়া কিয়ৎ পরিমাণে পরিচালক হইল। তখন হঠাৎ দেখিলেন যে সূতার কতকগুলি সূক্ষ্মাংশ খাড়া হইয়া পরস্পর পৃথক হইয়া দাঁড়াইল। তড়িৎযন্ত্র দ্বারা তড়িদাক্রান্ত হইলে সূতা উক্ত ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। তদ্দর্শনে তিনি চাবির নিকটে নখ ধারণ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ একটী স্ফুলিঙ্গ ও সংক্ষোভ প্রাপ্ত হইলেন। তখন তাঁহার আনন্দের আর পরিসীমা রহিলনা। কিয়ৎক্ষণ পরে ঘুড়ীর সমস্ত সূতা বৃষ্টিতে উত্তম রূপ সিক্ত হইয়া অধিকতর পরিচালক হইয়া দাঁড়াইল। তখন তিনি বহু সংখ্যক স্ফুলিঙ্গ গ্রহণ করিলেন। এমন কি তদ্দ্বারা একটী লিডেন বোতল সম্পূর্ণ রূপে তড়িৎপূর্ণ করিয়া লন। এই মহতী পরীক্ষা সংসাধনানন্তর তাঁহার পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহেন,—"বাপু! এই মুহূর্ত্তেই আমার মৃত্যু হইলেও আমি যে জগতে চিরযশ স্থাপন করিয়া যাইব তাহার আর সন্দেহ নাই।"

তদনন্তর ডাক্তার ফ্রাঙ্কলিন্ নিজ প্রাসাদোপরি এক সুদীর্ঘ লৌহ দণ্ড স্থাপন করেন। তাহার মূল দেশ তাঁহার পাঠ-গৃহ মধ্যে সন্নিবেশিত থাকে। তড়িৎযন্ত্র যোগে যত প্রকার পরীক্ষা হইতে পারে

তৎসমস্তই তিনি বিদ্যুৎ হইতে ঐ দণ্ড দ্বারা সংসাধন করিয়াছিলেন। সুতরাং তড়িৎ ও বিদ্যুৎ যে একই পদার্থ তাহা তিনি নিঃসংশয়িত রূপে সপ্রমাণ করিলেন। উক্ত দণ্ড দ্বারা তিনি বিবিধ পরীক্ষা করেন। যখন দণ্ড দ্বারা তড়িদা কর্ষিত হইত তাহা জ্ঞাত হইবার জন্য তিনি কএকটী সামান্য ঘণ্টা শ্রেণীবদ্ধ পূর্ব্বক দণ্ড সংলগ্ন করিয়া রাখেন। দণ্ড তড়িদাক্রান্ত হইলে ঘণ্টাগুলি তড়িদা কর্ষণ ও বিক্ষেপণ ধর্ম্মে স্বতই ধ্বনিত হইয়া উঠিত। তচ্ছ্রবণে তিনি ত্বরায় তথায় উপস্থিত হইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিতেন। কখন কখন তাহার ধ্বনি এত প্রবল হইত যে তাহা সমস্ত বাটী মধ্যে শ্রুত হইত।

এই মহতী আবিষ্ক্রিয়ার পর ফ্রাঙ্কলিন বজ্রাঘাত হইতে বাটী সংরক্ষণ হেতু ধাতব দণ্ড ব্যবহার করেন। মানব হিতার্থে তড়িতের এই প্রথম নিয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি অনুমান করিলেন যে বিন্দু বা সূক্ষ্মাগ্রের যখন তড়িদাকর্ষণ করিবার এরূপ ক্ষমতা সপ্রমাণ হইল, তখন কোন সূচ্যগ্র ধাতবদণ্ড যদ্যপি বাটীর পার্শ্বে এরূপে সংলগ্ন করিয়া রাখা যায় যে দণ্ডের সূক্ষ্মাগ্রভাগ বাটীর উচ্চতা কিঞ্চিৎ অতিক্রম করিয়া থাকিবে এবং অপর শেষাংশ ভূমি সংলগ্ন থাকিবে, তাহা হইলে বাটীর সমীপাগত কোন বৈদ্যুতিক মেঘ হইতে তড়িৎরাশি উক্ত দণ্ড দ্বারা নিঃশব্দে ও নিরাপদে পৃথিবীতে সঞ্চালিত হইয়া যাইবে। সুতরাং তদ্দ্বারা অকস্মাৎ বিদ্যুৎপাত হইতে বাটীর কোন আশঙ্কা থাকিবে না। এবং যদিও দণ্ডোপরি বজ্রাঘাত হয় তাহা হইলেও তড়িৎ রাশি নিরাপদে পৃথিবীতে পরিচালিত হইবে।

এববিধ সিদ্ধান্ত করিয়া ফ্রাঙ্কলিন সর্ব্ব সাধারণকে, উচ্চ প্রাসাদ ও মন্দিরাদিতে এবং জাহাজের মাস্তুলে উক্ত রূপ বিদ্যুদ্দণ্ড ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন। তদবধি সাধারণতঃ এই উপায় অবলম্বিত হইয়া আসিতেছে। এতদ্দ্বারা যে অনেকাংশে অনিষ্টোৎপাতের নিরাকরণ হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই।

অতঃপর অনেকানেক তড়িৎ-বৈজ্ঞানিক ফ্রাঙ্কলিনের পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করণে সমুৎসুক হয়েন। এবং অনেকে তৎপরীক্ষা সংসাধন কালীন অনবধানতা বা কোন রূপ ব্যতিক্রম বশতঃ প্রবল আঘাত প্রাপ্ত হন। কাহার ও বা জীবন পর্য্যন্ত ও বিনষ্ট হয়। ১৭৫৩ খৃঃ অঃ নিরাক নিবাসী এমঃ ডি রোমস্ (M. De. Romas) ৭ ফীট উর্দ্ধে ও ৩.ফীট প্রস্থে এক খানি বৃহৎ ঘুড়ী প্রস্তুত করেন। তদ্দ্বারা তিনি মেঘ হইতে যত অধিক পরিমাণে নিরবচ্ছিন্ন তড়িৎস্রোত আকর্ষণ করেন তদ্রূপ অন্য কেহই সক্ষম হয়েন নাই। তিনি উক্ত ঘুড়ী খানি কেবল শোনের সুতা দ্বারা না উড়াইয়া সুতার মধ্য দিয়া এক গাছি সূক্ষ্ম ধাতব তার সন্নিবেশিত করিয়া দেন।

সূতার সহিত তারের এক প্রান্ত ঘুড়ী-সংলগ্ন থাকে এবং অপর শেষাংশ একটী টিনের নলের এক অন্তে সংলগ্ন করিয়া নলের অপরান্ত এক গাছি বিচ্ছেদক রেশমি সুতায় সংলগ্ন করিয়া ঐ সুতা ভূপৃষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। ঘুড়ী খানি ৬০০ ফীট উর্দ্ধে উঠে। এবং টীনের নল হইতে ১০ ফীট দীর্ঘ ও ১ ইঞ্চি প্রস্থ বহুসংখ্যক তাড়িতাগ্নি-স্রোত নির্গত হয়। তন্মধ্যে একটী স্ফুলিঙ্গ তীব্র শব্দ সহিত বহির্গত হইয়া ভূমধ্যে এক গর্ত্ত করতঃ প্রবেশ করে। তৎপরে আর একটী বৃহত্তর স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া তাঁহাকে এরূপ সংক্ষোভ প্রদান করে যে তিনি ভীত হইয়া পরীক্ষাটী ঐ খানেই সমাপ্ত করেন।

এম. মরমিয়ার্ নামক (M. Mormier) একাডমি অব্ সায়েন্সের (Academy of science) জনৈক সভ্য, এবং মণ্টমারন্সি (Montmorency) নিবাসী এম. বারটিয়ার M Bertier তাঁহাদের নিজ নিজ স্থাপিত বিদ্যুদ্দণ্ড হইতে উভয়েই গুরুতর সংক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়া ভূতলশায়ী হয়েন।

১৭৫৩ খৃঃ অঃ ২৬ আগস্ট, সেণ্ট পিটারস্বর্গ নিবাসী অধ্যাপক রিচমানের মৃত্যু এস্থলে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। তিনি তড়িৎ বল-পরিমাপক একটী অভিনব যন্ত্রের আবিষ্ক্রিয়া করেন। ঐ যন্ত্রের তিনি তড়িৎ নোমন (Electrical gnomon) নাম প্রদান করেন। এক দিবস এম্ঃ সলকাউ (M. Solkow) নামক জনৈক খোদকের সহিত উক্ত যন্ত্রটীর উপর বৈদ্যুতিক মেঘের ফল পরীক্ষা করিতেছিলেন। অধ্যাপক যন্ত্রের সন্নিকট প্রায় ১ ফুট অন্তরে মস্তক নত করিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। ইতি মধ্যে এক মুষ্টি পরিমাণ নীল বর্ণ একটী অগ্নি-বর্ত্তুল ঐ যন্ত্রের একটী লৌহ দণ্ড হইতে হঠাৎ নির্গত হইয়া অধ্যাপকের মস্তকে প্রবেশ করিল। তন্মুহূর্ত্তেই তাঁহার মৃত্যু হইল। সলকাউ তাঁহার নিকটেই ছিলেন। তিনি হত-জ্ঞান হইয়া ভূতলশায়ী হন। সংজ্ঞা লাভ করিয়া পরে তিনি অধ্যাপকের উক্ত মৃত্যু-বিবরণ প্রকাশ করেন। তাঁহার নিজের বিষয় তিনি এই মাত্র স্মরণ করিয়া বলেন যে অধ্যাপকের মৃত্যু হইবা মাত্র গৃহ মধ্যে এক প্রকার বাষ্প উত্থিত হইয়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার সমস্ত শরীর অবশ করিয়া ফেলে। তৎপরে যে উৎকট বজ্র-ধ্বনি হইয়া ছিল তাহা কিছু মাত্র তাঁহার শ্রবণগোচর হয় নাই। সমস্ত ব্যাপার অতিঅল্পক্ষণ মধ্যেই সংঘটিত হয়। পরে পর্য্যাবেক্ষণ দ্বারা সেই গৃহে বজ্রাঘাতের স্পষ্ট লক্ষণ দৃষ্ট হয়। গৃহের দ্বার বিখণ্ডিত ও কবজা ভ্রষ্ট হইয়া যায়।

অধ্যাপক রিচ্মানের মৃত দেহ পরীক্ষায় ললাটদেশে একটী লোহিতবর্ণ মধ্যমাকৃতি চিহ্ন দৃষ্ট হয়। তথা হইতে দুই চারি বিন্দু শোণিত নির্গত হইয়াছিল। কিন্তু তত্রস্থ ত্বক্ অক্ষুণ্ণ ছিল। বাম পদের চর্ম্ম-পাদুকা একস্থানে দ্বিখণ্ডিত হইয়া যায়। সেই স্থানের পদতলে একটী নীল

বর্ণ চিহ্ন থাকে; তজ্জন্য অনুমান হয় যে বিদ্যুৎ তাঁহার কপাল দিয়া প্রবেশ করতঃ শরীর মধ্যে সঞ্চালিত হইয়া পদ-দ্বারা বহির্গমন করিয়াছিল। অন্যান্য ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে সমস্ত শরীরে বহুসংখ্যক লোহিত ও নীলবর্ণ চিহ্ন লক্ষিত হয়। পরিচ্ছদের কোনও অংশ বিচ্ছিন্ন হয় নাই। মৃত্যুর ২৪ ঘণ্টা পর সেই দেহ ভেদ করতঃ তাঁহার অন্তর পরীক্ষায় লক্ষিত হয় যে মস্তকের খুলি (Cranium) অক্ষত রহিয়াছে। মস্তিষ্ক সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিস্থ। তাহার কোন বিলোড়ন ঘটে নাই। শ্বাসনলীর স্বচ্ছ ঝিল্লী সমূহ শিথিলীভূত হইয়াছে। স্পর্শ মাত্রে ছিন্ন হইতে লাগিল। ফুস ফুসের অধঃস্থ আধার সমূহ শোণিত-গ্রন্থী সকল পূর্ণ হইয়াছে। (Glands,) এবং নাড়ী সমস্ত স্ফীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন আভ্যন্তরিক বিশৃঙ্খল লক্ষিত হয় নাই। মৃত দেহ দুই দিবসের মধ্যে এরূপ পচিয়া উঠে যে তাহাকে অতি সন্তর্পণে কফিন্-বদ্ধ করিতে হয়।

জীব দেহে বজ্রাঘাতের ও লিডেন জারের ব্যাটারির, উভয়েরই কার্য্য সর্ব্ব বিষয়ে সমতুল্য।

বিদ্যুদ্দণ্ডের আবিষ্ক্রিয়ার পর কতিপয় তড়িৎ-বৈজ্ঞানিক মেঘস্থ তড়িতের ধর্ম্ম অর্থাৎ বৈদ্যুতিক মেঘে যৌগিক না বিয়োগিক তড়িৎ অবস্থিতি করে তাহা নির্দ্ধারণে যত্নবান হয়েন। তন্নির্দ্ধারণোদ্দেশে প্রথমতঃ ডাঃ ফ্রাঙ্কলিন বহুবিধ পরীক্ষা সাধন করেন। তাহাতে তিনি নির্দ্দেশ করেন যে বিদ্যুদ্দণ্ডের প্রত্যেক পরীক্ষায় যখন বিয়োগিক তড়িতেরই সত্ত্বার লক্ষণ সমূহ দৃষ্ট হয়, তখন মেঘ অবশ্য সর্ব্বদা বিয়োগিক তড়িদাক্রান্ত হইবে, এবং পৃথিবী যৌগিক তড়িদাক্রান্ত হইবে, তাঁহার এই উপপত্তি যে ভ্রমাত্মক তাহা তিনি ত্বরায় অবগত হইলেন। অন্যতর এক পরীক্ষায় তাঁহার উপলব্ধি হয় যে মেঘস্থ তড়িৎ যৌগিক। কিন্তু অন্যান্য প্রতিভাশালী তড়িৎ-তত্ত্বজ্ঞের মতে মেঘে বিবিধ কারণ বশতঃ কখন বিয়োগিক ও কখন বা যৌগিক তড়িৎ বর্ত্তমান থাকে। ফলতঃ যৌগিক এবং বিয়োগিক যখন কেবল তড়িতের ন্যূনাধিক্যের অবস্থাবাচক মাত্র, তখন সময় বিশেষে মেঘে পৃথিবী অপেক্ষা অধিক, কখন বা ভূপৃষ্ঠে মেঘাপেক্ষা অধিক তড়িৎ থাকিবে ইহাই যুক্তিসিদ্ধ।

এইরূপে ফ্রাঙ্কলিন কর্ত্তৃক যদিও তড়িৎ মেঘ সম্বন্ধে একটী মহত সত্য নিঃসংশয়িত রূপে প্রতিপন্ন হইল বটে, কিন্তু তিনি স্বয়ং বিদ্যুতের কার্য্য প্রণালী বুঝিতে পারেন নাই। তিনি অনুমান করিয়াছিলেন যে তাঁহার ঘুড়ী ও বিদ্যুদ্দণ্ড দ্বারা এবং বজ্রাঘাত কালীন মেঘস্থ তড়িৎ ভূপৃষ্ঠে নীত হয়। বাস্তবিক তাহা নহে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে বিভিন্ন-ধর্ম্মী কোন দুইটী তড়িৎ যেমন পরস্পর আকর্ষণশীল, সমধর্ম্মী তড়িৎদ্বয় তদ্রূপ পরস্পর বিয়োজনশীল। এই তড়িৎ-ধর্ম্মের কার্য্যকারিতা নিবন্ধন একবর্ণ-

যৌগিক অথবা বিয়োগিক-তড়িদাক্রান্ত কোন মেঘ পার্থিব কোন পদার্থের সমীপস্থ হইলে সেই মেঘস্থ তড়িৎ উক্ত পদার্থ-নিহিত এবং তৎসঙ্গে ভূপৃষ্ঠস্থ অসমান বর্ণ তড়িৎকে আকর্ষণ করিতে থাকে ও সমধর্ম্মীকে প্রতিক্ষেপ করে। ঐ মেঘ এবং পদার্থ যেমন ক্রমে পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হয় তদুভয়গত তড়িতের আকর্ষণী ও প্রতিক্ষেপণী শক্তি ও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি হইতে থাকে। ক্রমে বিভিন্ন-ধর্ম্মী তড়িৎদ্বয়ের বিততিষা (Tension) এত বাড়িয়া উঠে যে মধ্যস্থ বায়ু ব্যবধান সত্ত্বেও পরস্পর অগ্রসর হইয়া বেগে মিলিত হয়। বিদ্যুৎই এই মিলন-ফল, এবং বিদ্যুৎপাত কালীন বায়বীয় বিলোড়ন-জনিত শব্দই ভীষণ বজ্র। এবং ফ্রাঙ্ক্লিন্ যে ঘুড়ীর সুতা ও বিদ্যুদ্দণ্ড হইতে তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গ গ্রহণ করেন তাহা ঐ সুতা ও দণ্ড মধ্যস্থ পূর্ব্বোল্লিখিত বিক্ষিপ্ত তড়িৎ মাত্র। মেঘের তড়িৎ নহে। কখন কখন এক মেঘের তড়িৎ মেঘান্তরের তড়িতের সহিত মিলিত হইয়াও বিদ্যুদ্দাম ঘটিয়া থাকে। এই বিষয়টী উত্তমরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে প্রথমে তড়িৎ-সংক্রামণ ও সিমারের তড়িৎ-মতের (Symmers' theory of the electric fluid) বিষয় বিশেষ জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। তদুভয় বিষয়ই যথাস্থানে উল্লেখ করা যাইবে।

তদনন্তর কতিপয় বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসু বিদ্যুদ্দণ্ড ও তদানুসঙ্গিক তড়িৎ-পরিমাপক যন্ত্র দ্বারা বাত্যা বা মেঘ-রহিত অতি পরিষ্কার আকাশস্থ বায়ুতেও তড়িৎ-সত্তার লক্ষণ প্রত্যক্ষ করেন। সিনর বেকেরিয়া (Signor Bacharia) এই বিষয় সম্বন্ধে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করেন যে, প্রবল বাত্যা, বৃষ্টি, শিল, উল্কাপাত, কুজ্ঝটিকা, জলস্তম্ভ, নীহার—আরোরা বরিয়ালিস্ (Aurora Borealis) প্রভৃতি যাবতীয় জলবায়ুঘটিত প্রত্যক্ষ (Meteorological phenomena) তড়িৎ-মূলক। তড়িৎই তৎসমস্তের মূলীভূত কারণ। উক্ত বিখ্যাতনামা বিজ্ঞানবিদের তত্ত্বানুসন্ধানের পর অন্য কোন বৈজ্ঞানিক এ বিষয়ের নিগূঢ় নিয়মাদি নির্ণয়ে কৃতকার্য্য হয়েন নাই।

গত শতাব্দির মধ্যে তড়িৎ ও বিদ্যুতের প্রকৃতিগত একতা সম্পাদন দ্বারা তড়িৎ-শাস্ত্রে একটী নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছে বলিতে হইবে। এতদ্দ্বারা তড়িৎ-বৈজ্ঞানিকের সম্মুখে তড়িত্তত্ত্বানুসন্ধানের একটী নবক্ষেত্র বিস্তারিত হইয়াছে। তদবধি বিবিধ অভিনব সত্যও নির্ণীত হইতে লাগিল। এবং তড়িৎ-কার্য্য সমূহও অনেকাংশে সুবোধ্য হইয়া আসিতেছে।

বিজ্ঞ তত্ত্ববিশারদ ক্যানটন মহোদয় (Mr. Canton) দ্বারা তড়িৎ-সংক্রামণের (Electrical Induction) সবিশেষ তত্ত্ব আলোচিত হয়। এবং তৎকর্ত্তৃকই তড়িতের এই ধর্ম্মের কার্য্যাদি বিশেষরূপে নির্ণীত হয়। তদ্দ্বারা তড়িৎ-কার্য্য সমূহ অনেকাংশে সহজবোধ্য হইয়াছে।

কোন পদার্থ তড়িদাক্রান্ত হইলে তড়ি-

কটস্থ সহজাবস্থ বস্তুর উপর তাহার ক্ষমতার বিষয়ে পূর্ব্বতন তড়িৎবেত্তাদিগের স্পষ্ট কোন জ্ঞান ছিলনা। পরে ক্যানটন বহু পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, যে তড়িদাক্রান্ত পদার্থ-নিহিত তড়িৎ মাত্রেই তদায়ত্তিস্থ সহজাবস্থ বস্তুতে তড়িৎউত্তেজিত করিয়া থাকে। ইহাকেই তড়িৎ-সংক্রামণ কহে। ক্যানটন কোন বিচ্ছেদক পদার্থোপরি স্থাপিত একটী ধাতব পরিচালকের সন্নিহিত একটী ঘর্ষিত তাড়িত পদার্থ (Excited electric) ধারণ করিয়া দেখেন যে যতক্ষণ ঐ তড়িদাক্রান্ত পদার্থ পরিচালকের নিকট রহিল ততক্ষণ পরিচালকও তড়িদাক্রান্ত লক্ষিত হইল। তাড়িত পদার্থটী যৌগিক তড়িদাক্রান্ত হইলে পরিচালকের তদভিমুখস্থ দিক তৎবিপরীত অর্থাৎ বিয়োগিক তড়িৎযুক্ত হইবে, ও অপর দিকটী যৌগিক তড়িৎ-পূর্ণ হইবে। কিন্তু ঘর্ষিত তাড়িত-পদার্থ পরিচালকের নিকট হইতে স্থানান্তরিত করিবা মাত্রই পরিচালক পূর্ব্বাবস্থা পুনঃ প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু আবার যদ্যপি ঐ পরিচালকের যৌগিক তড়িৎ-যুক্ত দিকটি অন্য কোন পরিচালক সংস্পর্শ করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে উক্ত তড়িৎ-পদার্থ স্থানান্তরিত করিলেও পরিচালক তড়িদাক্রান্ত থাকিবে। ক্যান্‌টন কৃত এই পরীক্ষা সমূহ ডাক্তার ফ্রাঙ্কলিন কর্ত্তৃকও পুনরাবৃত্ত হয়।

তড়িৎ-সংক্রামণের কারণ-অনুসন্ধিৎসু হইয়া ইপিনস M. Aepinus ও উইলকি Mr. Wilke—নামক তত্ত্বজ্ঞদ্বয় তদ্বিষয়ক বিবিধ পরীক্ষায় নিযুক্ত হন। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পরিশেষে একটি অভিনব পরীক্ষা সংসাধনানন্তর নিবৃত্ত হন। তড়িৎ-সংক্রামণের কার্য্য-পরিদর্শনে তাঁহাদিগের অনুমিত হয় যেমন লিডেন বোতলের অন্তর ও বহির্ধাতব ফলকের সাহায্যে তন্মধ্যস্থ বোতলকে তড়িৎ-পূর্ণ করা যায়, তদ্রূপ পরস্পরের কিঞ্চিৎ ব্যবধানে স্থাপিত দুইটি ধাতব ফলক দ্বারা তন্মধ্যস্থিত বায়ুকেও তড়িৎপূর্ণ করা অসম্ভাবনীয় নহে। এবং তদ্দ্বারা লিডেন বোতলেরও কার্য্য সমূহ সংঘটিত হইতে পারে। তদনুসারে তাঁহারা মধ্যমাকৃতি দুইটী ধাতব ফলক (Plates) দুইটি বিচ্ছেদক পায়ায় সন্নিবেশিত করিয়া পরস্পরের সম্মুখীন করিয়া প্রায় ১।৮ ইঞ্চ ব্যবধানে স্থাপন করেন। তদনন্তর ধাতব দণ্ড দ্বারা উভয় ফলককে সংযোজিত করিবা মাত্র তীব্র আস্ফোটন ও অগ্ন্যুদ্গম সংঘটিত হয়।

ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে যে ইহার অনেক পূর্ব্বে যখন লিডেন বোতলের প্রক্রিয়া সমূহ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, এবং ফ্রাঙ্কলিন যখন এতদূর বুঝিয়াছিলেন যে বোতলের আভ্যন্তরিক ফলক এক বর্ণ তড়িৎ-পূর্ণ হইলে বহির্ফলকে স্বতই কাচ ব্যবধান সত্ত্বেও তৎবিপরীত-ধর্ম্মী তড়িৎ সংক্রামিত হইবে; তখন তাঁহার অথবা তৎসাময়িক অন্য

কোন তড়িৎ-বিদের মনে ইহা একবারও উদয় হয় নাই যে লিডেন বোতলের কাচের ন্যায় বায়ু ব্যবধান সত্বেও তড়িদাক্রান্ত কোন বস্তু তন্নিকটস্থ সহজাবস্থ পদার্থ মাত্রে তড়িৎ সংক্রামিত করিবে। লিডেন বোতলের প্রক্রিয়া কেবল তড়িৎ-সংক্রামণের ফল মাত্র। সুতরাং লিডেন বোতলের পরীক্ষা আর ক্যান্টনের পূর্ব্বোক্ত সংক্রামণের পরীক্ষা সুদূর-পরাহত নহে।

ক্যান্টন-কর্ত্তৃক আর একটি তড়িৎ সত্য আবিষ্কৃত হয়। তাহাতে তড়িৎ-বিজ্ঞান উন্নতি মার্গে আর একপদ অগ্রসর হইয়াছে সন্দেহ নাই। তিনি নির্ণয় করেন যে কোন পদার্থকে কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তু দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া দুইএর এক বর্ণ তড়িৎ-পূর্ণ করিয়া, তৎপরে অন্যবিধ কোন বস্তু দ্বারা সেই পদার্থকে ঘর্ষণ করিয়া তদন্তর্গত তড়িৎকে বিভিন্নধর্ম্মী করিতে পারা যায়। অর্থাৎ ঘর্ষণী পদার্থের বিভিন্নতানুসারে ঘর্ষিত এক বস্তুর তড়িৎ কখন যৌগিক কখন বা বিয়োগিক হইয়া থাকে। আরও ঘর্ষিত পদার্থের বহির্গাত্রের মসৃণতা বা বন্ধুরতানুসারে, এক প্রকার ঘর্ষণী দ্বারা তন্মধ্যে যৌগিক অথবা বিয়োগিক তড়িৎ উত্তেজিত হইবে। কাচ-নিহিত যৌগিক তড়িৎ অন্যান্য বস্তুর ন্যায় এ বিষয়ে তত পরিবর্ত্তনশীল নহে। অর্থাৎ কাচকে যে কোন পদার্থ দ্বারা ঘর্ষণ করা যাউক না কেন, তাহাতে কেবল যৌগিক তড়িৎই উদ্ভাবিত হইবে। কেবল মাত্র কাচের উপরিভাগ বন্ধুর করিয়া কিম্বা বিড়ালের চর্ম্ম দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া তাহার যৌগিক তড়িৎকে বিয়োগিক তড়িতে পরিণত করা যায়। বিচক্ষণ তত্বদর্শী ক্যান্টন এই খানেই নিরস্ত হয়েন নাই। তৎপরে তিনিই সর্ব্ব প্রথমে তড়িৎ-যন্ত্রে অ্যামালগ্যাম * Amalgam ব্যবহারের প্রবর্ত্তনা করেন।

১৭৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তড়িৎ-প্রকৃতি সম্বন্ধে ফ্রাঙ্কলিনের যৌগিক ও বিয়োগিক মত—Positive and Negative, or Plus and Minus theory—প্রচলিত ছিল। তৎপরে ঐ অব্দে সিমারস্ সাহেব Mr. Symmers উক্ত মত বিবিধ সদ্‌যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিয়া তদ্বিষয়ক এক সুদীর্ঘ প্রস্তাব রএল সোসাইটীতে (Royal Society) প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে তিনি এবম্বিধ কতকগুলি পরীক্ষার প্রস্তাবনা করেন যে দুই বিভিন্ন প্রকার তড়িতের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে অন্যমতে তৎ-

* ইহা এক প্রকার মিশ্র পদার্থ। দুই ভাগ দস্তা ও এক ভাগ টিনকে একত্রে দ্রব করিয়া তাহার সহিত ছয় ভাগ পারা মিশ্রিত করতঃ তাহাকে শীতল করিতে হয়। তৎপরে তাহাকে উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া চর্ব্বি মিশ্রিত করিয়া রাখে। আবশ্যক মতে উহার কিঞ্চিৎ তড়িৎ যন্ত্রের ঘর্ষনীয় গাত্রে বিস্তৃত করিলে সত্বরে ও প্রচুর পরিমাণে তড়িদুত্তেজিত হইয়া থাকে। ইহার কারণ অদ্যাবধি নির্ণীত হয় নাই।

পরীক্ষা সমূহের ফল অসম্ভাবনীয় হইয়া উঠে। ইতি পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ডুফেব মতেও তড়িৎ দ্বিবিধ; কাচজ ও লাক্ষাজ। কিন্তু তাঁহার মতে এই দ্বিবিধ তড়িৎ পরস্পরের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, কেহই কাহারও উপর কোন প্রকারে নির্ভর করেনা। এবং উভয়ে কখনও মিলিত অবস্থায় ও থাকেনা। উভয়েব অন্যতর মাত্র এক সময়ে কোন পদার্থে উদ্ভুত হইয়া থাকে।

কিন্তু সিমারের মতে ঐ দুই বিভিন্ন প্রকার তড়িতেরই সম সংযোগে এক প্রকার নিশ্চেষ্ট তাড়িত তরল (Neutral fluid) পদার্থ মাত্রেই নিহিত আছে। পদার্থের সহজাবস্থায় তাহার সত্বা উপলব্ধি হয় না। কিন্তু কোন কারণে যথন কোন পদার্থস্থ ঐ উভয় তড়িতের সাম্যাবস্থা নষ্ট হয় তখন একেব আধিক্য জন্মায় এবং ঠিক সেই পরিমাণে অপবটিব ও হ্রাস হইয়া থাকে। আবও অসমানবর্ণ তড়িৎ পরস্পর-আকর্ষণশীল ও তদ্বিপরীতে সমানবর্ণ তড়িৎ পরস্পর-বিয়োজনশীল। অর্থাৎ যৌগিক তড়িৎ অপর এক যৌগিক তড়িতের নিকটবর্ত্তী হইলে উভয়েই বিক্ষিপ্ত হয়, ও বিয়োগিক তড়িৎ যৌগিককে আকর্ষণ করিয়া থাকে। সুতরাং কোন পদার্থের সাম্যাবস্থা নষ্ট হইলেই তাহাকে তড়িদাক্রান্ত কহে। এবং তজ্জনিত সমস্ত তড়িৎ-কার্য্য সংঘটিত হইয়া থাকে। এই মতানুসারে আবিষ্কৃত তড়িৎকার্য্য সমস্তই বুঝিতে পারা যায়। এবং এই মতই এক্ষণে সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইয়াছে।

মে ইপিনস (Mr. Aepinus) এবং অনারেবল হেনরি ক্যাভেনডিস (The Hon Henry Cavendish) বহু যত্নে গণিত শাস্ত্রের সাহায্যে তড়িতের আকর্ষণী ও বিক্ষেপণী শক্তির পরিমাণ এবং কতক নিয়মাদিও নির্দ্দেশ করেন। ঐ মহাত্মাদিগেব আদর্শিত তত্ত্বানুসন্ধান ১৭৮৫ খৃঃ অব্দে কুলম (M. Coulomb) কর্ত্তৃক অনুসৃত হয়। তিনি তড়িতের আকর্ষণ ও বিয়োজন-পরিমাপক টরসন তুলামান (Torsion Balnce) নামক একটী অভিনব অতি সূক্ষ্ম যন্ত্র আবিষ্ক্রিয়া করেন। এই যন্ত্রের সূক্ষ্মতা এতদূর যে তদ্দ্বারা অর্দ্ধ কুচের ২০,০০০০০০ বিংশতি কোটি অংশের একাংশ পরিমাণ পর্য্যন্ত তড়িৎ-বল নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই যন্ত্র সহযোগে কুলম নিরূপণ করেন যে সমধর্ম্মী তড়িদাক্রান্ত দুই বস্তুর মধ্যবর্ত্তী দূরত্বের বর্গানুসারে তাহাদের পরস্পরের বিয়োজনী শক্তির হ্রাস হইয়া থাকে। এবং দুইটি তড়িদাক্রান্ত পদার্থস্থ তড়িতের পরিমাণানুসারে তাহাদের পরস্পরের আকর্ষণ অথবা বিক্ষেপণের ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে, ও তাহাদেব মধ্যবর্ত্তী দূরত্বের বর্গানুসারে তাহাদের পরস্পরের আকর্ষণ ও বিক্ষেপণের হ্রাস হইয়া থাকে। তিনি আরও নির্ণয় করেন যে কোন তড়িদাক্রান্ত পদার্থ উত্তম বিচ্ছেদক বস্তুর উপর স্থাপিত হইলেও কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে তন্মধ্যস্থ তড়িৎ, চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী বায়ু এবং অন্যান্য বিচ্ছেদক বস্তুর দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে পরিচালিত হইয়া যায়। বায়ুতে সর্ব্বক্ষণই

ন্যূনাধিক আর্দ্রতা বা জল-কণা অবস্থিতি করে; এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিচ্ছেদক বস্তু ও কিয়ৎ পরিমাণে তড়িৎ-সঞ্চালক। সুতরাং তদুভয় দ্বারা পূর্ব্বোক্ত তড়িদাক্রান্ত বস্তুর তড়িৎ কিয়ৎকাল মধ্যে ইতস্তত: বিসৃত হইয়া যায়। আরও কুলম্ব স্পষ্টাক্ষরে ও নিঃসংশয়িত রূপে সপ্রমাণ করেন যে সঞ্চালক বস্তর বহির্গাত্রেই Surface—ঘর্ষণোত্তেজিত তড়িৎ অবস্থিতি করে। অন্তর ভেদ করে না।

টরসণ তুলামান যন্ত্রের আবিষ্ক্রিয়ার দুই চারি বৎসর পূর্ব্বে সুবিখ্যাত ভল্‌টা—M. Volta ইলেক্‌ট্রোফোরস্‌ (Electro phoras নামক তড়িৎ যন্ত্রের আবিষ্কার করেন। এই যন্ত্রটি তড়িৎ-সংক্রামণ কার্য্যের একটি উত্তম দৃষ্টান্ত স্থল। গালা, রজন ধুনা অথবা অন্য কোন তাড়িত পদাথ নির্ম্মিত একটী চাক্‌তিতে (Disc) ঘর্ষণ দ্বারা তড়িৎ পূর্ণ করিয়া কোন বিচ্ছেদক পদার্থোপরি স্থাপিত একখানি ধাতব চাকতির উপর রাখিবা মাত্র সেই ধাতব চাক্‌তির উপরিভাগে প্রথমোক্ত তাড়িত চাক্‌তিগত তড়িতের বিপরীত তড়িৎ সংক্রামিত হয়। এবং তদ্বিপরীত দিকে অর্থাৎ নিম্ন ভাগে প্রথমোক্ত তড়িৎ সংক্রামিত হয়। অর্থাৎ ধাতব চাকতির উপরিও নিম্নভাগ সংক্রামণ গুণে দুই বিভিন্নধর্ম্মী তড়িদাক্রান্ত হয়। তাড়িত চাক্‌তিটী বিয়োগিক তড়িদাক্রান্ত হইলে ধাতব চাক্‌তির উপরিভাগ যৌগিক ও নিম্নভাগ বিয়োগিক তড়িৎ-পূর্ণ হইবে। সেই সময়ে, যখন উভয় চাক্‌তি পরস্পর সংস্পৃষ্ট ভাবে আছে যদ্যপি ধাতব চাকৃতির নিকট অঙ্গুলি অথবা কোন পরিচালক পদার্থ ধারণ করা যায়, তাহা হইলে চাক্‌তির অধঃস্থ বিয়োগিক তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ-রূপে ধৃত সঞ্চালক পদার্থে প্রবেশ করিয়া সঞ্চালিত হইয়া যায়। তখন ঐ তাড়িত চাক্‌তিটী স্থানান্তরিত করিলেও লক্ষিত হইবে যে ধাতব চাক্‌তি যৌগিক তড়িদাক্রান্ত, এবং এত অধিক পরিমাণে, যে তাহা হইতে প্রায় এক ইঞ্চ দীর্ঘ স্ফুলিঙ্গ গ্রহণ করা যায়। এই রূপে বারম্বার ঐ উভয় চাক্‌তির সংস্পর্শে ও তৎপরে তাহাদের পৃথক করণ দ্বারা এত অধিক পরিমাণে ঐ যৌগিক তড়িৎ বৃদ্ধি করা যায় যে তদ্দ্বারা গুটিকতক লিডেন বোতল তড়িৎ-পূর্ণ করা যায়। তাহাতে প্রথমোক্ত তাড়িত চাক্‌তিটীর তড়িতের কিছুমাত্র হ্রাস লক্ষিত হইবে না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর অবশিষ্ট শেষ ভাগের মধ্যে লাভইসর (Lavoisier) লাপ্লাস্‌ (La Place) প্রভৃতি কতিপয় বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বিবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়া-জনিত তড়িৎ-তত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন।

ক্রমশঃ

শ্রীঅমৃত লাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

যুনানী নাট্য প্রণালী।

আমরা আহ্লাদে নৃত্য ও বিষাদে ক্রন্দন করি। নর্ত্তন ও ক্রন্দন মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। অত্যন্ত আনন্দ হইলে বালকেরা সহজেই নৃত্য করে। সমাজের বাল্যাবস্থায় মনুষ্য-হৃদয় বালকের ন্যায় সরল ও অকপট থাকে, এই নিমিত্ত অসভ্যাবস্থায় মানবকে যত নৃত্য-পর দেখা যায়, সুসভ্যাবস্থায় তত দেখিতে পাওয়া যায় না। সকল জাতিই আদিমাবস্থায় নৃত্য করিয়াছে। আমাদের মহাদেব, বলদেব, বাসুদেব, দেবর্ষি নারদ, সর্ব্বদা নৃত্য করিয়াছেন। সমাজের ক্রমোন্নতি-সহকারে নৃত্য-গীত হইতে সর্ব্বজন-মনোহর নাটকের অভ্যুদয় হইয়াছে। কি স্ত্রী কি পুরুষ, কি যুবা কি বৃদ্ধ, কি অজ্ঞ কি বিজ্ঞ, নাটক সকলেরই মনোরঞ্জন করে। একজন সুবিখ্যাত আর্য্যাচার্য্য কহিয়াছেন "নানা-ভাব-রসৈরাঢ্যং নাটকং সুরয়ো বিদুঃ। কিঞ্চিদঙ্গ-বিহীনঞ্চ ন ত্যাজ্যং নাটকং কচিৎ।" সুপ্রসিদ্ধ যুনানী পণ্ডিত আরিষ্টটল্ নিজপ্রণীত অলঙ্কার শাস্ত্রে মহাকাব্য হইতেও নাটকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং সম্রাট্ ফ্রেডেরিক্ প্রভৃতি সহস্র রসনায় নাটকের গুণানুবাদ করিয়া গিয়াছেন। যেমন শীত ও গ্রীষ্মের সন্ধিকাল মধু মাসে অপর্য্যাপ্ত গোলাপ ফুল প্রস্ফুটিত হয়, সেই রূপ মনুষ্য-সমাজের মধ্যাবস্থায় দৃশ্য-কাব্য প্রচুর সম্পাত হইতে দেখা যায়। সকল সুসভ্য দেশের সাহিত্যেতিহাস আমাদের এই উক্তির পোষকতা করিতেছে।

অতি পূর্ব্বতন কালে গ্রীসদেশান্তর্গত আটিকা প্রদেশে বেকস্ দেবতার পূজোপলক্ষে প্রতিবৎসর মহা সমারোহ ও উৎসব হইত। এই মহোৎসবে সমাগত যুনানিগণ ভিন্ন ভিন্ন দলবদ্ধ হইয়া নৃত্য ও গান করিত এবং এতদ্দেশীয় ইতর লোকদিগের তরজার ন্যায় এক দল অপর দলকে লক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গোক্তি কবিতাবলী সমস্বরে আমেড়ন করিত। এই সকল বিভিন্ন দল হইতেই পূর্ব্বোক্ত গায়ক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। ক্রমে যুনানী জাতির সভ্যতার উন্নতি হইলে নৃত্য গীতের সহিত কথোপকথন ও পৌরাণিক উপাখ্যান সংযোজিত হইয়া তাঁহাদিগের আদিম অসভ্যতা-সূচক কুৎসিত উৎসব—প্রকৃষ্ট নাট্যামোদে পরিণত হইয়াছিল। এই রূপ নৃত্য-গীত হইতে যে সংস্কৃত নাটকেরও উৎপত্তি হইয়াছিল ইহা বলা বাহুল্য—নাটক শব্দই ইহা প্রমাণ করিয়া দিতেছে।

যুনানীদিগের সর্ব্ব প্রথম নাটককার থেস্‌পিস্‌। তিনি কতিপয় সুশিক্ষিত চারণ সমভিব্যাহারে নিজ-প্রণীত নাটকাবলি নগরে নগরে অভিনয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার পূর্ব্বে কেহই আর ঐ প্রকার ব্যবসায় অবলম্বন করেন নাই। থেস্‌পিসের মৃত্যুর অনুমান বিংশতি বৎসর পরে ফ্রাইনিকস্‌ নামক তদীয় একজন শিষ্য নাট্য রচনা সম্বন্ধে অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন। রাজধানী এথেন্স্‌ নগরে তিনিই প্রথমে বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় করেন এবং তিনিই প্রথমে নারী চরিত্র নিবিষ্ট করিয়া যুনানী নাটকে বিশেষ পারিপাট্য বিধান করিয়াছিলেন। কথিত আছে, এক সময় তৎ-প্রণীত নাটকান্তরের অভিনয়ে অসংখ্য দর্শক-মণ্ডলীর মধ্যে কেহই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। তিনি সমাগত দর্শকদিগকে এইরূপ ব্যথিত করিয়াছিলেন বলিয়া রাজাজ্ঞায় তাঁহার অর্থ-দণ্ড হইয়াছিল। তাঁহার পর ইস্কাইলস্‌, সফোক্লিস্‌, ইউরিপাইডিস্‌ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ কবিগণ যুনানী নাটকের চরমোৎকর্ষ সাধন করিয়া যান। এই সকল মহাকবিগণের অভ্যুদয় সময়ে এথেন্স্‌ নগরে সাধারণ নাট্যমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে এথেনীয় রঙ্গাঙ্গন কাষ্ঠ-নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রাটিনাস্‌ নামক কবি-রচিত নাটক বিশেষের অভিনয় কালে সেই মন্দির সহসা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া বিস্তর লোকের প্রাণ-হানি হওয়ায় নাগরিকগণ অপর্য্যাপ্ত অর্থ ব্যয় করিয়া প্রস্তর-রচিত এক প্রশস্ত নাট্যশালা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই মহদট্টালিকা এত বৃহদায়তন ছিল যে তথায় অন্যূন ত্রিংশৎ সহস্র দর্শক সচ্ছন্দে বসিয়া অভিনয় দর্শন করিতে পারিত। ইহার একদিকে অভিনয়-মণ্ডপ (Stage) ও অপর তিনদিকে স্তম্ভাবলি-শোভিত সুচারু প্রকোষ্ঠরাজি বিরাজিত ছিল এবং মধ্যবর্ত্তী সুবিস্তীর্ণ অনাবৃত প্রাঙ্গণে দর্শক-মণ্ডলীর অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি উপবেশনাসন সোপান-শ্রেণী-নিভ ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের সাধারণ রঙ্গভূমি ছিলনা। রাজার এবং রাজাস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের প্রায়ই এক একটী নিজস্ব নাট্যশালা থাকিত। ঐ সকল নাট্যমন্দির বিস্তৃত, সালঙ্কৃত ও পুরীর বহির্দ্বার সমীপে নির্ম্মিত হইত। যুনানী রঙ্গাঙ্গণের সহিত তুলনায় ভারতবর্ষীয় নাট্যশালা সকল যে অতীব ক্ষুদ্রায়তন ছিল তাহার সন্দেহ নাই। পূর্ব্বতন ভারতবর্ষে কেবল অল্প সংখ্যক উচ্চ শ্রেণীর লোকেরাই নাট্যামোদ সম্ভোগ করিতে পারিতেন এই জন্য যুনানী জাতির ন্যায় প্রাচীন আর্য্যগণের প্রকাণ্ড সাধারণ নাট্যমন্দিরের প্রয়োজন হয় নাই।

এথেনীয় অভিনয়-মণ্ডপ রঙ্গাঙ্গণের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত, কাষ্ঠ-নির্ম্মিত এবং প্রস্তরময় শূন্যতল বৃত্তোপরি প্রস্থাপিত ছিল। ইহার পুরোভাগ বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত

ও সর্ব্বদা অনাবৃত থাকিত—পূর্ব্বতন যুনানীগণ আদৌ যবনিকা ব্যবহার করিতেন না। তাঁহাদিগের দৃশ্যাভিনয়ে চিত্রকার্য্যের অপেক্ষা স্থাপত্য ও ভাস্কার্য্যেরই অধিক ব্যবহার ছিল। অভিনয়-মণ্ডপের পশ্চাদ্দেশে একটি অসিতবর্ণের প্রাচীর লক্ষিত হইত। প্রাচীরে তিনটি প্রবেশ দ্বার ছিল। মধ্যের প্রধান দ্বার দিয়া নাট্যোক্ত রাজা, রাণী, রাজপুত্র প্রভৃতি মুখ্য পাত্রগণ এবং পার্শ্বস্থ অপর দুইটি দ্বার দিয়া ইতর চরিত্র সকল রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিত। দেবচরিত্রেরা যন্ত্রযোগে শূন্য হইতে অবতারিত হইতেন এবং গায়ক-সম্প্রদায়ের নিমিত্ত পৃথক্ প্রবেশ পথ নির্দ্দিষ্ট ছিল। আর্য্যদিগের অভিনয়-মণ্ডপ সুচারু-কারু কার্য্য-খচিত কয়েকখানি যবনিকা দ্বারা সংরচিত এবং সুবাসিত-কুসুম-মালায় সুসজ্জিত হইত। দর্শকদিগের সম্মুখস্থ যবনিকা উৎক্ষিপ্ত হইলে সর্ব্বপ্রথম একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া দেবতাবিশেষের মহিমা কীর্ত্তনাত্মক মঙ্গলাচরণ বা নান্দী পাঠ করিয়া যাইতেন। তৎপরে নটনটী আসিয়া পরস্পর আলিঙ্গন ও চুম্বন সহকারে সরস নৃত্য ও গান করতঃ প্রসঙ্গক্রমে অভিনেয় নাটকের অবতারণ করিয়া দিতেন। নটনটীর এবম্বিধ নৃত্য সংস্কৃত সঙ্গীতশাস্ত্রে চুম্বিত বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে।

অভিনয় স্বভাবানুরূপ হইতেছে কিনা যুনানীগণ ইহা একবারও অনুধাবন করিয়া দেখিত না। সৌন্দর্য্য ও চমৎকারিত্বেই তাহাদিগের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এই নিমিত্ত তাহারা উচ্চতম উপানৎ, দীর্ঘ কম্রাবরণ, সুদৃশ্য মুখস ও মনোহর পরিচ্ছদ সকল ব্যবহার করিত। তাহারা উদাত্ত দৃশ্যাভিনয় দ্বারা দর্শককে চমৎকৃত ও স্তম্ভিত করিতে পারিত বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারিত না। তাহাদিগের কৃত্রিমমুখ দেবানুরূপ পরম সুন্দর হইলেও জীবিত ভাব-বিহীন্ ও ভাবাভিনয়ের একান্ত অনুপযুক্ত। ভাবাভিনয়ে নানা প্রকার নয়ন ও মুখভঙ্গির আবশ্যক, জড় মুখসদ্বারা সে প্রয়োজন কখনই সংসাধিত হইতে পারে না, সুতরাং যুনানী কুশীলবগণ ভাবাভিনয়ে কোনকালেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

কণ্ঠস্বর উচ্চ ও সুমধুর করিবার জন্য তাহারা মুখস মধ্যে একটি যন্ত্র ব্যবহার করিত ও অভিনয় সময়ে সেই যন্ত্র-সাহায্যে অস্মদ্দেশীয় রামায়ণ-গায়কদিগের ন্যায় সুর করিয়া কথোপকথন করিত। সুরের সহিত সহজে মিলিত হইবে বলিয়া তাহাদের নাটকেও আদ্যোপান্ত অলঙ্কৃত কবিতায় লিখিত হইত। ব্যক্তি ভেদে ভিন্ন ভাষা, যুনানী নাটকে দেখা যায় না। কি সামান্য চরিত্রের কথোপকথন কি গায়ক সম্প্রদায়ের গীতাবলী সকলই একঘেয়ে গম্ভীর ভাষায় লিখিত, কুত্রাপি বৈচিত্র্য নাই। বৈচিত্র্যই সংস্কৃত নাটকের প্রধান আকর্ষণ। সংস্কৃত নাটকে যেমন বিবিধ প্রকার চরিত্র দেখা যায়, তাহাদের ভাষাও সেইরূপ বিবিধপ্রকার লক্ষিত

হয়। সংক্ষিপ্তসারদামোদর গ্রন্থে নাটক লক্ষণে সংস্কৃত, প্রাকৃত, ভূতভাষা প্রভৃতি নানাবিধ ভাষার উল্লেখ আছে। বাস্তবিক ভাষা-বৈচিত্র্য না থাকিলে নাটক ভিনয় হৃদয়-গ্রাহী হয় না।

সংসার যাত্রায় যাহা আমরা নিত্য দেখিতে পাই, মানব সমাজে যাহা সর্ব্বদা ঘটিয়া থাকে, সে সকল সামান্য ব্যাপার যুনানী-নাটককারগণ একেবারে পরিত্যাগ করিতেন। যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু ভয়ঙ্কর, যাহা কিছু তেজস্কর, উজ্জ্বল ও উদাত্ত তাহারই অনুকরণ বা কল্পনায় তাঁহারা একান্ত যত্নশীল ছিলেন। সংক্ষেপতঃ নাট্য রচনা সম্বন্ধে তাঁহারা এক কাল্পনিক পূর্ণতার অনুধাবন করিতেন। কিন্তু তৎপ্রাপ্ত কস্মিন্ কালেও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহারা পূর্ণচন্দ্র ধরিতে গিয়া পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক কাল্পনিক পূর্ণতার অনুরোধে তাহাদের প্রণীত নাটকাবলী অনেক স্থলে অস্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছেন। সংস্কৃত নাটক সমূহ ঔদাত্ত্য বিহীন হইলেও আদ্যোপান্ত স্বাভাবিক ও মনোহর সংস্থাপনে পরিপূর্ণ।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

হেম-নলিনী—বিয়োগান্ত নাটক। শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত। কলিকাতা জি, পি, রায় যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৸০ আনা মাত্র। আমরা এই নাটকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বিস্মিত হইয়াছি। ইহাতে বিনা স্বীকারে সেকসপিয়ারের ম্যাক্‌বেথ ও রোমীয় জুলিয়েট হইতে অনেকগুলি চরিত্র ও অনেকগুলি ভাব রূপান্তরীকৃত হইয়াছে। সংস্কৃত ও পাশ্চাত্যভাষা-রত্নাকরে যে অনন্ত রত্নরাশি নিহিত আছে, তাহার উদ্ধরণ ও বঙ্গভাষায় রূপান্তরীকরণ, বঙ্গভাষার আশু দারিদ্র্য নিবারণের একমাত্র উপায় তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি; কিন্তু মৌলিকতার যশোলাভের আশায় আজ কাল সাহিত্য-সংসারে যে সকল চৌর্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহা অক্ষমণীয়। গ্রন্থকার রোমীয় জুলিয়েট্ ও ম্যাক্‌বেথ্ হইতে অবিকল অনুবাদ করিয়াছেন অথবা অবিকল অবিকৃত অবস্থায় ছবিগুলি গ্রহণ করিয়াছেন তাহা আমরা বলিতেছি না। তবে তাঁহার হেমনলিনী যে ঐ দুইখানি বিখ্যাত নাটকেরই বিকরণ বা রূপান্তরীকরণ তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

কালিদাস ও ভবভূতি—বাল্মীকি প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের নিকট যতটুকু

ঋণী—হেমনলিনীকার সেক্সপিয়রের নিকট তাহা অপেক্ষা অধিকতর ঋণী।

কালিদাস রঘু- বংশের প্রারম্ভে এবং ভবভূতি উত্তররামচরিতের নান্দীতে কৃতজ্ঞতার • চিহ্নস্বরূপ পূর্ব্ব কবিদিগের প্রতি যেরূপ ভক্তি ও শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা লোকপ্রসিদ্ধঃ—"অথবা কৃতবাগ্দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্ব্বসূরিভিঃ। মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ।" রঘুবংশম্। অথবা (বাল্মীকি প্রভৃতি) পূর্ব্ব পণ্ডিতগণ যে বংশরূপ গৃহে বাক্যরূপ দ্বার কাটিয়াছেন—হিরক শলাকা দ্বারা ছিদ্রীকৃতমুক্তায় (কোমল) সূত্রের প্রবেশের ন্যায় সেই বংশে (আমার মত মূঢ়মতি ব্যক্তিরও) প্রবেশ অনায়াস-সাধ্য।

"ইদং গুরুভ্যঃ পূর্ব্বেভ্যো নমোবাকং প্রশাস্মহে।" উত্তররামচরিতম্।

আমি বাল্মীকি প্রভৃতি প্রাচীন গুরুজনদিগকে নমস্কার করিয়া এই প্রার্থনা করিতেছি • •।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় হেমনলিনীকার আদর্শকবি সেক্সপিয়রের নামোল্লেখ পর্য্যন্তও করেন নাই। ইহা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ।

হেমনলিনীকার যে যে প্রধান চরিত্র ম্যাকবেথ্ ও রোমিও জুলিয়েট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা নিম্নে বলা যাইতেছেঃ—

উদয়পুরের ভূতপূর্ব্ব রাজা রণবীরসিংহ স্কট্‌লণ্ডের ভূতপূর্ব্ব রাজা ডঙ্কানের; উদয়পুরের বর্ত্তমান রাজা যশোবন্ত সিংহ স্কট্‌লণ্ডের বর্ত্তমান রাজা ম্যাক্‌বেথের; রণবীরসিংহের পুত্র হেমচন্দ্র ডঙ্কানপুত্র ম্যাল্‌কম ও রোমীয়ের; যশোবন্ত সিংহের কন্যা নলিনী জুলিয়েটের; পূর্ব্ব রাজমন্ত্রী চন্দ্রবেশী ব্রহ্মচারী ফ্রায়ারের; ভূতপূর্ব্ব রাজবয়স্য ইন্দ্রদমন প্রভৃতি, ম্যাক্‌ডফ্ লেনক্স প্রভৃতি স্কচ্ সম্ভ্রান্তগণের; নলিনীর প্রস্তাবিত বর শিকারবতীর রাজকুমার, প্যারিসের; এবং বিষবিক্রেতা বণিক্ ভেরোণার এপথিকারীর—প্রতিরূপ। যশোবন্ত সিংহের স্ত্রী রাজ্ঞী বিমলা ও লেডী ম্যাক্‌বেথের চরিত্রের ছায়া অবলম্বন করিয়া গঠিত। যদিও এই দুই কামিনীর চরিত্রে সম্পূর্ণ বৈসাদৃশ্য উপলক্ষিত হয়, তথাপি ইহাঁদিগের অনুতাপ ও তজ্জনিত উন্মাদ এবং পরিণাম একই রূপ। ম্যাক্‌বেথের ন্যায় রাজা যশোবন্ত সিংহও ভূতপূর্ব্ব রাজা রণবীরসিংহের বিশেষ প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাস-ভাজন ছিলেন। তিনি সেই বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়া রণবীর সিংহের গুপ্ত হত্যা সাধন পূর্ব্বক তদীয় গর্ভবতী পত্নীকে বনে বিসর্জ্জন করেন। সেই বনবাস অবস্থাতেই রাণীর গর্ভে যে কুমার জন্মগ্রহণ করেন তাঁহারই নাম হেমচন্দ্র। ম্যাক্‌বেথ্ যেমন ডাকিনীদিগের মোহমন্ত্রে উত্তেজিত হইয়া তাদৃশ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, নগনলিনীতে যশোবন্ত সিংহও সেইরূপ স্বপ্নের কুহকিনী মায়ায় প্রতারিত হইয়া তাদৃশ ঘাতুকজনোচিত কার্য্যের

অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ম্যাক্‌বেথের হৃদয় যেমন প্রথমে দয়াদাক্ষিণ্যাদির আধার ছিল, যশোবন্ত সিংহের হৃদয়ও সেইরূপ ছিল। পাপপথে একবার অগ্রসর হইয়া ম্যাক্‌বেথের হৃদয়ের ন্যায় তাহা ক্রমেই আবিল হইতে লাগিল। ম্যাক্‌বেথের ন্যায় ক্রমেই যশোবন্ত সিংহের রক্তপিপাসা বলবতী ও স্বাভাবিকী হইয়া উঠিল। তিনি অবশেষে রণবীর সিংহের একমাত্র বংশধর হেমচন্দ্রের সংহারে কৃত সংকল্প হইলেন। ইহাই তাঁহার পতনের অপ্রতিবিধেয় কারণ হইয়া উঠিল। রাণী বিমলার নিকট পরামর্শ চাহিলেন, রাণী নিষেধ করিলেন। রাজা তাঁহার নিষেধ শুনিলেন না, রাণী উন্মত্ত হইলেন। কিন্তু এ উন্মাদ লেডী ম্যাক্‌বেথের উন্মাদের ন্যায় স্বকৃত পাপের অনুশোচনার ফল নহে। তাহা সতীত্বের চরম উৎকর্ষের ফল। স্বামী ঘোর পাতকী, নিষেধের অবাধ্য। ইহা অপেক্ষা সতীর অধিকতর যন্ত্রণার বিষয় আর কি আছে? লেডী ম্যাক্‌বেথও সতীত্বের ভয়ঙ্কর দৃষ্টান্তস্থল। স্বামীকে উচ্চ সিংহাসনে আসীন করিবার জন্য স্ত্রী প্রকৃতি কতদূর নরকগামিনী হইতে পারে তিনি তাহার চরম নিদর্শন। লেডী ম্যাক্‌বেথ্ নিজকৃত পাপের অনুশোচনায় উন্মাদগ্রস্ত, কিন্তু পবিত্রহৃদয়া দেবী বিমলা স্বামিকৃত পাপের অনুশোচনায় উন্মাদগ্রস্ত। এই দুই রমণী-কুসুমই সেই ঘোর অনুশোচনা-নিদাঘ তাপে বিশুষ্ক হইয়া স্বামীর অগ্রেই জীবলোক হইতে অন্তর্ধান করেন। তাহার পর যশোবন্ত সিংহ ও ম্যাক্‌বেথ্ উভয়েরই এক ভীষণ পরিণাম।

রাজবালা নলিনী হেমচন্দ্রের প্রেমভিখারী ও প্রণয়পাত্রী। প্রাণের হেমকে পিতা বধ করিবেন এ চিন্তা নলিনীর অসহনীয়। হেমের প্রাণরক্ষা তাঁহার একমাত্র চিন্তা ও জীবনের শেষ ব্রত হইয়া উঠিল। এই চিন্তায় মগ্ন, এমন সময় আবার শিকাবতীর রাজকুমারের সহিত তাঁহার বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। এই দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য নলিনী ব্রহ্মচারীর পরামর্শে ফ্রায়ারের উপদেশে জুলিয়েটের ন্যায় চৈতন্যহারক এক প্রকার ঔষধ পান করিলেন। চৈতন্য লোপ হওয়ার পূর্ব্বে তিনি পিতার নিকট এই অনুরোধ করেন যেন তাঁহার দেহ ভস্মসাৎ করা না হয়। তাঁহার চৈতন্যলোপ হইল, তিনি মৃত বলিয়া উদ্ঘোষিত হইলেন। তাঁহার দেহ সজ্জিত অবস্থায় শ্মশানে পরিত্যক্ত হইল। ফ্রায়ার যেমন জুলিয়েটের মৃত্যু সংবাদের কাল্পনিকতা দূত দ্বারা রোমিওকে লিখিয়া পাঠান; কিন্তু সে সংবাদ রোমিওয়ের নিকট পৌঁছিবার পূর্ব্বেই জুলিয়েটের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া রোমীয় যেমন ভেরোনা যাত্রা করিয়াছিলেন; সেইরূপ ব্রহ্মচারীও ইন্দ্রদমন দ্বারা নলিনীর কাল্পনিক মৃত্যু-ঘটিত ষড়যন্ত্রের সংবাদ হেমচন্দ্রকে লিখিয়া পাঠান কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইন্দ্রদমন হেমচন্দ্রের নিকট পৌঁছিবার পূর্ব্বেই হেমচন্দ্র নলিনীর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া শ্মশানে

তাঁহার শবাভিমুখে ধাবিত হইলেন, দেখিলেন সত্য সত্যই নলিনী মৃতা পড়িয়া আছেন। তিনি বহুকষ্টে কোন বণিকের বিপণি হইতে বিষ ক্রয় করিয়া আনিলেন। এবং রোমিওর ন্যায় প্রিয়তমাব পার্শ্বে বসিয়া সেই বিষপান কবিলেন। ক্রমে অবসন্ন ও মৃত প্রায় হইয়া প্রিয়তমাব পার্শ্বে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইলেন। কিয়ৎপরে নলিনীর মোহভঙ্গ হইল। নলিনী উঠিয়া দেখিলেন পার্শ্বে প্রাণাধিক হেমচন্দ্রের মৃত দেহ পড়িয়া রহিয়াছে। বুঝিলেন হেমচন্দ্র তাঁহাদিগের ষড়যন্ত্রেব সংবাদ না পাইয়া তাঁহাকে বাস্তবিকই মৃত মনে করিয়া তাঁহার শোকে বিষপানে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। যাহা হউক তিনি বহু বিলাপের পর যে পাত্রে হেমচন্দ্র বিষপান করিয়াছিলেন সেই পাত্রে যে অল্প বিষ ছিল তাহা পান করিয়া প্রিয়তমের অনুগমন করিলেন। জুলিয়েটও যখন মোহনিদ্রা হইতে অভ্যুত্থিত হন তখন পার্শ্বে প্রিয়তমের মৃতদেহ পতিত দেখিয়া বহু বিলাপের পর বিষপানে প্রাণত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। কিন্তু বিষপাত্রে বিষ নাই দেখিয়া স্বামীর বিষসিক্ত অধর চুম্বন করেন। তাহাতেও বিষ নাই দেখিয়া অবশেষে পার্শ্বে পতিত ছুরিকা বক্ষে প্রবেশিত করিয়া স্বামীর ক্রোড়ে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হয়েন। এই প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি সমস্তই ম্যাক্বেথ্ ও রোমিও জুলিয়েটের সংমিশ্রণে সংগঠিত।

যাহা হউক গ্রন্থকাব যে এই সংমিশ্রণ ও রূপান্তরীকরণ ব্যাপারে কিয়ৎ পরিমাণেও সেই প্রকাণ্ড নাটকদ্বয়ের সৌন্দর্য্য রাখিতে পারিয়াছেন ইহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট প্রশংসার বিষয়।

অদ্ভুত দিগ্বিজয়—সারভেন্‌টিস কৃত সুপ্রসিদ্ধ ডন্‌কুইক্‌জোট্ ডি লামাঞ্চা নামক গ্রন্থের অবলম্বনে লিখিত উপাখ্যান। পূর্ব্ব খণ্ড, আদিপর্ব্ব। শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী প্রণীত। প্রথম সংস্করণ। কলিকাতা চিকিৎসাতত্ত্ব যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ।৵০ আনা মাত্র। অনন্ত পাশ্চাত্য-সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে আমবা যত রত্ন আহবণ কবিতে পারি, ততই আমাদিগের মঙ্গল, ততই বাঙ্গালা ভাষার আশু উন্নতি ও পরিণতিব সম্ভাবনা। মৌলিকতাব অভিমানে যদি আমরা সকল বস্তুই নূতন কবিয়া গড়িতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে পাশ্চাত্য সভ্যতায় উপনীত হইতে আমাদিগেব আবও দুই সহস্র বৎসব লাগিবে। বাষ্পীয় শকট, বাষ্পীয় পোত, তড়িৎবার্ত্তাবহ, মুদ্রাযন্ত্র, বস্ত্র যন্ত্র, প্রভৃতি বিবিধ যন্ত্র এবং নানা প্রকাব শিল্প দ্রব্য—এ সমস্ত যদি আমরা ইউরোপের নিকট হইতে শিক্ষা ও অনুকরণ না করিয়া আমূল ইহাদিগেব উদ্ভাবনে নিযুক্ত হই, তাহা হইলে আমাদিগের যন্ত্রণারও পরিসীমা থাকিবে না এবং বহ্বায়াসজনিত ফলও সুদূর-পরাহত হইবে, এবং যদিও আমরা এ সমস্তের পুনরাবিষ্কারে সমর্থ হই, তথাপি আমরা নবাবিষ্কারের গৌরব

লাভ করিতে পারিব না। বিজ্ঞানবিষয়ে যেরূপ, সাহিত্য-বিষয়েও সেইরূপ। যে সকল অমূল্য চিন্তা, অমূল্য ভাব, এবং অমূল্য কল্পনা পাশ্চাত্য সাহিত্য-ভাণ্ডারে সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহার প্রতিরূপ দ্বারা বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডার পরিপূরিত করা বিজ্ঞতার পরিচায়ক। আমাদিগের গ্রন্থকার সেই বিজ্ঞতার বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ডন্‌কুইক্সোট্ ইউরোপে এত আদৃত, যে ইউরোপীয় প্রায় সমস্ত ভাষাতেই ইহার অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছে। ইহার কল্পনা এরূপ হৃদয়গ্রাহিণী ও কৌতুক-জননী যে যে ভাষাতেই কেন ইহাকে রূপান্তরিত করুন্ না ইহার পূর্ব্ব-সৌন্দর্য্য বিকৃত হইবে না। গ্রন্থকার আশঙ্কা করিয়াছেন "হয়ত, আমার এই লেখনীর আঘাতে মহাকবির সুরঞ্জিত চারুচিত্র এককালে ছিন্ন ভিন্ন হইবে—হয়ত বঙ্গের চক্ষে তদীয় অলোকসাধারণ গুণ সন্নিপাত দোষ রাশিতে পরিণত হইবে—হয়ত তাঁহার সুবিমল কীর্ত্তি-কুসুম মলিন ও বিশুষ্ক হইয়া, নিয়তির অস্তস্তল স্পর্শ করিবে—হয়ত মহাকবির চিরঞ্জীবনী প্রতিভা কল্পনা-সাগর মন্থন করিয়া, যে দেবদুর্ল্লভ অপূর্ব্ব দিব্য পদার্থ সৃজন করিয়াছিল, মদীয় পাপ লেখনী সংস্পর্শে তাহাই রূপান্তরে উদ্গত হইয়া, বাঙ্গালায় বিরাগ ও অসন্তোষ ভাজন হইবে।" আমরা বলি গ্রন্থকারের এরূপ আশঙ্কার বিশেষ কারণ নাই। মূল গ্রন্থের রূপান্তরীকরণে তিনি বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। সারভেন্‌টিসের প্রচণ্ড প্রতিভাবেগ ধারণ করিতে তিনি অনেক পরিমাণে সমর্থ হইয়াছেন। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন "কবিকল্পনার আংশিক ছায়া প্রকটন করিতে পারিলেও শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।" আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে গ্রন্থকার ইহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

গ্রন্থের ভাষা অতি সুন্দর। আমরা নিম্নে তাহার দুই একটী নিদর্শন প্রদান করিলামঃ—

"—নবোদিত অরুণের আরক্তিম রশ্মি-মালা গগনাঙ্গনে বিকীর্ণ হইলে; সুরঞ্জিত বিহগ-কুল মধুর কূজনে উষাদেবীর শুভাগমন দিগ্‌দিগন্তর বিঘোষণ করিলে; উষাদেবী প্রিয়তমের সহবাস শয্যা পরিত্যাগ করতঃ উদয়-গিরির দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া মানবের নয়ন-পথবর্ত্তী হইলে; বিখ্যাত বীর মলয়েশ্বর মহারাজ কান্তিরাজ সিংহ শয়নাগার পরিত্যাগ পূর্ব্বক, বিখ্যাত ঘোটক রোজিনান্তী আরোহণ করিয়া, প্রাতঃস্মরণ্য কুরুক্ষেত্রাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।"

'—সংসার-ললাম-প্রতিমে! অভাগার বলহীন জীবনের একমাত্র বল! নিস্তেজ অন্তরের প্রচণ্ড হুতাশন! শান্তি! কমলমালিনি! একবার তোমার মৃগ-লাঞ্ছিত নয়নের কটাক্ষ বিক্ষেপ কর! দেখ, আজি তোমার চিরদাসকে কি অসাধারণ বল বিক্রম প্রকাশ করিতে হইবে।'

বিশ্ব-বিষ চিকিৎসা। The treatment of the Universal poisons শ্রীহরিমোহন সেন গুপ্ত প্রণীত। প্রথম ভাগ। আয়ুর্ব্বেদ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য বার আনা। আমরা এবার একখানি সংবাদ পত্রে দেখিলাম যে ভারতবর্ষে প্রতিবৎসর গড়ে বিংশ সহস্র লোক সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করে। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে বিষাক্ত সর্পের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। সুতরাং সর্প দংশন ও সর্পাঘাতে মৃত্যুও সচরাচর ঘটিয়া থাকে। এইজন্য বিষ-চিকিৎসার উৎকর্ষ সাধন বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই গ্রন্থে বিষচিকিৎসার যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা কতদূর ফলবতী হইবে তাহা চিকিৎসকেরা বলিতে পারেন। কিন্তু এবিষয়ের আন্দোলন যে একান্ত প্রয়োজনীয় তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। গ্রন্থকার এবিষয়ে যেরূপ আহরণ করিয়াছেন তাহাতে ইহা সাধারণের বিশেষ উপাদেয় হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। গ্রন্থকার উপসংহার-কালে যে সতর্কতার উপদেশ দিয়াছেন সকলেরই তাহা হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখা উচিত বলিয়া আমরা তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম:—

"—বাটী ঘর প্রভৃতি পরিষ্কার রাখা, যখন কোন স্থান ঘেরিতে হইবে তখন বেড়ালতার মধ্যে শ্বেতকরবী ও জবার ডাল পুতিয়া দেওয়া, অন্য বৃক্ষের খুটী না করিয়া জিয়ালী বৃক্ষের (জিকা বা কাফেলা) খুটী দিলে সে অধিক দিন স্থায়ী ও উপকারী উভয়ই হয়। হাঁড়ী, কলসী, প্রভৃতি সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখা, গৃহের কোন স্থানে গর্ত্ত থাকিলে তাহা বন্ধ করা, দুই বেলা বেশ করে ঘর্ দরজা ঝাঁট দেওয়া প্রভৃতি নিত্য কর্ম্ম, সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হয়। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে নির্ধূম অগ্নিতে কিছু হলুদ ও কয়েকটা লঙ্কা মরিচ পোড়াইয়া, সেই ধূম গৃহের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত করিয়া দেওয়া উচিত, বাটী ঘর প্রভৃতি সাজাইতে হইলে, বকুল ফুলের মালা বা পাতার দ্বারা সাজাইলে, সর্প, বৃশ্চিক, প্রভৃতি আসিতে পারেনা। মধ্যে ২ গৃহে কিছু ধুনা, ও গন্ধক জ্বালাও। শয়ন কালে বিছানার আস পাশ দেখিয়া মশারি বন্ধ করিয়া শয়ন কর। এবং যাহাতে বিড়াল বা পোষিত বেজী প্রভৃতি বিছানাতে না আসিতে পারে তাহার উপায় কর। পোষিত পাখী থাকিলে তাহাকে সাবধানে গৃহান্তরে রাখ, এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক উপায়ও দেখ।"

চরক সংহিতা—— সূত্রস্থান। প্রথম খণ্ড। শ্রীবামাচরণ বরাট কর্ত্তৃক অনুবাদিত ও প্রকাশিত। কলিকাতা গুপ্ত যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত। মূল্য ৷৷৹ আট আনা মাত্র। চরক-সংহিতা সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের এক খানি অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহা চারিভাগে বিভক্ত—সূত্রস্থান, নিদানস্থান বিমানস্থান, শারীরস্থান। প্রকাশক তিন খণ্ডে সূত্রস্থান সমাপ্ত করিবেন এরূপ আশা দিয়াছেন। সূত্রস্থানে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৬২৫ টী শ্লোক। প্রথম খণ্ডে তাহার কিয়দংশ-

মাত্র প্রদত্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষে ইংরাজী চিকিৎসার প্রথম আবির্ভাব হইতে অতি অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইংরাজী চিকিৎসার প্রতি সাধারণের চিত্ত এতদূর আকৃষ্ট হয়, যে আয়ুর্ব্বেদোক্ত প্রণালীমতে চিকিৎসা করা অনেকেই কুসংস্কারের একটী অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাশাস্ত্র সুতরাং লুপ্তপ্রায় হইবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছিল। তৎকালে আর্য্যশাস্ত্রমাত্রেরই প্রতি লোকে বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু আজ কাল সে স্রোত ফিরিয়াছে, সে বেগ থামিয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে সমস্ত ইউরোপ ভারতবর্ষীয় প্রাচীন আর্য্যগণের কীর্ত্তিকলাপে বিমোহিত হইয়া ভক্তিপূর্ণ মনে ও নিঃশিরে তাঁহাদিগের গভীর গবেষণা সকলের অধ্যয়নে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহা দেখিয়া ভারতবর্ষীয় আধুনিক আর্য্যগণ লজ্জার অনুরোধে পাশ্চাত্য পণ্ডিত মণ্ডলীর উদার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তন করিতেছেন। এই বিপ্লবসময়ে, আমরা আশা করিতে পারি, চরক-সংহিতা অনুবাদ সহ সাদরে পরিগৃহীত হইবে। ডাক্তর মহেন্দ্রলাল সরকার ইহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়া ইউরোপে ইহার গৌরব বিস্তার করিতেছেন। মূলের সহিত ইহার বাঙ্গালা অনুবাদ—কি চিকিৎসক, কি বিষয়ী, কি সংসারী—বঙ্গবাসিমাত্রেরই যে বিশেষ উপকারে লাগিবে তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।

পরিমিতি বা Bengali mensuration মাইনর ও বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থিদিগের বিশেষ প্রয়োজনীয়। লীলাবতীর কঠিন প্রশ্ন সমাধা-সম্বলিত পাটীক নিয়মাবলী। ময়মনসিংহ হার্ডিঞ্জ বঙ্গবিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীহরিচরণ রায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত, বিরচিত ও প্রকাশিত। কলিকাতা গুপ্ত প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র। এই বিষয়ে আরও কয়েক খানি পুস্তক সত্ত্বে যদিও ইহার প্রচারের বিশেষ আবশ্যকতা পরিদৃষ্ট হয় না, তথাপি একজন বঙ্গবিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্ত্তৃক প্রণীত বলিয়া ইহা আমরা সমাদরে গ্রহণ করিলাম। ইহা ইউক্লিডের ক্ষেত্রতত্ত্ব ও শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের প্রণীত বীজগণিত ও পাটীগণিত এই তিন খানি পুস্তক মূল অবলম্বন করিয়া বিরচিত হইয়াছে। ইহাতে বিবিধ বাঙ্গালা ও ইংরাজি গণিত পুস্তকের ও লীলাবতীর এবং ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার দুরূহ প্রশ্ন সকল করিবার নানা প্রকার সঙ্কেত ও পাটীক নিয়মাবলী প্রদত্ত হইয়াছে। এক্ষণে গ্রন্থকার যে উদ্দেশ্যে এরূপ গুরুতর শ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিয়াছেন তাহা সফল হয়, ইহা আমাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা।

বাঙ্গালী গরিব কেন ?

বাঙ্গালী গরিব কেন জানিতে হইলে প্রথমতঃ বঙ্গদেশীয় লোকের অবস্থা সম্যক্‌ রূপে অবগত হওয়া আবশ্যক। বঙ্গদেশীয় লোকে কি উপায়ে দিনপাত করে, কত লোক কোন্ কাজ করে, কৃষকের সংখ্যাই বা কত, শিল্পীর সংখ্যাই বা কত, বিশেষ রূপে জানা আবশ্যক। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী দুই একটী জেলার অবস্থা কতক জানিয়া একরূপ দুরূহ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হওয়া দুঃসাহসিকের কার্য্য তাহা আমরা জানি। আমরা এই বিষয়ে হাত দিয়া কৃতকার্য্য হইব ভরসা করি না। কিন্তু যেহেতু কেহই দেশের প্রকৃত অবস্থা Economic Condition দর্শন বিষয়ে মনোযোগী নহেন, এই জন্য যদি আমাদের যৎসামান্য কয়েকটী কথায় দেশের কোন উপকার হয় এই ভরসায় লেখনী ধারণ করিলাম।

টাকায় দেশ ধনী হয় না।

অনেকের সংস্কার আছে দেশে টাকা থাকিলেই দেশ সমৃদ্ধ হয়, টাকা না থাকিলেই নির্ধন হয়। অনেকেই দুঃখ করিয়া বলেন যে কালে রাজাদের বাড়ী কত হীরা জহরাৎ থাকিত, আমাদের দেশে কত ধনী ছিল, সেই সকল মুসলমানে লুট করিয়াছে; যাহা ছিল ইংরাজেরা লইতেছে। ইংরাজেরা রূপা টুকু পর্য্যন্ত দেশে রাখিতে চাহে না। পাঁচ টাকার নোট করিয়াছে, কোন দিন এক টাকার নোট করিবে। এই সংস্কারটী ভ্রান্ত সংস্কার। রূপা সোনা হীরা জহরাতে দেশ ধনী হয় না। বরং যে দেশে ঐ সকল বস্তু অধিক থাকে তথায় ধনাগমের বিলক্ষণ ব্যাঘাত হয়। ধন কাহাকে বলে ? যাহা দ্বারা আমরা স্বচ্ছন্দে জীবন অতি-পাতিত করিতে পারি তাহার নাম ধন। যে দ্রব্য থাকিলে আমরা অনায়াসে খাইয়া পরিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটা-ইতে পারি সেই ধন। সে দ্রব্য কি ? রূপা না সোনা ? রূপা বা সোনায় উদর পূর্ত্তি হয় না, শরীর আচ্ছাদন হয় না, শয্যা হয় না, বাড়ী ঘর হয় না, কিছুই হয় না। স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাইবার জন্য রূপা সোনা কেহই নহে। তবে ধন কি ? কৃষিজ শিল্পজ বাণিজ্যানীত বিবিধ দ্রব্য। যাঁহাতে উদর পূর্ত্তি হয়, শরীর আচ্ছাদন হয়, শীত নিবারণ হয়, সংক্ষেপতঃ মনু-ষ্যের জীবন রক্ষা হয় ও স্বাচ্ছন্দ্য বর্দ্ধিত হয় তাহাই ধন।

তবে টাকার দরকার কি ?

এ প্রশ্নটীর উত্তর দেওয়া আমাদের

প্রয়োজন নাই। বাঙ্গালী গরিব কেন? এ প্রস্তাবে উহার বিশেষ আবশ্যকতা লক্ষিত হয় না। তথাপি টাকায় দেশ ধনী হয় না—এ কথা শুনিয়া অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন তবে টাকার দরকার কি? টাকার দরকার এই:—প্রকৃত ধন শস্যাদি, সভ্যতা বৃদ্ধি সহকারে সেই শস্যাদির বিনিময়ের প্রয়োজন হয়। একজনে জীবনোপযোগী সমস্ত বস্তু উৎপাদন করিতে পারে না। আমি ধান্যের চাস করিলাম। তুমি কাপড় বুনিতে শিখিলে, আমার চাসের তোমার দরকার। তোমার কাপড়ের আমার দরকার। আমার চাস বেশী আছে, তোমার কাপড় বেশী আছে। আমাদের বিনিময় প্রয়োজন। আমি চাল দিলে তুমি কাপড় দিবে। কিন্তু মনে কর আমার একখানি কাপড় দরকার, তোমার একসের চালের দরকার কেমন করিয়া বিনিময় হইবে। হয় তুমি ঠকিবে না হয় আমি ঠকিব। অতএব এইরূপ অসুবিধা নিবারণের জন্য এখন একটা জিনিস দরকার যাহা অংশ করিলে নষ্ট হয় না, যাহা সকলেই লইতে চায়। এইজন্য টাকার সৃষ্টি হইল। তোমার একসের চালের দরকার তুমি একটুকু রূপা কাটিয়া দিলে, আমার একখানা কাপড়ের দরকার আমি এতটা রূপা দিলাম। রূপার প্রয়োজন ধনের বিনিময় সাধন, সেই রূপাকে ধন বলিয়া বলা নিতান্ত অন্যায়।

বাঙ্গালী গরিব কেন?

যাহা হউক আমরা এক্ষণে আমাদের প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করি। দেশ গরিব হয় কিসে? (১) যদি উৎপন্ন কম হয় তাহা হইলে দেশ গরিব হয় (২) আর যাহা উৎপন্ন হয় তাহা যদি পাঁচ জনে সমান ভাগ না করিয়া একজন অধিক লয় আর চারি জন কিছুই না পায়, তাহা হইলেও দেশ দরিদ্র হইল। ইহা ভিন্ন বোধ হয় কোন দেশ গরিব হইবার আর কারণ নাই। এক্ষণে দেখা যাউক, বঙ্গদেশে উৎপন্নই বা কিরূপ হয় আর সেই উৎপন্নের ভাগই বা কি রূপ হয়।

উৎপত্তির কারণ কি?

শস্যাদি উৎপত্তির তিনটী কারণ ইকনমিষ্ট মহোদয়গণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই তিনটী এই জমী মজুরী আর ধন। তিনটীরই প্রয়োজন, তিনটীর একটী না হইলে উৎপন্ন হইবে না। জমী নহিলে কিছুই হইবে না। আর জমী রহিল তুমি যদি মজুরী না কর কিছুই জন্মিবে না। বনের ফল সংগ্রহ করিবে তাহাতেও মজুরী দরকার। বিনা মজুরীতে জমীতে জঙ্গল হয় কোন উৎপন্ন হয় না। অতএব যেমন জমীর দরকার তেমনি মজুরীর দরকার। তেমনি আবার মূলধনের দরকার। তুমি চাস করিবে তোমার লাঙ্গল চাহি, তোমার মূলধন না থাকিলে তুমি লাঙ্গল কোথায় পাইবে। মনে কর এমন

কার্য্য আছে যাহাতে কোন রূপ লাঙ্গলাদি দরকার হয় না। তোমার ত খাইতে হইবে, বাঁচিতে হইবে, তোমার উৎপন্ন পরে হইবে, বনের ফল তুমি কাল সংগ্রহ করিবে; আজ তুমি কি খাইয়া বাঁচ? তোমার মূল ধনের দরকার সুতরাং মূল-ধনের প্রয়োজন হইল। তিনের একটীর অন্যথা হইলে হইবে না।

বাঙ্গালায় কি পরিমাণে আছে?

এখন দেখা যাউক উৎপত্তির এই তিন কারণ বাঙ্গালায় কি পরিমাণে আছে। যে কালে রাশি রাশি শস্য প্রতিবৎসর উৎপন্ন হইতেছে সে কালে এ তিনের কোনটী নাই বলিতে পারি না, তিনটীই আছে তবে কোন্‌টী কি পরিমাণে।

১ম জমী।

বাঙ্গালার জমী অপর্য্যাপ্ত আছে, যত লোক তাহার প্রয়োজনাতীত জমী আছে। জমী অতি উৎকৃষ্ট অতিশয় উর্ব্বরা। বিনা সার প্রয়োগে শস্য উৎপন্ন হয়। তাহার পর বাঙ্গালায় অনেক নদী, শস্য একস্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবারও বেশ সুবিধা। জমীর উর্ব্বরতা ও শস্য-প্রেরণ-সুকরতা এই দুইটিই প্রধান গুণ বলিয়া ইকনমিষ্ট মহোদয়গণ বলিয়া থাকেন। বাঙ্গালার জমীর দুইটিই আছে। কিন্তু এখন এ জমীর দোষ আছে। বাঙ্গালার অধিকাংশ জমী দেব-মাতৃক অর্থাৎ আকাশের উপর অনেক স্থানে নির্ভর করিতে হয়। যদি সেই সকল স্থানে খাল খনন করিয়া এই জমীকে নদী-মাতৃক করা যায়, দুর্ভিক্ষাদির ভয় কমিয়া যাইবে। দেবমাতৃকতা দোষ নিবারণ করা খননাদি দ্বারা হইতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালা উষ্ণ-প্রধান দেশ, এদেশে ধারে অনেক শস্য নষ্ট করে তাহার উপায় হইবার যো নাই। যাহা হউক বাঙ্গালা জমী বিষয়ে গরিব নহে বরং পৃথিবীর সকল দেশ অপেক্ষা ধনী।

২য় মজুরী।

বাঙ্গালায় লোক অলস বলিয়া ত আজ কাল সকলেই বাঙ্গালীকে গালি দিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তবিক কি তাহা সত্য? বাস্তবিক কি আমরা বড় অলস? বোধ হয় না। ভদ্র লোকের মধ্যে, ব্রাহ্মণ কায়স্থের মধ্যে, পরিশ্রমী লোক কম বটে, কিন্তু চাসারা ত সকলেই পরিশ্রমী, সকলেই খাটে, আর আমরা যে কোন গ্রন্থ গুলি দেখিতে পাই বাঙ্গালীরা বুদ্ধিমান্ ও পরিশ্রমী। বাঙ্গালীরা পরিশ্রমী এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ধনোৎপাদনে উচ্চদরের পরিশ্রম একটুও করা হয় না। চাসা লোকের যৎসামান্য বুদ্ধি শুদ্ধি আছে, তাহারাই খাটে, কোন ভদ্র লোক বা বুদ্ধিমান্ লোক তাহাদের সাহায্য করিতে রাজি নহেন। পরিশ্রম দুই প্রকার শারীরিক ও মানসিক। শুদ্ধ শারীরিক পরিশ্রমও কোথাও মিলে না। শুদ্ধ মানসিক পরিশ্রমও কোথাও মিলে না। চাসারা যে

শ্রম করে তাহাতে মানসিক শ্রম অতি অল্প। ভদ্র লোকের শ্রমে উহাই অধিক; কিন্তু ভদ্র লোকের মানসিক পরিশ্রম এখন চাসাদের সপক্ষে না হইয়া বিপক্ষে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যত ভদ্র লোক, হয় জমীদার না হয় মহাজন। যদি ভদ্র লোকে চাসের তত্ত্বাবধারণ করেন অথবা যদি চাসাদিগকে শিক্ষা দ্বারা সেই দরকারী মত বুদ্ধি টুকু দেওয়া যায় তবেই উচ্চ দরের পরিশ্রম চাসে লাগিবে। নচেৎ বর্ত্তমান অবস্থায় বঙ্গীয় উৎপাদক শ্রমের বিজাতীয় দোষ মানসিক শ্রমের সহিত অল্প সম্বন্ধ। বাঙ্গালার শারীরিক শ্রম উৎকৃষ্ট নহে। বাঙ্গালীরা সম্বৎসর নিয়মিত সমান জোরে খাটিতে পারে না। শীত-প্রধান দেশীয় লোক যেমন ক্রমাগত একটানে খাটিয়া যায়, আমরা তাহা পারিনা। এই দুই কারণ বশতঃ বাঙ্গালায় উৎপাদক শ্রম অতি মন্দ। উৎপাদন কার্য্যে ইহাতে বিলক্ষণ ব্যাঘাত হয়।

উৎপাদন কার্য্যে মূলধন প্রয়োগের অল্পতা।

মূলধন দুই প্রকার, এক প্রকারে হল লাঙ্গলাদি উৎপন্ন হয়, আর এক প্রকারে শ্রমজীবীদিগের ভরণপোষণ হয়। এতদ্ভিন্ন জমীর উন্নতি কার্য্যেও মূলধন ব্যয়িত হইতে পারে। তিন প্রকার মূলধনেরই এদেশে অভাব। প্রথম মান্ধাতার আমলেও যে হাতিয়ার চলিয়াছে আজিও তাহাতেই চলিতেছে। ইহার কারণ উহাতে মূলধন ব্যয় করা হয় না। জমীর উন্নতি করা হয় না। বিশ ক্রোশ বিল আছে, শস্য হয় না। যদি কিছু খরচ করিয়া জল বাহির করিয়া দেওয়া যায়! তবে জমীর উন্নতি করা হইল। কিন্তু তাহা কখনই হয় না। ইহার কারণ কি, মূলধন অল্প। তাহার পর চাসারা যে সম্বৎসর খায় সে টাকাও অল্প। যদি যে টাকায় চাসারা খায় সে টাকা অধিক হইত তবে আর দেড়া বা দুই গুণ বাড়ি শুনিতে পাইতাম না। কাজেই অল্প টাকা ধার করিতে হইলেই অধিক সুদের কম মহাজন ছাড়িবে কেন?

যাঁহারা বলেন বাঙ্গালায় টাকা নাই তাহারা এই সময়ে আমাদিগকে বলিবেন এই ত আমরা বলিতেছিলাম বাঙ্গালায় টাকা নাই। কিন্তু বাঙ্গালায় টাকা নাই সেই তাহাদের ভ্রম। টাকা বিনিময় সাধন-সামগ্রী মাত্র। অধিক থাকিলে বিনিময়ের একটু সুবিধা হইবে, অল্প থাকিলে অসুবিধা হইবে এইমাত্র। বিনিময়ের দ্রব্য শস্যাদি ত আছে, তাহা হইলেই হইল, তাহা হইলেই বাঙ্গালা ধনী হইল।

এরূপ মূলধন-অল্পতার কারণ কি?

কয়েকটী কারণ নির্দ্দেশ করিব। অন্যান্য দেশ অপেক্ষা এদেশে অলস লোক অধিক। একজন উপার্জ্জন-ক্ষম হইলেন ত দশজন অলসে তাঁহার ধনস্থানে শনি হইয়া দাঁড়াইলেন। ব্রাহ্মণ বলিয়া একজাতি

আছেন তাঁহারা এখন জগতের কোন উপকার করেন কি? করুন আর নাই করুন লোকের টাকা যাহাতে সঞ্চয় না হয় সে বিষয়ে তাঁহাদের খুব নজর। তোমার কিছু নাই, ব্রাহ্মণ তোমার কাছে ঘেঁসিবেন না দুই টাকা হইবে এই আশা পাইলেই তোমার নিকট আসিলেন। প্রথম মেয়েদের ধন গচ্ছানিয়া ফলদান প্রভৃতি ছোট ছোট ব্রতে দীক্ষিত করিলেন। তাহার পর ক্রমে বড় ব্রত আসিতে লাগিল। ক্রমে ব্রতেই তোমার ২। ৩ শত টাকা বৎসর দিতে হইল। তাহার পর পুত্র হইলে একটি নহে আধটি নহে বারটি সংস্কার, পিতৃকৃত্য, মাতৃকৃত্য, দোল দোল দুর্গোৎসব, শেষ গ্রামশিলা শেষ বিগ্রহ ও মন্দির। তুমি কত সঞ্চয় করিবে। অলস লোক অধিক পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে (এই অলস লোক চাসাদের মধ্যে বড় নাই) উহাদের খাওয়া পরা ও বাবুগিরি ইহাতেই অনেক ব্যয় হয়। তাহাতে আমাদের এ সংসারে তত টান নাই। আমরা জানি এসবই মিথ্যা, অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা বৃথা, এই জীবন কাটিলেই হইল। সুতরাং অধিক অর্থ সংগ্রহ করিয়া এসংসারে অধিক সুখী হইবে সে চেষ্টা নাই। আমাদের কালি কি হবে এ ভাবনাও বড় নাই, "জীব দিয়াছেন যিনি শিব দিবেন তিনি" এই অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া পুরুষকার আমরা প্রায়ই বিসর্জ্জন দিই। টাকা হাতে আসিলেই খরচ করিয়া ফেলি। যতক্ষণ খরচ না হয় ততক্ষণ যেন ঈশ্বর সর্ব্বাঙ্গ কামড়ায়। আমাদের সঞ্চয়ের ইচ্ছা নাই, সঞ্চয়ের জন্য যত্নও নাই। সঞ্চয় হয় জলা সঞ্চ, না হওয়ায় শস্য উৎপাদনও ভাল হয় না। চাসারা সঞ্চয় করেনা, বৎসরের তিন মাস ধার করিয়া খায়, এবৎসর যদি ৩ মাস ধার করিয়া খাইল, দেড়া বাড়িদিল; আর বৎসর তাহাকে ৪॥ সাড়ে চারিমাস ধার করিয়া খাইতে হইবে। এইরূপে ধারই বাড়িয়া চলিল। সঞ্চয় না হওয়ায় জমীর উন্নতি হয় না। অস্ত্র শস্ত্র ভাল হয় না। কৃষিকার্য্য ভাল হয় না।

বঙ্গদেশ কৃষি-প্রধান দেশ। এখানকার পরিশ্রম কৃষিকার্য্যেই অধিক ব্যয়িত হয়। শিল্প আমাদের ছিল, রেসম ও তুলার কাপড় এই দেশেই হইত। কিন্তু এক্ষণে তাহা নাই। যে কিছু শিল্প আছে তাহা গণ্যের মধ্যে ধরা যায় না। সোনা রূপার গহনা, কাসা পিতলের বাসন, মোটা লোহার অস্ত্রশস্ত্র, সরু কাপড়, এসব পদার্থ কিছু কিছু এখনও আছে। শিল্পজীবিদিগের অবস্থা মন্দও নহে। শিল্পজীবিরা পরিশ্রমী কিন্তু তাহারাও সঞ্চয়ী নহে। শিল্প বিষয়ে ভবিষ্যতে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

মূলধনের বিষয় আর এক কথা বলিতে বাঁকি আছে। ইদানীং আমাদের দেশে বিদেশীয় টাকা অনেক ব্যয় হইতেছে। রেলওয়ে প্রভৃতি দ্বারা ভূমির উন্নতি হইতেছে। নীলকুটি চাকুটি প্রভৃতি

দ্বারা নূতন নূতন ফসল উৎপন্ন হইতেছে। বিদেশীয়দিগের সহবাসে অনেকে সঞ্চয় করা অভ্যাসও করিয়াছে। কয়েক-বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালীরা নীলের আবাদে বিলক্ষণ কৃতার্থ হইয়াছেন। অনেক বিলাতী নীলকুঠী উঠিয়া যাইতেছে। দুই এক জন বাঙ্গালী নীলকুঠী ওয়ালার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি হইয়াছে। এরূপ ভরসা করা যাইতে পারে অল্প দিনের মধ্যে চাস কর্ম্মে বৈদেশিকেরা এদেশে আমাদের সঙ্গে পারিবে না। নীল চা রেসম বা যাহা এক্ষণে সাহেবদের হস্তেই অধিক ক্রমে বাঙ্গালীদের হস্তে পড়িতে পারে।

বাঙ্গালার ভূমি উৎকৃষ্ট হইলেও পরিশ্রমের দোষে ও সঞ্চয় না থাকায় ফসল জন্মানের বিলক্ষণ ব্যাঘাত হইতেছে। আমাদের জাতীয় চরিত্র পরিবর্ত্তিত না হইলে আমাদের পূর্ব্বোক্ত দুইটি দোষ যাইবে না। পূর্ব্বোক্ত দুইটি দোষ না গেলেও বাঙ্গালার যেমন ভূমি তেমন ফসল হইবে না। যখন আমরা সঞ্চয় করিতে শিখিব আর যখন ভদ্র লোকে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিবেন, তখন বাঙ্গালা বাস্তবিক ধনী হইবে, এখন বাঙ্গালা গরিব। যদিও বাঙ্গালা হইতে শস্য রপ্তানি হইতেছে, তথাপি বাঙ্গালা গরিব। গরিব বলিয়া শত বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহা অপেক্ষা অনেক গুণে বাঙ্গালা ধনবান্ হইয়াছে বলিতে হইবে আর হইবারও সম্ভাবনা।

বাঙ্গালায় দারিদ্র্যের দ্বিতীয় কারণ উৎপন্ন দ্রব্যের অসম বিভাগ। যাহা কিছু যে বৎসর উৎপন্ন হইল সে সমুদয় জাতীয় সম্পত্তি। রাজার রাজ্যে বাস করিতে হয়, রাজার ও রাজ্যের খরচ সেই জাতীয় সম্পত্তি হইতে দাও। বাকী শ্রমজীবী দিগকে বিভাগ করিয়া দাও। তাহার পর কেহ শ্রমজীবীদিগের নিকট হইতে তাহাদের তুষ্টি সাধন করিয়া যে কেহ কিছু লইতে পারে লউক তাহাতে ক্ষতি নাই। ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম উপদেশ দিয়া, পণ্ডিত বিদ্যা শিক্ষা দিয়া, ময়রা মিষ্টান্ন বিনিময় করিয়া, বাদকর বাজনা বাজাইয়া, গায়ক গান করিয়া লও ক্ষতি নাই। কিন্তু তাহাদিগকে পেটে মারিয়া যদি সমস্তই রাজা গ্রহণ করেন, সে রাজা অত্যাচারী রাজা। যদি জমীদারেরা গ্রহণ করেন, তবে জমীদারেরা অত্যাচারী জমীদার। যদি মহাজনেরা গ্রহণ করেন, তবে তাঁহারা অত্যাচারী মহাজন। আমাদের দেশের আইন এ তিনই অত্যাচারী হইয়াছেন। রাজার কর-স্থাপনের ক্ষমতা অসীম। তাঁহার এই জ্ঞান থাকিলেই হইল যে প্রজারা কর দিতে পারিবে (প্রজাদের জিজ্ঞাসা না করিয়াই) নূতন নূতন কর সংস্থাপন করিতেছেন, যত দূর পারিতেছেন নিঙ্ড়াইয়া আদায় করিতেছেন।

এটী অত্যাচার তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার সপক্ষে একটী কথা বলা যায় যে তিনি এই সকল কর রেলওয়ে খাল ইত্যাদি করিবার জন্য গ্রহণ করেন। আপাততঃ দেশের উন্নতিই কর গ্রহণের অর্থ। আইন

মতে জমীদার জমীর মালিক। যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক খাজনা দিবে সেই জমী করিতে পারিবে। রাজার ন্যায় জমীদারও কূপ লাগাইতেছেন, যতদূর পারিতেছেন আদায় করিতেছেন, আইন—তাঁহার জমী তিনি বন্দোবস্ত করিবেন তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। অধিক সুদের বিরুদ্ধে যে আইন ছিল তাহা উঠিয়া গিয়াছে। মহাজন নাতওয়ান্ চাসার নিকট যত পারিতেছেন আদায় করিতেছেন। যাহার সমুদয় পাইবার কথা সেকিছুই পাইল না। খাইল যার ভূতে। চাসা ধারে ডুবিয়া মরিল। এরূপ অসম বিভাগ বাঙ্গালার গরিব হইবার প্রধান কারণ। প্রথম যাহা উৎপন্ন হয় তাহা যত অধিক বলিয়া শুনা যায় তত নহে। তাহার পর সেই উৎপন্ন দ্রব্যে কৃষিজীবীদিগের কোন সত্ব নাই প্রায়ই আর পাঁচজনে খায়। আর দেশ গরিব হইবে না ত কি?

যাঁহারা বলেন হীরা জহরাৎ সোণা রূপা থাকিলেই দেশ ধনী হয় তাঁহারা দেশকে কেন গরিব বলেন জানি না। জমীদারের ঘরেত অনেক টাকা থাকার সম্ভাবনা। মহাজনও ত বড় মানুষ হইবার কথা। কিন্তু বাস্তবিক তাহা থাকে না। সঞ্চয়ের ক্ষমতা কাহারই নাই। সকলেই খরচ করিয়া ফেলে। সে খরচে উৎপত্তির সাহায্য হয় না। মনে কর খরচ নাই করিল, সেটাকা একজন কৃপণ জমীদারের গৃহে জমা রহিল। লাভ কি হইল? দেশের লোক যেমন গরিব তেমনি রহিল জমীদার বড় মানুষ রহিলেন। যদি ঐ টাকা সহস্র কৃষকের ঘরে দাঁড়াইয়া থাকিত ভূমির উন্নতি হইত। ভাল অম্ল শস্য হইত, কৃষককে ধারে ডুবিতে হইত না, বঙ্গদর্শনে চারি বৎসর পূর্ব্বে একবার এই কথার প্রস্তাব হইয়াছিল। আজি আবার হইল।

শ্রীহরপ্রসাদ—

ফুলবালা

গীতিকা

তরল জলদে বিমল চাঁদিমা
সুধার ঝরণা দিতেছে ঢালি।
মলয় চলিয়া কুসুমের কোলে
নীরবে লইছে সুরভি ডালি।

যমুনা বহিছে নাচিয়া নাচিয়া,
গাহিয়া গাহিয়া অস্ফুট গান;
থাকিয়া থাকিয়া, বিজনে পাপীয়া
কানন ছাপিয়া তুলিছে তান।

পাতায় পাতায় লুকায়ে কুসুম,
কুসুমে কুসুমে শিশির দুলে,
শিশিরে শিশিরে জোছনা পড়েছে,
মুকুতা গুলিন সাজায়ে ফুলে।

তটের চরণে তটিনী ছুটিছে
ভ্রমর লুটিছে ফুলের বাস
সেঁউতি ফুটিছে, বকুল ফুটিছে
ছড়ায়ে ছড়ায়ে সুরভি শ্বাস।

কুহরি উঠিছে কাননে কোকিল
শিহরি উঠিছে দিকের বালা
তরল লহরী গাঁথিছে আঁচলে
ভাঙ্গা ভাঙ্গা যত চাঁদের মালা।

ঝোপে ঝোপে ঝোপে লুকায়ে আঁধার
হেথা হোথা চাঁদ মারিছে উঁকি।
সুধীরে আঁধার ঘোমটা হইতে
কুসুমের থোলো হাসে মুচুকি।

এস কলপনে! এ মধুর রেতে
দুজনে বীণায় পুরিব তান।
সকল ভুলিয়া হৃদয় খুলিয়া
আকাশে তুলিয়া করিব গান।

একই নিমিখে হেরিব দুজনে
আকাশ পাতাল স্বরগ ধরা
তাই বলি বালা বীণাখানি লয়ে
মনে প্রাণে ঢালো সুধার ধারা।

হাসি কহে বালা "ফুলের জগতে
যাইবে আজি কে কবি?
দেখিবে কত কি অদ্ভুত ঘটনা
কতকি অদ্ভুত ছবি!

চারিদিকে যেথা ফুলে ফুলে আলা
উড়িছে মধুপ-কুল।
ফুল দলে দলে ভ্রমি ফুল-বালা
ফুঁ দিয়া ফুটায় ফুল।

দেখিবে কেমনে শিশির সলিলে
মুখ মাজি ফুলবালা
কুসুম রেণুর সিঁদুর পরিয়া
ফুলে ফুলে করে খেলা।

দেহখানি ঢাকি ফুলের বসনে
প্রজাপতি পরে চড়ি
কমল কাননে কুসুম-কামিনী
ধীরে ধীরে যায় উড়ি।

কমলে বসিয়া মুচুকি হাসিয়া
দুলিছে লহরী ভরে
হাসি মুখখানি দেখিছে নীরবে
সরসী আরসি পরে।

ফুল কোল হতে পাপড়ি খসায়ে
সলিলে ভাসায়ে দিয়া
চড়ি সে পাতায় ভেসে ভেসে যায়
ভ্রমরে ডাকিয়া নিয়া।

কোলে ক'রে লয়ে ভ্রমরে তখন
গাহিবারে কহে গান।
গান গাওয়া হলে হরষে মোহিনী
ফুল মধু করে দান।

দুই চারি বালা হাত ধরি ধরি
কামিনী পাতায় বসি
চুপি চুপি চুপি ফুলে দেয় দোল
পাপড়ি পড়য়ে খসি।

দুই ফুল বালা মিলিবা কোথায়
গলা ধরা ধরি করি
ঘাসে ঘাসে ঘাসে ছুটিয়া বেড়ায়
প্রজাপতি ধরি ধরি।

কুসুমের পরে দেখিয়া ভ্রমরে
আবরি পাতার দ্বার
ফুল ফাঁদে ফেলি পাখায় মাথায়
কুসুম রেণুর ভার

ফাঁকরে পড়িয়া ভ্রমর উড়িয়া
বাহির হইতে চায়
কুসুম রমণী হাসিয়া অমনি
ছুটিয়ে পালিয়ে যায়।

ডাকিয়া অনিয়া সবারে তখনি
প্রমোদে হইয়া ভোর
কহে হাসি হাসি করতালি দিয়া
"কেমন পরাণ চোর!"

এত বলি ধীরে কলপনা রাণী
বীণায় আভানি তান
বাজাইল বীণা আকাশ ভরিয়া
অবশ করিয়া প্রাণ!

গভীর নিশীথে সুদূর আকাশে
মিশিল বীণার রব
ঘুম ঘোর হতে জাগিয়া উঠিল
দিকের বালিকা সব।

ধীরে ধীরে ধীরে উঠিলরে তান
সুর বালা এল ফেলিয়া কেলী
শুনিতে লাগিল অবাক হইয়া
পৃথিবীর পানে নয়ন মেলি!

ধীরে ধীরে ধীরে উঠিলরে ধ্বনি
মধুরে ছাপিয়া নদীর গান
আকাশ ছাইয়া, স্বরগ ছাইয়া
কোথায় উড়িল মধুর তান।

ঘুমায়ে পড়িল আকাশ পাতাল
ঘুমায়ে পড়িল স্বরগ বালা
দিগন্তের কোলে ঘুমায়ে পড়িল
জ্যোছনা মাখানো জলদ মালা

একি একি ওগো কলপনা সখি!
কোথায় আনিলে মোরে
ফুলের পৃথিবী—ফুলের জগৎ—
স্বপন কি ঘুম ঘোরে?

হাসি কলপনা কহিল শোভনা
"মোর সাথে এস কবি!
দেখিবে কতকি অদ্ভুত ঘটনা
কতকি অদ্ভুত ছবি!

ওই দেখ ওই ফুল বালা গুলি
ফুলের সুরভি মাখিয়া গায়
শাদা শাদা ছোট পাখা ঝিকি মিকি ঝুমি ঝুমি
এফুলে ওফুলে উড়িয়া যায়

এফুলে লুকায় ওফুলে লুকায়
এফুলে ওফুলে মারিছে উঁকি!
গোলাপের কোলে উঠিয়া দাঁড়ায়
ফুল টল মল পড়িছে ঝুঁকি!

ওই কোণা ওই ফুল-শিশু সাথে
বসি ফুল বালা অশোক ফুলে
দুজনে বিজনে প্রেমের আলাপ
কহে চুপি চুপি হৃদয় খুলে

কহিল হাসিয়া কলপনা বালা
দেখায়ে কতকি ছবি;
"ফুল বালাদের প্রেমের কাহিনী
শুনিবে এখনকবি?"

এতেক শুনিয়া আমরা দুজনে
বসিনু চাঁপার তলে
সুমুখে মোদের কমল কানন
নাচে সরসীর জলে

একি কলপনা, একিলো তরুণী
  দুরন্ত কুসুম শিশু,
ফুলের মাঝারে লুকায়ে লুকায়ে
  হানিছে ফুলের ইষু।

চারিদিক হোতে ছুটিয়া আসিয়া
  হেরিয়া নূতন প্রাণী
চারিধার ঘিরি রহিল দাঁড়ায়ে
  যতেক কুসুম রাণী!

গোলাপ মালতী, শিউলী সেঁউতি
  পারিজাত নরগেশ,
সব ফুল বাস মিলি এক ঠাঁই
  ভরিল কানন দেশ

চুপি চুপি আসি কোন ফুল শিশু
  ঘা মারে বীণার পরে
ঝন্ করি যেই বাজি উঠে তার
  চমকি পলায় ডরে।

অমনি হাসিয়া কলপনা সখি
  বীণাটি লইয়া করে
ধীরি ধীরি ধীরি মৃদুলমৃদুল
  বাজায় মধুর স্বরে।

অবাক্ হইয়া ফুলবালাগণ
  মোহিত হইয়া তানে
নীরব হইয়া চাহিয়া রহিল
  শোভনার মুখ পানে

ধীরি ধীরি সবে বসিয়া পড়িল
  হাত খানি দিয়া গালে
ফলে বসি বসি ফুল শিশুগণ
  দুলিতেছে তালে তালে।

হেন কালে এক আসিয়া ভ্রমর
  কহিল তাদের কানে—
"এখনো রয়েছে বাকী কত কাজ
  বসে আছ এই খানে?

রঙ্ দিতে হবে কুসুমের দলে
  ফুটাতে হইবে কুঁড়ি
মধুহীন কত গোলাপ কলিকা
  রয়েছে কানন জুড়ি!"

অমনি যেনরে চেতন পাইয়া
  যতেক কুসুম-বালা
পাখাটি নাড়িয়া, উড়িয়া উড়িয়া
  পশিল কুসুম-শালা

মুখ ভারি করি ফুল শিশু দল
  তুলিকা লইয়া হাতে
মাখাইয়া দিল কতকি বরণ
  কুসুমের পাতে পাতে।

চারি দিক দিকে ফুল শিশুদল
  ফুলের বালিকা কত
নীরব হইয়া রয়েছে বসিয়া
  সবাই কাজেতে রত।

চারিদিক এবে হইল বিজন
  কানন নীরব ছবি
ফুল বালাদের প্রেমের কাহিনী
  কহে কলপনা দেবী॥

ক্রমশঃ প্রকাশ্য

শ্রীর

পৌরাণিকী গাথা।

পাঠক ! তোমার নিকট দশ অবতার বর্ণন কালে কহিয়াছিলাম, সময়ানুসারে তোমাকে পুরাণের রূপক দেখাইয়া দিব, অদ্য রূপক দেখ।

তুমি পুরাণে অবশ্য শুনিয়াছ যে কশ্যপ হইতে সমুদায় প্রাণীর উৎপত্তি হইয়াছে। তুমি তাহা সহজে বিশ্বাস করিতে পার না ? কিন্তু রূপক ভাঙ্গিয়া দিলে তোমার বিশ্বাস জন্মাইবার সম্ভাবনা। প্রথমে দেখ কশ্যপ কোন্ ব্যক্তি ? তাঁহার পিতা কে ? তাঁহার পত্নীই বা কে ? তুমি উত্তর করিবে পুরাণের লিখনানুসারে কশ্যপের পিতা মরীচি, ইনি আবার ব্রহ্মার মানস-পুত্র, তদনুসারে কশ্যপ ব্রহ্মার পৌত্র। কশ্যপের পত্নী কে ? এ প্রশ্নের উত্তরে পাঠক কহিবেন কশ্যপের পত্নী একটী নয়, তেরটি। তাঁহারা দিতি অদিতি প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ।

পাঠকের পূর্ব্ব পক্ষ প্রমাণ যথা—

मरीचेः कश्यपो जातः

कश्यपात्तु इमाः प्रजाः ॥

লেখক ও ঐ পূর্ব্বপক্ষকে স্বীকার করিয়া উত্তর দিতে বাধ্য। সুতরাং কশ্যপের ঐ পত্নীগুলির সাধারণ নাম কাশ্যপী। কাশ্যপী শব্দে পৃথিবীকে বুঝায়। যথা—ব্রহ্মবৈবর্ত্তের প্রকৃতি খণ্ডে পৃথিব্যুপাখ্যানং—

"काश्यपी कश्यपस्येयमचला स्थिर-
रूपतः ।
विश्वम्भरा सहनत्वाच्चानन्तानन्तरूपतः ॥"

অমরসিংহ নিজ অভিধানেও পৃথিবীকে কাশ্যপী শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

"उर्व्वी उर्वा काश्यपी क्षिति ॥"

পাঠক এ প্রমাণকে যদি সামান্য বলেন তবে অবশ্য অখণ্ডনীয় প্রমাণ দর্শাইতে হইবে, সে প্রমাণ শ্রুতি বা স্মৃতির হওয়া আবশ্যক। পাঠকের বোধসৌকর্য্যার্থ তাহাই দিব। কিন্তু অগ্রে কশ্যপকে স্থিরতররূপে পৃথিবীর পতি রূপে মীমাংসা করিয়া না দেখাইতে পারিলে পাঠকের তুষ্টি জন্মিবে না। সুতরাং প্রথমে তাহাই স্থির করা উচিত।

কশ্যপ শব্দে "আকাশ" যথা কশ্যং পাতি যঃ সঃ কশ্যপঃ।

কশ্য শব্দে মধু বা মদ্য বুঝায় এই কশ্য যিনি পান করিয়াছিলেন তাঁহার নাম কশ্যপ।

যথা

ब्रह्मणस्तनयो योऽभूत्

मरीचिरिति विश्रुतः ।

कश्यपस्तस्य पुत्रोऽभूत् ।

कश्यपानात् स कश्यपः ॥

मार्कण्डेयपुराणम्—

তেছেন। গ্রন্থকারদিগের মধ্যে যাঁহাদিগের কিঞ্চিৎ লাভ ছিল, তাঁহাদিগের ত দশাপরিণাম এই হইল। আর এক শ্রেণীর গ্রন্থকার আছেন, তাঁহাদিগের অবস্থা আরও শোচনীয়। ইহাঁরা সাধারণতঃ সম্পাদক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইহাঁরা সাময়িক পত্রের প্রচার দ্বারা পৈতৃক ধনের বা স্বোপার্জ্জিত অর্থের ধ্বংশ করিয়া থাকেন। দেশের মঙ্গল সাধন করা তাহাদিগের উদ্দেশ্য। কিন্তু দেশের মঙ্গল সংসাধিত হউক বা না হউক, তাঁহাদিগের নিজের অমঙ্গল নিশ্চিত। ক্রমে তাঁহাদিগের মনের স্বাধীনবৃত্তি সকল এতদূর তেজস্বিনী হইয়া উঠে, যে তাঁহারা ক্রমে পরের উপাসনা ও পরের দাসত্ব করিতে অক্ষম হইয়া উঠেন। কিন্তু সাহেবের উপাসনা ও সাহেবের দাসত্ব ব্যতীত আজ কাল যে অর্থসম্বন্ধে আমাদিগের কোন উন্নতিরই আশা নাই তাহা বলা কেবল বাহুল্য মাত্র। সেই সাহেবদিগের সহিত সম্পাদক দিগেরত চিরশত্রুতা দাঁড়াইয়া যায়। তাঁহারা অনেক সময় সাহেবদের বিচারকর্ত্তা হইয়া দাঁড়ান, এই জন্য সাহেবদিগের অধীনে চাকরীকরাও তাঁহাদিগের পক্ষে অতিশয় ক্লেশকর হইয়া দাঁড়ায়। এইজন্য তাঁহাদিগের অর্থবিষয়ক উন্নতির দ্বার একপ্রকার রুদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু যে দেশের উন্নতি সাধন করিবেন বলিয়া তাঁহারা নিজের উন্নতির আশায় জলাঞ্জলি দেন, সে দেশের লোকের তাঁহাদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার? নিঃস্বার্থভাবে সম্পাদক দিগের উৎসাহবর্দ্ধন করা দূরে থাকুক, কাগজ লইয়া তাঁহারা অনেকেই দাম দিতে চাহেন না। সম্পাদকেরা যে কি খাইয়া তাঁহাদিগের জন্য লড়িবে তাহা তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখেন না। সম্পাদকদিগেরনিজের উদর পূরণ করা দূরে থাক্, কি দিয়া তাঁহারা মুদ্রাঙ্কনের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন তাহাও তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। স্বদেশীয় রাজা হইলে সম্পাদকদিগের সহিত রাজার সহযোগিতা হইতে পারিত; কিন্তু বৈদেশিক রাজার সহিত সম্পাদকদিগের স্বভাবসিদ্ধ প্রতিযোগিতা। সুতরাং তাঁহাদিগের রাজার নিকট কোন উৎসাহ পাইবার আশা নাই। তাঁহাদিগের একমাত্র আশাস্থল স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণ। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সম্পাদকদিগের কষ্টে স্বদেশবাসিগণের হৃদয় বিচলিত হয় না। সুতরাং সম্পাদকদিগের ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়ান ভিন্ন অন্য উপায় নাই। আর এক শ্রেণীর গ্রন্থকার আছেন, যাঁহাদিগের লিখিত গ্রন্থ নবন্যাস, নাটক বা স্কুলের বই এ কোন শ্রেণীর অন্তর্গত নহে। তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সাধনের নিমিত্ত উচ্চদরের পুস্তক লিখিয়া থাকেন। ইহাঁদিগেরও দশা সম্পাদকদিগের ন্যায়, সুতরাং ইহাদিগের বিষয় আর অধিক করিয়া বলা বাহুল্য। সুতরাং এ জীবিকা সাধারণের প্রলোভনীয় হইতে পারে না। সুশিক্ষিত দলের সম্মুখে

এবং অদিতির পুত্র সমুদায় তোমরা সকলে একত্র হইয়া আমাদিগকে সুখ প্রদান কর।

পাঠক! এখন কহিতে পারেন যে পৃথিবী-যে আদিত্যগণের জননী বেদ হইতে তাহার প্রমাণ দর্শাইতে হইবে। লেখকের সুতরাং শ্রুতিকেই প্রমাণ স্থলে আনা উচিত, যথা—

সুবীরস্তে জনয়িতা মন্যত দ্যৌরিন্দ্রস্য
কর্ত্তা স্বপস্তমোভূৎ।
য ঈং জজান স্বর্য্যং সুবজ্রমনপচ্যুতং
সদসো ন ভূম॥

ঋগ্বেদসংহিতা ৪ মণ্ডলম্। ১৭ সূ। ৪ ঋ

তোমার জনয়িতা দ্যৌ মনে করিয়াছিলেন আমি সৎপুত্রশালী ইন্দ্রের জনক দ্যৌ সুকীর্ত্তিশালী হইয়াছিলেন। ঐ দ্যৌ স্বর্গ হইতে অবিচলিত। বজ্রশালী মহত্ত্ববিশিষ্ট ইন্দ্রকে উৎপাদন করিয়াছিলেন।

পৃথিবীই যে ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণের মাতা, তাহাও বেদে প্রমাণী কৃত হইয়াছে। পাঠক তোমার বোধসৌকর্য্যার্থ আমি কেবল তাহার একটী উদাহরণ প্রদর্শন করিব। তাহাতেই তোমাকে নিরস্ত হইতে হইবে। যথা—

তন্নোবাতো ময়োভুবাতু ভেষজং
তন্মাতা পৃথিবী তৎপিতাদ্যৌঃ।"
ঋগ্‌বেদ সংহিতা ১ মণ্ডল, ৮৯
সূক্ত ৪ ঋক্।

বায়ু আমাদিগকে সেই সুখপ্রদ ঔষধ প্রাপ্ত করাইয়া দেন তাঁহার মাতা পৃথিবী ও পিতা দ্যৌ সেই সুখজনক ঔষধ আমাদিগকে প্রাপ্ত করাইয়াছেন।

পাঠক! এখন তুমি কহিতে পার ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব ইহাঁদিগকে কোথায় রাখিবে, তাহার উত্তর ক্রমে দিব।

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই তিন জন হইতে সৃষ্টি, স্থিতি, ও লয় হয়। অতএব যাঁহা হইতে সৃষ্টি হয় তিনি সত্ত্ব গুণের আধার, যিনি সৃষ্ট বস্তুর স্থিতি অর্থাৎ রক্ষা করেন তিনি রজোগুণের আধার, এবং যাঁহাতে সমস্ত বস্তু লয় হয় অর্থাৎ লীন হয় তিনি তমোগুণের আধার।

ভারতীয় আর্য্যগণ এই ত্রিগুণাত্মক মূর্ত্তি ত্রয়কেই এক পদার্থ এবং এক শক্তিরই অবস্থা বিশেষ বর্ণনা করিয়াছেন। কি বেদে কি পুরাণে সর্ব্বত্রই তিনেই এক একেই তিন বলিয়াছেন।

এখন দেখ ঐ ত্রিগুণাত্মক মূর্ত্তি এমন কোন বস্তুকে আছে যাহাকে আশ্রয় করিয়া ত্রিমূর্ত্তির অবাস্তব ভেদ দেখান যাইতে পারে। যাঁহারা নিত্য সন্ধ্যাবন্দন করিয়া থাকেন তাঁহারা জানেন যে জগৎ-প্রসূতি সাবিত্রীর প্রথম অবস্থা ব্রহ্মরূপা অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্রের কৌমারাবস্থা। এই হেতু শক্তির ঐ অবস্থা-বিশেষকে কুমারী বলা হইয়াছে।

শক্তির দ্বিতীয়াবস্থাকে বিষ্ণুরূপা এবং যুবতী রূপে বর্ণন করা হইয়াছে। বিষ্ণুরূপ শব্দে জল-রূপা ধরিতে হইবে। জল দ্বারাই সমস্ত পদার্থের রক্ষা হয়।

শক্তির তৃতীয়াবস্থা বা শেষাবস্থাকে

শিবরূপা ও বৃদ্ধাবস্থা বলা হইয়াছে। এই অবস্থার নাম তমোরূপা এই খানেই সকল ভূতের পঞ্চত্ব হয়। এইজন্যই শিবের নাম পঞ্চানন অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম রূপ শিবের পঞ্চ বদনে সকল বস্তু স্ব স্ব নিয়মানুসারে লীন হয়। পাঠক তুমি এখন এই সকল কথার প্রমাণ দেখিতে ইচ্ছা কর—সামবেদী সন্ধ্যা দেখ যথা—

प्रातर्गायत्रीं कुमारीमृग्वेदयुतां ब्रह्मरूपां
सूर्य्यमण्डलमस्थितामित्यादि विचिन्तयेत्।
मध्याह्ने विष्णुरूपां यजुर्वेदयुतां युवतीं
सूर्य्यमण्डलसंस्थितमित्यादि विचिन्तयेत्।
सायाह्ने शिवरूपां वृद्धां सामवेदयुतां
सूर्य्यमण्डलसंस्थितामित्यादि विचिन्तयेत्।

নিত্য ক্রিয়ার প্রকরণ দেখ, শিবের অষ্টমূর্ত্তি দেখিতে পাইবে।

পুরাণ দেখ অষ্টমূর্ত্তির প্রকরণ পাইবে। যথা—

क्षितिर्जलं तथा तेजो वायुराकाशमेव च।
यजमानस्तथा चन्द्रः मूर्त्तयोऽष्टौ पिनाकिनः॥
पूजाप्रकरणे क्षित्यादिमूर्त्तिभेदेन तस्य (शिवस्य) नाम भेदः। यथा प्रणामान्तरं पूजयेत्।

शर्व्वाय क्षिति मूर्त्तये नमः।१
भवाय जल-मूर्त्तये नमः। २
रुद्राय अग्नि मूर्त्तये नमः। ३
उग्राय वायुमूर्त्तये नमः। ४
भीमाय आकाश-मूर्त्तये नमः।५
पशुपतये यजमान-मूर्त्तये नमः। ६
महादेवाय सोम-मूर्त्तये नमः। ७
ईशानाय सूर्य्यमूर्त्तये नमः। ८

এই সকল মূর্ত্তি-বিশিষ্ট যিনি তিনিই ভগবান্, তিনিই শিব, তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই আদ্যাশক্তি।

মহা-মহোপাধ্যায় কবিকুল চূড়ামণি কালিদাস এই অষ্ট মূর্ত্তিকেই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের নিদান বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তদীয় শকুন্তলা দেখ। যথা—

या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हवि र्या च होत्री
ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्।
यामाहुः सर्व्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः
प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः॥

উক্ত কবিবর ঈশ্বরকে ত্রিগুণাত্মক রূপে বর্ণন করিয়া কার্য্যকালে ভেদ বর্ণন করিয়াছেন। ইহাও তাঁহার স্বকপোল-কল্পিত বা বেদের বিরুদ্ধ নহে। তিনি কুমারসম্ভবে যাহা কহিয়াছেন তাহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। যথা—

नमस्त्रिमूर्त्तये तुभ्यं प्राक्सृष्टेः केवलात्मने,।
गुणत्रय-विभागाय पश्चाद्भेदमुपेयुषे॥

এক্ষণে পাঠককে ইহা দেখাইতে হইবে যে যিনি শিব তিনিই বিষ্ণু, তিনিই ব্রহ্মা অর্থাৎ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা। তদনুসারে গন্ধর্ব্বরাজ পুষ্পদন্তকৃত শিবের মহিম্নস্তব প্রমাণ-স্থলে উদ্ধৃত করা গেল যথা—

तवैश्वर्य्यं यत्तज्जगदुदय-रक्षा-प्रलयकृत्
त्रयीवस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु।

ঘমস্থাদারাশিনি বদে বেদান্তামরেলো
বিস্তু ব্যাক্তাখী বিদেধন হইকে অভধিব:।

এক্ষণে পাঠক কহিবেন যে, তবে আর্য্য-সমাজ কেন শক্তির উপাসক হইল। লেখক তাহার এই উত্তর দিবে যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ জড় বস্তুতেই আছে; কিন্তু শক্তি সহকৃত না হইলে এই ত্রিগুণের কার্য্যকারিতা হয় না। তজ্জন্যই আর্য্যেরা প্রকৃতিকেই (শক্তিকেই) সর্ব্ব-শক্তিমতী এবং পুরুষকে জড় স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন। এবং প্রকৃতি গুণ সংযোগে শিবের (অর্থাৎ জড় পদার্থের) স্পন্দনাদি ক্রিয়া জন্মে। প্রকৃতির গুণ-যোগ ব্যতীত জড়ের চৈতন্য জন্মে না।

তাহার প্রামাণ্য সংস্থাপন জন্য দিব্য চক্ষুঃ বেদবেদাঙ্গ-পারদর্শী পূজ্যপাদ শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্য-বিরচিত আনন্দলহরীর বচন উদ্ধার করা গেল। বিবেচক পাঠকগণ শিব ও শক্তির প্রভেদ অর্থাৎ জড় ও জড়ের গুণ দেখুন। যথা—

শিব:শক্ত্যাযুক্তো যদি ভবতি শক্ত: প্রভবিতুং
নচেদেবং দেবো ন খলু কুশল: স্পন্দিতুমপি।
অতস্ত্বামারাধ্যা হরিহর বিরিঞ্চ্যাদিভিরপি
প্রণন্তুং স্তোতুং বা কথমকৃতপুণ্য: প্রভবতি॥

এখন প্রিয়দর্শন পাঠকগণ লেখকের প্রতি নিম্নলিখিত প্রশ্ন করিতে সমর্থ যথা।—

১ম। ব্রহ্মা চতুর্মুখ কেন?
২য়। বিষ্ণু চতুর্ভুজ কেন?
৩য়। বিষ্ণুর নারায়ণ মূর্ত্তি সহস্র-শীর্ষ-যুক্ত, সহস্র-পাদ ইত্যাদি কেন?
৪র্থ। গণেশের গজেন্দ্র বদন কেন?
৫ম। কার্ত্তিকেয় ষড়ানন কেন?
৬ষ্ঠ। দুর্গা দশভুজা কেন?
৭ম। লক্ষ্মী জলনিধিকন্যা কেন?
৮ম। সরস্বতী আকাশভবা কেন?
৯ম। কালী শবশিবারূঢ়া কেন?
১০ম। জগদ্ধাত্রী সিংহবাহিনী কেন?

ইত্যাদি বহুবিধ প্রশ্নের উত্তর এক প্রস্তাবে দেওয়া সহজ নহে। এবং এক স্থলে দিলেও নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হয়। তদ্ধেতু লেখাও নিতান্ত নীরস হইয়া যায়। ক্রমে লিখিলে পাঠকের পাঠ করিতে অভিলাষ জন্মিবে এই আশায় এইখানেই লেখনীকে বিশ্রাম দেওয়া গেল। তথাপি পাঠকগণকে একটী কথা বলিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করা উচিত।—বিচারক পাঠক তুমি এক বার মনঃসংযোগ পূর্ব্বক আদ্যন্ত পাঠ কর, প্রমাণ গুলি প্রকৃত পুস্তকের সহিত মিলন কর, পদার্থ তত্ত্ব অনুসন্ধান কর, আর্য্য জাতির শাস্ত্রীয় তাৎপর্য্যও কূটার্থের ব্যাখ্যা দেখ। অবশ্য লেখকের মতগুলি নিতান্ত অভ্রান্ত জ্ঞান হইবেনা। লেখক একজন সামান্য মানব। মানুষমাত্রই ভ্রান্তি দেবীর নিতান্ত আশ্রিত। এবং পাঠকগণের মধ্যে অনেক প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তি আছেন। তাঁহারা অন্ততঃ একবার নিবিষ্টচিত্তে লেখকের অভিপ্রায় গুলি ও প্রমাণ গুলি মিলাইয়া দেখিবেন। এবং যে যে স্থল অসংলগ্ন বোধ হইবে ও পথ-চ্যুত বোধ হইবে তাহার প্রতি বিচার করিতে পারেন। তাহা করিলে লেখকের উৎসাহের উদ্দীপ্তি হইবার সম্ভাবনা। তখন লেখক আশ্রয় পাইবে।

শ্রীলাল—

আর্য্যজাতির ব্যবহার বিজ্ঞান।

(১১ শ সংখ্যার অনুবৃত্তি।)

প্রত্যর্থী বা প্রতিবাদী কাল (আর্চ্চা) প্রার্থনা করিলে তাহা প্রদত্ত হইত। কিন্তু যিনি নালিশবন্দী হইতেন (বাদী) তিনি আর্চ্চা চাহিলে পাইতেন না, প্রত্যুত তাঁহার মোকদ্দমা খারিজ হইয়া যাইত। ইহার প্রমাণ পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে।

অভিযোগের কাল।

এক্ষণকার ন্যায় পূর্ব্বেও অভিযোগের নির্দ্দিষ্ট কাল রাজ ব্যবস্থায় নির্দ্ধারিত হইত কিন্তু এমন কতকগুলি অভিযোগ ছিল যাহা তৎক্ষণাৎ রাজদ্বারে না জানাইলে ব্যবহারোচিত কার্য্য করা হইত না। যথা

" সাহস-স্তেয়-পারুষ্য গোভিশাপাত্যয়ে স্ত্রিয়াং।
বিবাদয়েৎ সদ্য এব কালোঽন্যত্রেচ্ছয়া স্মৃতঃ।" [যাজ্ঞবল্ক্য]

'সাহস' মনুষ্যহত্যা, 'স্তেয়' চুরি, 'পারুষ্য' মারপিট্, গালিগালাচ্, 'গো' দুগ্ধবতী গাভিহত্যা; 'অভিশাপ' মহা পাতকের কার্য্য, 'স্ত্রী' কুলস্ত্রীর চরিত্র ঘটিত বিবাদ, এবং দাস দাসী ঘটিত বা তদ্বিষয়ক স্বত্বাসত্ব ঘটিত, এই সকল কেস্ সদ্যই করিতে হইত। এ স্থানে সদ্য শব্দের অর্থ ৩ দিন। তিন দিনের মধ্যে এই সকল কেস্ রাজদ্বারে বিজ্ঞাত না করিলে তাহা তমাদি হইয়া যাইত। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বিবাদ সমস্ত যখন তখন করিতে পারিত। তাহাতে দোষ হইত না। এই সকল বিবাদ যেমন সদ্য উপস্থিত করার বিধি, তেমনি ইহার উত্তরও দিবার নিয়মিত বিধি ছিল। বাদী নালিশ বন্দী হইলে প্রতিবাদী এমন সকল বিষয়ের উত্তর দিবার জন্য আর্চ্চা প্রার্থনা করিলে পাইতেন না। সদাই তাঁহাকে উত্তর দিতে হইত। (ইহা শূলপাণি সম্মত)।

যুক্তি।

প্রতিবাদীই কাল (আর্চ্চা) পাইবেন আর বাদী তাহা পাইবেন না, এই ব্যবস্থার মূল বা যুক্তি এইরূপ নির্দ্ধারিত আছে। যথা—

" যস্মাৎ কার্য্যসমরাম্ভ-বিরাম্ভেন বিনিশ্চিতঃ।
তস্মান্ন লভতে কাল মভিযুক্তস্তু কালভাক্।" (কাত্যায়ন)

যে কার্য্য করে, সে অগ্রে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া এবং চারিদিক্ দেখিয়া শুনিয়া কর্ত্তব্য বক্তব্য নিশ্চয় করিয়াই করে। এই জন্য অভিযোগকারী কাল পাইতে পারেন না কিন্তু উত্তর প্রদাতা (প্রতিবাদী) তাহা পাইতে পারেন। কেননা তাঁহাকে

হঠাৎ উত্তর দিতে হইবে। হঠাৎ উত্তর যাহাকে দিতে হয়, তাহাকেই কিঞ্চিৎ কাল দেওয়া উচিত।

অপবাদ বা বিশেষ বিধি।

অভিযোগ-কর্ত্তা সময় চাহিলে পাইবেন না, ইহা রাজবিধি। কিন্তু এই বিধিতে কিঞ্চিৎ বিশেষ বিধি সংলগ্ন থাকা দৃষ্ট হয়। যথা—

"অভিযোক্তাঽপ্রগল্ভত্বাৎ বক্তুং নোৎসহতে যদি।
তদা কালঃ প্রদাতব্যঃ কার্য্যশক্ত্যনুরূপতঃ।"
(বৃহস্পতি)

যদি এমন প্রমাণ হয় যে, অভিযোক্তা অপ্রগল্ভ অর্থাৎ ভাল-বক্তা নহে বা ভয়াদি দ্বারা জড়বুদ্ধি হইতেছে, তজ্জন্য সে জিজ্ঞাসিত বিষয় বলিতে পারিতেছে না, তাহা হইলে তাহাকে কিঞ্চিৎ সময় দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু তাহা অধিক পরিমাণে নহে। তাহা "কার্য্য শক্তির অনুরূপ" অর্থাৎ যত সময়ে সে মাত্র সেই বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারে। এতাবতা এই বুঝাইতেছে যে, অভিযোক্তা ২।১ ঘণ্টা মাত্র সময় পাইতে পারেন।

অবধারিত দিনে বাদী প্রতিবাদীর অন্যতর অনুপস্থিত থাকিলে কোন কোন মোকদ্দমা খারিজ হইয়া যাইত। তাহাতে যিনি অনুপস্থিত থাকিবেন তিনিই হারিবেন, এইরূপ নির্ণয় ছিল। সে যদি বিশিষ্ট প্রমাণ দর্শাইতে পারে যে, তাহার অবধারিত সময়ে অনুপস্থিত হইবার বিশেষ কারণ ছিল অর্থাৎ কোন প্রকার দৈব বিড়ম্বনা বা রাজার কোন কার্য্য ছিল, তাহা হইলে সে পরাজিত হইবে না কিন্তু ইহা বিশিষ্ট সাক্ষ্যদ্বারা প্রমাণ না করিতে পারিলে গ্রাহ্য হইবে না। যথা—

"রাজদৈবকৃতো দোষস্তস্মিন্ কালে যদা ভবেৎ।
অবধাঽযোগমাত্রেণ ন ভবেৎ স পরাজিতঃ।"
(ব্যাস)

রাজকৃত দোষ কি দৈব বিড়ম্বনা বশতঃ যদি সে নির্দ্ধারিত সময় উপস্থিত না হইতে পারে, তবে সে, সময়ের অতিক্রমণ জন্য অপরাধী হইবে না এবং পরাজিতও হইবে না। কিন্তু যদি তাহা প্রমাণ না হয় প্রত্যুত যদি তাহাতে কুটিলতা বা কোন দুরভিসন্ধি থাকা প্রকাশ পায় তাহা হইলে সে পরাজিত হওয়া দূরে থাকুক বিশেষ দণ্ডনীয় হইবেক। যথা—

"রাজদৈবকৃতং দোষং সাক্ষিভিঃ প্রতিপাদয়েৎ।
ছদ্মেন বর্ত্তমানস্তু দণ্ড্যো দাপ্যস্তু তদ্ধনম্॥"
(ব্যাস)

ইহার অর্থ উপরে ব্যক্ত হইয়াছে।

পূর্ব্ব বাদীর কার্য্য।

এক্ষণে পূর্ব্ব বাদীর কার্য্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। পূর্ব্বকালে বাদীগণ কি প্রকারে অভিযোগ উপস্থিত করিতেন এবং কি প্রকারে বা উত্তর বাদী উত্তর দিতেন —পাঠকগণকে এই সকল বিষয় অবগত করানই এই অংশের উদ্দেশ্য।

ভাষাপ্রয়োগ।—পূর্ব্ব বাদীর প্রথম কার্য্য ভাষাপ্রয়োগ বা ভাষা প্রদান। এক্ষণকার দরখাস্ত বা আর্জি দাখিল উক্ত-ভাষা প্রয়োগের সহিত তুল্য; কেননা, সম্পূর্ণ ব্যবহার-ব্যাপারটিকে ৪ ভাগ করিয়া তাহার প্রত্যেক এক এক ভাগকে পাদ নাম দিয়া এই ভাষাদানকে ১ম পাদভুক্ত ও ইহার যেরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে কথিত বিধ (আর্জি দাখিল) ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না। সেই সেই স্থলগুলি আমরা ক্রমানুরূপ অনুবাদ করিয়া যাই—পাঠকগণ মিলাইয়া যাউন।

ভাষাপাদ, উত্তরপাদ, ক্রিয়াপাদ, ও নির্ণয়পাদ। এই চতুষ্পাত্ ব্যবহার। যথা—

"পূর্ব্বপক্ষঃ স্মৃতঃ পাদো দ্বিপাদশ্চোত্তরঃ স্মৃতঃ।
ক্রিয়াপাদস্তথাচান্যশ্চতুর্থোনির্ণয়ঃ স্মৃতঃ।"
(বৃহস্পতি)

পূর্ব্বপক্ষ প্রথমপাদ (ইহাই ভাষাপাদ নামে বলা হইয়াছে), উত্তর পক্ষ দ্বিতীয়; ক্রিয়া তৃতীয়, এবং নির্ণয় চতুর্থ। প্রথম পূর্ব্বপক্ষ নামক পাদের অন্তর্গত ভাষার স্বরূপ লক্ষণ যাহা কাত্যায়ন ও বৃহস্পতির ব্যবস্থায় বিধিবদ্ধ আছে তাহা বলিতেছি মনোযোগ কর—

"প্রতিজ্ঞাদোষ নির্ম্মুক্তং সাধ্যং সংকরণান্বিতম্।
নিশ্চিতং লোকসিদ্ধঞ্চ পক্ষং পক্ষবিদো-বিদুঃ।" (কাত্যায়ন ও বৃহস্পতি)

মিতাক্ষরাকার এই শ্লোকস্থ পক্ষ শব্দটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন "ভাষা প্রতিজ্ঞা পক্ষ ইতি নার্থান্তরম্" অর্থাৎ ভাষা, প্রতিজ্ঞা ও পক্ষ, ইহাদের অর্থ এক প্রকার, সুতরাং আমরা যে ভাষা প্রয়োগ' বলিয়াছি তাহাও ঐ রূপ বুঝিতে হইবে। আমরা এক প্রকার পদার্থ কখন ভাষা কখন পক্ষ কখন বা প্রতিজ্ঞা বলিয়া উল্লেখ করিব, পাঠকগণ ইহা না ভুলেন। তিষ্ঠতু। এক্ষণে কি প্রকার বস্তুকে ব্যবহার শাস্ত্রে ভাষা বলিয়া উল্লেখ করে, মনোযোগ কর। আবেদন কারী আবেদন পত্রে যাহা লিখে বা বলে তাহার নাম ভাষা। এই ভাষা কীদৃশ হইলে যথার্থতঃ ব্যবহার যোগ্য ভাষা হইবে? ইহারই নির্দ্ধারণ জন্য উপরোক্ত শ্লোক বলা হইয়াছে। অতএব ব্যবহারের উপযুক্ত ভাষা এই প্রকার হওয়া আবশ্যক। যথা—প্রতিজ্ঞাবাক্য বা ভাষাটীতে কোন দোষ না থাকা অর্থাৎ লিখিত ভাষাতে পরস্পর বিরুদ্ধ কথা বলা না হয়, "অন্যথা প্রতিজ্ঞাদোষেণ সাধ্য-দোষঃ স্যাৎ" প্রতিজ্ঞার দোষেতেই সাধ্যের দোষ হইয়া থাকে।

অল্প কথায় লিখিতে হইবে এবং পূর্ব্বাপর বিপর্য্যয় না হয়।

এই ভাষার নির্ম্মাণ কালে কোন উদাসীন অর্থাৎ তৃতীয় ব্যক্তিকে দেখাইয়া তাহার দোষ গুণ সংশোধন করা হইত। তাহার কারণ তৃতীয় ব্যক্তিই দোষ গুণ দেখিতে পায়, বাদী প্রতিবাদী সকল দেখিতে পায় না।

"দূতে চ ব্যবহারের প্রবৃত্তে যজ্ঞ কর্ম্মণি। যানি পশ্যন্ত্যদাসীনাঃ কর্ত্তা তানি ন পশ্যতি," দ্যূত, ব্যবহার, যজ্ঞ, এসকল বিষয়ে তৃতীয় ব্যক্তি যেমন দেখিতে পায়, কর্ত্তারা তেমন দেখিতে পান না। বাস্তবিক দাবাখেলার উপর চাল দেখা যায় ভাল।

এই ভাষা সংশোধন বিধি, দাখিল করিবার পূর্ব্বেই নিয়মিত। কদাচিৎ দাখিলের পরেও করিতে পারে, যাবৎ না উত্তর বাদী উত্তর দিতে প্রস্তুত হয়। পূর্ব্বকার এই ব্যবস্থাটি ভাল কি মন্দ নির্ণয় করা সুকঠিন। কিন্তু, কেবল বৃহস্পতিই ইহাতে সম্মতি দিয়াছেন যথা,—

"ন্যূনাধিকং পূর্ব্ব পক্ষং তাবদ্বাদী বিশোধয়েৎ। ন দদ্যাদুত্তরং যাবৎ প্রত্যর্থী সভ্যসন্নিধৌ।"

এক্ষণে দেখা যাউক, পূর্ব্বে লিখিয়া দাখিল করিবার নিয়ম ছিল কি না। অনেকেরই জ্ঞান আছে যে, লিপী প্রথা অতি আধুনিক। বস্তুতঃ তাহা নহে। হিন্দু শাস্ত্র সকল অনুসন্ধান করিলে প্রতীত হয় যে, অতি প্রাচীন কাল হইতেই লিখনপদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে। আমরা যে হিন্দুদিগের পূর্ব্বপ্রচলিত ব্যবহার বিধি প্রকট করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এতন্মধ্যে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। দেখা যাইতেছে, ভাষা প্রয়োগ (দরখাস্ত) লিপিদ্বারা হইত। সাক্ষীদিগের জবানবন্দী লিপি বদ্ধ করা হইত। নিষ্পত্তি পত্র লিপীবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইত। এত প্রমাণ সত্বেও যাঁহারা লিপী প্রথাকে প্রাচীন মনে না করিবেন, তাহাদের মন যে কি দিয়া গঠিত বলিতে পারি না!! যাহা হউক, প্রকৃত বিষয়ে মনযোগ কর—

পূর্ব্বকালে প্রথমতঃ কাষ্ঠফলকে অথবা মৃত্তিকাতে ব্যবহার ভাষার পাণ্ডুলেক্ষ্য প্রস্তুত করিয়া, তাহার দোষগুণ সংশোধন করণান্তে পত্রারূঢ় করা হইত। পত্র শব্দের অর্থ এখানে কাগজ নহে; কেননা, কাগজ অতি আধুনিক। তালী নামক এক প্রকার বৃক্ষ আছে, তাহার পত্র ৪—৬ ইঞ্চি পর্য্যন্ত পরিসরযুক্ত হইয়া থাকে, তাহাই পত্র শব্দের বাচ্য। এই তালী পত্র এখনও ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা পুস্তক লিখিবার জন্য আহরণ করিয়া থাকেন। উড়িষ্যাতে অদ্যাপি এই পত্র জমীদার দিগের সেরেস্তায় বিদ্যমান আছে। তালী পত্র ভিন্ন আর এক প্রকার বৃক্ষের ত্বক্ ব্যবহার হইত। তাহা অতি আশ্চর্য্য পদার্থ। উহা ঠিক্ ফুলস্কাপ কাগজের ন্যায়। কেবল বর্ণ কিঞ্চিৎ হরিদ্রাভ। আমরা এই ত্বকের অনেক প্রাচীন পুস্তক দেখিয়াছি। এই ত্বক্ ও পত্র শব্দের গৌণ নাম।

এক্ষণে পাণ্ডুলেখ্য সম্বন্ধে ব্যাস কি বলিতেছেন, শুন—

"পাণ্ডু লেখেন ফলকে ভূমৌবা প্রথমং লিখেৎ।

ন্যূনাধিকন্তু সংশোধ্য পশ্চাৎ পত্রে নিবেশয়েৎ॥" ইহার অর্থ সুগম।

এই শ্লোকস্থ "ফলক' শব্দের অর্থ কাষ্ঠ পট্টক, কাঠের পাটা। এখনও পর্য্যন্ত বাঙ্গাল মহাজনেরা (ব্যবসায়ী) হিসাব রাখিবার জন্য কাঠের পাটা (পাটীয়া) ব্যবহার করিয়া থাকে, বোধ হয় অনেকেই তাহা অবগত আছেন।

তাদৃশ কাষ্ঠপট্টে অথবা মৃত্তিকাতে ভাষার শরীর রচনা করিয়া পশ্চাৎ পত্রারূঢ় করিয়া প্রাড়্বিবাকের নিকট দাখিল করিলে, প্রাড়্বিবাক, বা বিচারপতি তদনুসারে প্রতিবাদীকে আহ্বান করিয়া তাহার সমক্ষে অর্থীকে (বাদীকে) লিখিত বিবরণ সম্বন্ধে বাচিক প্রশ্ন করিয়া তাহা সংশোধন করিয়া লইতেন। পরে প্রত্যর্থীকেও বাচিক প্রশ্ন পূর্ব্বক তাহার প্রদেয় উত্তর লিপী সংশোধন করিতেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে উত্তর প্রত্যুত্তরের জন্য অর্থী প্রত্যর্থী উকিল নিযুক্ত করিতেন, তাহা এই স্থানে স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

ভাষা প্রয়োগের পর বিচার পতির নিকট যাহা বাচনিক বলিতে হয়, তাহা এক্ষণে এজাহার নামে চলিতেছে। এই এজাহারের সহিত লিখিত বিবরণের সহিত ঐক্য হইলে এবং প্রশ্নের দ্বারা তাহার অসাঙ্কর্য্য বা অকৃত্রিমতা নির্ণয় হইলেই তাহা সংশোধিত হইল। বাদী প্রতিবাদী বা অর্থী প্রত্যর্থীর এজাহার বা বাচনিক ভাষা এবং সাক্ষীদিগের বাচনিক ভাষা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে লিপিবদ্ধ করা হইত এবং তজ্জন্য স্বতন্ত্র লেখক নিযুক্ত থাকিত। পূর্ব্বকালে কায়স্থ জাতিরাই এই কার্য্য করিতেন। অদ্যাপি কায়স্থজাতিরা মসীজীবী বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। অর্থী প্রত্যর্থী এবং সাক্ষীরা বলিবেন, প্রাড়্বিবাক তাহা সমক্ষে থাকিয়া লেখাইবেন যথা—

"পূর্ব্বপক্ষং স্বভাবোক্তং প্রাড়্বিবাকোঽথলেখয়েৎ।
পাণ্ডু লেখেন ফলকে ততঃ পত্রেঽভিলেখয়েৎ।"

(কাত্যায়ন)

এতদনুসারে মিলিত হইতেছে যে এজাহারটিকে, পাণ্ডু লিপীর অনন্তর পত্রারূঢ় করা হইত এবং তাহা ক্রচ্ এগজামিনের দ্বারা সংশোধিত করিয়া লওয়া হইত। যথা—

"শোধয়েৎ পূর্ব্বপক্ষস্তু যাবন্নোত্তর দর্শনম্।
উত্তরেণাবরুদ্ধস্তু নিবৃত্তং শোধনং ভবেৎ॥"

(কাত্যায়ন)

লেথকদিগের মধ্যে যদি কেহ উৎকোচ গ্রহণ বা অন্য কোন কারণের বশতাপন্ন হইয়া সাক্ষী বা অর্থী প্রত্যর্থীর বাচনিক ভাষার অন্যথা করেন অর্থাৎ তাহারা এক রূপ বলিল, তিনি অন্যরূপ লিখিলেন, তাহা হইলে সেই লেথকের ভয়ানক দণ্ড দেওয়া হইত। যথা—

"অন্যদুক্তং লিখেৎ যোঽন্য দর্থিপ্রত্যর্থিনোর্বচঃ।
চৌরবচ্ছাসয়ে তত্তু ধার্ম্মিকঃ পৃথিবীপতিঃ॥"

(কাত্যায়ন)

অর্থাৎ অর্থী বা প্রত্যর্থী এক প্রকার বলিল, যে লেখক তাহার অন্যথা লিখিলে, ধার্ম্মিকরাজা তাহাকে চৌরের সমান দণ্ড করিবেন। (লেখকদিগের এই রূপ গুণ এখন আর প্রায় দেখা যায় না, পূর্ব্বে বিলক্ষণ ছিল)।

পূর্ব্বে প্রাড়বিবাকের লক্ষণ নির্দ্দেশ কালে বলা হইয়াছে যে, যিনি প্রাড়্বিবাক হইবেন, তাঁহার পর চিত্তজ্ঞতা অর্থাৎ অনুমান শক্তি সমধিক থাকা আবশ্যক, তাহার কারণ, ঐ গুণটি এই সময়ের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অর্থী প্রত্যর্থী বা সাক্ষীরা যাহা বলিবে তাহা স্বাভাবিক কি কৃত্রিম, তাহা তাঁহাকে প্রায় অনুমান দ্বারা বুঝিয়া লইতে হইবে।

"স্বভাবোক্ত মকৃত্রিমম্" "এতচ্চ স্বর শেষ বিশেষা দিনা জ্ঞেয়ম্।"

(স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য)

যাহা অকৃত্রিম, তাহা স্বাভাবিক; কৃত্রিম অকৃত্রিম, বক্তার স্বর বিশেষ ও মুখাদি অবয়ব বিশেষের ভাবভঙ্গী বিশেষ দ্বারা জানিতে হইবে।

পূর্ব্বকালে ছল বা কৃত্রিমতা দূর করিবার জন্য যে প্রশ্ন করা হইত। তাহার আর একটি নাম ভূত তত্ত্বার্থবাক্য। যথা—

"ছলংনিরস্য ভূতেন ব্যবহারান্নয়েন্নৃপঃ।"

(যাজ্ঞবল্ক্য)

"ভূতং তত্ত্বার্থ সম্বন্ধং" তত্ত্বার্থ সম্বন্ধ অর্থাৎ যাথার্থ্যের উদ্ঘাটক যে বাক্য, তদ্দ্বারা ছল অর্থাৎ কৃত্রিমতা নিরাস করিয়া ব্যবহার নির্ণয় করিবেন।

এক্ষণে দেখা আবশ্যক যে, কি প্রকার ভাষায় লেখা প্রস্তুত করা হইত। কেন না, এই সকল বিষয় সংস্কৃতে লেখা হইত? কি দেশভাষায় লেখা হইত? এই রূপ সংশয় অনেকেরই হইবার সম্ভা বনা। সুতরাং এস্থলে তাহা অবশ্য বক্তব্য হইতেছে।

স্মৃতিতে এই বিষয়টির কোন নির্ণয় দৃষ্ট হয় না। কেবল পুরাণ সকল পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীত হয় যে, সংস্কৃত ও দেশ ভাষা উভয়বিধ ভাষাতেই লেখা দাখিল করা হইত। যাঁহারা সংস্কৃত ভাল না জানিতেন তাঁহারা দেশ ভাষায় আবেদন করিতেন যথা,—

সংস্কৃতৈঃ প্রাকৃতৈ র্বাক্যৈঃ—।
দেশ ভাষা দ্যুপায়ৈশ্চ—॥"

(বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

ব্যবহারতত্ত্বেও এই রূপ উল্লেখ আছে, যথা—

"এতত্ত্ব সংস্কৃত দেশ ভাষান্তরেণ।
যথাবোধং বক্তব্যং লেখ্যং বা।"

সংস্কৃতই হউক, আর দেশ ভাষাই হউক, যে যাহা ভাল জানে—সে তাহা তেই বলিবে বা লিখিবে।

একথায় আর একটি সত্য লাভ হইতেছে। এক্ষণকার ন্যায় পূর্ব্বকালেও সংস্কৃত ভাষা ভিন্ন দেশভাষা স্বতন্ত্র ছিল। সংস্কৃত ভাষা কৃত্রিম, কোন কালেই উহা মনুষ্যের স্বাভাবিক নহে। পুস্তকাদি লিখিতে হইলে এই সংস্কৃত ভাষাতেই লিখিত হইত তদ্ভিন্ন গার্হস্থ্য ব্যবহারের

জন্য যে দেশের যাহা মাতৃভাষা—সে দেশের লেখকেরা সেই সেই ভাষাই ব্যবহার করিত। ব্যাস যাজ্ঞ বল্ক্য প্রভৃতির সময় হিন্দুস্থানের গার্হস্থ্য ভাষা কি রূপ ছিল, বঙ্গদেশেরই বা কি আকারের ভাষা ছিল, তাহা এক্ষণে,নিঃ সন্দিগ্ধ নির্ণয় করা যায় না।

ক্রম প্রকাশ্য।

কালীবর বেদান্ত বাগীশ।

বৃন্দাবন দৃশ্যাবলী।

যমুনাতীর।

নিশীথ সময়।

শ্রীকৃষ্ণ একাকী—

শ্রীকৃষ্ণ।—যমুনে! কহ কিবা ভেয়ল
তব নীল নীরে বিরাজিতা ভুবন-বি-
মোহিনী ?
তুহ মন্থর গমনে বারীন্দ্র-সঙ্গমে
চলত কলকলি—কহত হমারে!
হম শুধাই তোহারে!
হম আয়ত নিত নিত তব তীরে খোনত
তব তীর ধোয়ত নয়ন আসারে!
যমুনে!
তব তীরে নিত হম্ ঢোঁরত তাহারে!—
(দীর্ঘনিশ্বাস)
এই অত নিশীথ তব নীরে ধীরে
নাচত তারা কোটী শশী থর থরে!
রজ রুচি কৌমুদীময়ী নবরাই
থর থর নাচত মম হৃদি নীরে!
প্রতি এক তরগে ধমনী ভিতরে
বিহারত রাধিকা রুধির প্রবাহে।
অন্তর মাঝারে অনন্ত-রূপিণী
আনন্দ-প্রবাহিনী বহব মধুরে!
প্রতি এক নিশ্বাসে রাধিকা নিস্বরে
প্রতি এক প্রশ্বাসে রাধিকা প্রবেশে!—
রাধা ভুবনময়ী অঙ্কিত অন্তরে
নয়ন দুর্ভাগ কাঁহে না পায় তাহারে!?
(দীর্ঘনিশ্বাস)
ইহ বৃন্দাবনে ইহ যমুনা-তটে
নিত নিত নিশীথে খোমত রোই!
বিষাদিত ভ্রমর বিকচ কুসুমে
বিরত গুঞ্জরে অহ মোর রোদনে!
কদম্ব-বিটব সেহ বিষাদিত
ঝর ঝর ঝরত নয়ন-শিশিরে!
তমাল-শেখরে পীক নাহি কুহুমে
চলত সমীরণ মেদুল কাতারে!
সচল চন্দ্রমা অচল ভেয়ত
করুণা হিম বিথরি!
প্রেম-উন্মাদিনী মদন বাসর

আশয়ে অবিরত চলত যমুনা
সেহ বিষাদিত হমার রোদনে
সেহ ফিণি পেখত উগ্রন তরগে!—
(দীর্ঘনিশ্বাস ও ক্ষণকাল নিস্তব্ধ)
রাধা রমণী শিরোমণি!
রাধা বিধাতা-সৃজন-চাতুরি!
চন্দন-সৌরভ কাঞ্চন গলাই
মদন হুতাশনে নিরমিল তায়!
নিরমল সোহাগ বসান রঞ্জনে
হেমাঙ্গ উজলি সৃজল তাহারে!
নবীন নীরদে গরল মিলাই
রচল কৌশলে নয়ন-যুগলে!
তরুণ প্রবালে অমৃতে গলাই
বিরচল অধরে মধুর ভাণ্ডার!
বক্ষে পীনোন্নত বিকচ কমলে
রচল যুগল মলয় মন্দরে!—
কিন্তু—নীল মরমরে গঠন অন্তরে!—
(দীর্ঘনিশ্বাস ও ক্ষণকাল নিস্তব্ধ)
কই বৃন্দে কই আয়ত?
প্রতি পত্র বিকম্পনে চিত্ত বিচঞ্চল
লোচন চকিতে নেহালে!
দুরাশা মরুভূমে দারুণ পিপাসা
অযুত মরীচিকা ছলত মোয়!
নীরস অধর নীরস কণ্ঠ
নীরস মুরলী বাজনে না চায়ও!
(বৃন্দার প্রবেশ)
আও বৃন্দে আও অমৃত সঞ্চারি
যায়ত জীবন বাচাও হমারি!
বৃন্দা।—নবীন যৌবনে গরব গভীর
নবীনা নিমগনা তায়!
নবীনা প্রেম নাহি জানে!
নবীনা নবভুজঙ্গিনী ঔষধি না মানে!—
(শ্রীকৃষ্ণ একএকবার বৃন্দার প্রতি দৃষ্টি এবং দীর্ঘনিশ্বাস)
তায় কি ফল সধমে?—বিফল!—
বিফল যইসন অরণ্যে রোদনে!—
শ্রীকৃষ্ণ।—বৃন্দে
যদি বিফল সাধনা অরণ্যে রোদন
বিফল বিফল তবে মম জীবন!
রাধা রূপ কৌমুদীময় মম অন্তর
রাধা বিনা নিখিল নিরখি আঁধার!
রাধা নাম জপ—রাধা রূপ ধ্যান—
'রাধা রাধা' স্মরি ত্যজব জীবন!—
(অধীর হইয়া উপবেশন)
বৃন্দা।—কেশব নাকহবি মোয়
কহবি তাহারে যুবতী যে হোয়!—
কবে সে যৌবন জোয়ার কি বারি
আয়ল— গিয়ল!—(ফিরল না আর!)
ষোড়শ গ্রীষ্মে বিংশতি বসন্তে
সপ্ত ত্রিংশতি হেমন্তে অতীত!
কেশব না কহবি মোয়
হম নবীনাত নয়ও!—
কত শ্যামে গঠলু কত শ্যামে ভাঙ্গলু
কত শ্যামে পেখলু আকুল পাথারে!
কত শ্যাম আয়ল কত শ্যাম সাধল
কত শ্যাম ভাসল নয়ন কি জলে!
বৃন্দা পুরাতনী অতি
পেখি ঠেকি শিখল পুরুখক রীতি!
প্রথমে সাধত পায়ে ধরি রোয়ত
যাচি যাচি কহত বাত!
ছলে কলে কৌশলে সহলে সহলে
অন্তর করত হাত!

সব মধু লুটল পিপাস। নিভায়ল
ধীরে ধীরে হটইতে চায় !
তবে যদি সাধব গুমার বাড়াব
কত ছল করব কহন না যায় !
তখন কাঁদব যেত দেখি হাসব
নবীনা মরব পীরিতি কি দায় !
শিকল লাগায়ব শিকল না মানব
কাটব পলাব পালাব নিচয় !
বহুবারে পুরুখ নমত পায় !

শ্রীকৃষ্ণ।—

ব্যঙ্গ ত্যজ বৃন্দে প্রাণ অত যে তোয়
ব্যঙ্গ ত্যজ বৃন্দে কহ করি কি উপায় !
সাগর শুখায়ব। শশী ভানু খসব !
সাগর উঠব হেমাদ্রি শেখরে।
যদি দিনেশ দেব পশ্চিমে উদয়ব !
গরল খেলব মলয়-অনলে !
কান বাত ছোড়ব ! জলদে না সাধব
চাতক পিয়ব নিলাম্বু জল !
বৈকণ্ঠ টলব। তাপ নাহি রহব
অনলে ! সলিলে ভাসব অচল !
ইহ যমুনা যদি
সাগরে না যাই শেখরে ফিরব !
রাধা-রূপ তবু নাহি পাসরিব।—

বৃন্দা।—নাকহবি মোয়

ভিষক্‌কে রোগ নাহি ছাপা রয়ও !
বিশাইক কারিগরি না শিখাবি তুইও !
নিরখি পবনে শারদ গগণে
নিরখি জাহ্নবী জোয়ার ভাটায় !
নিরখি হরষে নিরখি চন্দ্রমে
নিরখি ষড় ঋতু আয়ে আর যায়ও !
নিরখি স্বভাবে স্বভাব না রয়ও !
পুরুখে রহব ? হা মোর কপাল !
কোমল পরশে অটল জল ?

শ্রীকৃষ্ণ।—

হাম্ হারনু বৃন্দে !—জিতব তোমারে
জনমিল নাহি আবহি সংসারে !
পীরিতি সাধনে সিদ্ধা ইহ বৃন্দাবনে
উদ্ভব সাধিকা তুই !
হম নবীন পথিক নবীন সাধনে
গুরু করি বরত তোয় !
শিষ্য ত্যজ রঙ্গ
কহ কই সনে সাধব ?
সাধনেও কিবা সিদ্ধ নাভেয়ব ?

বৃন্দা।—সাধনে সিদ্ধ।

শ্রীকৃষ্ণ।—তবে হম সাধব।

বৃন্দাবন ত্যজি শখরে পসব !
দুরাশা শ্মশানে ভীষণ বিশাল
মদন অনল কুণ্ড জ্বালাই
শ্বাস হবি স্বাহা অবিরত ঢালই
রাধা-স্মৃতি-মালা জপব নীরবে !
রাধা পীরিতি মহান্ মন্ত্রে
দীক্ষিত হমার অন্তর কায় !
সফল মন্ত্র বা শেখরে লয় !

বৃন্দা।—কেশব না যাবি শেখরে

শেখরে জপলে না পাব তাহারে !
হম তোরে কহব দীক্ষিত করব
যোগ যাগ যত শিখয়ব তোরে !—

(বংশী উঠাইয়া)

লহ বংশী—

এর মধুর বাদনে মদন ভুই
মদন-মোহিনী ডগ মগ হোয়ও
কানন-শোভিনী মোহন মালতী

মদনে গলই অনিলে মিশায়!
পাথান তরল যমুনা উজন
ভানুর কিরণ সুশীতল হোয়!
মলয়-সমীর আমোদে বিভোর
পরাগে মিলই নাচিয়া বেড়ায়!
চাঁদের কৌমুদী হাসিয়া হাসিয়া
সোহাগে মাতিয়া ঢলিয়া পড়য়।
বকুল তমাল শ্যামল সরল
মেদুল মেদুল ললিত আসারে!
নবীন নধর ননীর পুতলী
স্বপনে হাসত মধুর অধরে।
লাজের লতিকা নবীন বাসরে
নব বধূ লাজ তেয়জে।
কপোত কপোতী অধরে অধরে
ভ্রমর ঝঙ্কারে কুসুম নিচয়ে!
পেখত ব্রজাঙ্গনা স্বপনেমে তোহে।—
(বংশী শ্রীকৃষ্ণের হস্তে দিয়া)
তু'বাজাবি ইহারে দিবসে নিশীথে
প্রদোষে প্রভাতে।
মহেন্দ্র লগনে সৃজন ইহার
আরবে মদন মাত।
তু'আরবি নিত নিত ইহ যমুনা-তীরে
নীপবর মূলে
বৈঠবি—ঠরবি—পেখবি নয়নে
যমুন সলিলে!
আয়ব রাধা যমুনার গাহনে
যৌবন-গরবিনী!
ঈষদ বঙ্কিম লোচনে ভাকই
পেখবি ত্রৈলোক্য মোহিনী!
যবে আঁখি মিলব মধুরিমে হাসবি
অন্তর কহবি ঠারে!

যদি সময় পায়বি লাজ নাহি করবি
ছলে কলে কৌশলে যায়বি নিকটে
মন খুলি তারে কবি অকপটে!
এহি তব পাট সাবধ ইহাবে
একবারে নার—সহস্র বারে!

শ্রীকৃষ্ণ।—
উৎকট সাধনা বৃন্দে অন্তরে ডরাই!
কইসন সাধব ভাবই না পাই!
শর জাল মাঝারে সহজ গমন
শিহরি স্মরণে নয়ন থরতর
সন্ধানে। কইসন সম্ভব তায়?
বরঞ্চ সহজ তুরগ তুয়ারে
বিপক্ষ শত অসি তরঙ্গ মাঝারে
অটল অন্তরে বিজয় কামনা।—
পীরিতি প্রস্তাবে সম্মতি কামনা
কামিনী সমীপে মানত দুরূহ।
যদি কহব 'না' মরব তখনি!
তার সমতুল নহে সহস্র অশনি।—

বৃন্দা।—
রে নবীন প্রেমিক শুন মোর বাত
আঁখে আঁখে বহবি ডরবি মাত!
যদি আরক্ত লোচনে বঙ্কিম বদনে
দোষব হাসই উড়ায়বি তায়।
কামিনী-অন্তরে যাহা বদনে না কয়!—
ছলে ছলে চলবি সাথ নাহি ছোড়বি
নিষেধ করব নিষেধ না মানবি!
পুরুখ চুম্বক সংসর্গে করবে
কামিনী কোমল আয়সি কি তার!
পুরুখ পরশ পরশে হেম
ভেয়ত কামিনী অন্তর পাথাণ।
ভানুর কিরণে মোমের কমল

তরল-ঘইসন হোয়ও!
চাঁদের কিরণে আধার না রয়ও।

শ্রীকৃষ্ণ।—গুরু উপদেশ মানলু হম্‌,
সাধব বংশী—অব বংশী বাজত তোম্‌।

বৃন্দা।—(বনমালা উন্মোচন করিয়া)
ধর বনমালা যতনে পরবি ইহারে
রতি-পতি-রতি বিরাজে এ হারে!
এর প্রতি এক কুসুম প্রতি এক বিন্দু
অমৃত নিহারে তিতই রচল!
এর প্রতি এক কুসুম নন্দন-সৌরভ
প্রতি এক হিলোলে গুথাই গাঁথল!
মদন-মন্ত্রময় ইহ হার
যাদুকরী কই রচিল ইহারে!
এর যতেক গুণ কহন না যায়ও
পেখলে যোগিনী চঞ্চলা হোয়ও!
যতনমে রাখবি কণ্ঠমে ধারবি
গঙ্গা-নীরে ধুই পিয়বি নীর!

(শ্রীকৃষ্ণের গলায় পরাইয়া)

অব চলব হম তু'ত বংশী ফুকরি।—

(প্রস্থান)—

[illegible] (দাঁড়াইয়া)
[illegible] —
[illegible] বাত!—
[illegible]
[illegible] গয়িল বোলায়বি মত।
[illegible] (অধীর হইয়া উপবেশন;—
[illegible]কাল পরে বনমালার প্রতি দৃষ্টি [illegible]রিয়া)—
[illegible] প্রতি এক কুসুম প্রতি একবিন্দু
[illegible]ত নিহারে তিতই রচল।
[illegible] প্রতি এক কুসুম নন্দন-সৌরভ
প্রতি এক হিলোলে গুথাই গাঁথল।
মদন-মন্ত্রময় ইহ হার।
যাদুকরী রচল ইহারে!
এর যতেক গুণ কহন না যায়ও
পেখলে যোগিনী চঞ্চলা হোয়ও!
যতনমে রাখব কণ্ঠমে ধারব
গঙ্গা-নীরে ধুই পিয়ব নীর!
রাধালাভ ইথে হব কি হমার?

(ক্ষণকাল চিন্তা)

আও বংশী অব সাধব তোহারে।
বাজ দেখি আজি 'রাধা রাধা' স্বরে!—

(ক্ষণকাল চেষ্টার পর ক্ষণকাল 'রাধা রাধা' স্বরে বংশী ধ্বনি—পরে বিরক্ত হইয়া)—

কই বংশী?—তব সাধন বিফল।
কই তব সাধনে রাধিকা আয়ল?

(বংশী ফেলিয়া প্রস্থান)—

নেপথ্যে।— গীত।

বেহাগ। একতালা।

বাঁশরী বাজতরে।
গভীর রজনী চাঁদের কিরণ
হুতাসন সম লাগতরে।
নীরব কোকিল তমাল শেখে
সে রবে মোহিত বিরত কুহরে
মলয় অনিল চলত মন্থরে

মদন হানত রে।

স্খলিত ঘাঘরি গিরত ভূতলে
উড়ু উড়ু প্রাণ চরণ না চলে
হেলিয়ে পড়ত মেদল অনিলে

অনল নিশাসে বহতরে।

কাঁচলি কষণ এইত খুলল

কইসনে তায় কয়ব বল;
অন্তর মাঝারে কি যেন বিধল
ভূতলে গিরতরে।
হম্ আছলু শয়নে মুদিত নয়নে
সেরূপ কাঁহেবা পেখলু স্বপনে
মদন-মোহনে মুরলী বদনে
রাধা রাধা স্বরে হাঁকতরে॥

(রাধিকার প্রবেশ)

রাধা।—কই যমুনা তীরে কই বনয়ারি?
শ্মশান যমুনা—স্বপন ছললি হমারি!
হম আছলু শয়নে বঙ্শী বদনে
মদনমোহনে পেখলুরে।
ইহ যমুনা-তটে নীপতরু নিকটে
ত্রিভঙ্গ ঠাটে হেলিয়েরে।
বংশী ফুকারে রাধা রাধা স্বরে
নয়ন কি ঠারে বোলায়লরে।
উড়্ উড়্ অন্তর শরমে থরথর
জর জর জর ভেয়লরে!
অন্তর টলল পদ নাহি চলল
পাপ শরম বাদ সাধলরে।
কাচলি কঁষণ পুনপুন বাঁধলু
পুন পুন যেন খুললরে।
নয়ন যুগল পুনপুন তুললু
পুন পুন পুন মুদলুরে!
দুকূল অঞ্চল পুন পুন গিরল
পুন পুন ঝাড়ি তুললুরে!
ধীরে ধীরে ধীরে মধুর অধরে
হাসি হাসি শ্যাম আয়লরে।
আজানুলম্বিত ভুজ প্রসারিয়া
হৃদয়মে মোয় বাঁধলরে।
সলাজে অন্তর করলু বদন
ফিরায়ে অধরে লাগলরে।
সঞ্জীবনী সুধা রুধিরে মিসল
ধমনী ভিতরে খেললরে।
টলল চরণ কাঁপল জঘন।
আমোদে নয়ন ঢাকলরে।
ভাঙ্গল স্বপন আধার নয়ন
বাঁশরি শ্রবণে পশলরে।
আকুল অন্তরে বিপিন মাঝারে
একাকিনী হম পশলুরে।
শিশির সলিলে দুকূল তিতল
কুশাঙ্কুরে পদ বিধলরে।
গভীর নিশীথ বেতসে বায়ই
ভূতলে কতই গিরইরে
আয়লু—এখন যমুনা শ্মশান
পেখতরে।
কুসুম চাপ অব বিষম দাপে
হৃদয়মে মোর হানতরে!

(উপবেশন)

(ক্ষণকাল পরে বংশী দেখিয়া)

আঃ—বাশরী এহি মদন-দুন্দুভি—
অমূল্য নিধি লভলুরে।

(আগ্রহের সহিত বংশী গ্রহণ)

তোয় যতনে রাখব অধরে লাগব

(বংশী চুম্বন)

হৃদয় মাঝারে রাখবরে!

(বংশী হৃদয়ে স্থাপন)

নিত নিত তোয় পূজব রে!
শিরমণি করি রাখবরে!

(বংশী মস্তকে স্থাপন)

(ললাট হইতে সিন্দুর ও চন্দন গ্রহণাস্তর বংশীতে অভিষেক এবং বংশী

সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক)

বংশীবর হম নমত তোহারে

কবরী-কুসুমে পূজব তোহারে।

(কবরী হইতে কুসুম উন্মোচন পূর্ব্বক বংশীতে প্রদান এবং করপুটে জানু পাতিয়া ও নয়ন মুদিয়া)

নমতি বংশী ত্রিভুবন-মোহন

ব্রজাঙ্গনা-মন-মোহিত-কারি!

নমতি বংশী তব প্রতি রন্ধ্রে

সপত মোহন স্বর-নিসারি!

নমতি বংশী ত্রিভুবন-দুর্লভ

শ্যাম সুন্দরাধর সরগ-নিবাসি!

নমতি বংশী মদন-দুন্দুভি

মদন-বিজয়-ঘোষণা-কারি!

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ এবং নিঃশব্দে বংশীর নিকট দণ্ডায়মান)

নমতি বংশী—দেহ এহি বর

পাই যেন হম বংশীধর!—(প্রণিপাত)

(বৃন্দার পুনঃ প্রবেশ)

বৃন্দা।—

উঠলো রাধে পেখলো নয়ন মেলি তুং

বংশী পূজই বংশী ধরে লভলি।

(রাধিকা বংশী গ্রহণ এবং হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া লজ্জায় সঙ্কুচিতা এবং মুখ ফিরাইয়া অধোমুখী)

শ্রীকৃষ্ণ।—আজ

সরগকি দুয়ার খুলল হমারি!

রাধে!

বিনা পরশনে কাহে সঙ্কুচিতা

ললিত লাজবতী লতা ভেয়ল?

তব যুগ অধর—সরগ অরগল

পুনরপি খুলই কহত হমারে

ভকত তৃষিত দাঁড়াই দুয়ারে!—

(রাধিকা অধোবদনে গমন—শ্রীকৃষ্ণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন)

বৃন্দা।—(রাধিকার প্রতি)

ফাটিবে বুক কহবে না মুখ

ভীখন হুতাশন জ্বলবে অন্তরে

মুখ ফুটি নাহি কহবে নাগরে!—

(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি)

ছলে ছলে চলবি সাথ নাহি ছোড়বি

নিষেধ করব নিষেধ না মানবি!—

(অগ্রে রাধিকা পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণ তৎপশ্চাৎ বৃন্দার প্রস্থান)

যবনিকা পতন।

ক্রমশঃ—

বেদ, পুরাণ ও তন্ত্র।

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই বৈদিক আচার প্রচলিত। তান্ত্রিক আচার কেবল বঙ্গ দেশেই বিশেষ আদরণীয়, অন্যত্র ইহা নিতান্ত বিরল-প্রচার। বৈদিক ক্রিয়া

কলাপের মধ্যে বঙ্গদেশে সামবেদী ক্রিয়া কলাপেরই বাহুল্য দৃষ্ট হয়। অন্য বেদের অনুষ্ঠান অল্প কেন তাহার উত্তর এই—অন্যবেদী দ্বিজাতির সংখ্যা নিতান্ত ন্যূন। সামবেদের অনুষ্ঠান অপেক্ষা পৌরাণিক ও তান্ত্রিক অনুষ্ঠান নিতান্ত বাহুল্য রূপে দেখা যায়। এক্ষণে বঙ্গদেশে স্ত্রীজাতি ও শূদ্রাদির ভাগই অধিক। স্ত্রী ও শূদ্রাদির বেদে অনধিকার বশতঃ উহারা বৈদিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয় না। তাহাতেই বৈদিক কার্য্যের অনুষ্ঠানের হ্রাস হইয়া আসিতেছে।

কোন্ সময় হইতে বৈদিক কার্য্যের অনুষ্ঠানের খর্ব্বতা হয় তাহার প্রমাণ সহজ নহে। তবে মহামহোপাধ্যায় মহর্ষি ভগবান্ ব্যাসদেব মনুষ্যগণের অবস্থা দিব্য চক্ষে দর্শন করিয়া দ্বাপর যুগের অবসানে যে সকল কথা কহিয়াছেন পাঠকগণ তাহা পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, কেন বৈদিক অনুষ্ঠানের হ্রাস হইয়াছে। তিনি কহেন যুগেযুগে মনুষ্যের শক্তি হ্রাস হইয়া আসিতেছে, তাহারা দুর্ম্মেধ এবং দুর্ভাগ্য হইয়া আসিতেছে। সেই হেতু বৈদিক কার্য্যের অনুষ্ঠানে মনুষ্যগণ নিতান্ত অপারগ হইয়াছে দেখিয়া তিনি (ব্যাসদেব) বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করেন। তদ্দ্বারা চারি প্রকারে যজ্ঞ সমাধা করিবার উপায় বিধান হয়।

বেদের প্রথমভাগ ঋক্, দ্বিতীয়ভাগ যজুঃ, তৃতীয় ভাগের নাম সাম, চতুর্থ ভাগের নাম অথর্ব্ব। ব্যাসদেবের মতে পুরাণ গুলি বেদের পঞ্চম ভাগ।

এক্ষণে দেখ কোন্‌টীকে মনুষ্যেরা ঋক্ বেদ বলিবেন এবং কোন্‌টীই সামবেদ ইত্যাদি। কিন্তু মীমাংসকগণ বেদকে ত্রয়ী নামে আখ্যা দেন, তদনুসারে অথর্ব্ব বেদ ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত। অথর্ব্ব নিজে পৃথক্ নহে। পুরাণ গুলিতে বৈদিক কার্য্যের অনুষ্ঠান প্রকরণ আছে বলিয়াই তাহাকে পঞ্চম বেদ শব্দে নির্দ্দেশ করা গিয়া থাকে। কিন্তু উহা বেদ হইতে নিতান্ত ভিন্ন পদার্থ।

যথা বেদের মন্ত্র ভাগের নাম ঋক্, যাহাতে লৌকিক অনুষ্ঠান আছে তাহার নাম যজুঃ, যাহা স্বর-সংযোগে পাঠ্য তাহার নাম সাম। অথর্ব্বের সেরূপ কিছু নামান্তর নাই। ইহার মন্ত্র গুলিও ঋকের অন্তর্গত, অনুষ্ঠান যজুর অন্তর্গত, গীত গুলি সাম বেদের অবান্তর ভাগ মাত্র। যথা ঋক্—মন্ত্রম্, যজুরনুষ্ঠানম্, সাম—গানং।

অথর্ব্ব বেদে এই তিনেরই সমাবেশ আছে।

মহর্ষি ব্যাসদেব বেদ বিভাগ করিয়া কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে শিক্ষা দিলেন এবং তাঁহারা কোন্ কোন্ দেশে উহা প্রচার করিলেন এবং কি রূপেই বা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইল, এই সমস্ত বিষয় জানিবার জন্য লোকের কৌতূহল জন্মিবার সম্ভাবনা, তদনুসারে ভাগবত পুরাণের লিখিত কতকগুলি বিষয় অদ্য এখানে উদ্ধার করা গেল। যথা—

ব্যাসদেবের পৈল নামক শিষ্য ঋক্ বেদ অভ্যাস করেন। জৈমিনি সাম-বেদের শিক্ষায় বিশেষ পাবদর্শী হন। বৈশম্পায়ন সমগ্র যজুর্ব্বেদ পাঠ করিয়া তাহার সমুদায় বিষয়ে অধিকারী হয়েন। সমস্ত ঋষি অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করেন। লোমহর্ষণ মুনি সমুদায় পুরাণ ও ইতিহাস জ্ঞাত হইয়াছিলেন। এই সকল ঋষিগণ নিজ নিজ শিক্ষিত বেদকে বিভাগ করিয়া এক এক বিষয় আপন আপন শিষ্যগণকে অভ্যাস করান। তাঁহাদিগের শিষ্যেরা গুরুর নিকট যেরূপে শিক্ষিত হইয়াছিল তদনুসারে শিষ্যগণের শক্তি অনুসারে শিক্ষিত বেদের শাখা বিশেষকে আবার বিভাগ করিয়া স্বীয় স্বীয় শিষ্যগণ মধ্যে খণ্ড খণ্ড রূপে প্রচার করেন। তদনুসারে ব্যাসদেবের নিকট হইতে প্রথমে বেদ চতুর্ধা বিভক্ত হয়, পরে বেদব্যাসের শিষ্য সন্ততি দ্বারা শাখা রূপে বিভক্ত হয়, তৎ-পরে প্রশিষ্য ও তচ্ছিষ্য দ্বারা প্রশাখাদি দ্বারা বিভক্ত হয়। এই রূপে ক্রমে সমগ্র বেদের চর্চ্চার হ্রাস হয়। ক্রমে বেদের শাখা প্রশাখার এক দেশমাত্রের আলো-চনা হইতে লাগিল। ইহাতেই সমগ্র বেদের আলোচনা রহিত হইয়া আসিতে লাগিল। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে আবার ব্যাস দেব একদিন লোকের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া জানিতে পারিলেন যে স্ত্রী ও শূদ্রাদি বেদে অনধি-কারী। তাহাদিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তিনি বেদের সার ভাগ সঙ্কলন পূর্ব্বক ভারত নামক ইতিহাস প্রস্তুত করিলেন; তদ্দ্বারা লোকে অল্পায়াসে ও সুখে ধর্ম্ম্য কর্ম্মের শ্রেয়ো লাভ করিতে লাগিল। তদবধি বেদের চর্চ্চা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। এক্ষণে লোকের বিশ্বাস জন্য আমরা ভাগবত পুরাণের ঐ অংশটী এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম যথা—

দ্বাপরে সমনুপ্রাপ্তে তৃতীয়যুগপর্য্যয়ে।
জাতঃ পরাশরাদ্যোগী বাসব্যাং কলয়া হরেঃ॥ ১৪

স কদাচিৎ সরস্বত্যাঃ উপস্পৃশ্য জলংশুচি।
বিবিক্ত এক আসীন উদিতে রবি-মণ্ডলে॥ ১৫

পরাবরজ্ঞঃ স ঋষিঃ কালেনাব্যক্তরংহসঃ।
যুগধর্ম্মব্যতিকরং প্রাপ্তং ভুবি যুগে যুগে॥ ১৬

ভৌতিকানাঞ্চ ভাবানাং শক্তিহ্রাসঞ্চ তৎ-কৃতম্।
অশ্রদ্দধানান্ নিঃসত্ত্বান্ দুর্মেধান্ হ্রসিতা-যুষঃ॥ ১৭

দুর্ভগান্ স জনান্ বীক্ষ্য মুনির্দিব্যেন চক্ষুষা।
সর্ব্ববর্ণাশ্রমাণাম্ যৎ দধ্যৌ হিতং অমোঘ-দৃক্॥ ১৮

চতুর্হোত্রং কর্ম্ম শুদ্ধং প্রজানাং বীক্ষ্য বৈদিকং।
ব্যদধাৎ যজ্ঞসন্তত্যৈ বেদমেকং চতু-র্বিধং॥ ১৯

ঋক্ যজুঃ সামাথর্ব্বাখ্যা বেদাশ্চত্বার উদ্ধৃতাঃ॥

তত্রর্গ্বেদধরঃপৈলঃ সামগো জৈমিনিঃ কবিঃ॥ ২০
বৈশম্পায়ন এবৈকো নিষ্ণাতো যজুষামুত॥
অথর্ব্বাঙ্গিরসামাসীৎ সমন্তুর্দারুণোমুনিঃ।২১
ইতিহাসপুরাণানাংপিতামে রোমহর্ষণঃ॥
ত এত ঋষযো বেদং স্বং স্বং ব্যস্যন্ননেকধা॥ ২২
শিষ্যৈঃ প্রশিষ্যৈস্তচ্ছিষ্যৈ র্বেদাস্তেশাখিনোহভবন্॥
ত এব বেদা দুর্ম্মেধৈর্ধার্য্যন্তে পুরুষৈর্যথা॥২৩
এবং চকার ভগবান্ ব্যাসঃ কৃপণবৎসলঃ॥
স্ত্রী-শূদ্র দ্বিজ-বন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা॥ ২৪
কর্ম্মশ্রেয়সি মূঢানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ।
ইতিভারতমাখ্যানং কৃপয়ামুনিনাকৃতম্॥২৫
ভাগবত পুরাণ।
১ম স্কন্দ। চতুর্থ অধ্যায়।

এখন দেখা যাউক পুরাণ অপেক্ষা বেদের চর্চ্চায় লোকের অনুরাগ কম হইল কেন। তাঁহার উত্তর এই—বেদ শিক্ষা করিতে গেলে অন্যান্য শাস্ত্রের সাহায্য আবশ্যক, যথন শিক্ষা কল্প, ব্যাকরণ ছন্দ, ঋষি ও স্বরাদি জানা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু পুরাণ শিক্ষায় কিঞ্চিৎ ব্যাকরণ জ্ঞান যোগ থাকিলেই হয়। না থাকিলেও ভাবার্থ জানিতে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। যেহেতু বেদের ভাষা অপেক্ষা পুরাণের ভাষা সহজ সুললিত এবং মার্জ্জিত। বেদ পাঠের অধিকারী ও অনধিকারীর ক্রম যেরূপ লেখা-আছে তদনুসারে বেদের তাৎপর্য্য ও স্বর সম্যক্‌রূপে না জানিলে যজমান হোতা, আচার্য্য শ্রোতা পর্য্যন্তর কর্ম্ম সিদ্ধি হয় না বরং বিপরীত ফল হয়। কিন্তু পুরাণ সে প্রকার নহে। সমাহিত চিত্তে পুরাণের বিষয় শ্রবণ করিলেই শ্রোতার সমস্ত ইষ্ট সিদ্ধি হয়। বক্তা স্বর্গগামী হন—যে ব্যক্তি ইহার অনুষ্ঠান করে সে ব্যক্তি পুত্র পৌত্রাদির সহিত অনন্ত কাল সুখ ভোগ করে। পুরাণে ইত্যাদি প্রকারে বিস্তর ফল শ্রুতি আছে। সেই ফল শ্রুতি গুলি লোকের মনোহারিণী।

ইহ জগতে মনোহর বাক্যই লোকের সুখপ্রদ ও সহজে তাহাতে আস্থা হয়। সুতরাং বেদের চর্চ্চা ক্রমশঃ লোপ হইতে লাগিল। যাহাতে যত ফলশ্রুতি অধিক, তাহার প্রচার তত অধিক। এবং যাহা যত সহজে বোধগম্য হয়, সেই রূপ ধর্ম্ম পদ্ধতি তত শীঘ্র তত সহজে তত অধিক প্রচার হইয়া থাকে ইহা লোক-প্রসিদ্ধ।

সে মৌলিক নিয়ম অনুসারে অন্যান্য বেদ অপেক্ষা সাম বেদের প্রচার অধিক। যেহেতু সাম বেদের ক্রিয়া কলাপ তত জটিল নহে। সাম বেদকে স্বরসংযোগে যথার্থরূপে সংগীত করিতে পারিলেই বেদের লিখিত ফল প্রাপ্তি বিষয়ে আর সংশয় থাকে না। সামবেদের দেবতা সূর্য্য (রবি), ইনি প্রত্যক্ষ বস্তু এবং অষ্টমূর্ত্তি স্বরূপ শিবের রূপান্তর মাত্র। শিবানীই সামবেদযুক্তা, সুতরাং শক্তির উপাসক মাত্রই সামবেদী। শক্তিকে ভজনা

করা সহজ। শক্তিই বেদমাতা গায়ত্রী।

যজুর্বেদের দেবতা বায়ু—এবং যজুর্ব্বেদের সাবিত্রীকে বৈষ্ণবীরূপে নির্দ্দেশ আছে। তদনুসারে যজুর্বেদীরা প্রায় বিষ্ণু-মন্ত্র-উপাসক। ঋক্‌বেদীদিগের মধ্যে অগ্নির উপাসক অধিক এবং শক্তির উপাসনাও দেখা যায়।

অগ্নির্বায়ুরবিভ্যস্ত এবং ব্রহ্মসনাতনং।
দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমৃক্ যজুঃ সামলক্ষণং॥

মনু। ২য়। ২৩ শ্লো—

বিশেষতঃ ভগবদ্‌গীতায় সামবেদের এত প্রশংসা যে লোকে সেই প্রশংসা পাঠ করিলেই ও তাহার জন-শ্রুতি দেখিলেই প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে সাম বেদকেই আশ্রয় করিতে প্রবৃত্ত হয়। যাহা ভগবদ্‌গীতায় লিখিত আছে তাহা শ্রীকৃষ্ণের নিজের উক্তি।

তিনি কহিতেছেন আমি বেদের মধ্যে সামবেদ, দেবতাগণের মধ্যে বাসব (ইন্দ্র) এবং ইন্দ্রিয় গণের মধ্যে মনঃ, জড় পদার্থের মধ্যে চৈতন্য, রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর, যক্ষ ও রাক্ষসগণের মধ্যে ধনপতি, বসুগণের মধ্যে অগ্নি এবং গিরি সমূহের মধ্যে সুমেরু। অর্থাৎ এই সকল সমান-জাতীয় বস্তুর মধ্যে যে বস্তু শ্রেষ্ঠ তৎসমস্তই আমাতে আছে। সুতরাং সামবেদ সমস্ত বেদের সার ভাগ। এই বিশ্বাসে অধিকাংশ লোকে সামবেদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। ভগবদ্‌গীতার বচন যথা—

বেদানাং সামবেদোস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাংমনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা॥ ২২
রুদ্রাণাংশঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাং॥
বসূনাংপাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহং॥ ২৩

৩৩ অ। ২২।

মৎস্য পুরাণে পার্ব্বণ কালে অর্থাৎ পিতৃযজ্ঞে কাহাদিগকে ভোজন করান নিতান্ত কর্ত্তব্য তাহার উপদেশ চ্ছলে ব্যাসদেব কহিয়াছেন যত্ন পূর্ব্বক সামস্বর-জ্ঞান-বিশিষ্ট পংক্তি-পাবন ব্রাহ্মণকে এবং সামগ ব্রহ্মচারীকে অগ্রে যত্ন পূর্ব্বক ভোজন করাইবে। অন্যবেদীদিগের মধ্যে যাঁহারা সাগ্নিক, স্নাতক অর্থাৎ সমগ্র বেদ পাঠানন্তর সমাবর্ত্তন স্নান করিয়া পরিশুদ্ধ হইয়াছেন, ষড়ঙ্গ বেদ উত্তম রূপে অবগত আছেন, তাঁহারাও সামবেদীর তুল্য। সুতরাং সামবেদ সকলের উপমান স্থলে আসিতেছে। মনুতেও লেখা আছে যে দেব কার্য্যের জন্য ঋক্‌বেদ প্রশস্ত, অর্থাৎ দেবগণই ঋক্‌বেদের দেবতা, মনুষ্যগণের সাংসারিক কার্য্যে যজুর্বেদ প্রসিদ্ধ। পিতৃ কার্য্যের জন্য সামবেদ প্রশস্ত। সেই হেতু সামবেদের পাঠানন্তর অন্য বেদ পাঠ করিবার আবশ্যকতা নাই। অর্থাৎ সামগীত শ্রবণানন্তর অন্য মন্ত্র ও শ্রুতি গুলির ধ্বনি শ্রুতি-সুখকর হয় না। এই কারণে সাম ধ্বনির পর

অন্য বেদের ধ্বনি অশুচি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। লোক ব্যবহারেও দেখা যায় তানলয়বিশুদ্ধ গীত শ্রবণানন্তর অতি সুমধুর বাক্যও আর তাদৃশ রূপে প্রীতি-প্রদ হয় না।

মৎস্য পুরাণের বচন দেখ এবং মনুর আদেশের সহিত মিলন কর। তাহা হইলেও দেখিতে পাইবে পিতৃগণ হইতে দেবাদির উৎপত্তি হইয়াছে এবং দেবতা-গণ হইতে সমস্ত স্থাবর জঙ্গমের উৎপত্তি। এই কারণে পিতৃগণ সকলের নিকট পূজ্য। যথা—

ঋষিভ্যঃ পিতরো জাতাঃ
পিতৃভ্যো দেবদানবাঃ।
দেবেভ্যস্তু জগৎসর্ব্বং
চরং স্থাবরমনুপূর্ব্বশঃ॥ মনু

ঋক্‌বেদো দেবদৈবত্যো।
যজুর্ব্বেদস্তু মানুষঃ।
সামবেদঃ স্মৃতঃ পিত্র্যঃ
তস্মাত্তস্যাশুচির্ধ্বনিঃ॥

মৎস্য পুরাণের প্রমাণ যথা—

পার্ব্বণে যে নিযোজ্যাস্ত তান্ শৃণুষ নরাধিপ।
পঞ্চাগ্নিঃ-স্নাতকাশ্চৈব ত্রিসুবর্ণে ষডঙ্গবিৎ॥

সামস্বরবিধিজ্ঞাশ্চ পংক্তি পাবন-পাবনাঃ।

সামগো-ব্রহ্মচারীচ দেবভক্তোথ ধর্ম্মবিৎ॥

এতে ভোজ্যা প্রযত্নেন বর্জ্জনীয়াঃ নিবোধনে।

ইতি মৎস্য পুরাণে ষোড়শ অধ্যায়ঃ—

পুরাণাদির বাহুল্যরূপে প্রচার হইলে বেদচর্চ্চা ক্রমশো অল্প হইতে লাগিল। স্ত্রী ও শূদ্রগণের জন্য যে পুরাণ সৃষ্ট হইয়াছিল উহা অজ্ঞ প্রাজ্ঞ ও মহর্ষিগণের আশ্রয় হইয়া উঠিল। এদিকে সৌতি, উগ্রশ্রবা, লোম হর্ষণ প্রভৃতি এরূপে পুরাণের ব্যাখ্যা ও কথা আরম্ভ করিলেন যে, তাহাতেই লোকে মুগ্ধ হইতে লাগিল ক্রমে ব্রত নিয়ম বহির্গত হইতে লাগিল। পুরাণের মতানুসারে ক্রমে সকলেই চলিতে আরম্ভ করিলেন।

স্মৃতি-সংগ্রাহকগণ পুরাণের বচন গুলি বেদবৎ মান্য করিয়া নিজ নিজ সং-গ্রহের দৃঢ়তা সংস্থাপন করিতে লাগিলেন॥ ক্রমে যখন ঐ সংগ্রহ গ্রন্থগুলি লোকের নিকট সমাদৃত হইতে আরম্ভ হইল, তখন পুরাণের প্রতি লোকের বিশ্বাস এক-বারে বদ্ধমূল হইয়া আসিল। তদবধি পুরাণে মত সকল অবিসংবাদী রূপে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া উঠিল।

এদিকে লোকের বিশ্বাস শ্রদ্ধা ও ভক্তি সকলই পুরাণে আবদ্ধ হইল। ধর্ম্মকার্য্য মাত্রেই পুরাণ পাঠের প্রাধান্য হইল। শ্রাদ্ধে মহাভারতের বিরাট পর্ব্বের পাঠ আরম্ভ হইল। সামান্য কার্য্যেও পুরাণের আদরে বৈদিক অনুষ্ঠান সহজেই লোপ হইতে আরম্ভ হইল। এমন কি একের উদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ পর্য্যন্তেও বৈদিক মন্ত্র অপেক্ষা পুরাণের বচনের প্রতিই লোকের বিশেষ আস্থা হইতে লাগিল। তাহার প্রামাণ্য ব্যবস্থাপন জন্য আমাদিগকে মহাভারতীয়

বিরাট্ পর্ব্বের বচন উদ্ধার করিতে হইল।

যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ।
স্কন্ধোর্জ্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখা
মাদ্রীসুতো পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং-
কৃষ্ণঃ ইত্যাদি।

দুর্য্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধঃ
কর্ণঃ
শকুনিস্তস্য শাখা মূলং ধৃতরাষ্ট্রোমনীষী
ইত্যাদি।

সপ্ত ব্যাধা দশার্ণেষু মৃগকালঞ্জরে গিরৌ-
চক্রবাকাঃ সরদ্বীপে হংসাঃ সরসি মানসে
তেঽভিজাতা কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
ইত্যাদি।

এই তিনটী মন্ত্রে মহাভারতীয় সমস্ত কথা সমাপ্ত হইয়াছে। অধুনা শ্রাদ্ধে যে ইতিহাস পাঠ হয় তাহা এই।

পাঠক তুমি এখন দেখ যে পিতৃকার্য্যে সামগান হইত, সেই পিতৃকার্য্যে এক্ষণে কেবল মহাভারতের তিনটী শ্লোক মাত্র পাঠ হয়। তাহাতেই পিতৃলোকের তৃপ্তি ও শ্রাদ্ধ-কর্ত্তার আনৃণ্য লাভ হইয়া থাকে, যখন অনায়াসে ও অল্প কথায় মনোরথ সিদ্ধ হইতে পারিল তখন বৃথা অধিক আড়ম্বরের সহিত সামগানের আবশ্যকতা কি! সে গানও আবার সহজ নহে, তাহা উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিৎ—এই তিন স্বর এবং ষড়জ, মধ্যম, ঋষভ, গান্ধার ধৈবত ও পঞ্চম মিলন পূর্ব্বক সংগীত করিতে হয়। কিন্তু বিরাট পর্ব্বের বচন আবৃত্তি করিলেই চলে। এবং এই বচন গুলি স্ত্রী শূদ্রাদির নিকটও অনায়াসে বলা যায়। সুতরাং ইহা সর্ব্বত্র সমান রূপে সমাদরে স্থান প্রাপ্ত হইল। ইহাই বেদচর্চ্চার হ্রাসের একটী প্রধান কারণ।

পাঠক তুমি এখন জিজ্ঞাসা করিতে পার—"পুরাণ" ত' এইরূপেই সর্ব্বোচ্চ আসন অধিকার করিল, তৎপরে কি প্রকারে পুরাণকে স্থানভ্রষ্ট করিয়া তান্ত্রিক দীক্ষা বেদের আসন অধিকার করিল? তাহা তুমি জানিতে চাহ, তাহা এক প্রস্তাবে বলিতে গেলে এপ্রস্তাব নিতান্ত দীর্ঘ হয়। এবং সংক্ষেপে বলিতে গেলেও সহজ হইবার সম্ভব নহে। এই কারণে প্রস্তাবান্তরে বলিবার ইচ্ছা থাকিল। অদ্য এই খানেই বিশ্রাম-সুখ লাভ করুন।

শ্রীলাল মোহন শর্ম্মা।

ম্যাট্‌সিনি ও নব্য ইতালী।

(সপ্তম প্রবন্ধ।)

ম্যাট্‌সিনি "নব্য ইতালী" নামক পত্রিকায় অনেক গুলি প্রস্তাব লিখেন; তন্মধ্যে প্রথম কয়েকটী বৈদেশিকদিগের তাদৃশ কৌতূহলোদ্দীপক নয় বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।

ইহার পর তিনি—ইতালীর স্বাধীনতার

পরিণতি যে কারণ-পরম্পরায় এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত প্রতিহত হইয়া আসিয়াছে—তদ্বিষয়ে দুইটী সুদীর্ঘ ও সুস্পষ্ট প্রস্তাব লিখেন। ম্যাট্সিনির রাজনৈতিক জীবনের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বিংশতি বৎসরে অভ্যুত্থিত বিপ্লবসকল যে যে কারণে পর্য্যুদস্ত হইয়াছিল, এই প্রস্তাবদ্বয়ে সেই কারণমালা সাবধানে সমালোচিত হইয়াছে। তাঁহার মতে অভ্যুত্থানের ব্যর্থতার প্রধান কারণ—অধিনেতৃগণের ভ্রম ও অক্ষমতা, ইতালীয় জাতির বীরত্ব ও স্বজাতিপ্রেমের অভাব নহে। কারণ প্রত্যেক অভ্যুত্থানই সর্ব্বপ্রথমে জাতীয় আকার ধারণ করিয়াছিল।

ইতালীয় জাতির সহজজ্ঞান সর্ব্বপ্রথমে ইতালীয়ক্ষেত্রে ইতালীয় পতাকাই উড্ডীন করিয়াছিল; এবং বৈদেশিকদিগেকে ইতালীক্ষেত্র হইতে বিদূরিত করিবার জন্য যদিও জাতীয় একতা (Unity) সংসাধিত করিতে না পারুক, অন্তত জাতীয় সম্মিলন (Union) সংসাধনের জন্য একাগ্র হইয়াছিল।

অধিনয়নকার্য্যের বিশৃঙ্খলা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অভ্যুত্থানের পতনের কারণ। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই অধিনয়ন কার্য্য অক্ষম ও বিশ্বাসহীন অধিনেতৃগণের হস্তেই পতিত হয়। তাঁহারা জনসাধারণের অন্তর্নিগূহিত বলবতী হৃদয়াকাঙ্ক্ষার মর্ম্মবোধে অক্ষম এবং ইষ্টসাধনে জীবন উৎসর্গীকৃত করণে ভীতসাহস ছিলেন। তাঁহাদিগের সাহসও ছিল না এবং আপনাদিগের উপর বা জনসাধারণের উপর বিশ্বাসও ছিল না বলিয়াই তাঁহারা বৈদেশিক শক্তি ও কূট মন্ত্রণাজালের উপর তাঁহাদিগের বিজয়াশা সন্ন্যস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে সেই বৈদেশিক শক্তি ও কূট মন্ত্রণাজালই তাঁহাদিগকে পদে পদে পরিত্যক্ত ও শত্রুহস্তে সমর্পিত করে।

ঔদার্য্য ও বীরত্বের সহিত আরব্ধ এত গুলি জাতীয় অভ্যুত্থানের পতনের পরিণাম শেষে এই দাঁড়াইল যে ইতালীয় হৃদয়ে গভীর হতাশতা ও নিরুৎসাহতার ভাব দৃঢ় রূপে অঙ্কিত হইল। এবং তাহার বিষময় ফলস্বরূপ এরূপ কার্য্যবিমুখতা জন্মিল যে তাহা হইতে ইতালীকে উদ্ধৃত করিতে না পারিলে ইতালীর আর কোন আশা রহিল না।

যাঁহারা ভবিষ্য অভ্যুত্থানের অধিনায়ক হইবেন তাঁহাদিগকে জাতীয় শক্তির উপরই বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে এবং জনসাধারণকে অস্ত্রধারণে উত্তেজিত করিতে হইবে। তাঁহাদিগের মনে এই ধারণা চাই যে বিপ্লবের কৃতকার্য্যতা আক্রমণেই; এবং বৈদেশিক অস্ত্রে শাসিত দেশে যুদ্ধ অভ্যুত্থানের প্রতিশব্দমাত্র। সুতরাং যুদ্ধ যখন অনিবার্য্য, তখন ইহা এরূপ প্রণালীতে আরব্ধ করা চাই, যে যত দিন ইতালীয় ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা বিকীর্ণ না হইবে ততদিন যেন শান্তি বা সন্ধি অসম্ভাব্য হয়।

জানিও যদি এই জাতীয় অভ্যুত্থান জাতি সাধারণের জয় শব্দে উদ্বোধিত না হয়, তাহা হইলে ইহার পতন অনিবার্য্য।

জাতীয় অভ্যুত্থানের পতনের আর একটী কারণ—অধিনেতৃগণের অবিচলিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ বিশ্বাসের অভাব। বর্ত্তমান অবস্থার বিপর্য্যাস সাধন—যে শৃঙ্খলে ইতালীর জাতীয় চরণ আবদ্ধ রহিয়াছে, তাহার দ্বিধা বিচ্ছিন্ন করণ—এবিষয়ে তাঁহাদিগের মধ্যে মতদ্বৈধ নাই বটে, কিন্তু তাহার পর কি করিতে হইবে তদ্বিষয়ে তাঁহারা অনিশ্চিত, সন্দিগ্ধ ও নানামতে বিভক্ত। কিন্তু যাঁহারা প্রতিষ্ঠাপিত সমাজের শৃঙ্খল ছেদ করিয়া জনসাধারণকে উন্নতি-মার্গে অগ্রসর করিতে চান, তাঁহাদিগের উচিত অগ্রগামী হইয়া অগ্রবর্ত্তী পথে আলোক বিকীর্ণ করেন।

ব্যক্তি-বিশেষের আধিপত্য, বা ব্যক্তি-বিশেষের রাজত্বের কাল অতীত হইয়াছে; এক্ষণে সংঘাতমানবযুগ আবির্ভূত হইয়াছে। সংহিতমানবের শক্তি জগতে অনিবার্য্য। **জনসাধারণ কর্ত্তৃক জনসাধারণের জন্যই বিপ্লব আরব্ধ ও সংসাধিত করিতে হইবে**—ইহাই নব্য ইতালীসমাজের মূলমন্ত্র; ইহাই নব্য ইতালীসমাজের বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম, প্রীতি ও চিন্তা, লক্ষ্য ও কার্য্য।

ইতালীয় জনসাধারণ বহুদিন হইতে অসংখ্য অত্যাচার, [illegible] কষ্ট সহ্য করিতেছে; যথেচ্ছাচা[illegible]শক্তি এবং গর্ব্বিত ও ঘৃণিত উচ্চ[illegible] দ্বারা প্রতিদিন পদদলিত হইতেছে; যদি তাহাদিগকে অস্ত্রধারণে উত্তেজিত করিতে হয় তবে স্পষ্টাক্ষরে তাহাদিগের নিকট বলিতে হইবে যদি যুদ্ধে জয়লাভ হয় তাহা হইলে অত্যাচারের এই দুইটী মূলই উন্মূলিত হইবে।

তাহাদিগকে যুদ্ধে উত্তেজিত করিতে হইলে আর একটী কার্য্য করিতে হইবে। ইতালীয় অতীত অবদান-পরম্পরা—মাসানিলো, পারিস, ব্রসেল্‌স, ওয়ার্‌সা প্রভৃতি নগরের আধুনিক যুদ্ধ সকল—তাহাদিগের স্মরণপথে অবতারিত করিতে হইবে। তাহাদিগকে বলিতে হইবে "যদি তোমরা এই সকল কীর্ত্তিকলাপের অনুকরণ করিতে চাও, তবে অস্ত্রের বল ধারণ কর। ঈশ্বর তোমাদিগের মঙ্গল বিধান করিবেন। উৎপীড়িতদিগের সহিতই ঈশ্বরের সহানুভূতি। যখন দেখিবে এই উদ্দীপনাবাক্যে ইতালীয় ললাট স্ফুরিত হইতেছে, সাগর-হৃদয়ের ন্যায় ইতালীয় হৃদয় তরঙ্গায়িত হইতেছে, তখনই অপ্রতিহত [illegible]সমরশীর্ষে প্রধাবিত হইবে এবং লম্বার্ডী ক্ষেত্রের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিবে—

যাহাদিগ কর্ত্তৃক তোমাদিগের দাসত্ব-নিশা বর্দ্ধিতায়তন হইতেছে, ঐ দেখ সেই জাতি অদূরে দণ্ডায়মান। তাহার পর আল্‌পসের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিবে—এই আমাদিগের স্বাভাবিকী সীমা—যে অষ্ট্রিয়া সেই সীমা অতিক্রম করিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কর।

" ঈশ্বর জনসাধারণের মঙ্গল বিধান

করিবেন। জনসাধারণ তাঁহারই অনুগৃহীত এবং তৎকর্তৃকই তদীয় বিশ্বব্যাপী প্রেমের উদ্বোষণ কার্য্যে নিয়োজিত"।

"ভবিষ্য বিপ্লব সকল জনসাধারণের জন্য জনসাধারণ কর্তৃকই অনুষ্ঠিত হইবে"—এই আধুনিক মতের প্রবণতা সাধারণ তন্ত্রেরই দিকে। এই জনসাধারণকে সাধারণ-তন্ত্রের মূল সূত্রে দীক্ষিত করাই নব্য ইতালীসমাজের প্রধান লক্ষ্য। ম্যাট্‌সিনির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে সাধারণ তন্ত্র ব্যতীত ইতালীর একতা ও স্বাধীনতা কখনই সংসাধিত হইবে না।

ইউরোপ নানা আকারে রাজতন্ত্রের পরীক্ষা করিয়াছে; কিন্তু কোন প্রকার রাজতন্ত্রেই শান্তি পাইতেছে না। এক্ষণে সাধারণতন্ত্র ব্যতীত ইউরোপের উন্নতি ও শান্তির কোনও সম্ভাবনা নাই। নেপোলিয়ান্ সেণ্ট্‌হেলেনায় বসিয়া বলিয়াছিলেন যে "চল্লিশ বৎসরের মধ্যে ইউরোপের সর্ব্বত্র হয় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাপিত হইবে অথবা ইহা কসাকদিগের অধীন হইবে" ম্যাট্‌সিনির মুখ হইতে নেপোলিয়ানের সেই বাক্য সর্ব্বদা উচ্চারিত হইত।

সাধারণতন্ত্রের প্রতি লোকের যে বিদ্বেষ ও ভয় আছে তাহার কারণ প্রথম ফরাসী বিপ্লবের ভীষণ রণোন্মাদ। কিন্তু লোকের জানা উচিত যে তখন বস্তুতঃ ফ্রান্সে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাপনের চেষ্টামাত্র হইতেছিল—সাধারণতন্ত্রানুকূল সমরমাত্র আরব্ধ হইয়াছিল—সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাপিত হয় নাই।

লোকে সাধারণতন্ত্রের নামেই কম্পিত-কলেবর হয়। কিন্তু সাধারণ-তন্ত্র কি উপাদানে গঠিত, যদি একবার ভাবিয়া দেখে, তাহা হইলে ইহার গ্রহণে কখনই অস্বীকৃত হইবে না।

জাতীয় শাসন ভারের জাতীয় হস্তে পরিরক্ষণের নামই সাধারণতন্ত্রপ্রতিষ্ঠাপন। যে বিধিমালা দ্বারা এই শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে তাহা জাতীয় ইচ্ছা দ্বারা সংগঠিত ও নিয়মিত। এই শাসন প্রণালীতে জাতীয় প্রভুশক্তিই সর্ব্বোচ্চ নিয়ামক শক্তি ও সর্ব্বপ্রকার প্রভুতার কেন্দ্র ও মূল বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

ইহা এরূপ একপ্রকার জাতীয়সম্মিলন যথায় সংখ্যার শক্তি অনুসারেই প্রত্যেক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; যথায় সর্ব্ব-প্রকার মর্য্যাদা (Privilege) আইনে অস্বীকৃত হয় এবং কার্য্যের দোষ গুণ অনুসারেই দণ্ড ও পুরস্কার প্রদত্ত হয়; যথায় সর্ব্ব-প্রকার কর, সর্ব্বপ্রকার উপায়ন এবং শিল্প ও বাণিজ্যের উপর সর্ব্বপ্রকার শুল্ক ন্যূনতম পরিমাণে নির্দ্ধারিত হয়; যথায় সাধারণ-কর্ম্মচারিগণ সংখ্যায় স্বল্পতম ও বেতন-পরিমাণে পরিমিততম; যথায় সাধারণ অনুষ্ঠান মাত্রেরই প্রধান লক্ষ্য সংখ্যায় অধিকতম অথচ অবস্থায় দরিদ্রতম শ্রেণীর উপকার সাধন।

"নব্য ইতালী" পত্রিকায় ম্যাট্‌সিনি-লিখিত পরবর্ত্তী দুইটী প্রস্তাবের মধ্যে

একটী নিয়োপলিতান্ গবর্ণমেণ্টের অত্যাচার-বিষয়ক অপরটি "উনবিংশ, শতাব্দীর কবিবৃন্দের প্রতি প্রযুক্ত চিন্তামালা" নামক। ম্যাটসিনি নেপোলিয়ান্ বোনাপার্টের পুত্র ডিউক অব রায়েশ্‌ষ্টাডের মৃত্যুতে তাৎকালিক কবিবৃন্দের তুষ্টীম্ভাব দেখিয়া উত্তেজিত হইয়া কবিত্ব-পূর্ণ এই প্রস্তাবটি লিখেন। আমরা যতদূর সামর্থ্য ইহার মর্ম্মার্থ নিম্নে প্রদান করিলামঃ—

১৮১১ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের বিংশ দিবসে এই রাজকুমার ভূমিষ্ঠ হন। সে দিন পারীনগরী কামানের গভীর শব্দে নিদ্রোত্থিত হয়।

তৎকালে পারীনগরী জগতের আদর্শ-রূপিণী ছিল; তখন ফরাসি পতাকার আধুননে জগৎ-হৃদয় বিকম্পিত হইত, এবং তাহার আহ্বানে ফরাশি হৃদয় সম্মান ও গৌরব লালসায় উদ্দীপিত হইত।

কুমারের জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণে অধীর হইয়া প্রজাবৃন্দ পারীনগরীর রাজপথ সকল অবরুদ্ধপ্রায় করিয়া তুলিল। এই সংবাদে কত ইচ্ছা কত আশা তাড়িত বেগে তাহাদিগের শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হইল। তাহারা সেই একাধিক শত তোপ-ধ্বনি একটি একটি করিয়া গুণিতে লাগিল— যেন সেই তোপধ্বনিতে ফ্রান্সের অদৃষ্ট নির্ভর করিতেছে। অবশেষে যেমন সেই একাধিক শততম তোপধ্বনি সতৃষ্ণ প্রজাবৃন্দের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল, অমনি এই বিশ্বব্যাপী জয়ধ্বনি ভূতল বিদারিয়া গগণে উত্থিত হইল—

"জয় নেপোলিয়ানের জয়! জয় বিজয়লক্ষ্মীর প্রেমাস্পদের জয়! আনন্দ ও শান্তি ফ্রান্সের সর্ব্বত্র বিরাজ করুক। ফ্রান্সের অধিনায়কের অদ্য একটি নব-কুমার জন্মিয়াছে।"

আর সেই ফরাশিনায়ক স্বয়ং কুমারের দোলার পার্শ্বে দণ্ডায়মান; লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার অভিবাদন ও জয়োদ্ঘোষণ করিতেছে; তাঁহার মুখমণ্ডলে বিজয়-স্ফূর্ত্তি দেদীপ্যমান রহিয়াছে; এবং বর্ত্তমানের ন্যায় ভবিষ্যৎ তাঁহার নিকট তৃণবৎ প্রতীত হইতেছে।

সেই এক দিন আর এই এক দিন! একাধিক বিংশতি বৎসর মাত্র অতীত হইয়াছে! আজ ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ২শরা জুলাই।

আজ গাত্রে অষ্ট্রিয় পরিচ্ছদ, ললাটে গভীর চিন্তার রেখা, হৃদয়ে মর্ম্মভেদী যাতনা, "নেপোলিয়ান" নামের গুরুত্বে চূর্ণীকৃত ও বিশী[illegible] এই অবস্থায় ফরাশি-যুবরাজ স্কীন্‌ব্রন্ প্রাসাদে মৃত্যু-শয্যায় শয়ান!

মরণোন্মুখ রাজকুমারের মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে একটি সমগ্র জগৎ, কিন্তু বাহিরে অসীম শূন্য। যে সকল পরিচারক ও বন্ধু বান্ধবেরা তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস অপেক্ষা করিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিয়াছিল, তাহারা যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেছিল তাহা তাঁহার জাতীয় ভাষা নহে— যে পতাকা তাঁহার নয়ন-সমক্ষে দুর্গোপরি তরঙ্গায়িত হইতেছিল তাহা সেই ফরাসী পতাকা নয়, যে পতাকা একদিন তদীয়

পিতার আদেশে অষ্ট্রিয় রাজপ্রাসাদের ও উপর সগর্ব্বে ক্রীড়া করিয়াছিল!

বিখ্যাত ২০শে মার্চের শিশু আজ ধরাশায়ী! জন্মদিনে অসীম সাম্রাজ্যের অধীশ্বরের পুত্র—যাঁহার প্রথম ক্রন্দনে গগণ ভেদিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের আনন্দ-ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল—আজ অনাদরে অপমানে মৃত্যু শয্যায় শয়ান! পিতৃ সম্বন্ধিনী অমর গৌরব রশ্মিমালার ছায়া তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রতিবিম্বিত। তিনি তাহার ঔজ্জ্বল্যে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই মৃত্যু কালেও—গৌরব, সাম্রাজ্য, ভ্রষ্ট-লব্ধ মুকুট—এই সমস্ত গভীর চিন্তা অনিবার্য্য বেগে যুগপৎ তাঁহার মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার নির্ব্বাণোন্মুখ হৃদয় বহ্নিকে সহসা উদ্দীপিত ও পরক্ষণেই নির্ব্বাপিত করিল। তাঁহার অন্তর্নিগূহিত হৃদয়বহ্নিতে কেহই সান্ত্বনা-বারি প্রদান করিল না। প্রলাপোদ্দীরিত তদীয় মুখোচ্চারিত "যুদ্ধ" "[illegible]" শব্দ কেহই প্রতিধ্বনি দ্বারা সম্মানিত করিল না। অদ্ভুত প্রভুশক্তি-সম্পন্ন মহান্ পুরুষের সন্ততি এইরূপে অজ্ঞাত ভাবে মানব লীলা সম্বরণ করিলেন।

এই অদ্ভুত রাজকুমারের জন্ম ও মৃত্যু—গভীর কবিত্ব শক্তির অনুকূল দুইটী প্রকাণ্ড যুগ।

অবিশ্রান্ত কার্য্য, অবিশ্রান্ত আন্দোলন, ধারাবাহিক আনন্দ, এবং মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় খরতর প্রভুশক্তি ও উজ্জ্বলতর বিজয়-পরম্পরায় যে কবিত্ব, প্রথম যুগের সেই কবিত্ব; আর অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের ন্যায় গম্ভীর বিষণ্ণ এবং নিস্তব্ধ আভ্যন্তরীণ চিন্তায় যে কবিত্ব, দ্বিতীয় যুগের সেই কবিত্ব। বিশ্বাস ও বিজয়ে যে কবিত্ব, প্রথম যুগে সেই কবিত্ব; অসীম মহত্ত্বের ধ্বংসে যে কবিত্ব, দ্বিতীয় যুগে সেই কবিত্ব। একটী বর্ত্তমান বিষয়ক, অপরটী অতীত-বিষয়ক। ম্যারেঙ্গো, পিরামীড্‌স, ওয়েগ্রাম এবং অষ্টারলিট্‌স প্রভৃতির যে সকল প্রকাণ্ড সমরে বিজয়-লক্ষ্মী নেপোলিয়নের অঙ্কশায়িনী হন, প্রথম যুগ সেই সমর নিচয়ের কিরণ-মালায় উদ্ভাসিত; এবং মস্‌কাউ, ওয়াটালু ও সেণ্টহেলেনা প্রভৃতি যে সকল স্থল নেপোলিয়ানের অধঃপতনের সাক্ষীভূত, দ্বিতীয় যুগ সেই সকল স্থলের ভীষণ স্মৃতিতে তমসাচ্ছন্ন। একটী উদ্দীপনাপূর্ণ, অপরটী শোকোদ্দীপক। একটী জীবন-বিষয়ক, অপরটী মৃত্যু-বিষয়ক।

যে ব্যক্তিগত চরম মহত্ত্বের নিকট একদিন সমস্ত ইউরোপ নতশির ছিল, সেই ব্যক্তিগত চরম মহত্ত্বের একমাত্র প্রতিনিধির মৃত্যুতে কেন আজ ইউরোপ এত উদাসীন? কেন আজ এই উজ্জ্বল তারকার অন্তর্ধানে—এই প্রকাণ্ড ব্যক্তিগত মহত্ত্বরূপ ভাবের জগৎ হইতে অপুনরাগমনের নিমিত্ত তিরোধানে—ইউরোপীয় কবিবৃন্দের এরূপ তুষ্ণীম্ভাব? ব্যক্তিগত মহত্ত্বের চরম দৃষ্টান্তস্থল যে চতুর্দ্দশ লুই, দশম চার্লস ও প্রথম নেপোলিয়ন্ প্রভৃতির নিকট আজ দুই শতাব্দীকাল সমস্ত

ইউরোপ লুণ্ঠিত-শির ছিল, সেই ব্যক্তিগত মহত্বের শেষ স্ফুলিঙ্গের নির্ব্বাণে কেন আজ ইউরোপের এত ঔদাসীন্য?

সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফরাশি কবি এই প্রকাণ্ড ঘটনাবিষয়ে দুইটী চরণ ছন্দোবদ্ধ করিতে পারেন নাই। সম্পাদকেরা এই মৃত্যু উপলক্ষ করিয়া একটী গুরুতর আন্দোলন উত্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের রচনায় প্রবল হৃদয়োচ্ছ্বাস বা গভীর শোকের কোনও চিহ্ন দৃষ্ট হইল না। বরং তাঁহাদিগের রচনায় এই বিস্ময়ভাব পরিব্যক্ত ছিল যে তাঁহারা যেরূপ আশা করিয়াছিলেন আপনাদিগকে ততদূর উদ্বেলিত করিতে পারেন নাই।

কুমারের জন্মদিনের দোলা হইতে তদীয় সমাধি-মন্দিরের পথ একাধিক বিংশতি বৎসর মাত্র।

কিন্তু এই একাধিক বিংশতি বৎসর যে সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছে, পূর্ব্বে কখন এক শতাব্দী তাহা করে নাই।

কুমারের জন্মদিনের এক বৎসর পরে রুসিয়া হইতে নেপোলিয়নের পলায়ন, তাহার পর বৎসর জর্ম্মাণীতে লৌকিক অভ্যুত্থান, এবং তাহার পর বৎসর নেপোলিয়ান্ এল্‌বায় নির্ব্বাসিত। তৎপরে অদ্ভুত উপায়ে নেপোলিয়ানের প্রত্যাগমন এবং অবিচলিত-বিশ্বাস জনসাধারণের অনুগ্রহে সিংহাসন পুনঃ প্রাপ্তি। তাহার পর ওয়াটার্ল সমরে পরাজয় ও সেণ্টহেলেনা দ্বীপে নির্ব্বাসন। এ সকলের পর স্পেনিস্ বিপ্লব, গ্রীস্ ও ইতালীর ক্রমিক অভ্যুত্থান, পারীনগরীর ত্রৈদিবসিক বিপ্লব এবং ব্রসেল্‌স ও ওয়ার্সার সেই সকল ভীষণ দুর্দ্দিন; কত কত রাজবংশ বিধ্বস্ত, কত কত রাজা ইউরোপে নির্ব্বাসিত পরিব্রাজক; শ্রেষ্ঠতন্ত্র ভাবের ইংলণ্ডেও মূলোৎপাটন; এবং সাধারণতান্ত্রিক ভাবের জর্ম্মাণীতেও সবিশেষ উদ্দীপন।

এই সমস্ত ঘটনা সত্ত্বেও কেন আজ কবিবৃন্দের বীণা নেপোলিয়ন্-তনয়ের সমাধির নিকট নীরব?

ইহা এখন হইতে আর এক তানে বাজিবে। বিগত একাধিক বিংশতি বৎসরের ঘটনা-স্রোতে ব্যক্তি-বিশেষের নাম এবং অবিমিশ্রিত জিগীষা ও যশোলিপ্সা ভাসিয়া গিয়াছে। ব্যক্তিগত যুগের পরিবর্ত্তে এক্ষণে জাতীয় যুগ প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। কবিবৃন্দের বীণা এখন হইতে আর ব্যক্তি-বিশেষের যশোগান করিবে না। এখন হইতে জাতীয় সংগীত - জন-সাধারণের যশোগানই—ইহার লক্ষ্য হইবে। এই জন্যই নেপোলিয়ন্-তনয়ের মৃত্যুতে ইহা নীরব। অতীত সঙ্কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া এখন ইহা ভীষণ ও প্রকাণ্ড ভবিষ্যতের সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিবে। ভবিষ্যৎই এখন সকলের চিন্তা ও অভিলাষের বিষয়ীভূত; অনন্ত ভবিষ্যৎ—সাগরের ন্যায় তরঙ্গ বিস্তার পূর্ব্বক আগ্নেয় গিরির ন্যায় ধাতু-নিস্রব নির্গত করিয়া, দ্রুতপদে ও অনিবার্য্য বেগে আসিয়া মানব-মণ্ডলীর উপর অদ্ভুত শক্তি প্রকাশ করিতেছে। ইহার আগমনে বিলয়োন্মুখ জাতিসকল

আবার উঠিতেছে, বিচ্ছিন্ন জাতিসকল পুনরায় মিলিতেছে; ব্যক্তি-পরম্পরা প্রকাণ্ড মানব-গিরির আরোহণোপযোগিনী সোপান-পরম্পরায় পরিণত হইতেছে।

নেপোলিয়ন্ ও বাইরন্—ব্যক্তিগত যুগের দুই প্রকাণ্ড বীর, দুই প্রকাণ্ড অধিনায়ক। ইহাঁদিগের আবির্ভাবেই ব্যক্তিগত যুগ পরিণতির চরম শিখরে আরোহণ করে, আবার ইহাঁদিগের অস্ত-গমনের সহিতই ইহা অস্তমিত হয়। এক জন সাংগ্রামিক রাজ্যের অধীশ্বর; আর এক জন কল্পনা-রাজ্যের অধিপতি। এক জন কার্য্যবিষয়ক কবিত্বের, আর এক জন চিন্তাবিষয়ক কবিত্বের পারদর্শী।

এক জন এক হস্তে নরবারিপ্লাবিত দণ্ড-বিধি ও অন্য হস্তে অসি ধারণ পূর্ব্বক, জাতিবৈষম্য উপেক্ষিত ও পদদলিত করিয়া, একই সংস্কারমালায় ও একই শৃঙ্খলদামে ইউরোপীয় জাতি সমূহকে আবদ্ধ করিতেছেন; এবং তাহাদিগের রাজনৈতিক অবস্থাকে একীকৃত ও তাহা-দিগকে এক সম্মিলন সূত্রে গ্রথিত করিতেছেন। দেখিলে বোধ হয় যেন সভ্যতার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ভবিষ্যতের সংগঠনের নিমিত্ত ইহাঁকে দ্বিতীয় আটিলার ন্যায় ইউরোপীয় একতার প্রচারক করিয়া পাঠা-ইয়াছেন। এক বার ভাবিয়া দেখিলে বোধ হইবে সংহতি যুগের (Epoch of association) মূল ভিত্তি দৃঢ়তর রূপে সন্নাস্ত করিবার জন্যই যেন বিধাতা ইউ-রোপীয় জাতিসমূহকে পূর্ব্ব হইতেই বল-পূর্ব্বক একতাসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছেন; "এক দিন তোমরা যেমন দাসত্বের বোঝা একত্র বহন করিয়া আসিয়াছ, এখন সেইরূপ একত্র এক সময়েই ব্যক্তি-গত ও জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করিবে" ইউরোপীয় জাতি সমূহকে এই নব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্যই যেন বিধাতা নেপোলিয়ান্‌কে জগতে প্রেরণ করিয়া-ছেন।

এক্ষণে সে সময় আসিয়াছে, যখন লোকে আপনাদিগের শক্তি বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে; যখন ইউরোপ জানিতে পারি-য়াছে যে ব্যক্তি-বিশেষের শক্তিনিরপেক্ষ হইয়া উন্নতি-মার্গে অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে। যে দিন জাতিনিচয় আপনাদিগের কার্য্য বুঝিতে শিখিয়াছে, সেই দিনই নেপোলিয়নের কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে।

সেই দিন হইতেই নেপোলিয়নের পরাজয় আরম্ভ হয়। সেই জন্যই তাঁহার অবরোহণ ও পতনের বেগ, তাঁহার অভ্যুদয় ও আরোহণের বেগ অপেক্ষা দ্রুততর ও ভীষণতর হয়। বোধ হইল যেন ভবিষ্য পুরুষ-পরম্পরার সৌকর্য্যার্থে কোন ঐশী শক্তি দ্বারা তিনি ইউরোপক্ষেত্র হইতে সহসা অপসারিত হইলেন।

আত্‌লান্তিক-বক্ষে অবস্থিত হইয়া তিনি চিন্তানলে আত্মভস্মীকরণ আরম্ভ করিলেন। বোধ হইল যেন লোকতা-ন্ত্রিক মতের (popular principles) পর্য্যাপ্ত প্রচারের সুবিধার জন্য ব্যক্তিস্ব বাদের (Individual principles) পরি

রক্ষক ও মূর্ত্যন্তর নেপোলিয়ন ইউরোপ হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন।

আর এক জন—কবিত্বের নেপোলিয়ন্—একই সময়ে অভ্যুদিত হন। প্রকৃতি যেন দৃশ্যমান প্রকাণ্ড প্রতিকৃতি-নিচয়ের গভীর অনুভূতি ও তাহাদিগের সহিত তন্ময়ত্ব প্রাপ্তির জন্যই তাঁহার সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি বাহ্য জগতের উপর ইতস্ততো দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু সে দৃশ্যে পরিতৃপ্ত হইলেন না।

বাহ্যজগৎ দর্শনে হতাশ হইয়া তিনি নিজ অন্তর্জগতের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, এবং তাহার গভীরতম প্রদেশে অবরোহণ করিয়া গূঢ় গণনায় নিমগ্ন হইলেন। তথায় সমস্ত জগতের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইলেন—দেখিলেন যেন একটী প্রকাণ্ড আগ্নেয় পর্ব্বত অবস্থিত রহিয়াছে, তথা হইতে দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয় সকল ভীষণ ধাতুনিঃস্রব ও অগ্নিশিখা উদ্গীরিত করিতেছে; যথেচ্ছাচার সমাজকে যে শোচনীয় অবস্থায় আনীত করিয়াছে, এবং পোপ ও যাজকমণ্ডলী ধর্ম্মকে যে কলঙ্কিত আকার প্রদান করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন উত্থাপিত হইয়াছে; মানবজাতি যেরূপ অবনত বিকৃত ও সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে ভীষণ ভ্রূকুটী আবদ্ধ হইয়াছে। তিনি মানবের সেই সকল ক্রন্দন শুনিলেন, এবং নানা সুরে কিন্তু একই তীব্রতা একই বলে, সেই গুলি গাইলেন; এবং সৃষ্টির কার্য্যের বিরুদ্ধে সেই ক্রন্দনের অভিসম্পাত প্রদান করিলেন।

ইহার ফল বিশুদ্ধ ব্যক্তিগত কবিতামালার উৎপত্তি—ব্যক্তিগত হৃদয়োচ্ছ্বাসে ও ব্যক্তিগত প্রতিবিম্বে পরিপূর্ণ এক প্রকার কবিতা—যাহার মূল মানব সাধারণে নাই, এবং যাহাতে কোন ব্যাপক বিশ্বাস নাই।

ইহাই নেপোলিয়নের পতনের মূল; ইহারই জন্য বাইরন্ বিস্মৃতি-সাগরে ডুবিলেন। সেণ্ট্ হেলেনা ও মিসোলঙ্গি সমাধির অভ্যন্তরে অতীত সময়ের সেই দুইটি পূর্ণ ধ্বংসাবশেষ নিহিত আছে। নেপোলিয়নের পর—ইউরোপে যথেচ্ছাচার-প্রণালী পুনঃ প্রতিষ্ঠাপন করিতে, বিজয় দ্বারা ইউরোপীয় জাতি-সমূহকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে এবং সভ্যতার অনুমোদিত মতের স্থলে নিজের মতের অবতারণা করিতে, আর কাহার সাহস হইবে? আবার বাইরণের পর—তদীয় কর্সেয়ার, লারা, ম্যান্‌ফ্রেড প্রভৃতির প্রচারের পর—কে, বিনা জঘন্য অনুকরণে, এমন একটী মানব-প্রতিকৃতি সংগঠনে সমর্থ, যাহা সামাজিক মানব অপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক্?

নেপোলিয়ন্। আর তোমায় আমরা চাহিনা; তোমার অনিয়ন্ত্রিত বলবতী ইচ্ছা, ইউরোপীয় জাতি সমূহের উপর তোমার অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী ক্ষমতা, তোমার গভীর ও অবিচলিত মনঃসন্নিবেশ, তোমার শিরঃকম্পনের আকর্ষক শক্তি—যে কম্পনে একদিন অগণিত জনরাশি উন্মত্তের ন্যায় কার্য্যক্ষেত্রে প্রধাবিত হইত—, তোমার

সামরিক যথেচ্ছাচার, এবং জাতীয় শুভ-নিরপেক্ষ সামরিক কীর্ত্তিকলাপ—এসমস্তে আমাদিগের এখন আর কোন প্রয়োজন নাই; সুতরাং ইহাদিগের নিকটে এক্ষণে আমরা বিদায় চাই। ব্যক্তিবিশেষের নিকট আমরা বিদায় চাই। এখন সময় আসিয়াছে, যখন লোকে আপনাদিগের কর্ত্তব্যনিচয় আপনারা সম্পাদন করিতে শিখিয়াছে। এখন জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সমস্ত ইউরোপ উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা বাইরন্‌কেও আর চাহিনা। তাঁহার প্রকাণ্ড প্রতিকৃতি-সৃষ্টি, ও অদৃষ্টের সহিত সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ ব্যক্তিবিশেষের মূর্ত্তিকল্পনা দেখিতে, এবং জগৎ শূন্য মরুভূমি সদৃশ, ও কষ্ট যন্ত্রণাই বিশ্বের নিয়ম—ইত্যাদি ক্রন্দন শুনিতে চাহিনা।

বসুন্ধরা এক্ষণে আর মরুভূমি নাই। স্বাধীনতার নামে এখন ইহা বীরনিচয়ে পরিপূর্ণ হইয়াছে। নবযুগ ধীরে ধীরে বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়া কবিদিগের নয়ন-সমক্ষে উপস্থিত হইতেছে। যাহার জীবন পারিবারিক দুঃখযন্ত্রণায় ভারস্বরূপ হইয়াছে, সে এক্ষণে দেশের জন্য সগর্ব্বে জাতীয় স্বাধীনতা-সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারিবে।

যে কবিতা জাতীয় জীবন সঙ্কীর্ত্তন করে, এবং যাঁহাদিগের জীবন জাতীয় কার্য্যে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে তাঁহাদিগের যশোগান করে, সেই কবিতাই অনন্ত-কাল-স্থায়িনী হয়।

সম্প্রতি এই মত প্রথমে ফ্রান্স এবং ফ্রান্স হইতে ক্রমশঃ ইউরোপের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে যে—এক্ষণে কবিত্ব নির্ব্বাণপ্রায়; এবং কল্পনা, সৃষ্টি ও উৎসাহোন্মাদ মৃতপ্রায়। সমস্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়েরই এই মত। পৃথিবীতে যে—কোনপ্রকার সুখ আছে অথবা কোন আশা ভরসা আছে, তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন না। তাঁহাদিগের মতে মানব জাতি কেবল দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিবার জনাই যেন পৃথিবীতে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে। যেন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া ভিন্ন মানবজাতির ইহ জগতে অন্য কোন কার্য্য নাই।

এই সকল মত পাঠ করিলে হৃদয়ে যেন এক প্রকার শূন্য ও উদাস ভাব উদিত হয়; যেন শ্মশানের ভীষণ মূর্ত্তি আমাদিগের নয়ন-সমক্ষে অবতারিত হয়; মানবীয় বস্তুমাত্রেরই উপর গভীর বিদ্বেষ ভাব বদ্ধমূল হয়; জীবন শুষ্ক ও নীরস হয়; এবং কোন কার্য্যেই প্রবৃত্তি থাকে না।

কিন্তু মানব জাতির ভবিষ্য অদৃষ্টের উজ্জ্বলতার উপর আমাদিগের অবিচলিত বিশ্বাস; সুতরাং কবিত্বের অস্তিত্বেও আমাদিগের পূর্ণ বিশ্বাস। জন্মপরিগ্রহ করিয়া মানবমাত্রই কতকগুলি কর্ত্তব্য নিচয়ে আবদ্ধ হয় এবং সেই সকল কর্ত্তব্যের সংসাধনে যে গুরুতর মহত্ত্ব আছে, ও আত্মবিসর্জ্জনে যে অলৌকিক ঔদার্য্য আছে, তাহা আমরা বিশ্বাস করি। স্বদেশ ও স্বজাতি

যে ধর্ম্মের মধ্যবিন্দু, পৃথিবী ও মানব জাতি যে ধর্ম্মের পরিধি; স্বাধীনতা, একতা ও বিশ্ব-প্রেমিকতা যে ধর্ম্মের ব্যাসার্দ্ধত্রয়,—সে ধর্ম্মে আমাদিগের অচলা ভক্তি ও দৃঢ় বিশ্বাস। এ ধর্ম্মের সমস্তই কবিত্ব-পূর্ণ। যে যে দেশে আক্রান্ত অধিকারনিচয়ের বিরুদ্ধে জাতীয় ক্রোধ উদ্দীপিত হয়, সেই সেই দেশেই কবিত্ব; যে দেশেই জাতীয় ক্রন্দনের শক্তি অনুভূত ও অনুপেক্ষিত হয়, সেই দেশেই কবিত্ব; যে দেশেই জাতীয় স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য অসংখ্য বীরপুরুষ প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারেন, সেই দেশেই কবিত্ব। জগতে এমন পদার্থ নাই, যাহাতে কবিত্ব নাই। ইহা সৌর কিরণের ন্যায় সকল পদার্থের উপরই পতিত হয়, এবং সকল পদার্থের সহিতই বিমিশ্রিত হয়। ইহার ঐকতানিক শক্তি কাব্যদেবীর বীণার প্রতি তারের সহিত মিশাইয়া আছে, কবির উন্মেষকারী করস্পর্শেই কেবল তাহা উদ্দীপিত ও স্ফুরিত হয়।

প্রত্যেক মানব হৃদয়েই কবিত্বের উপাদান সকল নিহিত আছে, তাহাকে উদ্বোধিত করিতে কেবল গভীর হৃদয়োচ্ছ্বাস চাই। যে দেশ এত কষ্ট পাইয়া আবার উঠিতেছে, সে দেশে সে হৃদয়োচ্ছ্বাসের অসদ্ভাব হইবে বোধ হয় না।

যত দিন যাইবে ততই এই কবিত্বের পরিণতি ও পরিপুষ্টি সংসাধিত হইবে। কবিত্বই মানবের জীবন, কবিত্বই মানবের গতি, কবিত্বই মানবের কার্য্য-প্রবৃত্তির প্রধান উদ্দীপক, কবিত্বই তমসাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ-পথের একমাত্র ধ্রুবতারা, কবিত্বই উদ্ভ্রান্ত জাতিনিচয়কে মরুভূমির মধ্য দিয়া লইয়া যাইবার একমাত্র অগ্নিস্তম্ভ, কবিত্বই মূর্ত্তিমতী উদ্দীপনা, কবিত্বই আমাদিগের উদাত্ত চিন্তানিচয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, কবিত্বই আমাদিগের আত্মত্যাগের উপদেশক। কে বলে কবিত্ব মরিয়াছে? না, কবিত্ব মরে নাই, কবিত্ব অমর; কবিত্ব প্রেম ও স্বাধীনতার অনন্ত উৎসের ন্যায় অজর। রমণীয় নব্য ইউরোপকে অনুপ্রাণিত করিবার জন্যই কবিত্ব প্রাচীন ইউরোপকে পরিত্যাগ করিয়াছে। চাতক যেমন আশ্রয়ভূত অট্টালিকা পতনোন্মুখ হইলে তাহা পরিত্যাগ করিয়া উজ্জ্বলতর আশ্রয় ও নির্ম্মলতর আকাশের অনুসরণ করে, সেইরূপ কবিত্ব পূর্ব্বাশ্রয় প্রাচীন ইউরোপকে পরিত্যাগ করিয়া উজ্জ্বলতর ও নির্ম্মলতর নবীন ইউরোপের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ইহা এখন রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া মানবজাতিসাধারণরূপ অসীম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহা এক্ষণে রাজবৃন্দের জয়োদ্ঘোষণ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশ ও স্বজাতির কার্য্যে উৎসর্গীকৃতজীবন বীরবৃন্দের জয়স্তোত্র আরব্ধ করিয়াছে।

এই নবীন কবিত্বের বলেই ফরাশি জাতীয় সভার আদেশে সাধারণ-তন্ত্রিণী সেনা আভ্যন্তরীণ বিবাদ, ভীতি ও দারিদ্র্য সত্ত্বেও—রিক্ত পদে ও জীর্ণ বস্ত্রে,

প্রাচ্য সীমাভিমুখে প্রধাবিত হইয়াছিল; তাহাদিগের মুখে 'স্বাধীনতা' রব, উষ্ণীষে জাতীয় ককেড্‌,-করে উজ্জ্বল বেয়নেট্‌ এবং অন্তরে দুর্জ্জেয় বিশ্বাস।

এই নবীন কবিত্বের মোহিনী শক্তিতে উদ্দীপিত হইয়াই স্পেনের পার্ব্বতীয় গেরিলা সেনা নেপোলিয়নের অজেয় সেনারও গতিরোধ করিয়াছিল। পর্ব্বতে পর্ব্বতে ইহার ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইয়াই লোক-সাধারণকে বৈদেশিক উৎপীড়কের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিল।

এই নবীন কবিত্বে জর্ম্মণী পরিপ্লাবিত হইয়াছে। ইহা এখানে একটি পবিত্র ধর্ম্মের আকার ধারণ করিয়াছে। ইহারই উদ্দীপনায় জর্ম্মান্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া এবং গৃহের মমতায় জলাঞ্জলি দিয়া সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়াছিল।

যে কবিত্বের জন্মদিন এরূপ অমানুষী অবদান পরম্পরায় উদ্ভাসিত হইয়াছে, সে কবিত্বের কি এরূপ অসময়ে বিলয় সম্ভব? ব্যক্তি বিষয়ক কবিত্বের সহিত কি এই জাতীয় কবিত্বের তুলনা আছে? ব্যক্তিগত কবিত্ব সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ থাকিয়া, রাজপ্রাসাদ দেবমন্দির বা কোন প্রাচীন বংশের সঙ্কীর্ত্তনে নিরত থাকিবে; এবং যে সঙ্কীর্ণ সীমায় তাহার উৎপত্তি সেই সঙ্কীর্ণ সীমাতেই তাহার লয় হইবে। কিন্তু সেই গম্ভীর, স্থির, বিশ্বাস-পূর্ণ জাতীয় কবিত্ব—অসীম জগৎ ও অনন্ত মানব জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া জগতে এক নূতন যুগের অবতারণা করিবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিবৃন্দ কি এখনও নেপোলিয়ন-তনয় বা বোর্ব্বো-রাজকুমারের যশোগান করিয়াই পরিতৃপ্ত থাকিবে? পোলণ্ড—পবিত্রতার আধার, ও ঔদার্য্যের আবাসভূমি—পোলণ্ডের যে আর্ত্তনাদে সাইবীরিয়ার নির্ব্বাসনপথ প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, সেই আর্ত্তনাদে কি কেহই উদ্দীপিত হইবেন না?

যে সহস্র সহস্র নির্ব্বাসিত ব্যক্তি অদৃষ্টের অদ্ভুত মহিমায় ফরাশি-ক্ষেত্রে আসিয়া মিলিত হইয়া ভবিষ্য প্রকাণ্ড ইউরোপীয় মহাসভার সূত্রপাত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের দুঃখের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারেন, উপরোপে এমন কি একজনও কবি নাই?

অনন্ত উন্নতির দিকে মানব-হৃদয়ের এই অক্লান্ত জিগমিষা; বিশ্বব্যাপী সম্মিলনের জন্য মানবজাতির এই দুর্দ্দমনীয় স্পৃহা; যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে জাতিসমূহের এরূপ অনন্ত যুদ্ধ-ঘোষণা, অপহৃত স্বত্বনিচয়ের পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁহাদিগের এরূপ অক্লান্ত চেষ্টা; লৌকিক অভ্যুত্থানের সমক্ষে প্রাচীন রাজবংশ সকলের এরূপ পতন; নূতনের জন্য এরূপ অশ্রান্ত অন্বেষণ; প্রাচীন ইউরোপ হইতে এরূপ অপূর্ব্ব নবীন ইউরোপের সৃষ্টি; অধিক কি শ্মশান-ভস্ম হইতে এরূপ উজ্জ্বল জীবনের উৎপত্তি—এ সমস্ত কি কবিত্ব নয়?

ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিবৃন্দ! আপনারা অনন্ত ভবিষ্যতের মূর্ত্তি পরিকল্পনা করুন্। কেন আপনারা অতীতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন? অতীতের সহিত আপনাদিগের কোনও সম্বন্ধ নাই। ভবিষ্য পুরুষ-পরম্পরার ভাবী যশ কীর্ত্তন করুন্; বিশ্বপ্রেমিকতা স্বাধীনতা এবং উন্নতির পবিত্র নামে পুনরুজ্জীবিত জাতি সকলের নির্ব্বাণ-প্রায় বীর্য্য-বহ্নির সন্ধুক্ষণ করুন্। ইতস্ততঃ ও সম্মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন্, দেখিবেন সমস্ত ইউরোপ আপনাদিগের মুখ পানে চাহিয়া আছে। ভবিষ্যতের গভীর তমসাচ্ছন্ন গহ্বরে নামিয়া ভবিষ্য ঘটনাবলীর আবিষ্কার করুন্।

স্বদেশীয় কবিবৃন্দ! আমাদিগের জন্য জাতীয় সমরের উপযোগী গীতিমালা প্রস্তুত করুন; সেই গীতিরবে উত্তেজিত হইয়া ইতালীয় যুবকমণ্ডলী যেন অষ্ট্রিয় প্রভুশক্তিকে ইতালীক্ষেত্র হইতে বিদূরিত করিতে পারে; যেন সেই জাতীয় সঙ্গীতমালা ভীষণ কালস্রোত অতিক্রম করিয়া অনন্ত ভবিষ্যতে চিরসংলগ্ন হয়!!

ক্রমশঃ।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

সুধীরঞ্জন—৺দ্বারকানাথ অধিকারী প্রণীত ও তৎপুত্র শ্রীনীলরত্ন অধিকারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ৷৵৹ আনা মাত্র। দ্বারকানাথ অধিকারী কৃষ্ণনগর কালেজের একজন ভূতপূর্ব্ব বিখ্যাতনামা ছাত্র। কৃষ্ণনগর কালেজের দ্বারকানাথ অধিকারী, হুগলী কালেজের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও হিন্দু কালেজের দীনবন্ধু মিত্র ঈশ্বর গুপ্তের সময় প্রভাকরে এক ঘোরতর কবিত্ব-যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এরূপ প্রবাদ যে—এই কবিত্ব-দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে অধিকারী মহাশয়েরই জয়লাভ হয়। যাহা হউক ইহা প্রায় স্থির যে অধিকারী মহাশয় কবিত্ব-শক্তিতে বঙ্কিম বাবু বা দীনবন্ধু বাবুর ন্যূন ছিলেন না। দুর্ভাগ্য বশতঃ অধিকারী মহাশয় অকালে মৃত্যু-মুখে পতিত হওয়ায়, তাঁহার বীণা অসময়েই নীরব হয়। অধিকারী মহাশয় জীবিত থাকিলে যে এতদিন বঙ্কিম বাবু ও দীনবন্ধু বাবুর ন্যায় সাহিত্য-জগতে অশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিতেন তদ্বিষয়ে অল্প সন্দেহ।

অধিকারী মহাশয়ের কবিতাগুলি সদুপদেশ-পূর্ণ, কিন্তু প্রায় অধিকাংশই রূপক। এইজন্য সুকুমারমতি বালকদিগের পক্ষে দুর্ব্বোধ, কিন্তু ছাত্রবৃত্তিপরীক্ষার্থী বা

নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্রদিগের বিশেষ উপযোগী। সুধীরঞ্জনের শেষ প্রবন্ধটী "বঙ্গভাষার সহিত ইংরাজী ভাষার কথোপকথন"। এটী অতি সুন্দর। ইহার গদ্যাংশও অতি সুললিত ও মুগ্ধকারী। ইহার পদ্যাংশ হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল:—

বঙ্গভাষার উক্তি।

পয়ার।

কি ভয় দেখাও তুমি আর বার বার।
চাঁদে কি করিবে প্রিয় প্রভাকর যার॥
সে যদি আপন কর না করে প্রকাশ।
শশী কি কখন পারে শোভিতে আকাশ॥
কি কারণে তোষামোদ করিব সকলে।
পিপাসা যাবে না কভু গোষ্পদের জলে॥
বিশেষতঃ বারি বিনে কিছু নাই ডর।
একাকী ঈশ্বর মম বিদ্যার সাগর॥
তার যদি জননীর প্রতি থাকে টান।
ত্বরায় উঠিবে মম যশের তুফান॥
কালে না পারিবে কিছু করিতে আমার।
পেয়েছি কপাল গুণে অক্ষয় কুমার॥
তাহার বাসনা সবে শুনিবারে পায়।
অক্ষয় যশের মালা পরাইবে মায়॥

ইংরাজি ভাষার উক্তি।

এরা সুলেখক বটে মানিগো সুন্দরি।
তুষিবে তোমার মন প্রাণপণ করি॥
কিন্তু ইহাদের মাঝে কেহ কবি নয়।
কোথা পাবে মনোহর ভাব সমুদয়॥
কবিতা-লেখক তব পুত্র ছিল যারা।
কাল সহকারে আঁখি মুদিয়াছে তারা॥

বঙ্গভাষার উক্তি।

কবির অভাব কিসে দেখিলে আমার।
দুই জন আছে দেশ-বিখ্যাত কুমার॥
সুকবি সুন্দর মম মদন-মোহন।
পড়িলে কবিতা তার মুগ্ধ হয় মন॥
প্রাণের ঈশ্বর গুপ্ত প্রভাকর-কর।
মুদিয়াছে কিবা দৈব শক্তি মনোহর॥
চাহিলে তপন পানে দুনয়ন ধরে।
যুড়ায় যুগল আঁখি তার প্রভাকরে॥

ইংরাজী ভাষার উক্তি।

ভাল আশা সুবদনি করিয়াছ মনে।
বাড়াবে তোমার মান এরা দুইজনে॥
এতদিন তুমি কিগো করনি শ্রবণ।
মদন কবিতা আর করে না রচন॥
ক্রমে ক্রমে তার যত বাড়িতেছে পদ।
তোমায় ভাবিছে মনে বালাই আপদ॥
তোমার ঈশ্বর গুপ্ত কবিতা বচক।
লোকের হিতের হেতু লেখেনা পুস্তক॥
আর এক অলক্ষণ দেখি প্রতিদিন।
দেশের অনেক লোক দ্বেষের অধীন॥
সহজেই গুণগ্রাহি নাহি হেন জন।
সমাদর করি তোষে লেখকের মন॥

উত্তরপাড়া হিতকরী সভার চতুর্দ্দশ বাৎসরিক বিবরণ—১৮৭৬—৭৭ খৃঃ। যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের যন্ত্রে মুদ্রিত। প্রথম পৃষ্ঠায় মুরুব্বি-স্থলে লর্ড নর্থব্রুকের পরিবর্ত্তে লর্ডলীটনের নাম পরিদৃষ্ট হইল। আমরা আহ্লাদিত হইলাম লীটন বাহাদুর সভার কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট

হইয়া সভার উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ এককালীন ২০০ শত টাকা দান করিয়াছেন। সভা ও বঙ্গদেশ এই জন্য তাঁহার নিকট ঋণী রহিল।

আমরা পূর্ব্ব বৎসরেই বলিয়াছি—দীন ও অনাথ বালকদিগের শিক্ষা বিধান, পীড়িত দীনদুঃখীদিগকে ঔষধ বিতরণ, দরিদ্র বিধবা ও অনাথ বালকদিগের ভরণ পোষণ, স্ত্রীশিক্ষার উৎসাহ বর্দ্ধন এবং উত্তরপাড়া ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সকলের সামাজিক নৈতিক ও মনোবৃত্তিবিষয়ক উৎকর্ষ সাধন প্রভৃতি উদার কার্য্য সকল ইহার লক্ষ্য। সভার এই মহতী লক্ষ্য-পরম্পরা যে কত দূর কার্য্যে পরিণত হইয়াছে তাহা সভার কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলেই অবগত হওয়া যাইতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই কার্য্য-বিবরণ বৈদেশিক ভাষায় লিখিত হওয়ায় সাধারণের তাহা অবগত হওয়ার নিতান্ত অসুবিধা। হিতকরী সভার মহৎ দৃষ্টান্তে উত্তেজিত হওয়া দেশীয় লোক-সাধারণের পক্ষে একান্ত অসম্ভব। শুদ্ধ গবর্ণর জেনেরল বা দুই চারি জন সাহেবের অসুবিধা নিরাকরণের জন্য বঙ্গবাসি-সাধারণকে অন্ধকারে রাখা কোন মতেই সঙ্গত বোধ হয় না। আমরা গত বারই এই বিষয়ে বলিয়াছি এবারও বলিলাম। কিন্তু অরণ্যে রোদনের ফল কিছুই নাই।

হিতকরী সভা ভারতবন্ধু জষ্টিস ফিয়ারকে যে অভিনন্দন পত্র খানি দিয়াছিলেন তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে। পরলোকগত মহাত্মা বেথুনের ন্যায় ফিয়ারের নাম ভারত-বক্ষে অক্ষয় অক্ষরে অনন্ত কালের জন্য লিখিত থাকিবে। জষ্টিস্ ফিয়ার এই অভিনন্দনের যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা ভারত-হিতৈষণা বিনয় ও সৌজন্যে পরিপূর্ণ। সভা বিখ্যাতনামা কর্ণেল ম্যালিসন্‌কেও এই রূপ আর একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছিলেন। সভা যে সকল গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তন্মধ্যে স্ত্রী শিক্ষার বিস্তৃতি সাধন গুরুতম। এবিষয়ে সভার নিকট বঙ্গদেশ বিশেষ ঋণী।

সাহিত্য-বোধ—প্রথমভাগ। শ্রী ঈশানচন্দ্র রায় প্রণীত। ময়মনসিংহ ভারতমিহির যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য।৵০ আনা মাত্র। ইহাতে অসুচিত সুখ-ভোগ ও তাহার ফল, কুসংস্কার, পরিচ্ছন্নতা, রামের বনগমন, বায়ু, পারিবারিক সুখ, আশ্চর্য্য পক্ষী, উপার্জ্জন, আশ্চর্য্য বৃক্ষ, প্রবৃত্তির অনুযায়িনী শিক্ষা, মেঘ ও বৃষ্টি, শিষ্টাচার ও শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর!—এই কয়েকটী প্রস্তাব লিখিত আছে। আমরা মেঘ, বৃষ্টি, বৃক্ষ, পক্ষী ইত্যাদি প্রস্তাবের সহিত বিদ্যাসাগরের জীবনীর সংমিশ্রণ দেখিয়া গ্রন্থকর্ত্তার রুচির প্রশংসা করিতে পারিলাম না। এরূপ সংমিশ্রণ আমরা পূর্ব্বে আর কোন ভাষাতেই দেখি নাই। গ্রন্থ খানির স্থানে স্থানে অক্ষয়কুমার দত্তের অনুকরণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়।

গ্রন্থকার লিখিয়াছেন বালক বালিকাগণের নীতি ও ভাষার সহায়তা করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। আমাদিগের বিশ্বাস সে উদ্দেশ্য কিয়ৎ পরিমাণে সংসিদ্ধ হইয়াছে।